ভারত ও এশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা

অধ্যাপক সুধীর চন্দ্র রায়

নলেজ হোম • কলিকাতা-৬

ইস্কুলের ইতিবৃত্ত—প্রাচ্যখণ্ড

ভারত ও এশিয়ার শিক্ষাব্যবস্থা

*

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় এম এ (বাংলা), বি-টি, এম-এ (শিক্ষাবিজ্ঞান)

অধ্যাপক ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ

কলিকাতা

॥ নলেজ হোম ॥

৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক :
শ্রীশান্তি কুমার মজুমদার বি. এ.
নলেজ হোম
৫৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৬

প্রথম সংস্করণ, জুলাই— ১৯৬০

মূল্য ঃ আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

১। বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি
২। ইস্কুলের ইতিবৃত্ত
(ইয়োরোপ ও আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা)
৩। কাচামাটি (গল্পগ্রন্থ)
৪। ইস্কুল (স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক)।

মুদ্রাকর :
শ্রীসমীর কুমার মজুমদার, এম. এস-সি.,
বেঙ্গল প্রিণ্টার্স
১১৭/১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১২

ভূমিকা

ভারত ও এশিয়াব শিক্ষাব্যবস্থা 'ইস্কুলের ইতিবৃত্ত' পর্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ড। পূবেকার গ্রন্থ দুটি (বাংলা পড়ানোর নূতন পদ্ধতি এবং ইস্কুলের ইতিবৃত্ত) শিক্ষকসমাজ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিশেষ সমাদর পেয়েছে। তাঁদেরই উৎসাহ পেয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।

শিক্ষা ইতিহাসের ইংরেজি গ্রন্থে শিক্ষার কাল সাধাবণত গ্রীক-রোম থেকে স্থরু করা হয়। কিন্তু অন্যত্র অন্যদেশের শিক্ষার পবিচয় কিছু কিছু তাঁরা দিয়েছেন, ইংরেজি পাঠকের কোন অস্থবিধা হয় না। কাবণ তাঁবা ভূবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, সমাজ-মানব বিজ্ঞান থেকে অনেক পরিচয় পেয়ে থাকেন। বর্তমান যুগে এশিয়ার অন্য দেশেব শিক্ষা ইতিহাসের কথা বিশেষ ভাবে সন্ধান নিয়ে গবেষকেরা লিখতে স্থরু কবেছেন।

আমি তাঁদেরই পুস্তক আলোচনা কবে বাংলাতে এইরূপ গ্রন্থ লিখলাম মাত্র। নিজস্ব মতেব কথা তখনই জানিয়েছি যখন বিভিন্ন লেখকের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য পাইনি।

ভারত সম্পর্কে বেশি আলোচনা করতে হল। ভাবতের শিক্ষা সম্পর্কে বাংলা ভাষায় খুব প্রচাব না থাকায়, দেখতে পাওয়া গেছে, বাংলা পাঠকের কাছে ভারতের শিক্ষার রূপ খুব প্রত্যক্ষ বা স্পষ্ট নয়।

এই আলোচনার কাল আমি নিয়েছি নূতন প্রস্তর যুগ থেকে।

নলেজ হোমেব শ্রীযুক্ত শান্তিকুমার মজুমদার এবং বেঙ্গল প্রিণ্টার্সের শ্রীযুক্ত সমীব মজুমদাবেব সহায়তা ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

নিজের অসাবধানতার দরুণ কিছু কিছু ছাপার ভুল থেকে গেছে। সেই ভুলগুলি পাঠক নিজেরাই বুঝে নিতে পারবেন। তবে দুটি ভুলের কথা উল্লেখ করতেই হয়। 'শিম্পাঞ্জী' কেমন করে যেন 'শিম্পাজী' হয়ে গেছে; আর, ৬৪ পৃষ্ঠার ১৯ পংক্তিতে 'বুদ্ধদেব অর্থনৈতিক'—এর পর অযথা দাঁড়ি চিহ্ন পড়ে গেছে॥

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

গোড়ার কথা

এশিয়ার কথা বলতে গিয়ে মহাভারতের সেই বকরূপী ধর্মের কথা মনে পড়ে। কি এমন প্রশ্ন তার যার উত্তর চারটি মহাবীরও দিতে পারল না; আর তার মধ্যে অর্জুন নিজেও ছিল; এই অর্জুনের কাছেই তো ঈশ্বর তাঁর বিশ্ব-পরিচয় দিয়েছিলেন?

এশিয়ার প্রশ্নও অনেক। বিদ্যা এখানে যেন হার মেনে যায়। জাভা মানুষ, পিকিং মানুষ মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডারে অনেক প্রশ্ন এখনও রেখেছে, তার উত্তর মেলেনি। জগতের বণিকেরা নতুন সভ্যতা আর বাণিজ্যে এশিয়াকে পর্যুদস্ত করেছে বটে, কিন্তু মনীষীরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন এশিয়া মহাদেশই মানুষের সূতিকা-গৃহ (On the whole, the evidence for Asia as the 'cradle of humanity' seems somewhat more impressive—Mc Gregor)।

আর মানুষেরই হচ্ছে সমাজ, সমাজের ধর্মই হচ্ছে ইস্কুল। অতিকায় হাতিটির মতো তুষার যুগে মানুষ গায়ে পশম তৈরী করবার তাগিদে প্রজনন শক্তি-পঙ্কে প্রভাব বিস্তার করেনি, সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করেই বেঁচে গেল; আর এই নিয়ন্ত্রণ করবার শিক্ষা যুগে যুগে অব্যাহত রেখে মানুষ ধাপে ধাপে এগিয়ে চলল। এক পুরুষ অন্য পুরুষকে সেই শিক্ষা দিয়েছে, সেই পুরুষ আবার যুগের উপযোগী ক'রে তার অভিজ্ঞতাকে বদল ক'রেছে, সঞ্চারিত করেছে।

এই শিক্ষা যখন অনুষ্ঠানগত হ'ল তখনই ইস্কুল এল। কাজেই ইস্কুলের রূপটি বড় নয়, মুখ্য হচ্ছে ইস্কুলের উদ্দেশ্য আর বস্তু।

ইস্কুলের উদ্দেশ্য মানুষের ইতিহাসে কেমন ক'রে এসে পড়ছে—গোড়াকার কথায় তারই একটা হিসাব নেওয়া যাক।

এই হিসাবের প্রথমেই একটি প্রশ্ন জড়িত হয়ে পড়ে। শিক্ষা-সূত্র সম্পর্কে থর্ণডাইক থেকে সুরু ক'রে কাফ্‌কা-কুহ্‌লার যাদের নিয়ে গবেষণা করেছেন, সেই ইঁদুর, বিড়াল, মাছ, শিম্পাজী বানরের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মানুষের কি শিক্ষানীতি মিলবে?

মিলছে যে না, তা কিন্তু মানুষের চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে প্রথম যারা এল তাদের কায-প্রণালীতেই মনে হয়।

বাংলায় একটা বিদ্রূপ আছে, 'গাছেরও খাব, তলেরও কুড়োব।' এই বিদ্রূপটিই একটি ঘটনা হয়ে প্রথম মানুষকে কেবল পশুদেব থেকেই নয়, মৌল সহ-জ (Primate) থেকেও দুর্জয় ক'রে তুলেছিল। সে যেমন আগুনের মতো সর্বভুক ছিল, তেমনি গাছেরও খেত তলেরও কুড়োত, (The early proto-human, at first equally at home in the branches of trees or on the ground, may have found the terrestrial habit increasingly to his advantage.—Mc Gregor)।

সব্যসাচীর মতো কেবল দুই হাতের ব্যবহারেই নয়, মানসিকতার দিক দিয়েও এই যে দুই দিকে অভিযান-প্রবণতা, তাই থেকেই তাকে পাহাড়ে কন্দরে ছুটতে হয়েছে। পায়ের জোর বেড়েছে, হাত মাটী ছাড়া পেয়েছে। হাত যখন স্বাধীন হ'ল, তখন চোখ আর মাথার শক্তি বাড়ল (Elliot—The Evolution of Man)।

বর্তমান মানুষেব মতো মানুষ পৃথিবীতে এল বোধ হয ৮০০০ বছর আগে। কিন্তু সে যে শিম্পাঞ্জী ওরাং-উটাং থেকে স্বতন্ত্র তাব পবিচয় দিয়েছে সে আরও আগে, প্লেইস্টোসিন যুগে।

প্লেইস্টোসিন যুগ ধরা হয় আনুমানিক ৫০০,০০০ থেকে ১,৫০০,০০০ বছর আগে। আর জাভা মানুষ, পিকিং মানুষের বযস ৫০০,০০০ বছরেবও সীমা পেরিযে। এ সময জাভার সঙ্গে এশিযা মূল ভূখণ্ডের মাটীর যোগ ছিল। এ ছাড়া আছে সাসেকস-এব পিল্‌টডাউন আর জার্মানীব হিডেলবার্গ এবং নিয়ানডার্থাল মানুষ। তাদের বয়সও ১৫০,০০০ বছর।

৩৫,০০০ বছর আগে যুরোপের শেষ তুষাব যুগ শেষ হল। তখনও নিয়ানডার্থাল মানুষ ছিল। কিন্তু ৩০,০০০ থেকে ২৫০০০ বছর আগে এই আমাদেরই মতো স্বাভাবিক মানুষের হাতে তাদের নির্বাণ ঘটল। কিন্তু কেমন ক'রে তাদের মোক্ষলাভ ঘটল, নতুন মানুষ কারা, তাদের দেশ কোথায়—প্রভৃতি নিযে নানা মুনির নানা মত। অনেকে বলেন, নতুন মানুষের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে নিয়ানডার্থাল যে একেবারে কর্পূরের মতো উবে গেল তা নয, ওবা নতুন মানুষের সঙ্গে মিশে সঙ্কর হয়ে গেল।

অনেকেই স্থির করেছেন, এই নতুন মানুষ ইয়োরোপে এসেছিল হয় উত্তর আফ্রিকা থেকে, না হয় এশিয়া থেকে।

ভূমধ্যসাগরের তীরে গ্রিমল্ডি (Grimaldi) জাতির যে মাতাপুত্রের কঙ্কাল পাওয়া গেছে তার সঙ্গে নিগ্রোর অনেক মিল। এই গ্রিমলডিরা ক্রো-মাঁঞ মানুষ (Cro-Magnon)। এরা অস্ট্রালয়েড শাখার। অনুমান করা হয়, অস্ট্রালয়েড্‌রা দক্ষিণ এশিয়া থেকে বেরিয়ে একদল গেল অস্ট্রেলিয়ার দিকে, আর একদল পশ্চিমের দিকে অর্থাৎ ইয়োরোপ আর আফ্রিকাতে। এরাই হচ্ছে নতুন মানুষ। কেবল ইয়োরোপ আফ্রিকাতেই নয়, আমেরিকা-তেও এরা ছড়িয়ে পড়ল, (The first man to arrive in North America was of modern type and probably at the Neolithic stage of culture. He came from north-eastern Asia to Alaska and probably spread along the eastern foot of the Rocky Mountains where an ice-free corridor had formed some 20,000 to 15000 years ago. He seems to have reached the South-west at the age of transition between the pluvial and post pluvial epochs, or roughly 12000 years ago. —E. Antevs)।

নৃতত্ত্ববিদদের এই ইতিহাস-পরিচয় থেকে একটি কথা খুব স্পষ্ট যে, একটি জনসমষ্টি অপর জনসমষ্টির উপর অধিকার বিস্তার করবার মতো ক্ষমতা রাখে—আর বিজিত জনসমষ্টি বিজয়ীদের সঙ্গে মিশে গিয়ে বাঁচবার বুদ্ধি পায়। কিন্তু জনসমষ্টিই কেবল তারা নয়, তারা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে না শিখলে এমন সঙ্ঘর্ষ আর বাঁচবার মধ্য পন্থা আবিষ্কার করতে পারত না। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ আর আয়ত্ত করবার বুদ্ধি তারা পূর্বে পেয়েছিল, এখন মনুষ্য-জাতির যে সামাজিক চাপ তাকেও উপলব্ধি করবার ক্ষমতা অর্জন করল। কেমন ক'রে সে ক্ষমতা এল ?

প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের সম্পদস্থান এবং শিল্প-সম্ভার নিয়ে তিনটি যুগ-বিভাগ করা হয়েছে। তার মধ্যে পূর্ব যুগের (Chellean) চিলিয়ান যুগ, মধ্যযুগের (Mousterian) মস্টেরিয়ান এবং শেষ যুগের (Aurignacian) অরিগ্‌নেসিয়ান এবং (Magdalenian) ম্যাগডালেনিয়ান, বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাথরের অস্ত্র নির্মাণ পদ্ধতি থেকে এই যুগ বিভাগ করা হয়। পাথরের

উপর পাথর ছুঁড়ে অস্ত্র নির্মাণ থেকে, ঘসে-মেজে অস্ত্র নির্মাণ পদ্ধতির শ্রেণী-বিভাগ ক'রে তাদের শিল্প-জ্ঞান মূলক সংস্কৃতির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। একটি পদ্ধতি থেকে অপরটিতে অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সামান্য বুদ্ধির পরিচয় দেয় না। শেষ তুষার যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই (Mousterian) মস্টেরিয়ান যুগের মানুষদের দেখা গেল। তাদের বাস ছিল পাহাড়ের গুহায়। শীতের হাত থেকে বাঁচতে হবে তো ; পাহাড় না থাকলে জানু-ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ' ; কিন্তু পাহাড় থাকলে সেখানেই ঘর বাঁধ। এরা হ'ল শিকারী। অতিকায় জন্তুদের শিকার ক'রে তাদের মাংসে প্রাণ-ধারণ করত। এই অতিকায় জন্তুদের টেনে গুহার কাছে আনা একটি মানুষের কাজ নয় ; কাজেই তাদের এই জীবনযাত্রায় পারস্পরিক সহ-যোগিতা বা যৌথ-কাজের পরিচয় দেয়। ছোট ছোট পরিবার গঠন করেই তারা বাস করত মনে হয়। কেবল এই ছোট ব্যাপারেই তাদের সমাজ-গঠনের পরিচয় পাই না। মৃতদেহ সৎকার বা কবর-দেওয়ার রীতি থেকেও তাদের পরিবার এবং সমাজের পরিচয় পাই। মৃতকে যত্ন সহকারে কবর দেওয়া হ'ত গুহার অভ্যন্তরে, অনুষ্ঠানও কিছু একটা ছিল—কারণ সঙ্গে দিত হাতিয়ার আর মাংস। একটু গরম যায়গায় তাদের প্রোথিত করা হ'ত। ঐতিহাসিক চাইল্ড তো অনুমানই করতে চান যে, হয়ত বা তারা বুঝেছিল, গরমই প্রাণ বহন করে, অগ্নির অভাবেই মৃত্যু আসে (Man Makes Himself, Page 55).

অরিগ্‌নেসিয়ান আর ম্যাগডালেনিয়ান যুগের মানুষ আরও এগিয়ে গেল অস্ত্রবিদ্যায়। তারা তীর-ধনুক তৈরী করতে শিখল। এইটিই বোধ হয় প্রথম যন্ত্র আবিষ্কার মানুষের। ধনুক বাঁকিয়ে সামান্য পেশীর শক্তিকে প্রচণ্ড বেগে যোজনা করা যায়—এই বোধ তো সামান্য কথা নয়। এ ছাড়া, তারা কেন বিশেষ বিশেষ জায়গায় তাবু নির্মাণ ক'রে বাস করত, :কত লোক মিলে শিকার করতে বেরোত—তারও পরিচয় পাওয়া যায়। এই যে যৌথক্রিয়া এই থেকেই তো তাদের নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা বাড়ছে, আর নানা আবিষ্কার করতে পারছে। শেষের এই দুই স্তরে তারা আর যাযাবর নেই। তারা ঘর-বাড়ী নির্মাণ করেই বাস করছে। এই সময় জনসংখ্যা বাড়ছে। অনেক বেশী বেড়েছে। ধনুকের সঙ্গে বর্শা ছোঁড়াও তারা শিখল। দক্ষিণ ফ্রান্সে তারা শামুক শঙ্খ আনল

কি ক'রে। কেনই বা আনল? ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে? এগুলো তো স্বাভাবিক জীবনযাত্রার আবশ্যক উপকরণ নয়, বিলাস বিশেষ। তারা গুহার গায়ে ছবি আঁকে কেন? অঙ্কনের যে দৃষ্টি তাতো বিলক্ষণ বিকশিত হয়েছে, কেমন ক'রে গভীরতা আঁকতে হয় তাও তো তারা জানে! তাদের পূর্বে তো এমন অঙ্কন-শাস্ত্র ছিল না, তবে এ ক্ষমতা তারা আয়ত্ত করল কি করে? কোন একটা ব্যবসায়বুদ্ধিই কি এর সঙ্গে জড়িত ছিল, না নিছক স্বপ্ন-বিলাস? গুহার অভ্যন্তরে আঁকাও সোজা কথা নয়। শিল্পীকে অর্ধশয়ান অবস্থায় অথবা সহচরের কাঁধে ভর দিয়ে আঁকতে হয়েছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আলোও তেমন আসে না। পাথরের প্রদীপ জ্বালাতে হ'ল। কেন এত ক্লেশ-স্বীকার? আর পরিচয় আছে তাদের নৃত্যের। অনুষ্ঠানে বা পর্বে তারা নৃত্য করত।

এরা কেবল শিকারীই ছিলনা, তারা খাদ্য-সংগ্রহকারীও বটে। খাদ্য-সংগ্রহ থেকে তারা এল খাদ্য-উৎপাদন জীবন-যাত্রায়। এই শেষটিই হচ্ছে নতুন প্রস্তর যুগ।

পশু শিকার যে আদিম-জীবনযাত্রা তা একরকম স্বীকৃত। কিন্তু পশুচারণ, বাগান করা আর কৃষিকর্ম এই তিনটির মধ্যে মানুষ কোন্‌টি যে প্রথম গ্রহণ করল তা বলা কঠিন। তেমনি বলা কঠিন, ধান, যব, বার্লি এবং গমের মধ্যে কোন্‌টি আগে। তবে অনেকে মনে করেন, এশিয়াতেই যব এবং বার্লিরও চাষ হয় প্রথমে। তবে এমন আকারের ছিল না সে সব শস্য। সেগুলো বন্যশস্য। এই বন্যশস্যকে খাদ্যশস্যে রূপান্তরিত করা হ'ল। বর্তমান প্রকারের গম কিন্তু দুটি শস্যকে মিলিয়ে করা হয়েছিল (crossbreeding)। তার মধ্যে একটা এমার (Emmer)।

এইযে ফসল উৎপাদন রীতি—এই রীতি মানুষের সমাজকে বেশ বদলে দিল। শিকারে মানুষ যূথবদ্ধ হয়েছিল। শস্য সংগ্রহে তার একটু প্রসার ঘটে, কিন্তু কৃষিকাজে মানুষের সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। আর শিশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীও বদলে যায়।

শিকার-জীবনে শিশু ছিল আনাড়ী আর বাড়তি। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে বড় ক'রে তুললে তবে সে সাহায্যকারী হয়। কিন্তু কৃষিকাজে সে প্রথম থেকেই সাহায্য করতে পারে নিড়ানীর কাজে। পূর্বে শিক্ষা

নির্ভর করত অভিজ্ঞ আর বয়স্ক সম্প্রদায়ের হাতে, এখন শিক্ষা সুরু হল অনুকরণ আর অনুসরণ করে।

এমনি ক'রে,৬০০০ থেকে ৩০০০ খৃঃ পূর্বাব্দের মধ্যে মানুষ অনেক কিছুই আবিষ্কার করল। মাটির কাজ তার মধ্যে অন্যতম। মাটি পোড়ালেই যে হাঁড়ি হয় তাতো নয়, মাটি বাছাই ক'রে ভিজিয়ে, যন্ত্রে লাগিয়ে, শুকিয়ে তারপর বিশেষ তাপে পোড়াতে হয়। এই প্রক্রিয়া জেনে বা দেখে হয় না, বুদ্ধির সঙ্গে উপলব্ধি ক'রে আয়ত্ত করতে হয়।

এই নব্যপ্রস্তর যুগেই দেখতে পাওয়া যায় বস্ত্রবয়ন পদ্ধতি। এও তো মিশর আর এশিয়ার আবিষ্কার। কার্পাস বস্ত্র তো সিন্ধুনদের তীরের দ্রব্য (৩০০০ খৃঃ পূ)।

এমনি ক'রে এই সময়ে কত রকম কারিগরীই না এসেছে। আর এই সব কর্মশালা একটি লোকের দ্বারা নির্বাহ হয় না। বহুলোকের দরকার; পরিবারের সাহায্য তো একান্ত কর্তব্য। কিন্তু পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এক স্থানেই তো এই কারিগরী কুক্ষিগত হয়ে থাকল না।

শুধু কারিগরীই নয়, গ্রাম-গঠনেও তাদের কিছু কিছু পরিকল্পনা এসেছে, ছোট ছোট গ্রামেই যদি তারা বাস করল, তা হ'লে গ্রামের সংহতিশক্তি গড়ে উঠা দরকার। একটু রক্ষণশীল হয় আবার একটু ছড়িয়েও পড়তে চায়। ছেলেরা বড় হলে তাদের পত্নীদের আশে-পাশে যায়গা জমি খুঁজে সেখানে গ্রাম পত্তন করে। জঙ্গল কাটে, চাষ আবাদ করে। কিন্তু বড়দের রক্ষণশীলতার কিছু মিশ্রণও ঘটে। মেয়েদের প্রজনন শক্তির সঙ্গে ধরিত্রীর উর্বরতার বেশ এক ভাবগত মিল খুঁজে পায়। ভাব বা কল্পনা স্পষ্ট হয়ত হয় না, কিন্তু রূপকের মতো ফুটে ওঠে। এই রূপক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আরোপিত হয়, 'রাজা' 'রাণী'কে নিয়েও হয়। ছোট ছোট গ্রাম হলে, গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ঝোঁক থাকে। কৃষিকাজের যত উন্নতিই হোক লোক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাব অনটন এসে পড়ে। অভাব অনটন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণও হয়। কাজেই, ধর্ম বা মন্ত্রশক্তি বা ম্যাজিকের আবির্ভাব হয়। জমি হ'ল পবিত্র, ধান যেন 'ব্রহ্ম', মানুষ হ'ল শক্তি। গল্প কাহিনী রচিত হয়। রচিত হয় প্রধানত 'সমাসোক্তি অলঙ্কার'কে ঘিরে।

এ ছাড়া জীবনে ছিল অবসর। শিকার-জীবনে একটানা অবসর

যেমন কিছুদিন থাকত, কৃষিকাজে ততটা নয়। তবু একটানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে অবসর ছিল। এই অবসর নিয়ে তো আর মানুষ ঘুমিয়ে কাটায় না।

সমাজ-নিয়ম কিছু কিছু এসে পড়ল। মেয়েদের কি কি কাজ, তারা দুধ দুইবে কি দুইবেনা, পাখীর ডিম খাবে কি খাবে না, কোন্ শ্রেণীর লোক কি কি কাজ করবে, কাজের একচেটিয়া অধিকার—প্রভৃতি সামাজিক অনেক নিয়ম-কানুনই তারা মেনে চলল। মেনে চলতে বাধ্যও করল।

প্রাচীন-প্রস্তর যুগ থেকে নব্য-প্রস্তরযুগ পর্যন্ত এই যে নানাবিধ ক্রিয়া-কর্ম এবং শিল্প-জ্ঞান একটু একটু ক'রে বাড়ছে আর ভবিষ্যৎ পুরুষদের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে—এই থেকেই ইস্কুলের উদ্দেশ্যকে অনুভব করা যায়। অর্থাৎ ইস্কুল নামক প্রতিষ্ঠান না থাকলেও শিক্ষা দেওয়া আর গ্রহণ করবার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন হয় না।

তবে একটি কথা প্রণিধান যোগ্য। প্রাক্-চেলিয়ান যুগের পাথরের গায়ে পাথর ছুঁড়ে ভেঙে অস্ত্র তৈরী করা থেকে, হাতুড়ী আবিষ্কার এবং মৌস্টরিয়ান যুগের হাতের চাপে, আঁচড়ে পাথুরে-অস্ত্র, হাড়ের অস্ত্র তৈরী করবার মধ্যে যে-বৈচিত্র্য ধারাবাহিক ভাবে এসেছিল তার অবনতি ঘটল এর পরই। এই অবনতির যুগ হাজার হাজার বছর ধ'রে চলেছিল। যে সমাজেই হোক আবিষ্ক্রিয়ায় এই অবনতি আসে কেন? আবার ভিন্ন সম্প্রদায়ের হাতে পরবর্তী কালের (ম্যাগডালেয়ান) শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষ হ'ল কি করে? আগের যুগে এই আবিষ্ক্রিয়া সঞ্চারিত করবার শক্তিতে কোথায় ত্রুটি? অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে—প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেকটা এর হেতু। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় কি কোন ত্রুটিই ছিল না। পরবর্তী কালে অনেক সুসভ্য দেশেও এই বিপর্যয় দেখা গিয়েছিল।

নতুন আবিষ্ক্রিয়া কেবল হঠাৎ-ই হয় না। সমাজে তার সম্ভাবনাও থাকা চাই।

॥ দুই ॥

আবিষ্ক্রিয়ার প্রথম সম্ভাবনা হচ্ছে সমাজ-ব্যক্তি নিজে। ব্যক্তির দিক দিয়ে আবিষ্ক্রিয়ার প্রতি চাহিদা দুরকমের। একটি হচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রেষণা (want), অপরটি হচ্ছে বাহিরের তাগিদ (demand)। পুরনো

সমাজে দেখেছি উপকরণ তৈরী করবার তাগিদ আসছে বাহিরের চাহিদা মেটানোর প্রেরণা (motivation) থেকে, ব্যক্তির আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রেরণা কিন্তু ততটা নেই। অবশ্য একেবারে ছিল না তা কিন্তু বলা যায় না। কারণ অঙ্কনশিল্পের মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রেরণা বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তবে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা সে সম্পর্কেও বলেছেন যে, ব্যবসায় বুদ্ধি থেকেও অঙ্কনশিল্প-জাত হয়ে থাকতে পারে। আদিম মানবের চিত্র সমালোচকেরা প্রয়োজনবাদকে অগ্রাহ্য না করলেও একথাও জোর দিয়ে বলেছেন যে; শিল্পীকে যে-ভাবে চিত্রকল্পনা থেকে সুরু ক'রে তার উপকরণ সম্পর্কে মাথা ঘামিয়ে তারপর কল্পনাকে রূপ দিতে হয়েছে তাতে মনে, হয়, প্রকাশের তাগিদ না থাকলে কেবল প্রয়োজন নিয়ে এতখানি তারা এগোতে পারত না (Primitive Art—Leonhard Adam ; page 35) এ ছাড়া মেয়েদের মূর্তি-অঙ্কনে যেমন যৌনতার দিক ছিল তেমনি সৌন্দর্য-জ্ঞানও ছিল।

কাজেই আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রেরণার যে অভাব ছিল একথা না বলা গেলেও বাহিরের প্রেরণাই যে-বড় একথা অস্বীকার করা যায় না। অথচ, ইয়োরোপে আবিষ্ক্রিয়ার প্রতি বিমুখ তৎকালে থাকলেও, এশিয়া আফ্রিকা কিন্তু প্রায়-একই প্রকারের বিষয়-বস্তুর সম্মুখীন হয়ে তারা আবিষ্ক্রিয়া-শক্তিকে উন্মুক্ত ক'রে যাচ্ছে।

আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রেরণা ছাড়াও ব্যক্তির আর একটি দিকও এই আবিষ্ক্রিয়ায় জড়িত থাকে। যে-সমাজে সে বাস করে সে-সমাজে আবিষ্ক্রিয়ার উপযোগী বস্তু-সম্ভার ও বস্তু-চেতনা থাকা চাই; সে বস্তু-চেতনাকে রূপ দেওয়ার মতো বিশেষ ব্যক্তির মানসিকতাও চাই। সমাজের চিন্তা-ধারা সে যেমন সংগ্রহ করবে তেমনি তাতে মনঃসংযোগও করবে। জাতি-গত সংস্কৃতি থেকেই যে আবিষ্ক্রিয়া আসে, আবিষ্ক্রিয়ার বস্তুটি বহু মনে ছড়িয়ে পড়লেই যে তার বৃদ্ধি ঘটে তা নয়, বিশেষ ব্যক্তির মনের দীপ্তিতে সেটি যখন উদ্ভাসিত হবে তখনই নতুন-সৃষ্টির সম্ভাবনা। (The mere physical propinquity of many people with a multitude of ideas will not result in an ideational enrichment. That is an individual function. Innovation—Burnett.—Page 41)

ব্যক্তির এই সুযোগ সমাজে নানাভাবে যেমন দেওয়া যায় তেমনি নানা-ভাবে ব্যাহত করাও যায়।

সমাজে কর্তাপক্ষের উপর যখন বেশী নির্ভর করতে হয়, অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ যখন হামেসা দরকার হয় তখন নতুন বিষয়বস্তুর আবির্ভাব সম্ভাবনা কমে যায়। পরনির্ভরতা বা বিশেষ ব্যক্তির কর্তৃত্ব সমাজকে সর্বদাই ক্ষতিগ্রস্ত করে। সমাজ তখন কর্তা না-হোক 'কর্তার ভূত' কে আবাহন করে।

শুধু অনুচিকীর্ষার জন্যই যে আবিষ্ক্রিয়া-শক্তি রুদ্ধ হয়ে যায় তা নয়। কোন অনুকরণই এক খাতে বয় না। কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই। নিজকেও খাঁটি খাঁটি দুবার অনুকরণ করা যায় না। কিন্তু আবিষ্ক্রিয়ার মূলে যে মনের আর কয়েকটি শক্তি, যথা চিন্তা বা বস্তুর সামগ্রিক বোধ, বস্তুতে বস্তুতে সম্পর্ক রচনা করা, বস্তুর সত্যকার অর্থ পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আনা, এক বস্তুর সঙ্গে আর এক বস্তুর যোগ সাধন করতে শেখা, এক বস্তুতে আর-এক বস্তুকে আরোপ করা (projection) উভয় বস্তুকে মিলিয়ে নেওয়া (identification), এক বস্তুর সঙ্গে অন্যবস্তুর আত্মীকরণ প্রভৃতি মানসিক দিক পরিস্ফুট হওয়া চাই।

কিন্তু তৎকালের সমাজের বিধি-নিয়ম, ব্যক্তি-সম্পর্ক, নীতিবোধ, কথা-কাহিনী প্রভৃতি থেকে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, সমাজের অভিজ্ঞতা এমন একটা কঠিন মূর্তিতে ব্যক্তির মনে ছিল, সমাজ-রীতি এমন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, ব্যক্তির মনে এই বিশ্লেষণী শক্তি বা বস্তু সম্পর্কে আর অনুভাবনা জন্মাতে পারেনি। যে-সমাজে এই দিকটি কিছুমাত্রও ছিল তারাই এ বিষয়ে অভিনব পথে চলেছে। সে সময়ে ইয়োরোপ অঞ্চলে, যে-কোন কারণেই হোক, এই দুর্দশা চলছে—আর এশিয়াতে অভিনবত্বের সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। প্রাকৃতিক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সমাজের কারণও কম নয়। শুধু যে পুরাতন প্রস্তর যুগেই একথা সত্য তা নয়; ৩৫০০ থেকে ১৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দ প্রায় ২০০০ বছর ধরে ইয়োরোপ আবিষ্ক্রিয়ার দিকে এমনি পিছিয়ে ছিল, (For fully 2000 years, from 3500 to 1500 B.C., all Europe was a cultural wilderness by comparison with developments in Asia and North Africa, and for centuries there after its central and northern sections lagged far behind its south-eastern Aegean border.—Innovation, Barnett, Page 34)।

অবশ্য এদ্বারা এই কথাই বোঝা যাচ্ছে না যে, এশিয়া আফ্রিকাতে সমাজ-গঠনে ব্যক্তি ও সমাজের কাছে আবিষ্ক্রিয়ার সমস্ত সুযোগই ছিল,

ইয়োরোপের তা ছিল না। তুলনামূলক আলোচনায় এই দিকেই সে সুযোগ ছিল সে কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ছিল, একথা বলা চলে না। ইতিহাস থেকে বা ভূবিজ্ঞানীদের উপকরণ থেকে সমাজের তেমন চেহারা পাওয়া যাচ্ছে না যার দ্বারা একথা জোর ক'রে বলা যায়।

কিন্তু সুযোগ অর্থ কি ?

॥ তিন ॥

প্রস্তর-যুগের সমাজে ব্যক্তির বিশ্লেষণী-শক্তির সুযোগ ছিল না, একথা বলার চেয়ে বলতে হয়—সুযোগ থাকা না-থাকার সম্ভাবনাই তখন ছিল না। পরিবেশই হোক আর অন্য কোন অবস্থার সম্মুখীন হয়েই হোক মানুষ সাধারণত অবস্থার প্রতি বিশ্লেষণ-মুখী হয়ে পড়ে, কিন্তু সেই বাধা উত্তীর্ণ হলে বিশ্লেষণের সেই তীক্ষ্ণতা আব থাকে না, ধীরে ধীরে পূর্ব যুগের অভিজ্ঞতা 'বিশ্বাসে' পবিণত হয়ে যায়। এই বিশ্বাসকে ঘিরে প্রক্ষোভ (emotion) রস (sentiment) এমন সহজ হয়ে চরিত্রে বসে যায় যে নিয়মরক্ষা করেই তখন মানুষেব আনন্দ, নিয়মেব অন্তর্নিহিত অর্থটিতে আব সে প্রবেশ করতে চায় না।

প্রথম যখন পাথবের অস্ত্রাদি নানাভাবে সে তৈরী কবতে শিখল, গৃহ-নির্মাণ শিখল, তখন তার বুদ্ধি ক্রিয়াশীল; কিন্তু তারপর পরিবেশ যখন আয়ত্তে এসে গেল তখন পূবের বুদ্ধিব স্থানে এসে পড়ে অনুকরণ অনুসরণ এবং প্রক্ষোভ-রস সঞ্জাত আনন্দ।

ধর্ম, রাজনীতি এবং অন্যান্য কারিগরীতে মনুষ্য-সমাজের এই প্রকার ব্যবহারই দেখা গেছে। তাই রবার্টসন্ স্মিথ বলেন, রাজনৈতিক মতবাদের থেকে রাজনৈতিক প্রথা (institution) অনেক পুবনো, ধর্ম মতেব থেকে পুরনো ধর্ম প্রথা।'

আগে আচরণ, তারপর ব্যবহারিকপ্রথা, তারপর বিশ্বাস (belief)। আচরণেরই পূর্বে ঘটে আবিক্রিয়া।

ইয়োরোপে প্রাচীন এবং নব্যপ্রস্তর যুগে মনুষ্য-সমাজে বা গোষ্ঠীতে আচরণ থেকে প্রথায় (institution) উত্তীর্ণ হয়ে আসছে; খৃষ্টযুগের পূর্বে ও পরে বিশ্বাসের স্তরে এসেছিল বলে অনুমান করা যায়। আর এশিয়াতে হয়ত নানাকারণে প্রথা থেকে বিশ্বাসে না দাঁড়াতে পেরে পুনরায় বিশ্লেষণী-

শক্তি ব্যবহার করছে। কি কারণে এশিয়ার এই বৈশিষ্ট্য তা ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন।

'ইন্‌স্টিটিউসন'কে আমি প্রথা বলছি। 'আচার আচরণ' অর্থে প্রথা নয়। সমাজের কোন বিশেষ দিকের আচার-আচরণ যখন স্বভাবী বা স্বমিত (Standardised or normal) হয়ে পড়ল তখনই তাকে বলা যেতে পারে প্রথা। এই প্রথাকে অবলম্বন ক'রে সমাজে অনেক রকমের অনুমোদন আসে (Sanctions), তখন ব্যক্তি আর সমাজের আচরণ নিয়মিত এবং বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।

প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছে সমাজের অপ্রাপ্তবয়স্কেরা বয়স্কদের কার্যপন্থা অনুকরণ আর অনুসরণ ক'রে পরিণত হচ্ছে। শিকার-জীবনেও তাই, কৃষি-জীবনেও সেই অবস্থা। হয়ত পরিবারের নিয়ন্তারা, বা কারিগরেরা তাদের সেই পথে সহায় হত। কাজেই, বালক-বালিকার কাছে (হয়ত বা পরিবারের কাছেও) শিক্ষা ছিল তাদের জীবিকা মান (living values) অতএব শিক্ষায় তাদের প্রযত্ন ও আগ্রহ ছিল (interest)। কিন্তু সমাজের এদিকে খুব একটা সতর্কতা ছিল না, থাকতে পারেও না। তবে সমাজের হয়ত অনুমোদন ছিল ; সে-অনুমোদন বিক্ষিপ্ত (diffused) ; উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত বা সংগঠিত (organised) নয়।

বিক্ষিপ্ত অনুমোদনে মানুষ বা শিশু বশংবদ হয়ে পড়ে। কারণ বিক্ষিপ্ত অনুমোদন হচ্ছে সমাজ ব্যক্তির অনুমেয়, ঠিক সমাজীয় মঞ্জুরী একে বলা যায় না। আবার প্রাচীন সমাজে সামাজিক অনুমোদন যখন আসতে সুরু করল তখন নেতি-অনুমোদনেরই হ'ল প্রাচুর্য (negative sanctions)। কাজেই উভয়ত্রই, হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে নিজের চিন্তা নিজের করতে হয়েছে।

ঠিক প্রাচীন প্রস্তর যুগে শিক্ষা এমনি অবস্থাতেই ছিল, অন্তত ইয়োরোপে। কিন্তু এশিয়াতে হয়ত সে-অবস্থা ছিল না। সমাজ-মানব-বিজ্ঞানের (Social Anthropology) সূত্র অনুযায়ী বলতে হয়, ইয়োরোপে তখন বাহিরের জগতের সঙ্গে মানুষের প্রতিযোজন চলছে (Oecological adaptation), সমাজের কার্মিকতার দিক হয়ত কেবল আসছে (functional) কিন্তু সমাজ-সংস্থার সেই কর্মগুলিকে সংগঠিত বা বিন্যস্ত করার (organised) নিদর্শন কিছু দেখা যায় না।

শিক্ষার বেলাতে একথা আরও সত্য। এশিয়াতে সে-সময় শিক্ষা অনেকটা প্রথার স্তরে (institutional) চলে এসেছে, তবে সেই প্রথায় কার্যের দিকই হয়ত বড, অর্থাৎ প্রথার কার্য-নির্বাহের দিক (operative); তবে কার্য নিয়ামক (regulative) প্রথার আবির্ভাব হয়নি।

ইস্কুল বলতে আমরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বুঝিনা, শিক্ষার ধারা নয়। কিংবা অভিজ্ঞতাকে উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত করবার প্রেরণাকেও নয়। ইস্কুল হচ্ছে সংগঠিত কার্যনিয়ামক প্রথা (organised regulated institution)। এই ব্যবস্থার তিনটি স্তর—প্রথম প্রথা, দ্বিতীয় কার্যনিয়ন্ত্রণ, তৃতীয় সংগঠন। তিনটি স্তরের কোন্‌টি কোন সময় আসছে সে-কথা আমাদের সব সময় অনুধাবন ক'রে চলতে হবে, কারণ এরই উপর দাঁড়িয়ে আছে ইস্কুলের এই আধুনিক প্রকৃতি। প্রসঙ্গক্রমে সেসব দিক নির্দেশ করে নেওয়া যাবে।

ইতিমধ্যে আমরা মানবসভ্যতার পরবর্তীস্তর আলোচনা করে নিই।

॥ চার ॥

নতুন প্রস্তর যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু ঘটছিল, তবে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে নয়, অনেকটা বিলাসদ্রব্য নিয়ে। তবু বলতে হয়, ক্ষয়িষ্ণু শিকারজীবীদের উপর এমনি করেই তারা প্রভাব বিস্তার করল। ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং পূর্ব এশিয়াতেই এই মিথস্ক্রিয়া (interaction) বিশেষ ক'রে ঘটেছিল। ৬০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ১৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত এই ধারা (নব্য (প্রস্তর যুগের ধারা) চলতে থাকে। এরই মধ্যে কৃষিকাজ এল। ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ, খাদ্য-শস্য গোলাজাত করবার প্রথা, কুম্ভকারের কাজ, বয়নশিল্প সব কিছুই এই সময়ের মধ্যে ঘটে।

এইসব শিল্প বিশেষ জ্ঞান, নৈপুণ্য, অভ্যাস এবং শিক্ষা সাপেক্ষ। কিন্তু এই সময় কাজের শ্রেণীবিভাগ খুব লক্ষিত হয়নি। এই গুলিতে অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত জ্ঞানেরই প্রাধান্য থাকে। অর্থাৎ যাকে বলে ব্যবহারিক জ্ঞান মাত্র। পুরুষানুক্রমে এই নৈপুণ্য আর অভিজ্ঞতা বাহিত হয়ে চলতে থাকে। ছেলেরা পিতৃপুরুষের কর্ম-ক্রিয়া দেখে দেখে শেখে,

(All the foregoing industries require for their exercise a technical skill that can only be acquired by training and

practice. ···In our hypothetical neolithic stage there would be no specialisation of labour. ...The appropriate lore is handed on from parent to child for generation after generation. ...It is handed on from parent to child by example and by precept,—Childe, Man Makes Himself, 95-96)

কাজেই এখানেও শিক্ষা ঠিক প্রথা-সম্মত (institutionalised) হয়ে আসছেনা, তবে পরিবার-অভীষ্ট (কিন্তু নিয়ন্ত্রিত নয়) হয়ে চলছে। যৌথ ক্রিয়া ছাড়া এসব কাজ-কর্ম চলতে পারেনা। এই যৌথক্রিয়ার রীতি নীতি যে প্রথার অন্তর্ভুক্ত হল তাকে বলা যেতে পারে সমাজ এবং বসতি প্রথায় (social and political institutions)। অবশ্য একথা সত্য, এইসব কারিগরী এবং অভিজ্ঞতা মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলে দিয়েছে, তদনুযায়ী প্রথা এবং ধর্মকে তারা সংস্কার নিশ্চয়ই করেছিল, কিন্তু সে সংস্কারের কি যে স্বরূপ তা দুর্জ্ঞেয়। গর্ডন চাইল্ড বলেন, কিছুটা এগুলি ধর্মানুশাসন এবং বিশ্বাস আর অন্ধসংস্কার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। (Undoubtedly such institutions were consolidated and reinforced by magico-religious sanctions, by a more or less coherent system of beliefs and superstitions.

—Page 97-98).

এই যে 'ইংরেজি কথা magico-religious sanctions, এবং beliefs একথার নিতান্তই বাংলা যদি করতে চাই তা হলে বলতে হয় তান্ত্রিকতা-মিশ্রিত ধর্মীয় অনুমোদন এবং নেহাৎ-ই বিশ্বাস'।

সমাজ-মানব-বিজ্ঞানীদের পুরোধা র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন কিন্তু অত সহজে এই দুটি কথার এমন অর্থ মেনে নিতে চান না (Radcliff-Brown. Structure and function in Prmitive Society—Cohen & West Ltd, London, 1952-Chapters VI, VII, VIII & XI)। এ বিষয়ে চীন দার্শনিক কনফুসিয়াস, হ্‌সুন ৎসু (Hsun Tzu), উয়ে চি (Yue-Chi) মনীষীবৃন্দের মতোই তিনি বলতে চান যে, সমাজ-সংস্থার স্থিতির জন্যই মানুষের আবেগকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিশুদ্ধ করতে হয়, তারই জন্য দরকার সমাজে নানাবিধ অনুষ্ঠান। এগুলি কুসংস্কার নয়।

যেখানে মানুষকে বন্য পশু বা বন্য শস্যের উপর জীবন নির্বাহ করতে হয় সেখানে উৎসব-অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পশু বা শস্য এসে পড়বেই। এসে

পড়ে কারণ এখানে আছে সমাজ-কার্য বিধি; অর্থাৎ ঐ পশু বা শস্যকে পাওয়ার প্রতি মানুষের প্রচেষ্টা থাকে আবার পশু বা শস্য তাদের উৎসব মান (ritual values) হয়ে পড়ে। সমগ্র বিশ্বটাই তাদের সমাজের মধ্যে এসে যায়। এমনি ক'রে সমাজ-গঠনের এবং প্রত্যয় থেকে ধীরে ধীরে বিশ্বাস বা তান্ত্রিকতা এসে যায়। আর তার অর্থ যখন হারিয়ে গেল তখনই আমরা বলি কুসংস্কার। কুসংস্কার নাকি এমনি আছে উক্তিতে (Totem), আছে শৌচাশৌচ বিধিতে (Taboo) আছে ধর্মনীতিতে। ম্যালিনোস্কির মতে কোন উৎসব তখনই তান্ত্রিকতা পর্যায়ের যখন এর একটা নির্দিষ্ট ব্যবহারিক উদ্দেশ্য থাকে, এবং যখন সেই ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যক্তি অবহিত থাকে; আর উৎসব তখনই ধর্মীয় অনুষ্ঠান যখন এর কোন উদ্দেশ্য থাকে না, কেবলই মনের ভাবপ্রকাশের হেতু। কিন্তু 'ঐ নির্দিষ্ট ব্যবহারিক উদ্দেশ্য' বলতে ম্যালিনোস্কি কি বলতে চান তা স্পষ্ট নয়। এই জন্য র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন বলেন, কোন বিশেষণ প্রয়োগ করে মানুষের উৎসব-অনুষ্ঠান-ধর্ম-বিশ্বাসকে বোঝা যায় না। সেগুলি সমাজ ব্যক্তির মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার আচার আচরণে কি পরিবর্তন হয়, তার সঙ্গে সমাজের কি সম্পর্ক বজায় থাকে—তারই উপর নিভর করে তার অর্থ নির্দেশ করতে হয়। যাই হোক, ব্রাউন বলতে চান, 'অন্য লোকের ধর্মকে অথবা আদি-সমাজের ধর্মকে যখন আমরা ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস বলে পরিগণিত করি, তখন আমরা অবাক হয়ে যাই এই ভেবে যে, এইসব বিশ্বাস কেমন করে সূত্র সংজ্ঞায় এল বা কেমন করে সমাজ কর্তৃক গৃহীত হল (page 153). 'The hypothesis we are considering is that the social function of a religion is independent of its truth or falsity, that religions which we think to be erroneous or even absurd and repulsive, such as those of some savage tribes may be important and effective parts of the social machinery, and that without these 'false' religions social evolution and the development of modern civilisation would have been impossible (R. Brown—S. F, in Pr. Soc. 154)।

চাইল্ড এবং ব্রাউনের দুটি উক্তি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সমাজ-প্রথায় (Social Institution) সেই প্রারম্ভ যুগের বুদ্ধি ও

বিচার উদ্দীপ্ত প্রক্ষোভ আর নেই, সেখানে এসেছে আচার আচরণ, সমাজ-সংগঠকদের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করে যাওয়া, বয়স্কদের মত নির্বিচারে মেনে নেওয়া। তথাপি শিক্ষা-প্রথা ব'লে স্বতন্ত্র প্রথার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না।

৬০০০ থেকে ৩০০০ খৃঃ পূর্বাব্দের মধ্যেই লক্ষ্য করা গেল মানুষ নগর-সভ্যতার দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। লেখা, হিসাব-বিজ্ঞান, মাপ-জোক প্রভৃতি অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হয়ে গেল। ঐ তিনটি আবিষ্কার জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতাকে উত্তরপুরুষ এবং সমসাময়িক অন্য সমাজের নিকট পৌঁছে দেওয়ার প্রধান অবলম্বনস্বরূপ। আর এশিয়ার পূর্বাঞ্চল থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ত নানা সমাজের মানুষ ভীড় ক'রে পড়ল। কত রকম সমাজ-প্রকৃতি আছে, যথা—শিকারজীবী, মৎস্য-শিকারী, (এরা প্রাক্ নব্যপ্রস্তর যুগের), আবাদকারী (ভ্রাম্যমান) আর যাযাবর পশুচারণকারী। আর এদের নিয়েই স্থায়ী-বসতিগুলি ধীরে ধীরে নগর-প্রকৃতির মধ্যে এগিয়ে যাচ্ছে।

নানা কারণে নদীর তীর বেছে নেওয়া সমাজের কাছে সুবিধার ব'লে মনে হল। কিন্তু বন পরিষ্কার করতে হবে, জলাজমির সংস্কার করতে হবে, ঘর-বাড়ী নির্মাণ করতে হবে, সেচের কাজ আছে—কাজেই পূর্ত কাজ বিশেষ প্রাধান্য পেল। আর একদল শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। সুমেরের অধিবাসী, যারা পারস্য উপসাগরের ঠিক ধারে বাস করল তাদের হ'ল বিশেষ বিপদ; জলাজমি, বনবাদাড় এ সব পরিষ্কার করতে তাদের অনেকদিন যায়। কিন্তু জমি-জিরেতও পাওয়া গেল প্রচুর। মানুষের সংখ্যা ফলত বেড়ে চলল। এই সুবিধার জন্যই সুমের-সমাজ সংগঠনের দিকে নজর দিতে পারল। পূর্বে দেখেছি যৌথ-ক্রিয়া কর্ম, কিন্তু এখন সংগঠিত (organised) যৌথ-কাজ। কারণ, এই সব কাজ বহু লোকেরই সাধ্য কোন ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা সম্ভব নয়। আর একটু পরিবর্তন দেখা গেল, ঐ যারা শ্রমিকের কাজ করছে তারা তো ফসলের কাজ করছে না, তাহলে তাদের খেতে দেবে কে? বাড়তি খাদ্যদ্রব্য উৎপন্নের প্রয়োজন হল, খাদ্যদ্রব্য গোলাজাত করবার রীতিও চালু হয়ে যায়। আর সেচের কাজে বিশেষ ধরণের কর্মনৈপুণ্য এবং মজুর খাটানোর প্রয়োজন থাকায় এই ব্যাপারটি এখন সমাজের কতিপয় সম্প্রদায়ের হাতে, পরে বিশেষ শ্রেণী এবং ব্যক্তির হাতে একচেটিয়া অধিকার হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ রাজা এলেন

সমাজনীতির ধারক হয়েই কেবল নয়, জোর ক'রে মানুষ খাটানোর ক্ষমতা নিয়েও।

এইখানেই নতুন সমাজ-প্রকৃতি ফুটে উঠছে।

সমাজ-প্রকৃতি (social structure) অর্থে আমরা সমাজের অবয়ব বা আকারকেই মনে করছি না। সমাজ-অবয়ব অর্থহীন, কারণ জীবের মতো সমাজেরও অবয়ব হয়ত থাকে, কিন্তু জীবের মতো সমাজ-দেহ কখনও মরে যায় না বা ধ্বংস হয় না। সমাজ অর্থ সমাজ-ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক মর্যাদা আর সম্পর্কই সূচনা করে। এই সম্পর্ককে চালু রাখতেই সমাজের ব্যক্তিব নানারকম আচরণ বা কাজ করতে হয়। সমাজ ব্যক্তিব অন্যান্য সম্পর্ক এবং কার্মিক দিকই সমাজ-প্রকৃতি। স্পষ্টতই আমরা দেখতে পাচ্ছ, সমাজ ব্যক্তির নির্দিষ্ট কর্ম-বিভাগ আসছে, মর্যাদা আসছে, এবং পারস্পরিক সম্পর্কেরও একটা রীতি-নীতি বাঁধা হচ্ছে। এইখানে সংগঠন-শক্তি আত্মপ্রকাশ করল।

এই যে বৃহত্তর এবং নবীন সমাজ-প্রকৃতি এর সঙ্গে পুরাতন সমাজবাসীকে মানিয়ে নিতে আরও অনেক ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়েছে। তার দরুণ পেয়েছেও প্রচুর। প্রধান প্রাপ্তি হল, দ্রব্য-বিনিময়ে ব্যবসা আর পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার। তামা এল, ব্রোঞ্জ এল লোহা এল।

কিন্তু প্রথম যখন তামা এল তখন মানুষের প্রতিক্রিয়া কি? পাথরের কাজে তারা এতকাল অভ্যস্ত। সেই পাথরকে সরিয়ে দিতে আসছে আর একটি শক্ত বস্তু। কিন্তু এই শক্ত বস্তুটির নানা রূপ। গলিত তামার পূর্বাবস্থা, গলিত তামা এবং পরবর্তী অবস্থার মধ্যে যে একই চেহারা রয়েছে এইটি অনুধাবন করতে তার পুরাতন মনোবৃত্তি এবং শিক্ষাতে তো চলেনি। একটি বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর অভেদ কল্পনা করবার মানসিক শক্তির বিকাস তাকে ঘটাতেই হয় (identification)। প্রথমত তারা এতকাল পাথরের সঙ্গে নানাভাবে পরিচয় ঘটিয়ে এবং প্রয়োজন সাধন করে এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, অতি সহসাই তামাকে তারা পাথরের বদলে ধরে নিতে পারছে না। দুটো বস্তু দু-রকম রূপ নিয়ে এল। প্রথম রূপে তারা অভ্যস্ত এবং অভিজ্ঞ। নতুন রূপ নিতান্তই অপরিচিত—দুটো এক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। দ্বিতীয়ত তামা বস্তুটির মধ্যে বিভিন্ন অবস্থা। এই ক্ষেত্রে প্রথমবার তাদের পুরনো অভ্যাস আর অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ ক'রে

নিতে হল; বুঝে নিতে হল, পাথরের কোন্ কোন্ কাজের সঙ্গে তামার কোন্ কোন্ কাজের মিল আছে (trace-past)। সেই ক্রিয়া-সম্পাদনায় আবার কতখানি তারতম্য। মোটামুটি এইটি তাদের কাছে সত্য হয়ে পড়ছে যে, প্রাচীনকে যাচাই-বাছাই ক'রে নেওয়া দরকার, নতুনের কার্যকারিতা এবং অবস্থা বিশ্লেষণ করা কর্তব্য।

এক মুহূর্তে যদিও ঘটেনি, তবু মানসিক প্রস্তুতির এই যে অবিরত প্রচেষ্টা এই ব্যাপারটি তাদের মনের অনেক অনেক অঞ্চলেই আলোকপাত ক'রে বসল।

যাইহোক, সমাজের অভ্যন্তরেও নতুন কারিগরেরা একটা পরিবর্তন আনল এই যে, তারা আর মাঠে কাজ করতে পারে না। তাদের কাজ অভ্যাস এবং বিশেষ পর্যবেক্ষণ-মূলক। কাজেই মাঠে যারা কাজ করছে তাদের উপর আবার ভার জমল; আর সমাজের ভার যারা, যারা মাঠ থেকে সরে এল তাদেরই আদর হ'ল সমাজে বেশী।

এমনি ক'রে এশিয়াতে ৪০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের পর-পরই ধাতু সম্পর্কে নানা তথ্য জানা হয়ে গেল; যাতায়াতের জন্য চাকার গাড়ী এল সুমেরে ৩৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে, সিন্ধুনদে ২৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের কাছাকাছি। মিশরে এসেছে অনেক পরে। এর পর কুম্ভকারেরা চাকার ব্যবহার করে, কিন্তু ভারতবর্ষে কুমোরের চাক গাড়ীর চাকার সমসাময়িক। ভারতবর্ষে ঘোড়ার ব্যবহার ২৫০০ থেকে ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই ঘটে গেল। ঘোড়ায়-চড়া বোধ হয় ১০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দেই ঘটেছিল। নৌকাও এল।

কিন্তু আবিক্রিয়ার কথা থাক। সাপের ডিমের মতো মালা গেঁথে সেই থেকে আজ পর্যন্ত কত আবিষ্কারই তো হল।

আবিষ্কারের পরিণতিতে বিপদ হল কৃষকদের। তাদের বেশী উৎপাদন করতে হবে। আর এই থেকেই প্রভু মনিব রাজার সৃষ্টি।

সমাজপ্রকৃতির পরিবর্তন এত সহজেই কিন্তু শেষ হল না। প্রাচীন সমাজ নস্যাৎ হয়ে যায়নি। বহিরাগত আর আদিবাসী একত্রে বাস করতে শিখল, প্রথমত উভয়ের রীতি-নীতি প্রথা পাশাপাশি বজায় রেখেই। তার পর দুয়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটে, অর্থাৎ দুই-ও থাকল, তিন-ও এল। ভাব-আদর্শ যেমন পরস্পরের সান্নিধ্যে ভাঙছে তেমনি তৃতীয়টি গড়ছে, অথচ তৃতীয় থেকে দুটি বাহু পুরাতনের দিকে বিস্তার ক'রে।

এই তিনটি একত্রে বিরাজ কচ্ছে। তবে তিনেরই উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্ম-আচার, রীতি-নীতির ধারক-স্মারক সমাজে রয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ পুরোহিত-তন্ত্র সমাজ সৃষ্টি হচ্ছে।

অভিজাততন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র নিয়ে পুরনো আর নতুনসমাজ আডে-বহরে বেশ বেড়ে'চলছে। ভারতবর্ষের নগরে এসে ঐতিহাসিকেরা মাথা ঘামালেন, কি করে সম্প্রদায় বা সমাজে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য এবং উপকরণাদি সংগৃহীত হল আর নিয়ন্ত্রিত চল। কোন দিগদর্শন নেই। তাঁরা অনুমান করলেন, যুদ্ধ হওয়ায় অনেক সময় সমাজপ্রকৃতি রাতারাতি একটা নতুন রূপ নিয়ে বসে। হয়ত বা তেমনি কিছু একটা এখানে ঘটেছে।

যদি তাই হয়, তা হলে দুটো জিনিস লক্ষ্য করবার মতো; বিজয়ীরা যেমন সংগঠিত হয়ে এসেছে :তেমনি বিজিতেরাও সংগঠিত হয়ে বাধাদান করেছে। অর্থাৎ সংগঠনের একটা পরিষ্কার রূপ যেন এতদিন পর মনুষ্য-সমাজে এল।

সংগঠন শক্তির যেমন উদ্বোধন হল, তেমনি রাজা মহারাজেরাও সমাজের বুকে জেঁকে বসলেন, আর মানুষের মধ্যে কিছু শ্রেণী দাস হিসাবে পরিগণিত হল। সমাজ প্রকৃতির কার্মিকতার দিকে আবার পরিবর্তন আসে, নতুন ক'রে সমাজ-ব্যক্তির অন্যোন্য সম্পর্ক স্থাপিত করা হল। সমাজ-প্রথার অনড দিক ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। নতুন শৃঙ্খলা-বোধ এল। অর্থাৎ, অবাধ্য হ'লে সেচ বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে, অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ বন্ধ করা হবে, প্রভৃতি কত কি।

কিন্তু সংগঠনশক্তির পরিচয় তখনও কেবল রাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র এবং অর্থ-তন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল, শিক্ষা-ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেল না। ৩০০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে দেখা গেল, সরল কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের পাত্তা সমাজে নেই। পরিবর্তে রাজ্য এল, রাজা এল, পুরোহিত এল আর নানারকম ব্যবসায়িক সম্প্রদায় এল। কিন্তু ঐ যে স্বয়ং-নির্ভর সমাজ ছিল আর এখন যে বিশেষ কারিগরী সমাজ সৃষ্টি হল এতে তো খাদ্যে ঘাটতি পড়বে; পডলও বটে। তার দরুণ বহির্বাণিজ্যে মন দিতে হল, জনসংখ্যাও বেড়ে চলল।

অভাব বাডলেই ভাগ্যের কথা আসে। আর ভাগ্যের সঙ্গে কেমন ক'রে জানিনা জড়িয়ে আছে ধর্ম, মন্দির আর মাদুলী। মধ্য এসিয়া থেকে মন্দির

প্রথা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। মন্দির অর্থ ধনী এবং প্রভাবশালী পুরোহিত। অথবা দেবতা।

যারা কারিগর তারা আবার বিচিত্র সম্প্রদায় হয়ে ওঠে। তাদের পরিশ্রম এবং দক্ষতা ভারত থেকে সুরু ক'রে মিশর পর্যন্ত বেশ ভালো দামে কেনা বেচা হ'ত। কাজেই তারা ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করতে সুরু করে। তাদের স্থান সম্পর্কে কোন মমতা ছিল না। মাটির সঙ্গে যোগ তাদের কম। প্রয়োজনের তাগিদে রাজারা এদের পোষণ করতেন। রাজা কিন্তু আহার-সংগ্রহের ব্যবস্থা করতেন স্থানীয় লোকদের উৎপন্ন দ্রব্য থেকেই। বিলাস আর প্রয়োজন স্থায়ী-সমাজের কাছে যূপকাষ্ঠের দুটি দিক।

২৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দের মধ্যে সিন্ধু-পাঞ্জাবে অনেক নগরের পত্তন হয়ে যায়। এই সময়কার ইতিহাসের খবর খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু সমস্যাটি আছে। সমস্যা হচ্ছে, নগরে 'মূলধন' সঞ্চিত করবার পদ্ধতিটি কি ছিল। অন্যত্র দেখা গেছে মন্দির বা ঈশ্বর ছিলেন খাজাঞ্চি। এখানে ধনী দরিদ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু সমাজে সর্বেসর্বা কি রাজা না দেবতা তা কিছু বলা যাচ্ছে না।

সিন্ধু সভ্যতার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে এবং ভারতের বাহিরে মোটামুটি এই হচ্ছে সমাজচিত্র। মানুষের বুদ্ধি আছে, হয়ত বা তা বুদ্ধ্যঙ্ক দিয়ে (I. Q) ধরা যাবে না, কারণ 'অতি দ্রুত অভিনব পরিবেশে সুফল প্রসবী প্রতিক্রিয়া' মূলক বুদ্ধিতে মানুষের সমাজ এগোয়নি ; এগিয়েছে অভিজ্ঞতায়, পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় সাধন ক'রে, ধীরে সুস্থে, নির্বাচনী শক্তি-ব্যবহার ক'রে—প্রভৃতি নানা উপায়ে।

আরও এক কারণে মানুষের সমাজ-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে চলছে। তা হচ্ছে, পুরুষানুক্রমে অভিজ্ঞতাকে সঞ্চারিত ক'রে, শিখিয়ে, এবং বিশেষ অভিজ্ঞতা-লব্ধ বস্তু বা শিক্ষাকে কুক্ষিগত ক'রে।

সমাজের অর্থনৈতিক-প্রথা প্রতিটি আবিষ্কারের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে। কোন সময় প্রস্তর-কারিগরের উপর বেশী নির্ভর করে, কোন সময় দক্ষ শিকারীর উপর, কোন সময় গৃহপালিত পশুর উপর, কখনও কৃষিজীবীর উপর কখনও কারিগরের উপর।

অর্থনৈতিক প্রথায় মনুষ্য-সমাজের সংগঠনশক্তির যতখানি পরিচয় পাওয়া যায়, ততখানি পরিচয় পাওয়া যায় তার সমাজ প্রগতিতে নিষ্ফলতায়।

মানুষ যুগে যুগে এত যে বুদ্ধি ব্যবহার করল, এত যে আবিষ্কার করল

তাতে সমগ্র সমাজের কতটুকু লাভ হল। সমাজ থেকে মানুষ বেরিয়ে যাচ্ছে,—সমাজে ভেদাভেদ আসছে, ক্রীতদাস আসছে। খাদ্য-ব্যবস্থা যে-তিমিরে সেই তিমিরে। মানুষের যেন শান্তি আসেনি, সে কেবলই পরশ-পাথর খুঁজে বেড়ায়। এই যাত্রাটুকুই যদি সত্য হয় তবে সবই সত্য।

শিক্ষা-প্রথায় এই যাত্রা নেই। সমাজের সামগ্রিক দিক দিয়ে অর্থনীতি-প্রথায় যাত্রা থাকলেও তার যেমন উদ্দেশ্য নেই, শিক্ষায় উদ্দেশ্য-অনুদ্দেশ্য কোনপ্রকার যাত্রাই দেখা যাচ্ছে না। যা-আছে তাই শেখ। শিখবে তুমি তোমার বাঁচবার জন্য, শিখবে তুমি সমাজে বাঁচবার জন্য। 'আমি কে' 'তুমি কে' ও সব অত ভেবনা। সমাজে যে-নিয়মটি আছে, তা কি ক'বে হল জানি না, তবে ভালোর জন্যই হয়েছে—তুমি পালন কর।

এই 'পালন কর' আর 'কাজ কব' এইটি ছিল সমগ্র শিক্ষার মূলে। এখানে ইস্কুল হিসাবে কোন ঘর বা বাড়ী ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু সত্যিকারের ইস্কুল এমন কি শিক্ষা-প্রথাটিও থাকতে পাবেনা।

ভারতে

॥ এক ॥

মহেঞ্জোদারো আর হারাপ্পা আজকে অনেক কথাই বলতে চায়। কিছুদিন আগেও তার মৃত্তিকাস্তূপ বহন ক'রে তারা নিতান্তই ভারবাহী হয়ে পড়েছিল। চেস্টারটনের কবিতাটির গাধার মতো বর্তমানে সে-ও যেন বলতে চায় তারও একদিন গৌরবের যুগ ছিল।

পুরনো প্রস্তর-যুগ থেকে নতুন প্রস্তর-যুগ পযন্ত মানুষের অনেক চিহ্নই ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে। তার কঙ্কাল, তার পরিবেশ রচনা, তার হাতের কাজ অনেক কিছুই তার জীবনযাত্রার সাক্ষ্য বহন করছে।

প্লেইস্টোসিন যুগেই বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক রূপ অনেকটা স্থায়ী আকার নিয়েছিল। হিমালয়ের কাছে ভূমি-সংস্থানের যে ত্রুটিটুকু তখনও ছিল, তা পরবর্তী কালে পশ্চিমপ্রান্তে নদীনালা সৃষ্টি ক'রে, মগ্নভূমির উচ্চতা সম্পাদন ক'রে, মানুষের বসবাসের উপযোগী ক'রে তুলল।

সিন্ধু-গঙ্গা তীরের ভূমি মানুষেব বসবাসের উপযোগী হল আনুমানিক ৫০০০ থেকে ৭০০০ বছর আগে। এই ভূমির পরিমাণ প্রায় ৩০০,০০০ বর্গ মাইল মতো হবে।

গুজরাতের অঞ্চলও এর সমবয়সী। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে নর্মদার কাছে যে অস্ত্রটি পাওয়া গেছে তাকেই বলা যেতে পারে, প্রাগৈতিহাসিক ভারতের মানুষের প্রথম নিদর্শন। বোধ হয় প্রাক-চেলীয়ান (Pre Chellean) যুগের। আদি প্রাচীন প্রস্তর-যুগের জাতির বসতির সাক্ষ্য এই নিদর্শনই দেয়। এ ছাড়া আছে গোদাবরী তীরের ২½ ইঞ্চি দীর্ঘ ছুরিকাটি।

যমুনা-গঙ্গা বসতি অঞ্চল এই দুয়ের মাঝামাঝি (Mid-Pleistocene)।

মির্জাপুরের কাছে পাহাড়ের গায়ে চিত্র-অঙ্কন আবিষ্কৃত হয়েছে—একটি গণ্ডারকে যেন ছ'জন মানুষ আক্রমণ করছে, মাথায় তাদের পালকের পোষাক। রাইগড়ের ছবিতে নানারকম মূর্তি—মানুষ, পাখী, শূকর প্রভৃতি নানা রঙে আঁকাও পাওয়া গেছে, কিছু কিছু জ্যামিতিক রেখাও আঁকা। আদমগড়ের

ছবিগুলিও যদি বা স্পেনে-প্রাপ্ত প্রাচীন প্রস্তর-যুগের আভাস দেয়, তবু অত পুরনো কালের আঁকাই যে এই সব ছবি একথা নিশ্চিত ক'রে সবাই বলতে পারেন না। খৃঃ পূর্বাব্দ ১০০০ বছরের এদিকে বলে মনে হয় না। কিন্তু মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হওয়ার পর অনেকেই মনে করেন, এসব চিত্র তার সমসামযিক হলেও প্রায় ৪০০০ বছর আগেকার, অর্থাৎ ঠিক লৌহযুগ সুরু হওয়ার প্রারম্ভে। মহেঞ্জোদারো আর একটা প্রমাণও দেয় যে, সেখানে তামা ব্রোঞ্জের নিদর্শন অনেক পাওয়া যায়। কাজেই একটা যে-ধারণা আছে, ভারতবর্ষ নব্য প্রস্তবযুগে তামা ব্রোঞ্জকে বাদ দিয়ে সরাসবি লৌহযুগে এসে পড়ছে—তা এতটা জোর দিয়ে আর বলা যায়না। সুমাত্রা-জাভাকে ধরলে মনে হয় (ভারতবর্ষেব সঙ্গে যে এই দুটি দেশেব ভৌগোলিক যোগ ছিল অনেকেই মনে করেন) ভাবতবর্ষ সমস্ত প্রধান সম্পদজ্ঞানের স্তরকেই অতিক্রম করেছিল।

কুর্ন্নুল-গুহা হচ্ছে শিবালিক এবং নব্য প্রস্তর-যুগের মাঝামাঝি বয়সের। সেখান থেকেও ভূমিবাসী মানুষের যে তৎকালে কিরূপ জীবনযাত্রা ছিল তা কিছু কিছু অনুমান করা যায়।

এই সব ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনেব পব আমবা পাচ্ছি সিন্ধু-সভ্যতাব কথা।

সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ কালই অনুমিত হয়েছে খৃঃ পূঃ ২৩০০ এব কিছু পূর্বে। মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে এখানকার যোগাযোগ দেখতে পাওয়া গেছে। বিদেশী সভ্যতাব প্রভাব থাকলেও, স্থানিক নিদর্শনও কম নয়; স্থানিক অর্থে দেশজই বলা হয়েছে। তবু মহেঞ্জোদারোর আদিকালের তাবিখ নির্ণয় কবা যায় নি। দুটি কাবণে এই যুগকে আরও পূর্ববর্তী বলে ভাবা চলে। যে সময়ের সিন্ধু-নিদর্শন পাওয়া গেছে, সে সময় এ অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে নগরে পরিণত। বহু জাতির, বিভিন্ন মানবসম্প্রদাযেব অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন নৃতাত্ত্বিকেরা। অথচ, এত প্রভাব সত্ত্বেও কোন্ শক্তিতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সব কিছুর মধ্য দিয়ে বজায় থাকল? স্থানীয় সম্প্রদায় নিশ্চয়ই পুরনো। পুরনো অর্থে কেবল সমাজ দেহই নয়, তার আভ্যন্তরীণ কাজ কর্মের ধারা, সমাজ ব্যবস্থা, ব্যক্তি-সম্পর্ক। পুরনো সমাজ সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল বলেই নতুন সমাজ-তরঙ্গ তার ভিত্তিকে অত সহজে বদলে দিতে পারল না। প্রতিষ্ঠার কথা যখনই আসে তখনই সংগঠনশক্তিকে অনুমান করতে হয়। গোড়ায় কথায় পূর্ব সমাজের সংগঠনশক্তির আভাস আমরা পেয়েছি।

কিন্তু সিন্ধুতীরের আদিবাসীদের মধ্যে ঠিক কোন্ কোন্ দিক দিয়ে সংগঠন শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল তা নিশ্চয় ক'রে বলা না গেলেও, এ কথা সত্য নগর-পরিচালনা, সামাজিকতা এবং সমাজ নীতির প্রথা সুসংগঠিত হয়েই এসেছে।

বহির্ভারতের সঙ্গে আর একটি যোগাযোগের কথা জানা যায়। তামা-ব্রোঞ্জের অস্ত্র-শস্ত্র যে-ধরণের পাওয়া গেছে তা থেকে মনে হয়, সিন্ধু কাস্পিয়ান আর আনাতোলিয়া অঞ্চলের বেশ যোগ ছিল। কন্‌সোস আর হারাপ্পার মালার (beads) মধ্যে বেশ মিল। সুমেরের মধ্য দিয়েই কি তারা এই বাণিজ্য করত? সে তো খৃঃ পূঃ ১৬০০ এর পূর্বের কথা।

তা হলে সিন্ধু-সভ্যতার কাল হচ্ছে ২৫০০ থেকে খৃঃ পূঃ ১৬০০ এর মধ্যে। বিকাশ কাল। কিন্তু এর সূত্রপাত হিসাবে অনেকে খৃঃ পূঃ ৪০০০ বছরও ধরেছেন। অযথা নয়। এদেশে আর্যদের আগমনের কত আগেই না এরা সুসভ্য ছিল। সে তুলনায় আর্যেরা তো নিতান্ত বর্বর।

আমাদের মনের এমন ভাব সাধারণ ইতিহাস থেকে হয়েছে যে, মনে করি আর্যেরাই বুঝি তখন এখানে সভ্যতার শিশুস্তরে ছিল। অথবা যাঁদের পড়াশুনা আছে অর্থাৎ শিক্ষিত তাঁদের মনও কিছুতেই ভাবতে পারে না—এই দেশ মুনি ঋষিদের নয় আর তাঁরা আর্য নন। অনার্য অর্থ অসভ্য কথাটাই এই ভ্রান্তির মূলে।

জাতিতত্ত্বের গবেষণায় দেখা গেছে, সিন্ধুযুগের মানুষের মধ্যে কয়েকটি জাতি আছে—আদি-অস্ট্রালয়েড্, ভূমধ্যসাগরীয়, কিছু মঙ্গোলীয়। কিন্তু নামকরণে এই জাতির কালকে বোঝা যায় না, দেশকেও নয়। 'কিস্' বা মেসোপটেমিয়ার আল-উরাইদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে এদের মাথার খুলি মেলে বটে। কিন্তু প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার জন-ও তো আদি-এলাম, সুমের এবং আক্কাডের মিশ্রণ। (অবশ্য আক্কাড সেখানকার আদিবাসী নয়, পরে এসেছিল)। এই থেকে অনেকে মনে করেন (Mackay), সিন্ধুবাসী আদি এলাম এবং সুমেরবাসী একই মানবগোষ্ঠী থেকে এসেছে, আর সে মানবগোষ্ঠী সম্ভবত দ্রাবিড় বা আদি-দ্রাবিড় অর্থাৎ গায়ের রঙ কালো। গায়ের রঙ কালো, কিন্তু তারা স্নান-প্রক্রিয়া জানত, ইটের ব্যবহার জানত, পয়ঃ-প্রণালী তৈরী করতে পারত—প্রভৃতি সভ্যতার চরম উৎকর্ষে উঠেছিল তারা তৎকালেই।

এই আদিবাসী এল কোথা থেকে? অনুমান করা হয়, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস থেকে সেই সম্প্রদায় বেরিয়ে একটি ধারা গেল পশ্চিমে আর একটি ধারা পূর্বে, (But it can at least be averred that, however translated, the idea of civilisation came to the Indus from the Euphrates and the Tigris and gave the Harappans their initial direction or at least informed their purpose.

Between the two civilisations ensued a sufficiently active inter relationship to carry seals and other knick-knacks westwards to Sumer and more rarely Sumerian or Iranian objects eastwards to the Indus.—Wheeler, The Indus civilisation, C. H. I-1953 Page 94).

তবু ভাস্কর্যের সঙ্গে দু'সভ্যতার মিল নেই। মাটির কাজ অভিনব, আর ভাষা নিশ্চয় ক'রেই সুমের থেকে পৃথক। লিপি অপঠিত হলেও চিত্রধর্মী বলে (Pictographic) অনুমান করা যায়, কেবল তাই নয়, সমস্তযুগের মধ্যে কোন বিভিন্নতা নেই; তা ছাড়া সে সময় সুমেরে আছে ৭০০ বর্ণ এখানে আছে ৩৯৬টি; লেখা সুরু হয় ডান থেকে, দ্বিতীয় লাইন বাঁ থেকে (boustraphedon)। বর্ণ সমন্বয়ে লেখা নয়, 'অক্ষর' সমন্বয়ে, শ্বাসাঘাত বর্ণের উপর, যা থেকে মনে হয় তারা ধ্বনি সম্পর্কেও অবহিত হয়েছিল।

এইখান থেকেই একটা কথা উঠেছে যে, তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সিন্ধু-বাসীবাই লিপি সম্পর্কে একটা স্থায়ীভাব এনেছিল, একটি 'মান' পর্যায়ে তাদের লিপি দাঁড়িয়েছিল, এলোমেলো নয়। সুমেরের সঙ্গে এই প্রভেদ দেখে হুইলার এই কথাই বলেন। (And it is fair to suppose, that the disparity indicates a considerable measure of maturity in the Indus script. Page 81-82)।

এই পরিণতি তো এমনি এমনি হয় না। অভ্যাস থাকা চাই। কোথায় এবং কেমন ক'রে তারা এই অভ্যাস তৈরী করল; কি ছিল সামাজিক অনুশাসন, কি ছিল শিক্ষা-প্রথা? ইস্কুল কি ছিল?

এ কথার উত্তর স্পষ্ট নয়। কিন্তু রহস্য সৃষ্টি করছে বৃহৎ স্নানঘরের উত্তর পূর্বের ঐ ২৩০ × ৭৮ ফিট বাড়ীটা। ওটা কি ধর্মযাজকদের থাকবার ঘর, না মহাবিদ্যালয় (College)?

সিন্ধুবাসীদের মধ্যে ইস্কুল ছিল কিনা প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য আমাদের একটু সুমের অঞ্চলের আলোচনা ক'রে নিতে হয়। এ আলোচনার একান্ত প্রয়োজন এই জন্য যে, আর্যদের সংস্কৃতিতেও কিছু কিছু আলোকপাত করা হবে।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে ইতিহাসের কথা জড়িয়ে পড়বেই। কাজেই সিন্ধু থেকে আনাতোলিয় পর্যন্ত ইতিহাস যদি আলোচনা ক'রে নিই তাকে অপ্রাসঙ্গিক বলা যাবে না।

॥ দুই ॥

দক্ষিণ ব্যাবিলোনিয়াকেই সুমের বলা হয়; সুমেরীয়দের এই অঞ্চলই প্রধান শক্তিকেন্দ্র। কৌণিক বা খিলাকৃতি লেখা (cuneiform script) তারাই আবিষ্কার করেছিল বলে ধরা হয়। মেসোপটেমিয়ার কৃষ্টির এই লিপিই হচ্ছে অন্তর বাহিরের প্রতীক ও বন্ধন (Outward mark & inward bond)। এই ভাষাকে সেমিটিক বলা যায় না, বলা যায় agglutinative tongue—মিশ্রভাষা।

সুমেরীয় কৃষ্টিকে বিদেশ থেকে আগত বলে ধরা হয়। বিদেশটি কোন দেশ ?

সুমেরীয়েরা কখন যে আদিম-মানব অবস্থায় ছিল বলা যায় না। খৃঃ পূঃ ৪০০০ বছরের মধ্যেই তারা সুসভ্য হয়ে পড়েছে; ধাতব অস্ত্র ব্যবহার করতে শিখেছে; নগর নির্মাণ ক'রে জনবহুল অঞ্চলে বাস করতে শিখেছে; লিপি আবিষ্কার করেছে; নাগরিক এই ধর্মচর্চাব নিয়মসূত্র বেঁধে বাস করছে। আরব মরুভূমির পূর্বতীরে ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস নদীর অন্তর্বর্তী ভূমির আদিম বাসিন্দাদের যায়গা দখল করল, তাদের উপর নিজদেব সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে দিল, তাদের অনেক কিছু নিজেরাও গ্রহণ কবল।

পারস্য পর্বতমালার পূর্বদিকেই বুঝি সুমেরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এলাম-দের দেশ। এইখানেই সুমেরী সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল, যদিও এলাম-রা তার উপর নিজদের সংস্কৃতির প্রলেপ দিয়ে নিল। কিন্তু এলামদের হয়ত সুমেরীয়দের এক গোত্রীয় বলা যায় না। ভাষা তো সঙ্কর। আধুনিক জর্জিয়দের ভাষার সঙ্গে এদের মিল আছে। এরা অনার্যও বটে, অসেমিটিকও

বটে। এদের নামকরণ করা হয়েছে এ্যালোরোডিয়ান (Alarodian) বলে। অর্থাৎ ককেসীয় অঞ্চলের ভাষা। হয়ত বা সুমেরীয়রা এই ককেসীয় অঞ্চলের লোক। কিংবা আরও দূরের।

'হল' বলেন তাদের আকৃতির সঙ্গে ভারতীয় আকৃতির বিশেষ মিল। আজকের ভারতীয়দের চেহারা হাজার হাজার বছর আগেকার দ্রাবিড়দের মতো (H. R. Hall ; A. H. of the Near East, 1952 ; Page 173)। এবং এই দ্রাবিড়দের সঙ্গেই সুমেরীয়দের চেহারার মিল পাওয়া যায়। (And it is to this Dravidian ethnic type of India that the ancient Sumerian bears most resemblance, so far as we can judge from his monuments. He was very like a Southern Hindu of the Dekkan who still speaks Dravidian language). মনে হয় জল ও স্থলপথে তারা পারস্যের মধ্য দিয়ে এই দুই নদীর অববাহিকায় এসে পড়েছিল। কাজেই সিন্ধু উপত্যকাতেই তাদের সংস্কৃতির বিকাশ হয়। এখানেই হয়ত লিপি তারা আবিষ্কার করেছিল এবং এই লিপি প্রথমে খাঁটি চিত্রধর্মী ছিল, তা থেকে পরে সরলীকৃত এবং সঙ্ক্ষেপিত হয়ে গেল ; পরে ব্যাবিলোনে এই পরিণত লিপিই হল cuneiform—কারণ এখানে লেখা হ'ত নরম মাটিতে চতুষ্কোণ মুখের কলম দিয়ে।

উত্তর ব্যাবিলোনে আক্কাডেরা বাস করত। কিন্তু সুমেরীয়েরা নগর নির্মাণ পরিকল্পনা তাদের কাছ থেকে নিয়েছিল বলে মনে করবার কোন হেতু হল সাহেব পান নি। পয়ঃপ্রণালীর এবং সেচ পরিকল্পনা কাদের ? এ বিষয়ে হল সাহেব অনিশ্চিত। কারণ সুমেরীয়দের সঙ্গে আককাডের মিশ্রণ ঘটে যাবার পরবর্তী কালে মার্ডুকের কাহিনী থেকে কিছু বুঝবার উপায় নেই।

গিলগামেশ-এর সময়ে 'ইরেক' (Erech) সহরকে যেভাবে নৃশংস অত্যাচার ক'রে ধ্বংস করা হল—তার সঙ্গে মিল অনেক পরবর্তীকালের সংস্কৃতি-পরায়ণ জাতিরই আছে ; বিশেষ করে খুব কাছাকাছি দেখছি আর্য কর্তৃক সিন্ধু নগরী আক্রমণ। কুথা আর গিলগামেশের কাহিনী থেকে জানতে পারা যায়,

রাজ্যশাসনপ্রণালী : উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা—তিনিই স্থানীয় দেবতার পূজারী। তাঁর উপাধি 'পতেসি' (patesi) অর্থাৎ ঈশ্বরের মর্ত্যের প্রতিনিধি। রাজাকে বলা হ'ত লুগল, অর্থাৎ মহাত্মা!

রাজা উরনিনার সম্পর্কে বলা হয়েছে—তিনি খাল খনন করতেন, গোলা (ফসলের) নির্মাণ করতেন, ধর্মগোলার উদ্ভাবক ছিলেন।

উরনিনার আমলে সমবায় পদ্ধতির সুফল সম্পর্কে মানুষ সম্যক অবগত ছিল ধরা যাচ্ছে। 'কিস' থেকে যে সব স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, প্রস্তর নির্মিত ফলকে রাজা উরনিনা উপবিষ্ট বা দাঁড়িয়ে, আর শ্রদ্ধার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ছেলেমেয়ে; প্রধান ভূমিকায় বড মেয়ে লিড্ডা এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অকুরগল (Akurgal)। পরিবার-নীতি বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে (৩০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ)।

ধর্ম, রাজ্যশাসনপ্রণালী এবং রণনীতির অনেক পরিচয়ই এ যুগে পাওয়া যাচ্ছে। রণনীতির ব্যূহ নির্মাণ পদ্ধতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ সমস্তই নির্ভর করে বিশেষ শিক্ষাদীক্ষাব উপর। লিপির সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে এই সব ঐতিহ্য পরবর্তী পুরুষের হাতে পৌঁছে দেবার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এ গুলি কি ক'রে সমাধা হ'ত? ইস্কুলের কোন্ রূপ বজায় ছিল? শুধু কি কোন অনুচিকীর্ষার মাধ্যমে? অনুচিকীর্ষার একটি ধর্ম এই, যে অনুকরণ করে সে নিজের মনোভাবও মাঝে মাঝে মিশিয়ে দেয়। ২৭৫০ খৃঃ পূর্বাব্দে নরাম-সিনের যুদ্ধযাত্রার ছবি থেকে এই মৌলিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখান থেকে আর একটি প্রমাণও মেলে যে, সেমিটিকেরাই ধনুকের ব্যবহার ব্যাবিলনে আনল, সুমেররা ধনুক ব্যবহার করতে জানত না।

আর একটি খবরও জানা যায়। করনীতি থেকে কেমন দুর্নীতি আসে সেই কথা। লাগাসের (Lagash) শেষ রাজা উরুকাগিনার সময়ে ঘটনাটি। লাগাসের সমৃদ্ধি নির্ভর করত সুমের এবং আক্কাডের থেকে কেড়ে নেওয়া ফসল, কাঠ এবং অন্যান্য সম্পদ থেকে। সম্পদই রাজপুরুষ এবং পুরোহিতদের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। সাধারণ মানুষকে তারা উৎপীড়ন করতে থাকে। উরুকাগিনা এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। সাধারণ করদাতাদের পক্ষ হয়ে তিনি পুরোহিত এবং রাজপুরুষের সম্পদের অংশ ছাঁটাই করে দিলেন। করের অনেকটাই সাধারণ স্বার্থে মওকুব ক'রে দিলেন। স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার প্রথার বিরুদ্ধেও দাঁড়ালেন। বিধান দিলেন, "বিধবা এবং অনাথাদের উপর সবলেরা যেন কোন ক্ষতিকর কাজ না করে।" কিন্তু দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে তিনি শক্তিহীন ও বিত্তহীন হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে তো তাঁর রাজ্যই চলে গেল।

মানব-সমাজের এও এক অভিজ্ঞতা।

উরকাগিনার সম্ভাবনাকেই পূর্ণ ক'রে তুললেন খামুরাবি (Khammurabi 2143-2123 B. C.) খামুরাবি কিন্তু নতুন একটা কিছু করেন নি। ব্যাবিলনের প্রাচীন সুমের সভ্যতাকেই বিধিবদ্ধ ক'রে তুললেন যেন। তখন লেখা অগ্রসর হয়েছে, ধনুক এসেছে, মেডিয়া থেকে কাসিট্দের মাধ্যমে অশ্বচালিত রথ এসেছে। কিন্তু লাগসের পতেসিদের থেকে সেচকার্য যে তাঁর সময়ে খুব উন্নত হয়েছে তা নয়। ব্যাবিলন-অধিবাসীদের চরিত্রে আছে ব্যবসায় বোধ, উত্তমর্ণ হওয়ার রেওয়াজ, জ্যোতির্বিদ্যার কিছু। কিন্তু কৃষিকার্যে এরা অত্যধিক অগ্রসর হয়েছিল। ফসল ফলানোর নৈপুণ্য দেখে পরবর্তীকালে হিরোডোটাস অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মোটামুটি দুটো দিকে ব্যাবিলন অতি উন্নত, কৃষিকার্যে আর লিপি-চর্চায়। ঐ দুটি নদীই তাদের শিখিয়েছিল কি করে নালা কেটে জল আনতে হয়। সরকার এই নালা রক্ষণাবেক্ষণে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি দিতেন। করপ্রথা অনেকটা দ্রব্য-বিনিময়ে ছিল। কিন্তু মুদ্রা আর দ্রব্য বিনিময়ের সন্ধিক্ষণ এই ব্যাবিলন। ধর্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত ছিল দেশের অধিকাংশ জমি, আবার রাজার ভূমি অংশও এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকত। কারণ রাজা হচ্ছেন ধর্মরক্ষাকর্তা, অনেক সময় নিজেই প্রধান পুরোহিত। তবে করমুক্ত চাষী বা গৃহস্থও ছিল, যেমন ছিল দাসদের পাশাপাশি মুক্ত মজুর শ্রেণী।

বিচারক নিযুক্ত করতেন রাজা নিজে।

রাজার অনুশাসন প্রস্তর স্তম্ভে উৎকীর্ণ থাকত। এমনি একটি স্তম্ভ সুসাতে পাওয়া গেছে। কৃষিকাজ, ঋণ আদায় এবং স্ত্রী-পরিত্যাগ বিধি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। খামুরাবির পূর্বে বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল একতরফা, অর্থাৎ পুরুষের দিক থেকে। খামুরাবির অনুশাসনে বিবাহ-বিচ্ছেদ অনেকটা দু তরফা হ'ল এই অর্থে যে খোরপোষের ব্যবস্থা থাকল। মিশর ছিল মাতৃতন্ত্রের। আর সুমের ছিল পিতৃতন্ত্র প্রথার। খামুরাবি পিতৃতন্ত্র প্রথাকে উঠিয়ে দেননি; কিন্তু মিশরেরই মতো মেয়েদের সম্মান ও স্বাধীনতা এখানেও প্রচুর দেওয়া হ'ল। অবিবাহিতা মেয়েরা দেবালয়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। জমি বিক্রী নিয়েও অনেক বিধান রচনা করা হ'ল।

পূর্বে বলেছি সুমেরদের মধ্যে ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতা জড়িয়ে ছিল;

কিন্তু খৃষ্টপূর্ব ১৭০০ মধ্যেই আর্যেরা এখানে প্রভাব সুরু করল। প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ ঘটল কাসিটদের মাধ্যমে।

কাসিট বা ক্যাসাইটদের ভাষায় ইন্দো-ইয়োরোপীয় চরিত্রটি (element) পাওয়া যায়। তাদের প্রধান দেবতা সূর্যস্। ইন্দো-ইয়োরোপীয় জাতির যে-অংশ দক্ষিণ দিকে অভিযান ক'রে ইরাণ প্রভৃতি দেশে এল তাদের পুরোধা ছিল এই ক্যাসাইট ; আর উত্তরে ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে যে মিতান্নি রাজ্য তা হ'ল আর্য অধ্যুষিত। এই আয এবং ক্যাসাইট একই উৎস থেকে জাত। ইন্দ্র, বরুণ, অশ্বিন—প্রভৃতি দেবতাদের কথা এখান থেকেও জানা যায়।

এখন, এই মিতান্নি রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে প্রধানত দেখতে পাওয়া যায় সেমিটিক, হিট্টাইট। কিন্তু আর্যেরা হল শাসক-গোষ্ঠী মাত্র। আর এই মিতান্নির ভাষা ককেসীয় অথবা 'আলারোডিয়ান'। মিতান্নিদের পশ্চিম অঞ্চলে অভিযান ব্যাহত হল আর্যদের দ্বারা। এই আর্যেরা মেসোপটেমিয়া, উত্তর সিরিয়া, ইউফ্রেটিস তীরে পূর্বেই অধিকার বিস্তার করে রেখেছিল। পরবর্তীকালে সম্ভবত তারা ইউফ্রেটিস পার হতে পেরেছিল, তা ছাড়া উত্তর সিরিয়ায় সেমাইট এবং হিট্টাইটদের প্রভুও ব'নে গিয়েছিল। বাবিলন ক্যাসাইটদেব হাত থেকে মিতান্নিদেব হাতে এসে পড়ল।

এই সময় মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ মিতান্নি এবং ক্যাসাইটরা খুব একটা সংস্কৃতি-পরায়ণ ছিল না। এরা বিজিতদেব সভ্যতাকেই গ্রহণ করল। এ ব্যাপার ঘটল দু শতাব্দী ধরে। এর মধ্যে ক্যাসাইট রাজাবা বাবিলনের ধর্মকে গ্রহণ করে। এতৎসত্ত্বেও ক্যাসাইট আব বাবিলনেব অধিবাসীদের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় থেকেই ছিল—বহুদিন ধ'রে।

হিকসস্-রা মিশরে এল : ১৮০০-১৩৫০ খৃঃ পূঃ

আর্যেরা ইরান থেকে, আর আনাতোলিয়ারা এশিয়া মাইনর থেকে মোসোপটেমিয়া এবং উত্তর সিরিয়ায় যদি ঝাঁপিয়ে পড়ল, তবে সেমিটিক আধিবাসী দক্ষিণ সিরিয়া আব প্যালেস্টাইনে ঝুঁকে পড়ে। পবিশেষে মিশরের দুর্বলতার সুযোগে সমস্ত বাধা ভেঙে সেখানে ঢুকে পড়ল। এদের মরুভূমির বেদুইন বা মেষচালক বলে মিশরবাসী নাক সিঁটকেছিল, কিন্তু অবহেলায়

নিজের দুর্বলতা ঢাকা যায় না। এরা কোন্ শক্তিতে মিশরের কাছে শক্তিমান অথচ আর্যদের কাছে দুর্বল ?

এরা আনাতোলীয়দের যুদ্ধবিদ্যা শিখে নিয়েছিল, এরা সুসভ্য সিরিয়াবাসী, ঐ যুদ্ধ-রথ অশ্বচালিত। গাধায় রথ টানত—বাবিলনে স্মরণাতীত কাল থেকে। মিশরবাসী এই রথ ব্যবহার করতে জানত। কিন্তু ঘোড়ায় রথ টানে ? এইটি সংযোজন তারা করতে পারেনি। ২০০০ খৃঃ পূঃ মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার ইরানে ঘোড়াকে গৃহপালিত পশু হিসাবে ব্যবহার করতে শেখা হয়েছিল। সেই সময় থেকেই এই অশ্বচালিত রথের আবির্ভাব। তখন তীরন্দাজদের থেকে রথীদের উপরই যুদ্ধজয় নিভর করল বেশী। মিশর ঠেকে শিখল অনেকদিন পর।

কিন্তু হিকসস্‌রা পরবর্তীকালে মিশরের আচার আচরণ গ্রহণ করে নিল।

হিট্টাইট—খট্টি মুস্কয়া ; ১৪০০-১১০০ খৃঃ পূঃ

মিশরীরা তুকসের বরফের ভয়ে বেশী এগোতনা। কিন্তু আনাতোলীয়রা ছিল পরিশ্রমী, তারা সেমিটিক দেশকে আক্রমণ বার বার করল। আনাতোলীয় আর সেমেটিকরা একজাতি এক কৃষ্টির হলেও দুদলের সঙ্গে ভীষণ বিরোধ ছিল (No tie of common race or religion softened the antagonism between Semites and Anatolians—Hall ; Page 327)। আনাতোলীয়দের এরা বর্বর বলত। কিন্তু তারা সেমিটিকদের এই উত্তরপ্রান্ত পর্যুদস্ত করে দিল। এদেরই বলা হ'ত খট্টি। কিন্তু এসিয়া মাইনরে এই মেসোপটেমিয়দের বলা হ'ত মুস্কি (mushki), তাই তারা মুস্কায়া নামেও পরিচিত। ১৯২৫ খৃঃ পূ থেকেই খট্টিদের এই অভিযান চলে। ঐ সময়ে ওরা বাবিলন অধিকার করে।

পরবর্তীকালে এই খণ্ড যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। এই হিট্টাইটরা এশিয়াদের কাছে ভয়ঙ্কর এবং অতিমানবিক শক্তিশালী বলে অভিহিত হয়।

তিনদিকে পরিবেষ্টিত সভ্যতা—মিনোয়ান, গ্রীস, মিশর আর মেসোপটেমিয়ার প্রভাব থেকে আনাতোলিয়ার সংস্কৃতি বাঁচল কেবল হিট্টাইটদের প্রবল জাতীয়তা বোধে। এর আগেই এই অঞ্চলে cuneiform লিপি (মাটির গায়ে) উৎকীর্ণ হতে পেরেছে। বোগাজ কিওয়ি (Boghaz-kyoi) এর রাজার রাজকীয় দপ্তরের জন্য এই লিপি ব্যবহৃত হত ;

কিন্তু তাদের জাতীয় hieroglyphic লেখা স্তম্ভে প্রচলিত থাকত; এদের এই জাতীয় লিপি অনেকটা মিশরীয় ধরণের। কি করে এমন হ'ল সে সম্পর্কে কোন তথ্য নাই (No relation whatever between it and Egyptian system can be traced, but comparisons with the unreal Cretan Script might give results—Hall ; Page 329 foot note)। রীতি ছিল—Syllabic signs, determinatives এবং simple ideographs.

মাতার উপাসনা (Ma)' থেকেই মেসোপটেমিয়ার ইশ্‌তার জাত বোধ হয় (Characteristic was the universal worship of the Mother goddess (Ma), known to the Greeks and Romans as cybele, and generally identified with Rhea or Demeter at Ephesus with Artemis, elsewhere as the 'Mother' simply, the Dindymene Mother or the Zin Zimmene Mother, probably the original of the Mesopotamian Ishtar—Hall ; Page 329-30).

এই মা আর অতিশ (Ma & Attis) উপাসক এশিয়া মাইনরের প্রাচীন উপাস্য। পরবর্তী কালে পরিণতি—সূর্য এবং চন্দ্র হিসাবে ; বোধহয় আনাতোলীতে এই উপাসনায় এল পূর্বাঞ্চলের আর্যদের দেবতা থেকে (Both are probably Aryan or Proto Iranian gods introduced from the East—Hall ; Page 330),

মিত্র সম্পর্কেও ঐ কথা।

আযদের দেব-দেবতার সহচর যেমন কোন এক পশু, হিট্টাইটদের মধ্যেও তেমনি দেখা যায়।

(There the Hittite deities are often accompanied by animals in quite Indian fashion, and sometimes stand upon them. This was a peculiarity characteristic of Anatolian iconography down to the latest times. It may be that it was a feature borrowed from Aryan religion—Hall ; Page 331 footnote)

একটি দেবীকে পাওয়া যায় (Cybele or Ma) যিনি সিংহের উপর দাঁড়িয়ে। গ্রীক রোমানদের মুদ্রাতেও এইরূপ মূর্তি পাওয়া যায়। ভারতেও তো এমনি আছে। এই মূর্তির পিছনে আবার পরশু হাতে যুবক যোদ্ধা,

সেও সিংহের উপর, বোধ হয় সে এ্যাটিশ। তার পিছনে দুইটি যুগল দেবা। মাথার পোষাক অনেকটা চূড়ার মতো (মুকুট ?)।

আনাতোলিয়দের দেশজ ধর্ম—অনার্য। মাতৃতন্ত্র প্রথা (অনার্য)। অথচ সেমিটিকও নয় আর্যও নয়। গোঁফ দাঁড়ি কামান সব চেহারা, ভাষাতেও আর্যধ্বনি পাওয়া যায় না।

এশিয়ার এই অঞ্চলের খাঁটি ইতিহাস এই পর্যন্তই থাকুক। এর পর থেকেই ভারতে আর্যের অনুপ্রবেশ ঘটল। কিন্তু এসে কি পেল আর কি দিল, তা আলোচনা করবার পূর্বে ইস্কুল সমস্যার সমাধান করে নিই।

॥ তিন ॥

পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেখানে ধর্ম-উৎসব প্রথা, সামাজিক প্রথা (খামুরাবির অনুশাসন থেকে) এবং অর্থনৈতিকপ্রথা বেশ সংগঠিত হয়েছে। রাজারা যত বিষয় নিয়েই গর্ব করুন, শিক্ষা-সম্পর্কে কিছু বলছেন না ; কিন্তু শিক্ষাপ্রথা প্রত্যক্ষভাবে সংগঠিত না হলেও, প্রথাটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। লিপির যখন বিকাশ হয়েছে তখন সংগঠনের মধ্যেও সে প্রথা এসেছে। চাইল্ড এই জন্যই সুমেরে যে ইস্কুল ব্যবস্থা ছিল তা অনুমান করেছেন।

সুমেরে যে মন্দির-সমস্যা এল, সেই সমস্যার সঙ্গেই জড়িয়ে হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায় খৃঃ পূ ৩০০০ থেকেই। পুরোহিতেরা ঈশ্বরের সম্পত্তির একটা হিসাব লিখে রাখতেন। কিন্তু মন্দির তো একা পুরোহিতের নয়, একটি কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক (Corporation) পরিচালিত। কাজেই সে-লেখা যাতে পুরোহিতের অনুপস্থিতিতে সমস্ত সভ্যই বুঝতে পারেন তার জন্য ঐ লেখা অনেকটা সীমাবদ্ধ হলেও অনেকের উচ্চারিত এবং বোধগম্য। আবার এই লেখা শিক্ষা-সাপেক্ষ। শিক্ষানবীশেরা পুরোহিতের কাছেই হয়ত এই লিপি শিখতেন। এই লেখা শিখতেও হবে আবার তা পড়তেও হবে। কাজেই, দীক্ষা গ্রহণ করার পর বেশ অনেকদিন 'ইস্কুল' শিক্ষা চলত। কিন্তু সবাইয়ের এই অবসর ছিল না। কারণ সমাজের অধিকাংশ মানুষ শ্রম-শিল্পে আত্মনিয়োগ করত। কারিগরি শিক্ষার তখন ভরা মরশুম। কাজেই লেখা-পড়া জানা লোকের

সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। শুরুপ্‌পাকের (Shurruppak) মৃত্তিকালিপি থেকে অনুমান করা হয়, খৃঃ পূ ৩০০০ সময়ে মন্দির-হিসাব, লিপির তালিকাগুলিই এই ইস্কুলের পাঠ্য ছিল। এ ছাড়া পাওয়া গেছে রাজকীয়বিধি তালিকা, চুক্তিপত্র আরও কত কি। অর্থাৎ লিপি যখন আবিষ্কৃত হল তখন সমস্ত রকমের ব্যবসায় এবং কার্যক্ষেত্রেই তা ব্যবহৃত হ'তে থাকে। লিপির মারফৎ শিক্ষা যেন সহজ হয়ে গেল। নরম-মাটিতে খিলের আকারের কলম দিয়ে লেখার রেওয়াজ ছিল, তারপর সেই মাটি পুড়িয়ে লেখা স্থায়ী করা হ'ত। অভিধান আর হিসাব-বিদ্যাই এই শিক্ষায় প্রধান পাঠ্য।

শিক্ষার পদ্ধতিও কিছু অনুমান করা যায়। খিলাকৃতি লেখা পড়াও দুঃসাধ্য। কাজেই স্মৃতিশক্তিরই একমাত্র ব্যবহার অর্থাৎ মুখস্থ বিদ্যার। লিপি পড়ার এবং লেখার নিয়মও কিছু কিছু শিখতে হত।

ছাত্র কি ক'বে বাছাই করা হ'ত সে সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। কিন্তু জন্ম কৌলীন্য যে ছিল না এই ইস্কুলে তা সিদ্ধান্ত করা যায়। জাতি বিচার নেই; অবসর কার আছে সেই বিচারই বড।

তবে বিশেষ সম্প্রদায়েরই এদিকে ঝোঁক পড়ল। অন্যান্য কারিগরী শিক্ষায় শারীরিক পরিশ্রম বেশী। লেখাপড়ায় তা কিন্তু নেই। উপরন্তু নতুন কলা-কৌশল ব'লে সমাজে লিপিবিশারদের সম্মানও বেশী। একেবারে রাজা না হলেও রাজন্য। নব্য যুগেব মিশরের নিদর্শন থেকে অভিভাবকের এই দিকে তুরন্ত ইচ্ছা প্রকাশ পেযেছে যে তাঁর ছেলে নিশ্চয়ই লেখাপড়া শিখবে, মাঠের চাষ নয়। উঃ কি কষ্ট ঐ শারীরিক পরিশ্রমের কাজে; নখগুলোর অবস্থা কি, যেন কুমিরের ছানাব হাত (fingers like a crocodile's) আর গায়ে কি আঁসটে দুর্গন্ধ হয় (He stank worse than fish-spawn। এই শিক্ষিতেরা হলেন ক্ষমতায় আর মনেব গঠনে—আই. সি. এস. দেরও উপরে। (কেমন ক'রে শিক্ষা পেযে মানুষ মাটি-ছাড়া হয়, সমাজ-ছাড়া হয় তা সেই কালেও দেখা গেছে)।

সাধারণত ব্যবহারিক জগতে কাজেকর্মে লাগে এমন বিষয়ই এই ইস্কুলে, মন্দির-সংলগ্ন ইস্কুলে, শেখানো হ'ত। কিন্তু উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা যে একেবারে না ছিল তা নয়। তবে এই উচ্চশিক্ষা ব্যবহারিক জগৎকে বাদ দিয়ে একটু দর্শনঘেঁষা হয়ে পড়ত। পুরোহিতেরা নিজদের রহস্যবাদিতা মিশিয়ে দিচ্ছেন এই ভাবে। পুরাতন সুমেরীয় ভাষা (দেবভাষা

সংস্কৃতের মতোই) শিক্ষা ছিল তার মধ্যে বড। পুরনো চাল ভাতে যেমন বাড়ে পুরনো চলন তেমনি চিন্তাকে 'মোহিত' করে। কিছু পরে এখানকার শিক্ষায় অঙ্ক এল, চিকিৎসা বিজ্ঞান এল, কারিগরী বিদ্যার বিজ্ঞান এল।

কর্মশালাতে যেমন নবীশেরা কারিগরের কাজ দেখত, দেখে দেখে শিখত, ভুল হলে যেমন কারিগর শুধ্‌রে দিত—এখানেও শিক্ষা তেমনি পুরোহিতের বা লিপিকারের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যেই ঘটত। অনুকরণ করা, শুধ্‌রে দেওযা, অনুসরণ করা। কোনরকম তথ্য-মূলক বক্তৃতা বা আলোচনা বোধ হয় স্থান পায় নি।

ইস্কুলের এই রূপটি খৃঃ পূঃ ২৫০০ এর মধ্যে ঐ অঞ্চলে এমনি ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতার কাল যদি খৃঃ পূ ২৭০০ থেকেই ধরা যায়, এবং ঐ দেশের সঙ্গে নানাবিষয়ে যদি এদেব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই থেকে থাকে, তবে ঐ ইস্কুল ব্যবস্থা এখানে যে আসেনি তা কি ক'বে মনে করা যায়। সিন্ধুবাসীরা জ্যামিতিক রেখা আঁকছে, সীল-মোহবে লিখছে, লিপি-প্রতিষ্ঠা করেছে, কারিগরী শিল্পে উন্নতি করেছে, লৌহ-ধাতু ব্যবহারও করছে (এরাই প্রথম ঃ ১৫০০ খৃঃ পূর্বাব্দে) তবু তাদেব শিক্ষাপ্রথা থাকলনা—একথা ভাবতে পারা যায় না। তা ছাডা আমরা দেখছি, মন্দির-সংলগ্ন ইস্কুল সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে এল বটে, কিন্তু কর্মশালাতে শিক্ষাপ্রথা তো ছিলই উপরন্তু সংগঠিত ইস্কুলের সঙ্ঘটন হয়েছে পুরোহিতদের এমন কি লিপি শিক্ষারও আগে।

ইনস্টিটিউসনকে যদি আমরা প্রথা বলি তা হলে ইস্কুলকে বলব প্রতিষ্ঠান।

সমাজের বিবাহ-পদ্ধতি, উৎসব-পদ্ধতি এগুলো যেমন প্রথা, ইস্কুল সুসংগঠিত হওয়ার আগে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান হওয়ার পূর্বেও তেমনি শিক্ষাপ্রথা। এই প্রথার মধ্যে কি থাকে ?

সমাজ-ব্যক্তির পারস্পরিক আচরণ আর করণীয় নিয়েই সমাজ-সংগঠন। আচরণ আর করণীয়েরও প্রাক্ অবস্থা আছে। কিন্তু সেগুলি যখন প্রতিষ্ঠা অর্জন করল, সমাজের সিদ্ধ-মানে দাঁডাল (standardised) তখনই তা প্রথা রূপে প্রবর্তিত হয়।

সমাজ-ব্যক্তির কাজের যেমন সামাজিক উদ্দেশ্য আছে, প্রথারও তেমনি আছে। প্রথার স্বভাবই হচ্ছে, সামাজিক উদ্দেশ্যপূর্ণ। কিন্তু প্রথার উদ্দেশ্য সমাজ-ব্যক্তির মতো একক নয়, বা ব্যাহত নয়। সমাজের অনেক উদ্দেশ্যই

এই প্রথার মধ্যে থেকে একটি যেন সমগ্র বস্তুর আকার নিয়ে উদ্দেশ্য-বস্তু হয়ে দাঁড়ায় (Aim contents)। অনেক উদ্দেশ্যের একত্র সমাবেশ নয়, অনেক উদ্দেশ্যের একীভূত নব মূর্ত রূপ। আবার মানুষের আচরণ, অনেক মানুষের সামাজিক আচরণ মিলে একটা প্যাটার্ণ মতো হয় (action pattern)। এই কার্য-সমবায় আর উদ্দেশ্য-সমবায় এক হয়ে হয় প্রথা।

প্রথা আলোচনা করলেই আমরা সেই সমাজের স্বরূপ বুঝতে পারি। কাজেই একথা ধ'রে নেওয়া যায় যে, প্রথার উদ্দেশ্য এবং কার্যপন্থার মধ্যে একটা সামাজিক কর্তব্য প্রকাশ পায়। কর্তব্য-কর্মের সঙ্গে প্রথার গাঁট-ছড়া বাঁধা। এই উদ্দেশ্য-বস্তু (aim contents), কার্য-মান (action-pattern) এবং কর্তব্য সমাজে প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করে (standardised) এবং সেই প্রতিষ্ঠ-মান থেকে যে লব্ধ-রূপ (Resultant) তাব দ্বারা ব্যক্তিকে কর্তব্য পথে চালিত করাই প্রথার উদ্দেশ্য। এই প্রথাকে উদ্দেশ্য-বস্তু, কার্য-মান প্রভৃতির শ্রেণীভেদ ক'রে বিষয় অনুযায়ী নানাভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) সমাজ ব্যক্তিব শরীর সুস্থতার দিক, (২) অর্থনৈতিক, (৩) অবসর বিনোদন, (৪) বৈজ্ঞানিক, (৫) ধর্মীয়, (৬) শিক্ষা-সংক্রান্ত (৭) রাজনৈতিক, (৮) বিধি-সংক্রান্ত, (৯) পরিবার সংক্রান্ত।

এই প্রথার আবার দুটো চরণ। কোনটি সমাজ গতির জন্য (operative) কোনটি সমাজ-নিয়ন্ত্রণের জন্য (Regulative)। সমাজ-গতি বা চালনার জন্য যেটি তার মধ্যে স্বাভাবিকতার বা স্বতঃ প্রণোদিত ভাব অনেকটা থাকে; কিন্তু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বাধ্যবাধকতাই বেশী।

কতগুলি প্রথা আছে, যাতে বিশেষ বিশেষ সময়ে সমাজের একই গোষ্ঠী বারবার যোগদান করে (Repetitive); কতগুলি প্রথায় অনিয়মিত সময়ে বিভিন্ন গোষ্ঠী যোগদান করে (contingent); যেমন বিবাহ-সময়ে হয়। আর একটি শ্রেণী হচ্ছে, অবিরাম (continuous); পরিবার প্রথা এর মধ্যে, রাজশাসনও অনেকটা তাই।

এই শ্রেণীভেদ যে খাঁটি খাঁটি ভাবে সর্ব প্রথায় ঘটে তা কিন্তু নয়। মিশ্র ধরণের শ্রেণীও আছে।

প্রথার সংজ্ঞার মধ্যে আমরা পাচ্ছি, (১) তার মধ্যে সমাজ-ব্যক্তিদের অন্যোন্য কাজকর্মের মান থাকবে, (২) যারা এই মানটিকে ধারণ করে অর্থাৎ অংশীদার, (৩) কোন্ উদ্দেশ্যে এগুলি নিয়মিত হচ্ছে তা ও থাকবে।

প্রথা আবার সমাজ-ব্যক্তির সংখ্যা নিয়েও ভাগ করা যায়; যেমন—সমস্ত গোষ্ঠী সমবেত ভাবে যে কাজ নির্বাহ করে; সবাই কর্মী, সবাই নিয়ন্তা; শিকার যাত্রা, ধর্ম-অনুষ্ঠান এই পর্যায়ে পড়ে (Associative)।

আবার আর একরকমের আছে যেখানে বড়গোষ্ঠীর খণ্ড খণ্ড গোষ্ঠী মিলে কার্যমান অনুসরণ করে (parallel)। যেমন পরিবার, বিবাহ, আতিথেয়তা, ব্যক্তিগত উপাসনা প্রভৃতি।

তাহলে যে কোন প্রথারই বৃহত্তর সমাজের কার্যসম্পাদন কর্তব্য থাকে। প্রথার কর্তব্যকর্মের স্বভাব অনুযায়ী তার বিচার করতে হয়। প্রথার সময় অনুযায়ী, প্রথার সভ্যসংখ্যা অনুযায়ী।

প্রথার এই বর্গীকরণে আমি সমাজ-মানব বিজ্ঞানী নাডেল (Nadel) এর পদ্ধতিই অনুসরণ করলাম।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে সুমের-সিন্ধু শিক্ষাপ্রথায় সমাজ-কর্তব্য হিসাবে দেখছি বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতাকে উত্তরাধিকার সূত্রে পর-পুরুষে সঞ্চারিত করা, সমাজেব ঐক্য সাধন করা, মানুষেব লব্ধ অভিজ্ঞতার অংশীদার সবাইকে করা। কাজেব স্বভাব অনুযাযী দেখছি, সমাজ ব্যবহার চালু করা; কিছুটা পুরোহিত সম্প্রদায়ে এবং কারিগর সম্প্রদাযে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু সমগ্রসমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়। কাজেই একে সমগ্র গোষ্ঠীব উদযাপিত প্রথা (associative) বলা যায় না, বলা যায় সমান্তরালধর্মী (parallel)। সময়শ্রেণীতে ভাগ করে দেখছি, এগুলি অবিবাম চলতে থাকে (continuous) কিন্তু অনিয়মিতও বটে (contingent)। কেউ শিখল কি না শিখল তাতে খুব একটা আসে যায় না।

আরও একটা লক্ষ্য কববার বিষয, শিক্ষা ব্যক্তিগত পরিচালনায় প্রথমত হাতে-কলমের কাজে ছিল, লিপি আবিষ্কারেব পব সেটি যে পালটে গেল তা নয়, তবে কিছু কিছু অংশ তথ্যমূলকও আসছে। কারিগর থেকে শিক্ষা ধর্মীয় ও রজকীয় শিক্ষায় রূপান্তরিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রথা সংগঠিত হওয়ার পথে এল।

সিন্ধু-সভ্যতায় যদি ইস্কুল থেকে থাকে (থাকাই স্বভাব) তবে শিক্ষা প্রথার রূপ এই রকমই হয়েছিল অনুমান করা যায়।

অবশ্য এই সভ্যতায় কিছু বিশৃঙ্খলা এসেছিল, ভাঙনের মুখে এসে পড়েছিল। সেই সময় (খৃঃ পূ ১৬০০) আর্যেরা এদের উপর তৈমুরলঙের

বৌদ্ধযুগে

বৈদিক-শিক্ষার অবনতিব জন্যই যে বৌদ্ধ-শিক্ষার আবির্ভাব তা নয়। শুধু শিক্ষা কেন, বৌদ্ধধর্মও হিন্দুধর্ম থেকে খুব একটা স্বতন্ত্র নয়। মনীষীরা বলেন বুদ্ধদেব স্বয়ম্ভু তো ননই ববং তাঁব সময়ে হিন্দু সমাজে এই মতবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল।

বৈদিক ধর্ম ও শিক্ষা দাক্ষিণাত্যে ভাবতেব পূর্বাঞ্চল ঘুরে গিয়েছিল কিনা, কিংবা বিন্ধ্য-সাতপুবার কোন বন্ধ্র পথে গিয়েছিল সে বিতর্ক রেখে দিলেও একথা সত্য বৈদিক সভ্যতা ইতিমধ্যে উত্তর থেকে পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ছে অর্থ রাজ্য বিস্তৃত হচ্ছে, রাজার সংখ্যা বাড়ছে, সম্পদ কর্ষণেব মনোবৃত্তিও প্রবল। বাণিজ্য আছে শিল্পকলা আছে আর আছে উপনিষদ আর সূত্র সংস্কৃতি। বাস্তব অভিজ্ঞতাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্ম, আত্মা প্রভৃতির উপলব্ধিও ক্রমেই বিমূর্ত চিন্তাব মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করছে। আযেরা ভারতের অনগ্রসব জাতিকে, পুলিন্দ-শবর প্রভৃতিকে, দস্যু বলে অভিহিত করলে হবে কি, তাদের সংখ্যা কম নয়, তাদেব অভ্যাস প্রবৃত্তি আব আচারকে এক লহমায় বৈদিকপন্থী কবে আনা কঠিন। বৈদিক ভাষারও রূপ বদল হচ্ছে, নতুন ভাষা প্রচলিত ভাষাকে মান্য কবতে শিখছে।

এই অবস্থায় ব্যক্তিগত সন্নিধানে যে শিক্ষা তা প্রায় গোষ্ঠীবদ্ধ হ'তে চলেছে। সম্পদকর্ষণেব যে মনোবৃত্তি তাতে এসেছে অবসাদ, সাধারণ মানুষের দুঃখেব সীমা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। রাজাদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবের দরুন, এবং অর্থলিপ্সায় দেশে খুব যে একটা শান্তি ছিল তা নয। এমন অবস্থায় চতুরাশ্রম-প্রথা খুব একটা কার্যকবী হ'তে পারে না। হিন্দুদের যে শিক্ষা-অভ্যাস বহু মনোবৃত্তি গঠনের মধ্য দিয়ে নির্বাহিত হত তাতে ভাঙন সৃষ্টি হ'ল। হিন্দুরা ব্রহ্মচর্য-আশ্রমে দুটো ধারা এনেছিল—(১) উপকুর্বাণ সামযিক কালের ছাত্র, (২) নৈষ্ঠিক—জীবনব্যাপী শিক্ষার্থী। প্রথম সম্প্রদায় গৃহ থেকে গুরুব কাছে আসত তারপর শিক্ষা সমাপনান্তে স্নাতক হয়ে বাড়ী ফিরে যেত।

সমাজ বড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল—এই যে গার্হস্থ্যাশ্রম এখানে শিক্ষাকালের অভ্যাস এবং মানসিকতা খুব একটা কাজে লাগছে না কাজেই শিক্ষা অনেকটা ব্যর্থ হতে চলেছে।

বৌদ্ধশিক্ষায় তাই ব্রহ্মচারীর বা শিক্ষার্থীর একবার 'পবজ্জা' ক'রে এলে আর গৃহে ফিরে যাওযা চলত না। তৎকালীন হিন্দুধর্মের অনিকেত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদর্শও বৌদ্ধধর্ম মেনে নিল। এই অনিকেত সন্ন্যাসী গৃহ-পরিত্যাগ করতেন, বৃক্ষমূলে বাস করতেন, কখনও বা শূন্যাগাব, দেবাগার, মঠ, কুঠী, অরণ্য, গিরিগুহাতেও বাস করতেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসীরাও অনাগারিক হয়ে, বৃক্ষমূলে বা পূর্বোক্ত স্থানে বসবাস করতেন, শ্রেষ্ঠী বা বাজাবা পরবর্তীকালে তাঁদেব বাসেব জন্য বিহার, অর্ধযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্য, গুহাও তৈবী ক'রে দিতেন।

দেখা যাচ্ছে, বৌদ্ধধর্ম তৎকালীন প্রচলিত ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের রীতি-নীতি প্রায় সর্বাংশেই মেনে নিয়েছিলেন, এমন কি মঠ-প্রথাটিও এই ধর্মেব মৌলিক কিছু নয। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণদের উপব বুদ্ধদেবেব অশেষ শ্রদ্ধা ছিল, এইজন্য শিষ্য গ্রহণ এই দুই সম্প্রদায় থেকে কবা হ'ত। কাবণ মানসিক দিক দিযে এঁরা বৌদ্বধর্ম শিক্ষা গ্রহণেব জন্য অনেকখানি প্রস্তুত। বৌদ্ধধর্ম সমাজ-সংস্কার করতে চায়নি, সমাজসেবাও এই ধর্মেব নতুন নয়। তবে তাঁদের নতুন দিক কি? শ্রেণীভেদ দূব করা? তাও নয়। কাবণ তখনও কঠোব শ্রেণীভেদ হিন্দুসমাজে এসে পড়েনি। বুদ্ধদেব অর্থনৈতিক। সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণে মানুষের যে পবিবর্তন ঘটে তার দিকে দৃকপাত কবেননি, তিনি চেয়েছিলেন একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যাত্মিকতাবাদীদেব সমাজ। পার্থিব-জ্ঞানকে পবিহার ক'রে একটি সবল মানসিক বৃত্তির সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু জীবন-যাপন করাতে আহ্বান কবলেন। কাজেই সাধাবণ মানুষ খুব একটা স্বস্তি পেল না, বরং নতুন আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এসে জুটল। তাদের সামনে শাশ্বত কাল থাকল কিন্তু বর্তমান উহ্য হয়ে গেল যেন। সাধারণ গৃহস্থ তা মানতে চায় না। হিন্দুধর্মের গাহস্থ্যজীবনের পূর্ববর্তী ব্রহ্মচর্যাশ্রম একটু দৈনন্দিন সমস্যাব বাইরে ছিল। তাই শিক্ষা-বৃত্তি বা ব্রহ্মচারীদের মধ্যে অত ব্যতিক্রম এসে জুটেছিল। বৌদ্ধধর্মেও কালক্রমে তাই আসতে বাধ্য; এল ও।

পব্বজ্জা গ্রহণে অনেক রকম বিধিনিষেধ ছিল, তার মধ্যে অন্যতম নিষেধ

ছিল, অভিভাবক বা রাষ্ট্রের অসম্মতিতে কাউকে এই পব্বজ্জা গ্রহণ করতে দেওয়া হ'ত না। এই পব্বজ্জা গ্রহণ ক'রেই বৌদ্ধশিক্ষা সুরু হত। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব রাষ্ট্র বা পরিবার বিরোধী কোন কাজ করতে চাননি। শারীরিক কোন ব্যাধি বা ত্রুটি থাকলেও এই পব্বজ্জা নিতে দেওয়া হ'ত না। অর্থাৎ পলাতক-বাদ তাঁর পব্বজ্জায় ছিল না। কোন্ পরিবারই বা চাইবে তার পুত্র-কন্যা চিরকালের জন্য গৃহপরিত্যাগ করুক। দরিদ্রেরা পারতনা। পারল ধনী এবং শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়, যাদের মধ্যে সম্পদকর্ষণ মনোবৃত্তির অবসাদ এসেছে। কোন রাজনৈতিক কারণ কিছু কি ছিল? ব্রাহ্মণদের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া যাবে বলে কোন রকম ইচ্ছাই বা ছিল কিনা।

পব্বজ্জার পর উপসম্পদা। পব্বজ্জার কাল প্রায় দ্বাদশবর্ষব্যেপে ছিল। উপসম্পদার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থী বৌদ্ধভিক্ষুর পদে অধিষ্ঠিত হতেন।

এই উপসম্পদা পদে উত্তীর্ণ হতে হলে বৌদ্ধভিক্ষুদের মনোনয়ন দরকার। মনোনয়নের ব্যাপারে প্রথমে দশজন ভিক্ষুর উপস্থিতি ছিল সিদ্ধ, পরে এই সিদ্ধসংখ্যা (Quorum) কমিয়ে পাঁচজনে আনা হয়; অনেক বলেন এই নির্বাচন অনেকটা গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক কথাটি চিরকালই অস্পষ্ট। কাজেই ঐ শব্দটি পালটে বলা যেতে পারে, উপস্থিত বৌদ্ধভিক্ষুদের ভোটের উপরই নির্ভর করে।

উপসম্পদার নানা করণীয় (নিস্সয়া)-অকরণীয় ছিল। মজা হচ্ছে এই, যদি মঠ থেকে বেরিয়ে আসতে চান তবে অকরণীয়ের তালিকা থেকে কিছু একটা ক'রে ফেলুন, বেরিয়ে আসবেন। এইখানেই থা'কল এক ছিদ্র-পথ। এছাড়া উপাধ্যায়-আচার্যদেরও অনেক রীতি-নীতি ছিল। ধর্ম-অনুশাসন শিক্ষা দিতে হ'ত শিক্ষার্থীদের। তাঁরা দায়ী থাকতেন, দায়িত্ব থাকত। ছাত্রদেরও দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্ম নির্ধারিত ছিল—অনেকটা ব্রাহ্মণদের শিক্ষার মতোই। আমরা সে-সব তালিকা উল্লেখ না ক'রেই একটি সূত্র উল্লেখ করব। বৌদ্ধযুগে শিক্ষা নির্বাহিত হত বিহারে-মঠে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে। ব্রাহ্মণদের যুগের সেই গুরুগৃহ আর এখানে উপস্থিত নেই। অবশ্য পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণদের যে এই সঙ্ঘবদ্ধভাবে শিক্ষা প্রথা প্রবর্তিত না হয়েছিল তা নয়; কিন্তু বৌদ্ধশিক্ষা পাশাপাশি না চালিয়ে একটিকেই গ্রহণ করল। অর্থাৎ সূত্রটি হচ্ছে এই, বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষা প্রথার স্তরকে উত্তীর্ণ হয়ে নিয়ন্ত্রিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হল। এই নিয়ন্ত্রিত সঙ্ঘবদ্ধ শিক্ষা-প্রথা সমাজ ঈপ্সিত হয়ত নয়, কিন্তু সমাজের গতির

ভবিষ্যদ্বাণীই যেন ঘটে গেল। এই জন্যই বলা চলে, বর্তমান যুগের ইস্কুলের পূর্বপুরুষ এই বৌদ্ধ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

'নিয়ন্ত্রণ' কথাটি একটু পরিষ্কার করে নিই। ধর্ম-অনুশাসন নিয়ন্ত্রণ করত এই শিক্ষা, একথা বললে হিন্দুযুগের শিক্ষার সঙ্গে খুব একটা পার্থক্য থাকে না। ধর্ম এই দুটি রীতির মধ্যেই বর্তমান। আসল কথা হচ্ছে, বর্গে বর্গে শিক্ষার্থীদের ভাগ করে নিচ্ছেন উপাধ্যায় বা আচার্য। বৈদিক যুগেও বিভিন্ন গুরু ছাত্র-বর্গ তৈরী কবতেন, নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু বৌদ্ধ-শিক্ষায় প্রতি গুরুর তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্র ছাত্রবর্গ থাকলেও, সমস্ত উপাধ্যায় এবং ছাত্রবর্গের নিয়ন্ত্রণ করত বিহার। বৈদিক যুগে এই কেন্দ্র-শক্তি ছিলনা; পরিষদ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। যেমন আজকাল বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড (পর্ষৎ) সমস্ত বিদ্যালযের উপব সর্বশক্তিমান তেমনি ছিল এই বিহার। পরিষদের রূপের সঙ্গে বর্তমানের পর্ষতের (বোর্ড-এর) খুব একটা মিল নেই। এইজন্যই বিহার সম্পর্কে একটু বিস্তৃত আলোচনা ক'রে নিচ্ছি।

বিহার হচ্ছে আবাসিক বিদ্যালয়। বহু ছাত্র থাকত, নালন্দাতে দশহাজার মতো ছাত্র থাকত। এইসব ছাত্র বর্গে বর্গে শ্রেণীবদ্ধ হ'ল। এক এক বর্গ এক এক উপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। কি ভাবে শিক্ষা চলবে তা বিহার স্থির ক'রে দিত। বিহারের মধ্য দিয়েই বিভিন্ন বর্গ একটি বৃহত্তর সমাজ তৈবী কবত। এই সমাজই বুদ্ধদেবের আকাঙ্খার।

শৃঙ্খলার ব্যাপারে বিহার উপাধ্যায়কে জানিয়ে দিত তাঁর বর্গের ছাত্রদের জন্য। উপাধ্যাযকে না-জানিয়ে সেই বর্গের শিক্ষার্থীকে কোন বিধান জানানো যেতনা। নিয়ম এই ছিল বটে, কিন্তু দুর্ঘটনা যে না ঘটত তা নয়। যডভিক্ষুর যডযন্ত্র (পণ্ডুক, লোহিতক, অস্‌সজি, পুনব্বসু) প্রভৃতি এমনি এক সময় উৎপাত সুরু করেছিল। এত নিয়ন্ত্রণের মধ্যেও এই যডযন্ত্র দেখা যায় কেন—ভাববার কথা। ছাত্র ভাঙানি সে যুগেও ছিল। বিনয়-পিটকের অনুশাসন যে সবাই মেনে চলত তা নয়। যাই হোক, ব্যতিক্রম থাকলেও—নিয়মটাই নিয়ম ছিল।

বিহারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পার্থিব-জীবনের সঙ্গে ভিক্ষু জীবনের পার্থক্যটা বড ক'রে রাখা। বিহারের দুটি নীতি ছিল বড—(১) চির কৌমার্য এবং (২) দারিদ্র্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন ভিক্ষু সম্পদের মালিক হ'তে পারবেনা। সোনা বা রূপা কখনও কারও কাছ থেকে নিতে পারবেনা

সে। যদি পায়ই তবে তা সঙ্ঘকেই সমর্পণ করবে। সঙ্ঘ তার বিনিময়ে খাদ্যাদি সংগ্রহ করতে পারবে। এই জন্যই বোধ হয় সঙ্ঘের সম্পদও যেমন বৃদ্ধি হল শক্তিও বাড়ল।

এই বিহার খুব একটা সাধারণ ঘর নয়, তলায় তলায় বিভক্ত। প্রাসাদের মতো। তার কত ঘর, কোন্ ঘরে কে থাকবেন তার ব্যবস্থা, খাবার দাবার ব্যবস্থা। কাজেই বিহার শিক্ষা ও ধর্ম-চর্চা ছাড়াও কর্ম-মুখর। প্রধান কর্ম-কুশলী হচ্ছেন নব-কম্মক। ইনি বিহার তৈরীর মালমশলা যোগাড় করতেন, নক্সা আঁকতেন, আসবাবপত্র নির্মাণ করতেন। কাজেই ধর্মচর্চা ছাড়াও বিহার কারুশিল্পের শিক্ষালয়ও হয়ে উঠল।

ভিক্ষুদের কঠোর সাধনার কথা বিচার করলে বোঝা যায়, সাধারণ সমাজের মধ্যে থেকে একটি নতুন সমাজ পরিকল্পনা বৌদ্ধশিক্ষায় ছিল। সাধারণ সমাজে যে-মানসিক বৃত্তি ছিল তাকেই পরিহার করা হচ্ছে ভিক্ষুদের সাধনা। যেমন, যৌন-বৃত্তি চরিতার্থ করা, চুরি, হত্যা, অলৌকিক শক্তির বড়াই, প্রভৃতি। আর অবশ্য করণীয় হচ্ছে, পিণ্ডিয়ালোপভোজন (ভিক্ষান্নে জীবনযাপন), পংসুকুলচীবর পরিধান, বৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ, গোমূত্রকে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার। বৃক্ষমূল থেকে পরবর্তীকালে বাসগৃহ এল—কুটীর, গুহা বা বিহার। বিহারে বহির্বাটী আছে, অন্দরমহলও। অন্দরমহল ভিক্ষুদের শয়নের জন্য। শয়নঘরে চৌপায়া আছে, দেয়ালে কাপড় ঝোলানোর ব্যবস্থা আছে, বসবার আসন আছে, ক্ষৌরকর্মের ব্যবস্থা আছে—অর্থাৎ সমাজ-সম্মত সভ্যজীবনের অনেকখানিই বর্তমান।

পৃথক সমাজ, কিন্তু সমাজকে অস্বীকার করা হয় নি। কারণ খেলাধূলার ব্যবস্থাও বিহারে ছিল। এই আমোদ-প্রমোদের মধ্যে মেয়েদের সঙ্গে নৃত্যের প্রথাও অনুমোদিত। অভিনয়ের প্রাথমিক দিক অর্থাৎ অন্যের বাচনভঙ্গী অনুকরণ করা। আর আছে হাতি-ঘোড়ায় চড়া, গাড়ী চালানো, তরবারি খেলা, কুস্তি করা, মুষ্টি যুদ্ধ এবং মেয়েদের নৃত্যের জন্য মঞ্চ তৈরী করা। পরিশেষে বৈদিক যুগ থেকে যে জুয়ো-খেলা চালু ছিল তারও প্রচলন বিহারে দেখা যায়, অর্থাৎ নতুন সমাজ তৈরী করবার আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু প্রচলিত সমাজের অনেক ব্যবস্থাই বাদ দেওয়া গেল না। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা অনুধাবন করলে বেশ বোঝা যায়, অবদমনের ক্লান্তিকর দিককে প্রশমিত করবার জন্য বৌদ্ধধর্মের অনুচিত অনুষ্ঠানকে আহ্বান করা হচ্ছে।

মনে হয় পার্থিব অভিজ্ঞতাই মানুষের মন, মানুষের সংসার—আর সেই সংসারের মানুষই হচ্ছে গৃহস্থ। এই গৃহস্থের সমাজের স্বাভাবিকতাই দুঃখের কারণরূপে অভিহিত কিন্তু তাকে যেন পরিহার করা যায় না। ভিক্ষুদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তিনরকম নিয়মে—(১) প্রারম্ভিক স্তর—সূত্র পুনরাবৃত্তি করা মাত্র, (২) মধ্যস্তর—বিনয়ের কিছু অংশ পাঠ ও পারস্পরিক আলোচনা; (৩) উত্তম স্তর—ধম্মপদ নিয়ে আলোচনা। কিন্তু একস্তরের ভিক্ষু অন্যস্তরের ভিক্ষুর সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন না, স্বতন্ত্র থাকবার ব্যবস্থাও ছিল। তাঁরা মনে করতেন ওতে পাঠক্রমের অসুবিধা বা ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। আর এক শ্রেণী ছিলেন—তাঁরা ধ্যানী।

বুদ্ধদেব সমাজ-সংস্কার করতে চাননি, কিন্তু সমাজ স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। সংস্কৃত পড়া নিষিদ্ধ করলেন। যার যার মাতৃভাষায় সে পড়াশুনা করবে। মাতৃভাষার আদর শিক্ষায় ভারতে এই ভাবেই এল। তুকতাক মন্ত্র, যজ্ঞ, গণনা—এ সবও বিহার থেকে বর্জিত হল।

পড়াশুনা মৌখিক পদ্ধতিতেই চলত। এখানে একটা কথা ওঠে, লেখার প্রচলন কি ছিলনা? রাইস ডেভিড্স বা ওলডেনবুর্গ বলেন—লেখার প্রচলন থাকলেও গ্রন্থ লিখবার রীতি যে ছিল এমন কোন নিদর্শন মেলে না। বর্তমান কালে গবেষকেরা কিন্তু আর রাইস ডেভিডস এবং ওলডেনবুর্গ বা ম্যাকডোনেলের কথা মেনে নিতে পারেন নি। অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপির প্রচলন যে ছিল তার কিছু কিছু যুক্তিগর্ভ আলোচনা করেছেন। অনেকে অনুমান করেন, লেখা অপ্রচলিত হয়ে পড়ল তাই আমরা পূর্বের নিদর্শন পাই না। অপ্রচলনের অনেক কারণ —তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তেমন উপকরণের অভাব। যে-যুগে আঞ্চলিক ভাষার এত সমাদর, সে যুগে আঞ্চলিক ভাষাকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে লিপি থাকা স্বাভাবিক। তাছাড়া বৌদ্ধযুগে মানুষের যাতায়াত বেড়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সঙ্ঘবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে—কাজেই অবিকৃত পাঠের জন্য পাণ্ডুলিপির ব্যবহার আবশ্যিক।

এই শিক্ষায় বিতর্ক এবং আলোচনার স্থান অনেক উচ্চে। শ্রমণেরা একত্রিত হয়ে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা ক'রে সিদ্ধান্তে আসতেন। এক্ষেত্রেও বৈদিক যুগকে এঁরা অনুসরণ করেছিলেন।

যুক্তি-তর্কশক্তি চিন্তা এবং ধ্যানের সঙ্গী। কাজেই শিক্ষা একেবারে

অনুকরণে পর্যবসিত হয়নি, বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত স্বতন্ত্র এবং সক্রিয়। বড় হল-ঘরে (সন্থাগার) এই সব আলোচনা চলত। রাজারাও এ বিষয়ে খুব উৎসাহী ছিলেন। এই আলোচনারও অনেক বিধি ছিল।

শিক্ষকদের মধ্যেও নানাশ্রেণী ছিল। সাধারণ বিষয়-অভিজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ এই দুই রকমের তো ছিলেনই। তা ছাড়া অনুশাসনের বাইরে একদল ছিলেন। যাঁরা এঁদের অনুমোদন পেতেন না, কিন্তু শিক্ষা-ব্যবসায় চালু রেখেছিলেন। এঁদের সম্পর্কে অনেক অপবাদ দেওয়া হয়েছে, ইয়োরোপের সোফিস্টদের মতোই।

কিন্তু যতই হোক, এই সঙ্ঘবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার পরিণাম কিন্তু খুব ভালো হয়নি। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমাজ এখানে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে বৌদ্ধশিক্ষার উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করল।

ভিক্ষুরা নিজেরা দারিদ্র্য বরণ করতেন, বিত্ত সঞ্চয় করতে পারতেন না, কিন্তু সঙ্ঘ সবই পারত। এই সঙ্ঘের আশ্রয়ে ব্যক্তিগতভাবে দারিদ্র্য মোচন করা যেতে পারত। গেলও তাই। পরিবারের দরিদ্রেরা এসে ভীড় করতে থাকল। খাওয়া-পরা চলবে। সঙ্ঘের সমৃদ্ধি বাড়ানো দরকার, বাড়লও। ধর্ম-প্রসারের নেশা এল। এই নেশাই প্রব্রজ্যাগ্রহণকারীদের নিয়ম শিথিল ক'রে দিল। সঙ্ঘে মানুষ যোগদান করবে। কারণ এখানে খাওয়া-পরার প্রতিযোগিতা নাই। সঙ্ঘারামের 'আরাম' একেবারে প্রাকৃত হয়ে গেল। হয়ত বা ধীরে ধীরে এই সঙ্ঘ রাজাদের বদান্যতার উপর নির্ভর করল। আর তখনই এল রাজনীতি। এই রাজকীয় সঙ্ঘর্ষ বিম্বিসারের সময়েও তো একবার দেখা গেল। দেখা গেল অজাতশত্রুর সময়ে। দস্যুরা এসে মঠে আশ্রয় গ্রহণ করল, অলসেরাও। আর? আজকাল এক ধরণের ছেলেরা যেমন পরিবারের শাসনকে অত্যাচার মনে ক'রে, কাজকর্ম ক'রে খাওয়াকে পরাধীনতা মনে ক'রে—দূরের পথে পাড়ি দেয়, রোয়াকের দলে নাম লেখায়, সিনেমায় ঢোকে, তেমনি তখন উন্মার্গগামী ছেলেরা মঠের আশ্রয় গ্রহণ করল। ধর্মপ্রচারের আর প্রসারের শৈথিল্য মঠকে অপ্রিয় করে তুলল এমনিভাবে। রাজা আর মঠের উপাধ্যায়কে সম্মান করতে পারলেন না, প্রকাশ্যে অপমান করতে হয়, পরিবার আর মঠের পবিত্রতাকে মান্য করে না। ইয়োরোপে চার্চেরও এই অবস্থা হয়েছিল আমরা দেখতে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়,—

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সেজন মারে আর শুধু মরে।

নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সমাজ টেকে না—একথা যেমন সত্য. তেমনি সত্য অতি-নিয়ন্ত্রণ এসে পড়লে সে প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ভেঙে পড়ে। নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে আসে সমৃদ্ধি আর ক্ষমতা। এই ক্ষমতা সত্যদর্শন করতে দেয় না, দেয় শুধু মোহ। আরও একটা কথা, সব কিছুর অবয়বের বিস্তৃতির একটা সীমা আছে। সেই সীমা কোনক্রমে ছাড়িয়ে গেলে তার ধ্বংস। চিকিৎসাবিজ্ঞান দিয়ে যেমন শরীরের জীবকোষের বৃদ্ধির অবিরাম প্রবাহ সঞ্চার করা যায় না, তেমনি যায় না নিয়ন্ত্রণের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের পরিসরকে বাড়ানো। কিন্তু চাবুক-মারার যেমন নেশা আছে, তেমনি আছে প্রতিষ্ঠান প্রসারের সঙ্গে ক্ষমতার বৃদ্ধির। মহামানব ছাড়া এ ব্যাধিকে কেউ চিনে উঠতে পারে না। নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হতে হ'তে একদিন প্রতিষ্ঠান দেখতে পায় জনচিত্ত থেকে সে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে আছে।

আর একটা কথা। বৌদ্ধশিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু দেশের সমগ্র অধিবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারত না। কাজেই এই শিক্ষার পাশাপাশি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাও ছিল। গার্হস্থ্যজীবন-অনুসারী সে শিক্ষা ব'লে তার সঙ্গে এই বৌদ্ধশিক্ষার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না ছিল তা নয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বৌদ্ধশিক্ষা গৃহস্থদের দিকে এগিয়ে এল। মঠে আসতে হবে না, কিন্তু বৌদ্ধ অনুশাসন মেনে চললেই এই শিক্ষা পাওয়া যাবে। যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে জয় করবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন তেমনি আর একটি কারণেও। এই যে মঠ চলত এ তো গৃহস্থদের দানের উপর। ভিক্ষা সংগ্রহ করত ভিক্ষু এদের কাছ থেকেই। সেই গৃহে নারীই হচ্ছে মধ্যমণি। কাজেই স্ত্রীজাতিকে এবং গৃহস্থকে কিছু সুযোগ দিতে হবেই। এই সুযোগ দিতে গিয়েই গণশিক্ষার আবিভাব।

বৌদ্ধযুগ আর-একটি ঐতিহাসিক সমস্যা তুলে দিয়েছে জাতককাহিনী সামনে এনে। জাতকের এই সব গল্প ভারতবর্ষে কোন্ কাল থেকে কথিত হয়ে আসছিল ঠিক নির্ধারণ ক'রে বলা যায় না। তবে বৌদ্ধযুগের অনেক আগেই যে এসব গল্পের জন্ম সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধযুগে সেই সব গল্পের উপর ধর্ম ও যুগের রঙ চড়ল মাত্র। এই সব নিয়ে গবেষণা করেছেন বুহলার সাহেব। তাঁর সিদ্ধান্ত রাইস ডেভিডসও অনেকটা মেনে-

নিয়েছেন (Buddhist India—Rhys Davids ; 1917 ; page 203.) । জাতকের ঐতিহাসিক কাল নিয়ে আমরা আলোচনা করব না, তবে এই জাতকে ষষ্ঠ-পঞ্চম খৃষ্ট পূর্বাব্দের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে এবং তার পাঠ্যতালিকার বিষয় কিছু কিছু জানা যায়। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে তক্ষশীলা (গান্ধারে) এবং কাশী।

পাণিনির দেশে তক্ষশীলা। প্রায় তাঁর সমসাময়িক এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে অনেকে অনুমান করেন। তক্ষশীলায় প্রতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা শিক্ষা দিতেন। এই পণ্ডিতদের ভুবনজোড়া খ্যাতি ছিল। ভারতের সমগ্র অঞ্চল থেকে বিশেষ ক'রে কাশী-কোশল-কুরু প্রদেশ থেকে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সন্তানেরা এখানে বহু কষ্ট স্বীকার করে পড়তে আসত। আবার শিক্ষা সমাপনান্তে নিজের দেশে ফিরে গিয়ে সেখানকার শিক্ষার উন্নতি সাধন তারা করত। আর তক্ষশীলা প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সেই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন করত। তক্ষশীলার অনুমোদনলাভ বিদ্যালয়ের কৌলীন্য হয়ে পড়ত; বলতে গেলে তক্ষশীলার শিক্ষা তৎকালে ভারতবর্ষের শিক্ষাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করত।

ষোল বছর বয়সে শিক্ষার্থী বাপ-মা ছেড়ে বহুদূর দেশ থেকে ভ্রমণের বহু ঝঞ্ঝাট বহন করে তক্ষশীলায় আসত। শিক্ষার জন্য এই ক্লেশস্বীকার দেখে মনে হয়, হয় তাদের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ ছিল অথবা বৈষয়িকতার দিক দিয়ে বিশেষ লাভ ি স। এতো একরকম অগস্ত্য যাত্রাই। ভর্তির বয়স দেখে মনে হয়, তক্ষশীলা উচ্চতর বিদ্যালাভের একটি সহজলভ্য বিদ্যালয়। গুরুগৃহের চেয়ে এখানকার শিক্ষা কি অনয়াসলব্ধ?

যে সময়ে দেশের সর্বত্র গুরু-আশ্রম রয়েছে সে সময়ে এই সঙ্ঘবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষালাভের দিকে মানুষের ঝোঁক কেন? হয়ত বা, গুরুগৃহের থেকে বিধিনিষেধ কিছু শিথিল ছিল, অথবা এখানে এমন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হ'ত যা দেশের আর কোথাও ল'ভ করা যেত না।

ঐ যে হাজার মুদ্রা অগ্রিম দিয়ে তক্ষশীলায় ঢুকতে হত—ওর সঙ্গে গুরুগৃহের ব্যয়ের তুলনা কি কিছু করা যায়? তখন কি গুরুরাও এরকম অগ্রিম নিতেন? আবার ঐ নিয়মের বিকল্প রাখা হল কেন? যেমন—মুদ্রা না দিতে পারলে শিক্ষককে সেবা ক'রে পরিশোধ করতে হবে। কেমন ক'রে সেবা করা? না, দিনের বেলায় সেবা, রাত্রে পড়া।

কি রকম সেবা? না, বন থেকে সমিধ-কাঠ আহরণ করা। এই সমিধকাঠের কি আর্থিক মূল্য কিছু ছিল? কেউ কেউ এই শ্রম করতে চায় না। কেবল পড়তে চায় অথচ বৃত্তিও দিতে পারে না। ব্যবস্থা হ'ল পাঠসমাপন ক'রে ফিরে গিয়ে উপার্জন অংশ কিছু কিছু ক'রে দেবে। এছাড়া গ্রামবাসীদের দাক্ষিণ্যে দরিদ্র ছাত্রদের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করাও হ'ত। তাছাড়া আছে সম্ভ্রান্তদের ঘরে নিমন্ত্রণ খাওয়া, রাজার দান, কত কি।

তক্ষশীলা কেবল আবাসিক শিক্ষায়তনই নয়, বাইরে থেকেও পড়তে আসা যেত। নিজেরা নগরে বাসা নিয়ে এখানে পড়তে আসতে পেত। কেবল ব্রহ্মচারীরাই পড়ত তা নয়, বিবাহিতেরাও পড়তে পেত। তারাই হয়ত বাসা করে থাকত। অর্থাৎ গুরুগৃহ থেকে এখানে একটা বিষয় নতুন ছিল এই যে, সংসারের কাজকর্ম ক'রে, সংসার যাপন করে, পড়া চলত। জাতিভেদ খুব মানা হত না, তবে চণ্ডাল পড়তে পেত না। কিন্তু চণ্ডালদেরও শিক্ষাগ্রহণ করবার আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় তক্ষশীলার ইতিহাসে। ভগবানের কল্যাণে জন্মই যদি জীবনবিকাশে বাধা হয় তবে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে পড়তে চল। দুজন চণ্ডাল-তনয় এসে ঢুকল। মেধা-তে তারা খাটো ছিল না। কিন্তু কথাবার্তায় কিছুকাল পরে যখন ধরা পড়ল, তখন তাদের বহিষ্কার করা হল।

তবে অন্ত্যজাতির যে জাতিগত বৃত্তিই শিখতে হত তা নয়। যে-কোন বিষয় যে-কোন জাতি পড়তে পারে। এই দিক দিয়েও গুরুগৃহের শিক্ষা থেকে তক্ষশীলার নিয়মের স্বাতন্ত্র্য। জাতিগত বৃত্তিশিক্ষা হয়ত সব সময় অর্থোপার্জনের সহায়ক নয়। কিংবা বিশেষ শিক্ষার স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদা এসেছে; যার জন্য এই রকম স্বাধীনতা শিক্ষার্থীরা কামনা করে। তক্ষশীলার শিক্ষা সমাজের এই বিবর্তনকে ধরে রেখেছে।

তক্ষশীলার ইতিহাসে আর একটি বিশেষ কথাও আছে। সেটি হচ্ছে সর্দার-পোড়ো প্রথা। একজন উপাধ্যায়ের অধীনে যদি ৫০০ ছাত্র থাকে তবে পড়ানোর কাজ নিশ্চয়ই সহজে হত না। অতএব অগ্রসর ছাত্রকে শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত করা হ'ত। ভারতবর্ষের এ এক প্রাচীন পদ্ধতি। এঁদের নাম ছিল পিথিআচারিয়া।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই, ছাত্রদের সুবিধা অনুযায়ী ক্লাস বসত।

দিনে রাত্রে। যারা গরীব তারা প্রতিষ্ঠানে শ্রমদানের কাজ করত দিনের বেলায়, সুতরাং তাদের ক্লাস বসত রাত্রে।

পড়া সুরু হ'ত উষায়, মুরগীডাকার সঙ্গে সঙ্গে। ঘড়ির অভাবে কুক্কুটির ডাককেই তারা নিয়ম ক'রে নিয়েছিল।

লিপির ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। যদি পাঠ কোন প্রকারে মনোযোগ এড়িয়ে যায়, তবে লিখিত পুঁথি পড়ে সে-পাঠকে তারা আয়ত্ত ক'রে নিত। কাজেই মৌখিক পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে পুথি ব্যবহারও এখানে দেখা যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায এই লিপি-শিক্ষা একটি বিশেষ পাঠের মধ্যে গণিত হত।

পাঠক্রমের মধ্যে ছিল বেদপাঠ এবং আঠারো কলা বিদ্যা। কেউ কেউ বেদ-পাঠ নিত, কেউ বা কেবল কলা শাস্ত্র। আবার অনেকে উভয়ই নিত। তবে অথর্ববেদকে এই পাঠের মধ্যে ধরা হ'ত না। মাত্র তিনটি ঋক, সাম, যজু। তা ছাড়া ছিল হাতি-সূত্র, মাযা-বিদ্যা, শিকার, সঞ্জীবনী-বিদ্যা ধনুর্বিদ্যা প্রভৃতি নানা বৈষয়িক জ্ঞানের বিষয়।

বিশেষ বিষয় যথা—চিকিৎসা, বিধি এবং সমরবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য তক্ষশীলায় বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সময় কাশীতে সঙ্গীত শিক্ষাব জন্য বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ছিল—সে কথা ও জানা যায়। আর উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য থাকল গুরুব আশ্রম।

জাতক থেকে বৌদ্ধযুগের শিক্ষার এইসব প্রতিষ্ঠানের কথাই জানা যায়। এর মধ্যে দিয়ে আর-কিছু না হোক, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ইতিহাস অনুমান ক'বে নেওয়া যায়। এদের পাশাপাশি চরক সম্প্রদায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতেন। এই ধারাটি তখনও অবলুপ্ত হয়নি। বরং এঁদের সম্পর্কে বুদ্ধদেব নিজে মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করে গেছেন। এঁদেরকে ইয়োরোপের সোফিস্টদের সঙ্গে তুলনা করা যায। এইরূপ শিক্ষা-দাতাদের মধ্যে মাক্কালি গোসালের বিরুদ্ধে বুদ্ধদেব বিষোদ্গার করেছেন। ডক্টর হারমান ওলডেনবুর্গ বলেন, (Buddha : His life, his doctrine, his Order ; translated by Willam Hoey) 'বোধহয় বৌদ্ধেরা এঁদের বিরুদ্ধে শত্রুতা বশতঃ এঁদের সম্পর্কে দোষ গুলি অতিরঞ্জিত ক'রে বলেছেন, (Possibly, the Buddhists···may in their animosity against this class of dialecticians have drawn them in darker colours than

was fair—Page 69)। যতই অতিরঞ্জিত করুন, ওলডেনবুর্গ নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের স্বাভাবিক পরিণতির ধারাতে যে মঠ-শিক্ষা, সন্ন্যাস-গ্রহণ, শ্রমণ, ভিক্ষু প্রভৃতি প্রথা তদানীন্তন সমাজে চালু হয়ে এসেছিল—তারই ধারা বেয়ে বৌদ্ধ-শিক্ষা। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের আর্যেরা যতই পূর্বে ছড়িয়ে পড়লেন ততই বেদ-ব্রাহ্মণের শিক্ষা গুটিকতক বুদ্ধিজীবীর আওতা থেকে সাধারণভাবে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আসছিল, সেই ধারাকেই বৌদ্ধেরা গ্রহণ ক'রে নিলেন। বৌদ্ধ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ত নতুন কিছু নয় তবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্ঘবদ্ধতা গুণের দরুণ এই প্রতিষ্ঠান পবিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এল। এইজন্যই বৌদ্ধ যুগকেই আমরা ভারতবর্ষে ইস্কুলের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব কাল বলতে পারি।

ইতিহাস-সম্মত বৌদ্ধযুগের শিক্ষাকে জানতে হলে আমাদের তিনজন চীনা পরিব্রাজকের কথা থেকে জানতে হয়। এঁদের মধ্যে পঞ্চম শতাব্দীর (খৃষ্টাব্দ) কথা ফা-হিয়েন, আর সপ্তম শতাব্দীর কথা জানিয়ে গেছেন হিয়েন-ৎ-সাঙ্ এবং ই-ৎসিং।

ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে আমরা দেশে যে বৌদ্ধমঠ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সঙ্ঘারাম কত ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা জানতে পারি। তাঁর বিবরণ থেকে তক্ষশীলার কথা কিছু জানা যায় না। পুরুষপুর (পেশোয়ার) থেকে পাটলিপুত্র বা পাটনা পর্যন্ত মঠের তিনি ইতিহাস দিয়ে গেছেন। পাটলীপুত্রের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকেই তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এখানে প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়াও বয়স্ক ভিক্ষুদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এমনি ধরণের মঠ বা বিহার ছিল গয়াতে, চম্পাতে, তাম্রলিপ্তিতে। এইসব বিহার কোনটা মহাযানীদের কোনটা হীনযানীদেব। পাটলীপুত্রের বিহার মহাযানীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই সব বিহারেব ব্যয় নির্বাহ করতেন রাজা, ধনী বা গৃহস্থেরা। বিনয়ের অনুশাসন অনুযায়ীই এইসব শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত হত। ফা হিয়েনের সময়েও মৌখিক শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ প্রচলিত ছিল। পাটলিপুত্রে সংস্কৃত শিক্ষার খুব প্রচলন ছিল।

কিন্তু ফা-হিয়েন বলেন, দেশে বৌদ্ধশিক্ষাই যে একমাত্র ছিল তা নয়, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার মধ্যদেশে বিশেষ চালু ছিল—এবং তাদের শিক্ষা সেখানে কেন যেন জনপ্রিয়। হয়ত বা গুপ্ত রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

হিয়েন সাঙের সময়ে এই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। তাঁর সময়ে—(৬২৯-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ) ভারতে শিক্ষার তিনটি ধারা ছিল—ব্রাহ্মণ্য বাদ, মহাযানী এবং হীনযানী বৌদ্ধ মত।

হিয়েন-সাঙ্ দেখেছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধেয় ছিলেন। কেন? এর কারণ বলতেই হিয়েন-ৎ-সাঙ্ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার উৎকর্ষকে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত ভাষা সংস্কৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের একমাত্র আদৃত ভাষা। এবং মধ্যভারতের উচ্চারিত ও লিখিত এই সংস্কৃতই দেশের শিক্ষার মান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ, ব্রাহ্মণ্যধর্মে তখন সাধুসন্ন্যাসীর নানা শাখা-প্রশাখা সৃষ্টি হয়েছে, নানাধরণের পোষাক আশাক, এবং এঁদেরকে সারা দেশই শ্রদ্ধার চোখে দেখত। মানুষে তাঁদের শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত তাঁদের শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা, চরিত্র-বল প্রভৃতির জন্য। তাঁরা শিক্ষা লাভের জন্য, চরিত্র গঠনের জন্য, নির্জনে, লোকালয়ের বাইরে কিংবা আত্মসমাহিত হয়ে বাস করতেন, তাঁদের কোন সম্মানে প্রলুব্ধ করা যেতনা, তাঁদেরকে কোন ক্ষমতার আসনে বসানো যেত না। আর মজা এই, যত তাঁদের এই মর্যাদা আর ক্ষমতার প্রতি বিরাগ ততই ধনী, গৃহস্থ, রাজা তাঁদের সম্মানে ভূষিত করতে চাইতেন। শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি সারা দেশ যে এমন অযাচিত মর্যাদা বর্ষণ করতেন, শিক্ষার যে একটা সমাজ-নিরপেক্ষ শাশ্বত রূপ আছে—ভারতবর্ষে তা গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়েই উপভোগ করেছিল। বোধ হয়, আজও আমাদের সেই ঐতিহ্যই বারবার মনকে সেই পথে টেনে নেয়; তাঁরা সমাজের বাইরে চলে যেতেন কারণ সমাজকে উন্নত করবেন বলেই। তাঁদের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে তাঁদের চরিত্র দ্বারা সামাজের মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন। হয়ত বা সক্ষমও হয়েছিলেন। শিক্ষার মধ্যে ছিল তাঁদের চতুর্বেদ, শিক্ষাকাল ছিল ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু সেই পাঠক্রম আর পাঠকাল শিক্ষার একমাত্র নয়, সে যেন অক্ষর শেখার মতো। তারপরই চলত তাঁদের প্রকৃত শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের আদর্শ শিক্ষা। শিক্ষাকে জীবনের মধ্য দিয়ে ফোটাতে চেয়েছেন। মৌখিকপদ্ধতিই তখনও চালু ছিল বটে, কিন্তু তা পদ্ধতি-সর্বস্ব নয়, তা প্রয়োগবাদ নয়, তা বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষা-চিন্তা করার শিক্ষা, ধ্যানের শিক্ষা—যাকে বলে সত্য উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করার শিক্ষা।

যাই হোক, হিয়েন-ৎ-সাঙের বিবরণ থেকে বৌদ্ধধর্মশিক্ষার যে সারাদেশে কত মঠ বা বিহার ছিল তার একটা হিসাব পাই।

প্রায় ৫০০০ বিহার ছিল, এবং ভিক্ষুদের সংখ্যা প্রায় ২১২১৩০ জন। এই বিহার বা মঠের শিক্ষা পূর্বের মতোই, কাজেই আমরা সেগুলি আর আবৃত্তি করবনা, তবে মোটামুটি ধারণা স্পষ্ট করার জন্য একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

এইসব মঠ সাধারণত কলেজীয় বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র। এখানে ভর্তি হতে হ'ত প্রাথমিক শিক্ষার পর। এই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাও তাই এই সব বিহারে এসে পড়ল। সারাভারতের প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ পাঠ ছিল সিদ্ধিরস্তু বা সিদ্ধম্। সংস্কৃতভাষায় বর্ণমালা, যুক্তবর্ণ প্রভৃতির প্রাথমিক পুস্তক। একেই বলা হ'ত সিদ্ধম্। সাতবৎসর বয়সের মধ্যে সিদ্ধম্ শেখা হলে পঞ্চশাস্ত্রপাঠ অর্থাৎ ব্যাকরণ শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা, এই যদি হয় বৌদ্ধশিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা তা হলে অনুমান করা যায়—ধর্ম শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারিকশাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজনও অভিভাবকেরা বুঝেছিলেন, এই উচ্চশিক্ষার দুটো ধারা ছিল—বিষয়জ্ঞান এবং সেই বিষয়কে চরিত্রে সংযোজন। এ দিকটি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে হয়েছিল কিনা বিচার্য। শিক্ষার আলোকে চরিত্র আলোকিত করা ছিল সে যুগের ব্রাহ্মণ্য শিক্ষারই বৈশিষ্ট্য। শিক্ষা-পদ্ধতির দিক দিয়ে সেই পূর্ব প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করা হ'ত, এমন কি তক্ষশীলার শ্রমদানের মতো কর্মদানও এখানে ছিল। তা ছাড়া ছিল বিতর্কসভা, আলোচনা সভা ইত্যাদি।

ই-ৎসিং-এর সময় হচ্ছে খৃষ্টাব্দ ৬৭২। হিয়েন-ৎ-সাঙ চলে গেলেন ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে। কাজেই ই-ৎসিঙ-এর সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের খুব যে একটা পরিবর্তন হয়েছে, তা মনে করা যায় না। তিনি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার দুটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন (১) মুখস্থ ক'রে বুদ্ধিকে শাণিত করা, (২) এবং বর্ণমালা দিয়ে চিন্তাকল্পকে গ্রথিতকরা। এই দুটি পদ্ধতির উৎকর্ষ সম্পর্কে আমরা বর্তমানে কোন রকম আস্থা স্থাপনই করতে পারিনা। কিন্তু ই-ৎসিং এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষিত ব্যক্তির সান্নিধ্যে এসে অবাক হয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, এইভাবে অভ্যস্ত হয়ে দিন দশেক বা মাসখানেকের মধ্যে ছাত্র বুঝতে পারত নির্ঝরের মত তার চিন্তার উৎসার, আবির্ভাব;

যা শুনেছে যা পড়েছে। তা-ই মনে পড়েছে। রূপককাহিনী এ নয়, এরকম ছাত্র আমি নিজের চোখে যে দেখেছি। বর্তমান কালেও বুদ্ধির পরীক্ষার মেমারী একটা বড় স্থান ক'রে নিয়েছে। তবু আমরা এর প্রতি ভরসা হারিয়ে বলছি—পেশী আর স্নায়ুর ক্রিয়া ঘটিয়ে মনে-রাখাই আসল মনে রাখা এবং তাইই একমাত্র উন্নত পদ্ধতি। শারীর স্মৃতি (physiological memory) এবং মানসিক স্মৃতি (psychological memory) সম্পর্কে আমরা কত ব্যাখ্যা করছি, অভ্যাসগত-স্মৃতি এবং স্থায়ী-স্মৃতি (true memory) সম্পর্কে আলোচনা করে আমবা এই সিদ্ধান্তে এসেছি, কর্ম অর্থাৎ পেশী সম্পর্কীয় অনুষঙ্গ সৃষ্টিতেই একমাত্র স্মৃতি গঠিত হয়। অথচ, ইৎসিংয়ের বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে আমাদের এ বিষয়ে আর একবার ভাবতে হয়। কর্মপ্রধান শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করতে করতে আজ আমরা চিন্তাভীরু শ্রমিকের হাতে এসে পড়ছি না তো। আমাব তো মনে হয় প্রাচীন শিক্ষায় এত চুলচেরা পদ্ধতি হয়ত ছিলনা, ছিলনা তার বিশ্লেষণ, কিন্তু মানুষের মনের স্বাভাবিক নিয়মে দুটি পদ্ধতির ঠিক সমন্বয় ক'রেই চলত। বর্তমান কালে আমরা কঠোরভাবে একটার পর জোর দেওয়াতে অন্যটি হারিয়ে যাচ্ছে। অথবা, এমন হ'তে পারে—শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাব আদর্শ ই এমন ছিল যে, যে-কোন পদ্ধতি পরিণতিতে পৌঁছতে পারত; আজ আমাদেব শুধু কর্মী সৃষ্টিব আদর্শ কর্তার ভূত'কে সামনে রেখে সমস্ত পদ্ধতি ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে।

ই-ৎসিঙ্ প্রাথমিক শিক্ষাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। ছ বৎসর বয়সে শিক্ষাকাল সুরু। প্রথমপাঠ সিদ্ধিরস্তু—অর্থাৎ ৪৯টি বর্ণ, ১০,০০০ 'অক্ষর' ৩০০ শ্লোকে নিবদ্ধ এই পুস্তক। ৬ মাসে এই প্রথমপাঠ শেষ হ'ত। দ্বিতীয় পাঠ—সূত্র (পাণিনির)—১০০০ শ্লোক আছে এতে। ৮ বৎসর বয়সের মধ্যে শেষ করতে হবে। তারপর ধাতু, খিল—দশ বৎসর বয়সে। তারপর কাশিকা বৃত্তি—জয়াদিত্য রচিত পাণিনির শ্লোকের ব্যাখ্যা ১৮,০০০ শ্লোকে বদ্ধ।—পনের বৎসরের ছেলেরা এটি পড়ত।

এরপর আসবে—দর্শন, হেতুবিদ্যা, অভিধর্মকোষ (metaphysics)। হেতু বিদ্যার মধ্যে নাগার্জুনের 'ন্যায় দ্বার তারকশাস্ত্র', হর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 'জাতক মালা' ইত্যাদি। এরপর পঞ্চশাস্ত্র বা বিদ্যা—যা হিয়েন-ৎ-সাঙ বলেছেন। এইখানেই প্রাথমিক বা সাধারণ শিক্ষাস্তর শেষ হ'য়ে বিশেষ জ্ঞানের শিক্ষাকাল সুরু হ'ত—যেমন, চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যাকরণ প্রভৃতি।

ই-ৎসিং বিবরণ দিয়েছেন, কিভাবে ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্যে মঠে ভর্তি হতে হত। প্রথমে উপাধ্যায় নির্বাচন করতে হবে—উপাধ্যায় তার সম্পর্কে সমস্ত খোঁজ-খবর নিতেন। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে কিনা, হত্যাকারী কিনা, মিথ্যাবাদী কিনা ইত্যাদি। তারপর বিনয়ের অনুশাসন জেনে—উপাসক হবে; তারপর আচার্যের আদেশে বিশেষ পোষাক পরিধান করবে, মুণ্ডন করবে—অর্থাৎ প্রব্রজিত হল। এরপর 'শ্রমণের'। 'শ্রমণের' হলেই তার অধিকার জন্মাবে। বিশ বৎসর বয়সে সে ভিক্ষু হবার অধিকারী।

কিন্তু এই ধর্ম-শিক্ষা ছাড়াও সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাকে বলা হ'ত ব্রহ্মচারী স্তর। এঁরা ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা করতে আসতেন না। আর এক ধরণের শিক্ষার্থী ছিল তাদের বলা হত 'মানব'; তাঁরা ভিক্ষু না হলেও বৌদ্ধশাস্ত্র মেনে চলবেন। গৃহস্থাশ্রমেই এরূপ আশা করা হ'ত। অর্থাৎ পত্রিকাব্যবসায়ীরা যেমন লেখেন 'গ্রাহক, অনুগ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক' এমনি বোধ হয়।

সে যাই হোক, এই ই-ৎসিঙের বিবরণ থেকেই জানতে পারি অনেক। বিহারে প্রভূত সম্পত্তি-সঞ্চিত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের কর্ষণোপযোগী ভূমিও যথেষ্ট হ'য়ে পড়ল। ঠিক ইয়োরোপের চার্চের মতো। ই-ৎসিঙ এই সম্পত্তিশালী বিহারকে ভালো নজরে দেখেন নি। (It is unseemly for a monastery to have great wealth, granaries full of rotten corn, many servants, male & female, money and treasures hoarded in the treasury without using any of these things, while all the members are suffering from poverty—Quotation used in R. K. Mookerjee's. Ancient Indian Education. Page, 553)

এমন মঠও ছিল যেখানে মঠ-বাসীদের খাদ্য সরবরাহ না ক'রে মঠের ভিক্ষুরা নিজেরাই ভাগ বাঁটোয়ারা ক'রে নিত। অর্থাৎ একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা নিজের মর্যাদা পুনপ্রতিষ্ঠিত করছে অন্যদিকে বিহারগুলোতে এসে ঢুকছে যত অনাচার।

এই প্রসঙ্গে তৎকালের বৌদ্ধমহাবিদ্যালয় প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করে নিই। প্রথমেই নাম করতে হয় নালন্দা মহাবিদ্যালয়ের।

নালন্দা: রাজগীর থেকে ৭ মাইল উত্তরে বরগাঁওয়ের নামই বোধ

হয় নালন্দা ছিল। সারিপুত্তের জন্মভূমি ব'লে অশোক এখানে প্রথম চৈত্য নির্মাণ করেন। তবে তখনও শিক্ষার পীঠস্থান হিসাবে নালন্দার খ্যাতি জোটেনি (The Glories of Magadha ; J. N. Samaddar ; Page 121) শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে একে গণ্য করা হল ১ম খৃষ্টশতকের দিকে মহাযান মতবাদ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে। আব চতুর্থ শতকেই এর খ্যাতি সুদূর দাক্ষিণাত্যে ছড়িয়ে পড়ল। এখানে নাগার্জুন এলেন, এলেন দিঙ্‌নাগ।

ফাহিয়েনেন বিবরণে নালন্দার নাম পাওয়া যায় 'নাল' নামে। সারিপুত্তের জন্মভূমি। এরপর হিয়েনৎসাঙ্‌ এর বিবরণে নালন্দার 'দিগদেশ কালবাচিভিঃ' ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

নালন্দার নামকরণেও মতভেদ আছে। একটি নাম পেয়েছি ফা-হিয়েন থেকে। হিয়েনৎসাঙ্‌ থেকে পেযেছি 'না—আলম্‌-দা' (Charity without intermission)। কেন? তথাগত বুদ্ধকালে বোধিসত্ত্বর জীবনযাপন কবছিলেন, সেই সময় জীবের দুঃখ মোচনে অবিরাম চেষ্টা করতেন বলে এই নাম। ইৎসিঙ্‌ বলেন, নিকটস্থ আম্রনিকুঞ্জের দীঘিটাতে একটি নাগ থাকত তার নাম ছিল নাগনন্দ তার থেকেই নালন্দা নাম এসেছে। জেনারেল কানিংহাম ই-ৎসিঙের ব্যাখ্যাই মেনে নিয়েছেন।

যাইহোক বুদ্ধদেবের নির্বাণেব পর পাঁচজন রাজা পাঁচটি সঙ্ঘারাম তৈরী করেন। তাঁদের নাম—শক্রাদিত্য, বুদ্ধগুপ্ত, তথাগত, বালাদিত্য এবং বজ্র। তাছাড়া মধ্য ভা তের এক রাজা (বোধ হয় হর্ষ) আর একটি সংঘারাম তৈরী করেন। চারদিকে উঁচু প্রাচীর—একটি ফটক। এই ফটকেই বোধ হয হিয়েনৎ-সাঙ্‌ বর্ণিত দ্বার-পণ্ডিতেরা বাস করতেন। যাই হোক তাঁদের পর অন্যান্য নৃপতিরাও এই শিক্ষাপীঠকে সংস্কার এবং পৃষ্ঠপোষণা করতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করত (হিয়েন-ৎসাঙ্‌-এর ব্যাখ্যায়) দেশের রাজা, তাঁর ১০০ গ্রামের রাজস্ব দিয়ে। এই গ্রামবাসী প্রতিদিন চাল, দুধ মাখন এখানে সরবরাহ করত। কাজেই এখানকার শিক্ষার্থীদের আর ভিক্ষায় বেরোতে হ'ত না। ইৎসিঙ্‌ বলেন, নালন্দার আওতায় দু-শতাধিক গ্রাম পরিমাণ জমি।

শিক্ষা সূচি বা পাঠক্রম সম্পর্কে পূর্বে যা বলা হয়েছে তার থেকে নতুন কিছু আর নেই। ই-ৎসিঙ্‌ বলেন প্রচীন ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কই মেনে চলা হত। স্নাতক হওয়ার পর শিক্ষার্থীরা রাজসভায়

যেত কাজ-কর্মের প্রত্যাশায়। তারা পেতও। কেবল যে বৌদ্ধধর্মই শেখানো হত তা নয়, বেদ পাঠও প্রচলিত ছিল। ছিল তন্ত্রশাস্ত্র পাঠ। কিন্তু ঐ যে শিক্ষার্থীরা স্নাতক হয়ে রাজকর্মচারী হওয়ার জন্য রাজার আশ্রয়ে উঠত—তার পিছনে কি রহস্য? একি সেই মানবসমাজের চিরন্তন সত্যটিই রয়ে গেল?

সে যাক, নালন্দার ঐতিহাস থেকে দ্বারপণ্ডিত বলে একটা কথা শোনা গেল। দ্বারপণ্ডিতের কায কি? যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিতর্কে এবং আলোচনায় যোগ দিতে চান তাঁরা প্রথমে দ্বারপণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে নামেন। দ্বারপণ্ডিতদের প্রশ্ন এত জটিল হ'ত যে দশের মধ্যে আট জনই হেরে যেত। যে দুজন বাকী থাকল, যারা দ্বারপণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করেছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনায় হেরে যেতই। আবার এই দ্বারপণ্ডিতই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশেচ্ছুদের পরীক্ষা করে নিতেন। এই ব্যাপাবটি আমবা আগে পাইনি, এ যেন একপ্রকারের admission test।

নালন্দার খ্যাতির আব একটি কারণ তাব গ্রন্থাগার। তিনটি গ্রন্থাগার ছিল—রত্নসাগর, রত্নদধি, রত্নরঞ্জক। এর মধ্যে বত্নদধি ছিল নতলা। নালন্দার এই বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট হয়েছিল—মুসলমানদের আক্রমণে। তা ছাড়া, বিক্রমশীলার খ্যাতির জন্যও নালন্দার গৌরব অস্তমিত হয়েছিল। অনেকে অনুমান করেন, দালান কোঠা পুরনো হযে ভেঙে পডেছিল। কেউ বলেন, মুসলমান আক্রমণের পর এর পুনঃসংস্কার হয়েছিল, কিন্তু দুজন তীর্থঙ্কর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানবীশদের হাতে অপমানিত হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয় আগুন লাগিযে পুডিয়ে দেয়। তবে আগুনেই যে নষ্ট হয়েছিল তাব প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা পেয়েছেন।

এখানকার ছাত্রসংখ্যা অনুমান করা হয়, ৮৫০০ এবং শিক্ষক সংখ্যা ১৫০০। প্রতিদিন প্রায় শতাধিক বক্তৃতা বা ক্লাস বসত। পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন—নাগার্জুন, আর্যদেব, শীলভদ্র, ধর্মপাল, পদ্মসম্ভব, কমলশীল, স্থিরমতি প্রভৃতি।

নালন্দার মতো মৈত্রক রাজাদের রাজধানী (৪৭৫—৭৭৫ খৃষ্টাব্দ) ভলভীতেও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কথাসরিৎসাগরের একটি গল্পে পাওয়া যায়, ছেলেকে পডানোর জন্য কাশী বা নালন্দাকে মনোনীত না ক'রে ভলভী

বিশ্ববিদ্যালয়কেই নির্বাচন করছেন। হিয়েন-ৎসাঙের বিবরণে দেখা যায় এখানে একশ সঙ্ঘারামে ৬০০০ পুরোহিত-পণ্ডিত থাকতেন।

নালন্দা আর ভলভীর মতো খ্যাতি অর্জন করেছিল বিক্রমশীলা।

বিক্রমশীলা—বিক্রমশীলা যে কোথায় ছিল তার স্থান নির্ণয় করাই কঠিন। কানিংহাম বলেন, বরগাঁওয়ের কাছে শিলাও গ্রামটিতেই বিক্রমশীলা ছিল। কিন্তু গঙ্গা তো কাছে নয়। অথচ ইতিহাসে পাওয়া যায় গঙ্গার পারে বিক্রমশীলা। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—ভাগলপুরের কাছে সুলতানগঞ্জে। কিন্তু সে মত অনেকে গ্রহণ করতে পারেনি। নন্দলাল দে বলেন, সুলতানগঞ্জের কাছে পাথরঘাটাতেই এর অবস্থান ছিল। শ্রীযুক্ত সমাদ্দার শেষোক্ত মতই মেনে নিয়েছেন।

বিক্রমশীলা নামটি নাকি বিক্রম নামে এক যক্ষের থেকে এসেছে। নবম শতকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করেন ধর্মপাল (৮১০ খৃষ্টাব্দে)। প্রায় চারশো বছর ধরে এর পরমায়ু ছিল।

বিক্রমশীলার নামের আগে একটা বিশেষণ আছে; রাজকীয় (Royal)। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজন্য কর্তৃক কেবল পৃষ্ঠপোষিতই নয়, উপাধি বিতরণও করতেন রাজা নিজে। প্রথম দিকে ১০৮ জন অধ্যাপক ছিলেন, এ ছাড়া ছিলেন আচার্যেরা। নিয়ন্ত্রণ করত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি—৬ জন তার সভ্য, একজন প্রধান। অতীশ এখানকারই অধ্যক্ষ ছিলেন।

বিক্রমশীলার সঙ্গে নালন্দার একটি স্বাতন্ত্র্য ছিল দ্বারপণ্ডিত নিয়ে। নালন্দার ছিল একজন দ্বারপণ্ডিত, এখানে ছিলেন ৬ জন। ৬ টি দরোজা। এখানকার মধ্য-গৃহটির নাম ছিল বিজ্ঞান গৃহ বা মন্দির। একটি সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ ছিল ৮০০০ লোকের সমবেত হওয়ার মতো। বিনাব্যয়ে খাওয়া থাকার জন্য সত্রাদি ছিল। ভূম্যধিকারীরা এর ব্যয় নির্বাহ করতেন।

দুভাবে শিক্ষা সম্পন্ন হ'ত, ব্যক্তিগত ভাবে এবং শ্রেণীগত ভাবে। পাঠক্রমের মধ্যে দেখা যায় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাধান্য; এই তন্ত্রশাস্ত্র নিয়ে অনেক প্রকারের মন্তব্য পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুর্নীতির কথাটাই আসল। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করে মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম আর লৌকিক হিন্দুধর্ম প্রায় মিলে যাচ্ছে বলেই তান্ত্রিকতা প্রাধান্য লাভ করছে। পাণ্ডুলিপি নকল করাও শিক্ষার মধ্যে গণ্য হ'ত। ইয়োরোপের চার্চেও এই স্ক্রিপ্টোরিয়াম দেখা যায়।

দুবার আক্রমণ করে মুসলমান সৈন্য দ্বাদশ শতাব্দীতে। প্রথমবার তুর্কী সৈন্য বোধহয় হেরে যায়। দ্বিতীয়বার (১১৯৯ খৃষ্টাব্দে) অনেক শিক্ষাকেন্দ্রের মতো বিক্রমশীলারও ধ্বংস করা হয়।

ওদন্তপুর সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানা যায় না, তবে মনে হয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এটিও ছিল। তারানাথ (তিব্বতের ঐতিহাসিক) মনে করেন গোপাল এবং দেবপালের সময়ে এই বিহার নির্মাণ করা হয়েছিল।

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পঞ্চকর পুথি থেকে জানা যায়, গোবিন্দপালদেবের অষ্টাত্রিংশৎ রাজত্বকালে মহম্মদ বকতিয়ার কর্তৃক ওদণ্ডপুর বিনষ্ট হয়।

মুসলমান কর্তৃক বিক্রমশীলা এবং ওদণ্ডপুরের ধ্বংসের অনেক কারণের মধ্যে কয়েকটি খুব প্রণিধানযোগ্য। ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ্‌ বলেন:

মুহম্মদ-ই বখতিয়ার নেড়ামাথার ব্রাহ্মণদের (ভিক্ষু) সহযোগে এখানকার ফটকে আসেন। প্রথমে এগুলো দুর্গ বলে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু দুর্গ নষ্ট করার পর বোঝা গেল এ দুটি কলেজ এবং এখানে অনেক পুথি পত্তর ছিল।

তারানাথও একথা অনুমোদন করেন। তারানাথ বলেন, ওদণ্ডপুর আর বিক্রমশীলা এই দুটিকে মগধের রাজা দুর্গ ক'রে তুলেছিলেন, এখানে যোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে থাকত, ভিক্ষুরাও আক্রমণকারীদের সঙ্গে লড়াই করেছিল।

একদিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় রাজার শেষ দুর্গ, আর এক দিকে কিছু কিছু ভিক্ষুদের বিশ্বাসঘাতকতা এই দুটি সমাজবিদদের বিশ্লেষণযোগ্য বলে মনে হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মনে করেন—এই ভিক্ষুদের মধ্যে এরকম দুর্নীতি এসে পড়েছিল যে, মুসলমান বিজেতা তাদের নিহত করতে এতটুকু বাধা পান নি, করুণাও প্রদর্শন করেন নি।

অবশ্য ভিক্ষুদের দুর্নীতিই যে বিজেতাদের বেপরোয়া নৈতিক করেছিল তা নয়। হয়ত সে-যুগের এই-ই ছিল রীতি।

এই তরঙ্গেই নদীয়া, মিথিলার সংস্কৃতিকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গেল।

আর্যদের বেদের শিক্ষা কুরু-পাঞ্চাল থেকে সরে মগধে অনার্য কিকত-ব্রাত্যদের মধ্যে যে-ইতিহাস সৃষ্টি করল দাক্ষিণাত্যেও সেই একই ইতিহাস।

আর্যদেব শিক্ষা থেকে বৌদ্ধ শিক্ষা খুব একটা স্বতন্ত্র না হলেও গণশিক্ষার দিক দিয়ে এগিয়ে এল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ইস্কুলের ব্যবস্থাপনায় দেখা গেল, বৌদ্ধশিক্ষা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং রাজাদেব পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বোঝা যায় বৃত্তি-কেন্দ্রিকও বটে। ভাবতবর্ষে ইস্কুলেব ইতিহাসে এ একটা নতুন স্থব, কিন্তু এইখানেই এল বিপদ। বৌদ্ধভিক্ষুবা নতুন মর্যাদায় যেমন উন্নীত হল তেমনি সম্পদমুখী হয়েও ওঠে। এই দুটি অবস্থা তাদেব সাধারণ মানুষের সমাজ থেকে সবিয়ে নিযে গেল। অতি-নিয়ম কঠোর-শৃঙ্খলা আব সামাজিক-ক্ষমতার পরিণতিই এই। কেবল সাধারণ সমাজেব সঙ্গেই যে এব বিবোধ ঘটে তা নয়, রাজনীতিতেও এর প্রভাব এসে পড়ে বলে রাজাদেব হাতেও এদের ভাগ্য দোদুল্যমান। শুঙ্গবংশেব পুষ্যমিত্র প্রতি ভিক্ষু হত্যাকাবীকে কত মুদ্রা দিয়েছিলেন সে বিষয়ে হয়ত বিতর্ক থাকতে পাবে, কিন্তু তিনি যে বৌদ্ধবিরোধী ছিলেন এ কথা অনেকেই স্বীকাব কববেন। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব উপব আস্থা আসবাব কাবণ চীনা পর্যটক উল্লেখ কবে গেছেন—সে যে কেবল বাজার প্রভাবেই তা নয়, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা বৌদ্ধশিক্ষাব বিপদকে বুঝতে পেরে তাঁবা শিক্ষার শাশ্বত আদর্শকে মেনে চললেন।

এই ইতিহাসই দক্ষিণভাবতে। জৈন-বা যেদিন বাজার আশ্রয় নিল, রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ কবতে গেল সেই দিন থেকে বৌদ্ধ আব জৈন ধর্ম এবং শিক্ষা দক্ষিণ ভাবত থকে উৎখাত হল। জৈন তীর্থঙ্কর কালক গদাভিল্লেব হাতে অপমানিত হওযায় (১ম খৃঃ পূ শতক) কিভাবে শকদেব ডেকে এনে উজ্জযিনী আক্রমণ করিয়েছিলেন, ইতিহাসেও তার কাবণ পাওয়া যায। তা ছাড়া যে সাতবাহন বংশ মৌযদের আশ্রয়ে থেকে সেই সংস্কৃতিতে মানুষ, তাঁবাই বা কেন অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, ব্রাহ্মণ্যবাদ মেনে চলেন ভাববাব কথা। পহ্লভেবা তো খাঁটি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ভক্ত।

দক্ষিণভাবতে বৌদ্ধদেব থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের অনুপ্রবেশই স্থায়ী হ'ল। শিব-কৃষ্ণ-বিষ্ণুব উপাসকেবা লৌকক দেবতা মুরুগণ বা ভেলাণকে নাকচ না কবলেও ভক্তি-ধর্মের বন্যায় হিন্দুসংস্কৃতি তথা আর্য সংস্কৃতির প্রচলনই বেশি ঘটিয়ে দিল।

আর-একটা বিচিত্র বীতি দেখা গেছে বিদেশীদের বেলাতে। তারা উত্তর

ভারতে এসে হ'ত বৌদ্ধ-ধর্ম আশ্রয়ী আর দক্ষিণ ভারতে হিন্দু-পোষক (N. Sastri—A History of South India ; Page—93)।

শিক্ষার ব্যাপারে দক্ষিণভারতে উচ্চশিক্ষার ইতিহাস যেমন জানা যায়, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তেমনি অনুমানেব উপর নির্ভর করতে হয়।

মহীশূরের নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী (A History of South India, Oxford Univ. Press, 1958) একটি প্রশ্ন তুলেছেন লিপি-শিক্ষা নিয়ে। কুর্নুল এবং মহীশূরে অশোকেব যে অনুশাসন পাওযা যায় তা উত্তর ভারতেব থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র; এবং মনে হয় ব্রাহ্মী লিপিব দাক্ষিণাত্য প্রভাব সেখানে স্বীকৃত হয়েছে। এই জন্যই তিনি অনুমান করেন, দাক্ষিণাত্যে লিপি-শিক্ষা আরও বহুকাল আগে থেকে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল নতুবা তাদেব লেখায় এ বৈচিত্র্য আসে কি করে? কেবল তাই-ই নয়, এই যে হিন্দু সংস্কৃতি এবং ভাষা তাব সঙ্গে তাদের বহুদিনেব পবিচয় নিশ্চয়ই ছিল, নতুবা এমন দৃষ্টান্ত পাওযা যেত না। টলেমীর বিবরণ থেকে দক্ষিণ ভাবতেব ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ে আব-একটি খবব পাওযা যায় যে, শস্যবিক্রেতা, তন্তুবায়, ফল বিক্রেতাবা যে গিল্ড বা সঙ্ঘ কবত তাব মধ্যে লিপিকাবও একটি শাখা (Sastri—A History of S. India ; Page 94)।

দক্ষিণভাবত গ্রামীণ সভ্যতার। অশ্বত্থবৃক্ষ সেখানে দেবস্থান। এই বৃক্ষের তলায় নব-নাবী বালক-বৃদ্ধ সমবেত হযে তাবা গ্রামেব কার্যাবলী আলোচনা করত। এই যে ব্যবস্থা, এই যে নিযম-বদ্ধ সামাজিকতা এ চোলদের রাজত্বকালেও দেখা গেছে।

শাস্ত্রী অনুমান কবেন, কুন্তল অঞ্চলে তামিল মাবাঠী প্রাকৃত পডানোব জন্য রাজাদেব এবং গ্রামবাসীর দান ছিল। শিক্ষককে তাঁবা গ্রামের জমি চাকরাণও দিতেন।

এই প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই লোকভাষা শেখানো হ'ত। উচ্চশিক্ষায় ছিল সংস্কৃত। এই উচ্চশিক্ষা বিশেষ কবে বাজাদের দরাজ খয়বাতিতে নির্বাহ হত। কিন্তু বৃত্তিগত এবং কারিগরি শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে, পিতাই তাঁব ব্যবসায়িক শিক্ষা ছেলেকে দিতেন, কিংবা বণিকসঙ্ঘের বিশেষ ধরণের ইস্কুলও থাকতে পারে। স্থাপত্য ও শিল্প শিক্ষণ যে অতি উন্নত ধবণের ছিল তা তাঁদের মন্দির নির্মাণ, স্তম্ভ এবং অন্যান্য স্থাপত্যকার্য এখনও সাক্ষ্য দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের শিক্ষায় একটা

কথা অনুমান কবা যায়, সংস্কৃতভাষার চেয়ে মাতৃভাষা এবং অন্য অঞ্চলেব লৌকিক ভাষা প্রাধান্য পেত। এবং এই মাতৃভাষার চর্চা যে দাক্ষিণাত্যে অতি উন্নত ধরণেব ছিল তা তামিল এবং অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যই প্রমাণ কবে। কিন্তু এ শিক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে ঠিকভাবে কিছু জানা যায় না। মঠ প্রতিষ্ঠার পর দেখা গেল, এই মাতৃভাষা বিশেষ স্থান ক'রে নিয়েছে। ভক্তিমার্গীবা সহজ-সুন্দর এবং লোক-আয়ত্ত ক'বেই তাঁদের বক্তব্য ব্যাখ্যা করতেন। এই শিক্ষাব্যবস্থায় পাওয়া গেছে, মন্দিবের বাবান্দাতে অথবা গ্রামের ছায়ায গ্রামেব ইস্কুল বসত। গ্রামে ইস্কুলেব শিক্ষক (ভাত্তি বা অক্কবিগ) সাধাবণ অঙ্কসূত্র সমস্ত পডাতেন। এইজন্য তাঁবা বৃত্তিও পেতেন। তাদেব কাজ ঠিকমতো কবছেন কিনা দেখব ব জন্য কর্মচাবীও নিযুক্ত থাকত। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ কবেছিলেন পববর্তী যুগে ইবন-বতুতা (খৃঃ, ১৩৩৩-৪৫). পিয়েত্রো দেল্লা ভালে (খৃঃ ১৬২৩), ববার্ট দ্য নোবিলি (খৃঃ ১৬১০)। তাঁরা দেখেছিলেন ছেলেদেব এবং মেযেদের পৃথক পৃথক পডানোব ইস্কুল, দেখেছিলেন পডানো ছাডাও, বালু ছডিয়ে লেখা-অভ্যাস করতে। ইবনবতুতা হানুযার ইস্কুলের যে-রীতি দেখেছিলেন, তা অন্তত ভারতবর্ষে অন্য কোথাও দেখতে পান নি বলে উল্লেখ করেছেন। মাদুরা লেখাপডার একটা প্রধান ক্ষেত্র বলে হযত বা খৃষ্টান ধর্মযাজকেরা এখানেই তাঁদের ইস্কুল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা কবতে ''নাযোগী হন।

এ ছাডা বযস্ক শিক্ষাব অস্তিত্বও নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী অনুমান করেন।

এই বয়স্ক শিক্ষা প্রচলিত হ'ত মন্দিব বা মঠের মাধ্যমে। মহাকাব্য বা পুবাণ কথাব আলোচনাব মাধ্যমে এই শিক্ষা অনুষ্ঠিত হত। হিন্দুদেব মঠ, জৈনদের পল্লী এবং বৌদ্ধদেব বিহাবে শাস্ত্রালোচনায় স্বাধীন ব্যাখ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষাব জন্য ইস্কুল ছিল ব'লে অনুমান কবা যায়, কারণ এখনও ঐ অবস্থা বর্তমান আছে। এখানে প্রসিদ্ধ পুথিব নকল করবার আয়োজনও ছিল।

ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকাব ছিল সংস্কৃত শিক্ষায়। এবং এই শিক্ষায় নৃপতিরা প্রভূত বৃত্তি প্রদান কবতেন। যে কোন কারণেই হোক দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত আস্থা ছিল; বাজপদের দায়িত্বপূর্ণ পদেও তাঁদেবই নিয়োগ করা হ'ত। এঁদেব পাঠক্রমে কোন ক্ষেত্রে চারটি বিষয় যথা—

আন্বীক্ষিকী, ত্রিবেদ, বার্তা (অর্থশাস্ত্র) এবং দণ্ডনীতি ; অথবা চতুর্দশ বিদ্যা যথা—চতুর্বেদ, ষডঙ্গ, পুরাণ, তর্ক, মীমাংসা এবং ধর্মশাস্ত্র। এর সঙ্গে আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধারবেদ (সঙ্গীত) এবং অর্থশাস্ত্র যুক্ত হয়ে অষ্টাদশ বিদ্যায় পরিণত হ'ত। এই সমস্ত বিদ্যা অর্জন ক'রে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ রাজগুরুর পদে বৃত হ'তেন, এবং তাঁদের কর্তব্য ছিল গ্রামে গ্রামে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা। অনেক সময় শিক্ষা-কল্পে ব্রাহ্মণদের পত্তনীও দেওয়া হ'ত।

কিন্তু এই সব ইস্কুল যে বৈদিক যুগের মতো কেবল ব্যক্তিগত এবং অনিয়ন্ত্রিত থাকত তা নয়; শিক্ষা-সঙ্ঘ গঠিত করে তাঁরা 'ব্রহ্মপুরী' 'ঘটিকা' নাম নিয়ে বড বড কলেজের মতো প্রতিষ্ঠান গডতেন। এরকম শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল—বেলগাঁয়ের ব্রহ্মপুরী, কাঞ্চীর ঘটিকা, পণ্ডিচেরী সন্নিকট বাহুব। তৃতীয় কৃষ্ণের মন্ত্রী নারায়ণের (৯৪৫ খৃঃ অ) পৃষ্ঠপোষণায় সালাতগীর যে বিশেষ খ্যাতি ছিল তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ১০৫৮ খৃঃ অঃ নাগই-এর ঘটিকাতে ২০০ বেদাধ্যায়ী ৫০ জন শাস্ত্রাধ্যায়ী এবং তিন জন গুরুর কথা জানা যায়। এখানে একজন গ্রন্থাগারিকও ছিলেন।

প্রথম বাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকাল ১০১২-১০৪৪ খৃষ্টাব্দ। তিনি দক্ষিণ আর্কটে এন্নায়িরমে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে ২৭০ জন ছাত্র রূপাবতারের প্রাথমিক ব্যাকরণ, বোধায়ণের সূত্র এবং বেদ অভ্যাস করত; ৭০ জন উচ্চশিক্ষার্থী বেদান্ত, ব্যাকরণ, প্রভাকর মীমাংসা পডত। শিক্ষক ছিলেন ১৪ জন। ত্রিভূবনীর কলেজে ২৬০ জন ছাত্র এবং ১২ জন শিক্ষক ছিল। পরবর্তীকালে বিরাজবাজেন্দ্রেব সময়ে (১০৬৩—১০৬৯) তিরুমুক্কুদলের ইস্কুলেব ব্যবস্থাপনায় দেখা যায়, সেখানে আবাসিক ছাত্রদের জন্য একটি হাসপাতালও ছিল। তিরুভাড়ুতুডইতে একটি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নেব ইস্কুল ছিল—এখানে অষ্টাঙ্গহৃদয় এবং চরক-সংহিতা পডানো হ'ত। দেবগিরির যাদবেরা ধর্মশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কেরালার ইতিহাস থেকে শিক্ষাপ্রসঙ্গের আর একটি জানবার মতো খবর পাওয়া যায়। কেরালার নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রথা ছিল—জ্যেষ্ঠ পুত্রই শুধু বিবাহিত জীবনযাপন করতে পারবে, অনুজেরা

মুক্ত। তারা পাঠাভ্যাস করবে, এবং শিক্ষকতা বৃত্তি নিয়ে গ্রামে গ্রামে শিক্ষা-প্রসার ঘটাবে। এই যে পারিবারিক নিয়ম (ভালো মন্দ যাই হোক) এই নিয়মে সে অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার যে বিশেষ ভাবে হবে—এ অনুমান করা খুব কঠিন নয়। নবম শতকের মধ্যভাগে আই-রাজা একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সংস্কৃত শিক্ষার সুবিধার জন্য; এটি আবাসিক ছিল। ৯৫ জন বেদাধ্যায়ী ছিল। এঁদের ভর্তি করবার আগে একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হত। কলেজটি ছিল দক্ষিণ ত্রাবাঙ্কোরের বিষ্ণুমন্দিরে। এখানকার পাঠক্রমের মধ্যে জানা যায়, ব্যাকরণ, মীমাংসা, পৌরোহিত্য, ত্রৈরাজ্য ব্যবহার (পাণ্ড্য, চোল এবং কেরালা)। পৌরোহিত্য আর ত্রৈরাজ্য-ব্যবহাব বিষয় দুটি প্রণিধানযোগ্য।

কেরালা তথা দক্ষিণ ভারতের মন্দির প্রসঙ্গে কিছু বলে এই অধ্যায়টি শেষ করি।

ইহুদীদের সিনাগোগের মতো এখানকার মন্দিরও শুধু অর্চনার স্থান নয়। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এখানকার মন্দিরের দান অতুলনীয়। বৌদ্ধদের বিহাব হয়ত এতটা ছিল না। কিন্তু মন্দিরের প্রভাব ব্যাপক। অর্থনৈতিক দিয়ে কত লোকের কাজ যোগাত এই মন্দির সে কথা নাই বা তুললাম। কিন্তু মন্দিরের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পুরোহিত, বন্দনাকারী, সঙ্গীতজ্ঞ, দেবদাসী, মালী—তারা কাজ কর্মে প্রাঙ্গণ মুখরিত করে রাখত। সমাজের বহু লোককেই মন্দির আকর্ষণ করে নিত তার কাজে। এ ছাড়া ছিল মাসে মাসে মেলা, উৎসব। এই উৎসবের একটি অঙ্গ ছিল শাস্ত্রালোচনা (খেলাধূলা, কুস্তী ইত্যাদি বাদেও)। বিদ্যাত :, সত্র এবং চিকিৎসালয় থাকত এই মন্দিরে সংযুক্ত; আবার গ্রাম বা সহরের সভাসমিতির যায়গাও এই মন্দির। সেখানে যে কেবল বিদ্যাচর্চাই হ'ত তা নয়, সেখানে স্থানীয় সংবাদাদিরও আলোচনা হ'ত। তাঞ্জোরের মন্দিরের দান-তালিকা থেকে জানা যায়, রাজা, বণিক, এবং ধনীরা মুক্ত হস্তে এই মন্দিরে দান করতেন। রাজারা যুদ্ধে জিতে যে সব ধনরত্নাদি পেতেন তার অনেকাংশই এখানে দান করতেন। এখানকার পুরোহিত, দেবদাসী, শিক্ষার্থী জমি পেতেন বাসগৃহও পেতেন। অবশ্য এও জানা যায়—মন্দিরের এই কার্যনির্বাহের দিক রাজা বা তাঁর কর্মচারী নিয়ন্ত্রণ করতেন। এ দিয়ে এ প্রমাণ হয়ত করা যায়—রাজা বা ধনীদের স্বার্থ এই মন্দির-সভ্যতা অনেকাংশ পালন করত। কিন্তু যদি

আমরা মেনে নেই, কোন দেশেই কোন তন্ত্রেই শাসকবর্গের অভিলাষ-বিরোধী হয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি বাঁচেনা বা টিকতে পারে না, তা হলে আমরা বলবই দক্ষিণ ভারতের মন্দির-সংলগ্ন শিক্ষার তুলনা কোন দেশেই খুব বেশী পাওয়া যায় না। এখন, এই মন্দির-কেন্দ্রিক শিক্ষা বৌদ্ধদের বিহার থেকে উচ্ছ্রিত কি না সে কথা ভাববার বটে।

মুসলমান যুগ

গ্রীকদের শিক্ষা থেকে মধ্য-এশিয়া একটু স্বতন্ত্র ছিল। আসিরিয়দের আমল থেকেই প্রত্যক্ষ করা গেছে, প্রতিবেশী রাজ্য জয় করবার জন্য, এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সেই দেশের পবিচয় নেওয়া বিশেষ দরকার। প্রথম দিকটি গেল—তাদের ক্ষমতা যে-দেবতা বা পুরোহিতদের উপর নির্ভর করত তাদেব অপদস্থ ক'রে অধিবাসীদের অন্তরে ভীতি উৎপাদন। যে শক্তিকে তাবা একান্ত রকমে ভয় পেত সেই-শক্তিই যদি খর্বিত হ'ল, তখন তাদের বশ্যতা স্বীকাব করতে দেরী হ'তনা। তারপর এল পরদেশের পরিচয় জানবার জন্য তাদের শিক্ষাদীক্ষা বীতি-নীতি গ্রন্থ-মাধ্যমে জানা। এই রকম নীতি হয়ত নিয়েছিলেন অসুব বাণিপাল (খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে)। তাঁর সংগৃহীত পুথি পুস্তকের সংখ্যা কম নয়, গ্রন্থাগার বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই গ্রন্থ বৃটিশ মিউজিয়ামের একটি মূল্যবান সম্পদ (A History of Persia, volume I, Sir Percy Sykes, Macmillan & Co Ltd, London, 1951 page 123)। আর এক প্রকারে সংবাদ সংগ্রহ করা হত; সেই দেশের কতিপয় ব্যক্তিকে হঠাৎ বন্দী করে। এ ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গেছে দারিয়ুসের সাইথিয়ানদের রাজ্য আক্রমণ করবার সময় তিনি (খৃঃ পূ ৫১২ তে) কাপ্পাডোকিয়ার সত্রপকে হুকুম করলেন, 'ব্ল্যাক সী'র তীর থেকে কতিপয় লোককে বন্দী করতে; সেই বন্দীদের মধ্যে স্থানীয় রাজার ভ্রাতাও ছিলেন, তাঁদেরই কাছে তাঁরা পথের সন্ধান নিলেন। কাজেই বুঝতে পারা যায়, মধ্য-এশিয়াতে যে বহু ভাষাবিদ থাকতেন, পুরোহিত থাকতেন এবং বহু গ্রন্থ সংরক্ষিত করা হ'ত তার একটা বাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল।

এই উদ্দেশ্য বিনষ্ট হ'ল রোমানদের আমলে, তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস। আলেকজান্দ্রিয়া ধ্বংস করেন খলিফা ওমর ব'লে কথিত আছে। কিন্তু সৈয়দ আমীর আলি এই মতের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দিযেছেন তা বর্তমানে অনেকেই স্বীকার করেন। তিনি বলেন, জুলিয়াস সিজারেব সময়ে এই বিদ্যালয় এবং গ্রন্থাগাব বিনষ্ট হয়; পরে চতুর্থ শতকে সম্রাট থিওডসিয়াস্ (Theodosius) অবশিষ্টটুকু বিধ্বস্ত করেন এই অজুহাতে

যে, এখানে খৃষ্টান-ধর্ম-বিরোধী বা পৌত্তলিকদের গ্রন্থ আছে। রোমকদের সঙ্গে গ্রীকের যে বিরোধিতা তাতে মনে হয়, একথা সত্য। (A shorter History of the Saracens—Ameer Ali, Macmillan & Co Ltd. London ; 1924, Page 42)। হেনরী ম্যাসেও এই উক্তি সমর্থন করেন—(The burning of the Alexandrian Library by Omar's orders is pure legend.—Islam, Henry Masse, translated by Halide Edib. G. P. Putnam's sons, New York, 1938, Page 54)।

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার বা পুস্তক পোড়ানো সুরু হয় ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র ক'রে যখন জাতীয়তা সুরু হয়।

ধর্মগ্রন্থকে কেন্দ্র করে যখন জাতীয়-জীবন সংগঠিত হয় তখনই পড়াশুনা সুরু হয় উপাসনা মন্দিরে। মধ্য এশিয়ায় ধর্ম-গ্রন্থ এল—জেন্দ্ আবেস্তা, ইহুদীদের ওল্ড টেস্টামেণ্ট, খৃষ্টানদের বাইবেল, আর মুসলমানদের কোরাণ। আমাদের দেশে বেদ, বৌদ্ধগ্রন্থ ইত্যাদি। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই মঠের ইস্কুল পুষ্পে-পল্লবে সুশোভিত হল। কিন্তু লেখাপড়ার রাজনৈতিক কারণটি অবহেলিত হ'ল না। বিশেষ ক'রে পারস্যে। আসীরিয় রাজারা লেখাপড়া কিছু করতেন বটে, কিন্তু এ অঞ্চলে সে রেওয়াজ ছিল না (—Except for the listening to "the Book of the Chronicles" of the kings and their subjects who could read and write, the Persian monarchs were generally illiterate········ Even to-day in Persia I have known men holding high positions who could neither read nor write, and, as their letters were not signed but sealed, their ignorance was by no means easily discovered.—A History of Persia Vol I Sykes—Page 174-175)। কাজেই আকবর 'নিরক্ষর' ছিলেন কিনা এ নিয়ে শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয় বিতর্ক উপস্থিত করলেও (Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule—Page, 141) পুস্তকখানির ভূমিকায় এচ, বেভারিজ (H. Beveridge—Foreward XX) যে কথা বলেছেন, তাঁর সঙ্গে আমরাও একমত।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যে মুসলমান যুগেও সুকুমার কলাবিদ এবং পণ্ডিতদের প্রয়োগ করা হ'ত—তার উল্লেখ করেছেন এচ. জি. ফার্মার তাঁর 'মিউজিক' নামক প্রবন্ধে, The Legacy of Islam নামক গ্রন্থে

(The Legacy of Islam, edited by—Arnold & Guillaume, Oxford at the Clarendon Press, 1931—Page 362) সেখানে তিনি বলছেন, খলিফার রাজসভায় গায়কদের পৃষ্টপোষকতা করা হ'ত কেবল কলা হিসাবেই নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও বটে (The singer was patronised at the Caliph's Court not only on account of his art, but also because of his political use. The musician's vocation took him into many house-holds, where the wine-cup often revealed a secret of political import)।

কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই নয়, ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যও বটে। অবশ্য প্রথম যুগে এই উদ্দেশ্য দুটি এতখানি প্রকট হয়নি। তবে, কেরলের শিক্ষায় যেমন তিনটি রাষ্ট্রের শাসন-বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা দেখেছি, তেমনি মুসলমান সভ্যতায় অনুবাদ এবং বহু ভাষার চর্চাই একমাত্র দেখে এই ধারণাই জন্মে যায়।

মেদীনার মসজিদেই মুসলমান ধর্মের প্রথম ইস্কুল দেখা গেল মনে হয়। ওছমান (ওম্মায়েদ বংশের) তখন খলিফা। এই সময় (৬৫২ খৃষ্টাব্দ) আলী এবং আব্বাসের পুত্র আবদুল্লাহ্ মদীনার মসজিদে কোরাণ তার ব্যাখ্যা, হাদিস্, ফিখ্, ইবাদত, মুআমলত প্রভৃতি প্রচার করছেন। একে বলা যেতে পারে মসজিদ-সংলগ্ন ইস্কুল। অনেকটা য়িহুদীদের সিনাগগের মতো। আমীর আলির মতে এই-ই হচ্ছে ঐশ্লামিক শিক্ষার প্রাচীন রূপ এবং এরই পরিণতি দেখা যায় বোগদাদে পরবর্তী কালে (Page 47)। এই ধর্ম শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবেই মক্তব এবং মাদ্রাসার সৃষ্টি হ'ল। মক্তব সাধারণত ধর্মশাস্ত্রের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করবার যায়গা আর মাদ্রাসা উচ্চতর জ্ঞানের জন্য।

এই সাধারণ শিক্ষালয় ছাড়া আর একটি শিক্ষার স্রোত ছিল, তা খলিফাদের রাজসভায়। ওম্মায়েদ বংশের শাসকেরা প্রাক্-ঐশ্লামিক যুগের আরবদের বীর-গাথা, কাহিনী প্রভৃতি শ্রবণ করবার জন্য কাহিনীকারদের নিয়োগ করতেন। এই সঙ্গে আরবী কবিতা আবৃত্তিও ছিল। তারপর হ'ত সঙ্গীত। আমীর আলি বলেন তাঁদের অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠান চলত (The first rulers of the Ommeyade dynasty spent most of their unoccupied time in listening to the stories

of the wars, adventures, and deeds of heroism of the Arabs before the birth of Islam. Page 197)। কিন্তু অবসর বিনোদনের জন্য প্রাক্-ঐস্লামিক যুগের কথা-কাহিনী কেন?

এঁদের সম্পর্কে আর একটি সংবাদ যে, ওম্মায়েদরা সঙ্গীত শিল্প এবং কবিতাকে যতখানি সমাদর করতেন সাহিত্য বিষয়ে তার কিছুই করতেন না। দ্বিতীয় ওমর-এর সময়ে (৭১৭ খৃষ্টাব্দ) ইসলাম শাস্ত্রজ্ঞদের (ফিখ্) কিছু কিছু উৎসাহ দেওয়া হ'ত বটে, কিন্তু প্রথম ইয়েজিদের পুত্র একমাত্র খালিদ ছাড়া আর কোন পণ্ডিতব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না। খালিদ ছিলেন চিকিৎসা এবং কিমিয়া বিদ্যায় বিখ্যাত। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সাহিত্য ছিল হবু-মুসলমান বা জিম্মিদের হাতে। অবশ্য ইসলামের ধর্মসংক্রান্ত মতভেদের দরুণই দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি হচ্ছিল। এবং ঐস্লামিক ধর্ম-দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা সাদিকের কাল এই যুগেই।

এরপর আসে আব্বাসিদ বংশের কাল; ভাঙতে ভাঙতেও এই বংশ ৭৫০-১২৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই সময়ে পারস্যের প্রভাব আসাতে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রীকদের হাত থেকে হিন্দুদের শাস্ত্র থেকে অনুদিত হয়ে শিক্ষায় সর্বত্র সমাদৃত হ'তে লাগল। ৮ম থেকে ৯ম শতাব্দী পর্যন্ত এই অনুবাদের কাল বয়ে চলল। রোমকদের সঙ্গে গ্রীকদের দ্বন্দ্বে এবং পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্মের প্রভাবে গ্রীক সাহিত্য ও দর্শন একেবারে লোকচক্ষুর আড়ালে গিয়ে পড়েছিল। কিন্তু পূর্ব যুগে আলেকজান্দারের দৌরাত্ম্যে মধ্য-এশিয়া সেগুলির সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করতে বাধ্য তো হয়েছিল বটেই। কাজেই জিম্মীদের দ্বারা, নেস্টোরিয়ান, আর্মানিয়ানদের দ্বারা এগুলি পুনরুজ্জীবিত হল। এদিকে পারসিকদের সঙ্গে সিন্ধু-পাঞ্জাবের যোগ অনেক কালের। কাজেই সংস্কৃত সাহিত্যও বাদ গেলনা। এমনি ক'রে মিশর স্পেনের মধ্য দিয়ে লুপ্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান সারাসিনেরা ইয়োরোপকে আবার ফিরিয়ে দিল। (সারাসিন কথাটার দুটো অর্থ হয়ত আছে—সাহারা বা মরুবাসীদেরও বলা হয়; আবার ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বপ্রান্তবাসীদেরও বলা হয়)। ইতিহাসের আর একটি সংবাদ এই যে, ওম্মায়েদ বংশের আব্দুল মালিকই প্রথম দেওয়ানীর হিসাব-পত্তর রাখবার ব্যবস্থা আরবীতে করে তুললেন; তার আগে এই হিসাব থাকত হয় পারসীতে কিংবা গ্রীকে অথবা সিরিয়াকে। এর কারণ উল্লেখ করতে মনে হয়, হিসাব-নিকাশ বা

লিপিবিদ্যায় বোধ হয় পারসীক গ্রীক বা সিরিয়াবাসীর জিম্মীরাই দক্ষ ছিল এবং তারাই এ বিষয়ে চর্চা করত (The moslem conquerers, fresh from the desert and ignorant of book-keeping and finance, had to retain in the exchequers Greek, Pahlawi and other non-Arabic writing officials. —History of Syria; P. K. Hitti; Macmillan & Co Ltd, London, 1951. Page, 472)। এই থেকে মনে হয়, ওম্মায়েদরা নিতান্ত মসজিদের প্রার্থনা বা ইমামের ধর্মালোচনা ছাড়া লেখাপড়ায় বিশেষ এগোতে পারেনি। অর্থাৎ আব্বাসিদের পূর্বে মুসলমানদের ইস্কুল খুব সাধারণের অধিকারে ছিল না, শাসন ব্যাপারেও এর দান তেমন নেই বলে মনে হয়। কিন্তু রাজসভায় কাব্যচর্চা আছে।

ওম্মায়েদদের ইসলাম-ধর্মের নিষ্ঠা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন আছে। তার কারণ বেদুইনদের অনেক ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি ওম্মায়েদদের মধ্যে ছিল। হজরত মহম্মদ যেগুলি নিষেধ করেছিলেন তার মধ্যে কাব্যচর্চা একটি। বেদুইনদের একটি রীতি উটের পা কেটে মৃতের সমাধির উপর রেখে দেওয়া। এটি নাকি পূর্ব পুরুষদের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ব্যাপার। হেনরী মাসের বক্তব্য হচ্ছে—এই রীতি ঘাসানিদরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবার পরও যেমন বজায় রেখেছিল ওম্মায়েদরাও তেমনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করবার পর পালন করত (This custom was also prevalent among the Ghassanids even after their cenversion to Christianity--a fact which proves the vitality of some pagan customs! Such survival of pagan customs was particularly noticeable at the time of the Omayyad Caliphs, whose orthodoxy was often questioned—page 25)।

দক্ষিণ আরবে বেতিল (Betyl) বলে এক প্রথা ছিল। বেতিল অর্থ 'দেবগৃহ' (House of god)। যুদ্ধে এই বেতিল খুব পবিত্র ছিলেন। উটের পিঠে আসন তৈরী করে তাঁকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হ'ত, আর চারপাশ থেকে উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করা হ'ত, তাকে বলা হ'ত সাজ। এই বেতিল প্রথা দেখা গেল মুহম্মদের পরিত্যক্তা পত্নী আয়েষার বন্দীদশায়। আলী তাঁকে বন্দী ক'রে আনলেন মেদিনাতে কিন্তু তাঁকে বিশেষ ভাবে এবং বেতিলের মতোই সম্মানের সঙ্গে নিয়ে এলেন। এই দেখে লামেনস

(Lammens) বলেন—আরবদের সেই আদিমপ্রথা এখানেও দেখা যাচ্ছে (Henry Masse—page 57) ।

কাজেই আরবীয়েরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে বটে, কিন্তু দেশের যে-সেই পুরাতন রীতি তা ভুলতে পারেনি। সেইজন্য ব্যক্তিগতভাবে খলিফারা বেদুইনদের জীবন-যাত্রার বর্ণনার মধ্যে রোমান্সের মতো এক মাধুর্য খুঁজে বেড়াতেন। ফলে, আমরা মুসলমান সভ্যতায় শিক্ষার দুটি রীতি পাচ্ছি; প্রথমত ধর্মশিক্ষা যা মসজিদ থেকে মাদ্রাসা-মক্তবে এল; দ্বিতীয়ত, মসনদী শিক্ষা—যার চর্চা ক'রে মসনদের আমীর এবং বাদশাহদের সন্তুষ্ট ক'বে কিছু অর্থাগম হ'ত।

যাই হোক, হারুণ-অর-রসিদ থেকে মামুনের রাজত্বকাল পর্যন্ত আরবী পারসী সাহিত্যেব বিশেষ প্রসার ঘটে; সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে এবং সাহিত্যে খেতাব দেওয়ার প্রথা আনেন হারুণ।

তাঁর সময়েই ধর্ম-বিধান (ফিক্ Jurisprudence) শিক্ষার হানিফী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে একটা বিষয় পবিষ্কার করা দরকার। ইমাম খলিফা প্রভৃতি কথাটি নিযে। ওম্মায়েদেরা ছিল রাজনৈতিক নেতা, খলিফা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইমাম। কিন্তু আব্বাসিদদের সময় থেকে (পারস্য রীতি অনুসাবে) বাদশাই একাধারে দুই হলেন, খলিফাও বটে রাজাও বটে। হানিফী মতবাদ আসে সিরিয়ার আওজাইর ধারা থেকে (মৃত্যু ৭৭৪ খৃঃ)। আবু হানিফার মৃত্যু হয় ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি বিশ্বাস করতেন, লেখার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে শেখানোই বিশেষ কার্যকরী। হানিফা নিজে পারসী। আমরা ভারতে বহুকাল ধ'রে দেখেছি, মৌখিক পদ্ধতিই শিক্ষায় সমাদৃত হত। আর্য সভ্যতার ভূমি পারস্যেও হানিফার উক্তিতে সেই কথাটিই দেখা যাচ্ছে। তাঁর পদ্ধতির মধ্যে ছিল,

(১) সাধারণ জ্ঞানের উপর ব্যক্তিগত যুক্তি আরোপ

(২) ক্বিয়াস—অর্থাৎ সাদৃশ্য সূত্র দ্বারা যুক্তি প্রয়োগ

(৩) ইস্তিহ্সান—অর্থাৎ ঐ সাদৃশ্য সূত্রকে আবার লোকহিতকর এবং লোক-চলিত অবস্থার সঙ্গে সংশোধন ক'রে নেওয়া। অর্থাৎ সাদৃশ্য দ্বারা মনে করা গেল 'ক'এর মতো হওয়া উচিত, কিন্তু অবস্থা বিশেষে যদি দেখা যায় তা অনুমোদিত নয় তবে সেই পরিপ্রেক্ষিতেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

'মালিক ইবন আনস' (মৃত্যু ৭৯৫) এবং গোঁড়া সুন্নাইট হাদিস এবং মেদিনার লোকাচার ধর্মশাস্ত্র মান্য করতেন। কিন্তু ক্রমে বিভিন্ন দেশবাসী এসে মিশে যাওয়ায় হানিফের ধর্মশাস্ত্রের উদ্ভব। আর এই শাস্ত্রের পোষকতা করলেন বোগদাদের খলিফারা। ব্রাহ্মণ্যবাদে যেমন ধর্মসূত্র আছে, বৌদ্ধদের যেমন 'বিনয়' আছে, জরথুস্ত্রের যেমন সমাজনিয়ম ছিল, মুসলমান শিক্ষারও এই 'ফিক' বা ধর্মশাস্ত্র একটি বিশেষ পাঠ্য হয়ে দাঁড়াল। কোরাণের দৃঢ় নিয়মবদ্ধ ধর্মশাস্ত্র হাদিসের (tradition or history) ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সহিষ্ণু ধর্মশাস্ত্র হয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এসে পৌঁছাল রসিদেরই কল্যাণে (School of Law—Syria)।

হারুণের পিতামহ মনসুরের আমল থেকে সুরু হয়েছিল আরবীতে বিজ্ঞানের এই অনুবাদ করার রেওয়াজ; সেই ধারা অক্ষুণ্ণ থেকে মামুনে পরিণতি প্রাপ্ত হল। হারুণের সময়ে একজন বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায়—আসম-ঐ।

মামুনের সময়ে ঐশ্লামিক সাহিত্য সমস্ত দিক দিয়েই বিস্তৃত হয়ে উঠল। মামুন সমাস্সিয়াতে ইসলামিক সভ্যতাকালেব প্রথম মানমন্দির স্থাপন করেন। মামুনই পারস্যভাষাকে স্বীকার ক'রে নিলেন আরবীর পাশাপাশি। আধুনিক পারসীক কবিতার প্রতিষ্ঠাতা আব্বাস তাব কালেই জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ ৮৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইসলামিক সাহিত্য মক্তব মাদ্রাসায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে নিল। সাইক্স বলেন (A History of Persia, Vol II) এই যে শিক্ষার এত শাখা-প্রশাখা এ কিন্তু সবই কোরাণকে কেন্দ্র করেই বর্ধিত হচ্ছে। কোরাণ বুঝবাব জন্যই ব্যাকরণ, অভিধান, কোরাণের জন্যই আরব, পারস্য-গ্রীকের ইতিহাস পাঠ; আব ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য ভূগোল রচনা। আর, বিজলী বলেন, (Beazley—Dawn of Modern Geography) "Mamun created the first true school of geographical science which had been seen since the days of the Antonines."

আমরা এতক্ষণ ভাবতের বাহিরে মুসলমান শিক্ষার বিষয়বস্তুর ইতিহাস এইজন্যই নিরীক্ষণ করলাম যে, ইয়োরোপে মুসলমান শিক্ষা ইয়োরোপকে সাহিত্যে বিজ্ঞানে যেমন পুনরুজ্জীবিত করতে পেরেছিল, ভারতবর্ষে তা পারলনা, সেই কথাটিই বোঝানোর জন্য।

আমাদের দেশে দেশজ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি মুসলমান আমলেই ঘটেছে বটে,

কিন্তু আরবীয় সাহিত্যের সেই Platonic Love নিয়ে যে কাহিনী একাদশ শতাব্দীতে স্পেনে দেখা গেছে—তা আমরা পাইনি। স্পেন-আরব সমন্বয়ে যে কাব্যাদর্শ সেখানে তৈরী হয়েছিল, এখানে আমরা তাও পাইনি। ভারত থেকে করটক-দমনকের উপাখ্যান তারা সেখানে ছড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু স্পেন-আরবের গদ্য সাহিত্যের সেই মকামাত্ (belles-lettres) যা সেখানকার পিকারেস্ক উপন্যসের উৎসাহদাত্রী তা আমরা এখানে পাইনি। সেই বিদ্রূপ, সেই ভূয়োদর্শন, মকামাতের সেই ঔজ্জ্বল্য এখানে দেখা গেল না। এ কেবল ক্ষোভের কারণই নয়, এ দুর্ঘটনা কেন ঘটল তা ভাববার কথা।

মনে হয়, ভারতবর্ষের মক্তব মাদ্রাসা যতটা গম্ভীর, যতটা বৈষয়িক ততটা সরস নয়। সরস না হওয়ার কারণ বোধ হয় তুর্কী-আফগান আর মোঙ্গলদের শিক্ষায় দোলাচল চিত্তবৃত্তি। আবার বৈষয়িকতা থাকলেও বিজ্ঞান ততটা আসেনি। হয়ত বোগদাদের পরবর্তীকালের মননশাস্ত্রের প্রতি অতি-মাত্রার ঝোঁকের দরুণই এটি আসতে পারলনা এখানকার শিক্ষায়।

গজনীরাজ্য ইতিহাসে আসে বলখ-এর পারস্য বংশীয় সামানদের ক্রীতদাসদের আমল থেকে। আলপতগীন, সবুক্তগীন থেকেও ভারত মাহমুদের কথা বেশি শুনতে পায়। এঁরা তুর্কী বংশীয়। মাহমুদের সঙ্গে ফেরদৌসীর নাম যুক্ত আছে ব'লে আমরা তাকে সাহিত্য ও শিক্ষার পরিপোষক বলে মনে করি। তা ছাড়া মাহমুদ গজনী শহরে মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, এবং আনসারীর সহায়তায় ইসলামিক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন।

কিন্তু মাহমুদকে আমরা হারুণ বা মামুনের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে পারিনে। কারণ, হারুণ বা মামুন পরমত-সহিষ্ণুতার দরুণ শিক্ষার জন্য সমগ্র জগৎকে বোগদাদে যেভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন, মামুদের বেলাতে তা নয়। ইতিহাস থেকেই পাওয়া যায়, মামুদ রাজনৈতিক দিক দিয়ে উচ্চাভিলাষী ছিলেন। রাজ্য প্রসারের জন্য অর্থ চাই, তেমনি চাই খলিফার স্বীকৃতি; এই দুটির জন্য তিনি গজনীকে বোগদাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সহর হয়ত করতে চেয়েছিলেন। 'আমীর' না হ'তে পেরে 'মীর' হওয়ায় তাঁর মনোদুঃখ কম ছিল না। 'সুলতান' সম্বোধনে তিনি বিগলিত হয়ে যান। খলিফার স্বীকৃতির জন্য তিনি হিন্দু-মন্দির ধ্বংস ক'রে আর তার ধনদৌলত বিধান মতো খলিফাকে দিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন; আবার বোগদাদের ঐতিহ্য গজনীতে চালু করে তেমনি পূর্বপ্রান্তীয় মুসলমান জগতকে আকৃষ্ট করেছিলেন।

মাহমুদের চরিত্রের কথা সাইকস একটু আভাসে বলেছেন (The prestige of the Caliph and the craving for recognition by him constituted practically all that was left of his power, but it was a force that had to be reckoned with and was doubtless of material assistance in maintaining the caliphate—Vol II. Page 27.)। খলিফা যেমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন, তেমনি আকাঙ্ক্ষা-বিতাড়িত সুলতানেরাও সুযোগ-সন্ধানী হয়ে পড়ছেন। তবে তাঁর মধ্যে কাব্যরসিক মনটি ছিল তা তাঁর কাব্য প্রেমিকতা থেকে উপলব্ধি হয়। তাঁর থেকে ভারতবর্ষে প্রভাব এল এই ভাবে : (১) পরবর্তীকালের সুলতানেরা তাঁরই অনুসরণ করলেন যেমন রাজনৈতিক দিক দিয়ে, (২) তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইসলামিক রূপটি বুঝতে পারলেন। মন্দির নষ্ট ক'রে মসজিদ তৈরী কর, আর মসজিদে এবং সুলতানের দরবারে কবিদের উৎসাহ দাও। একদিকে এল দরবারী সাহিত্য আর একদিকে এল ধর্ম-শিক্ষালয়। দরবারী সাহিত্য বেশিরভাগই আগন্তুকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

পরবর্তী ইতিহাস একই রকম। মাহমুদের পুত্র মাসুদ গজনীকে সমৃদ্ধ করে তুললেন। ইসলামিক শিক্ষার জন্য ইস্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ইনিও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আলবেরুণীর কথা আমরা মাসুদের সময়ই প্রকাশ্যে শুনতে পাই। আলবেরুণীর উক্তি থেকে দেখা যায়, এই সময় সংস্কৃত আর গ্রীক সাহিত্য অবলম্বন ক'রে আরবী আর পারসী সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে থাকে। অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যোতিষী, দর্শন, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতি ইস্কুল কলেজে শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠল। মাসুদের সময় থেকেই গজনীর সুলতানেরা ভারতের উপর বেশী করে নির্ভর করতে সুরু করলেন। সৈন্য-সামন্ত বা ধনরত্ন ভারত ছাড়া আর তাঁদের পাওয়ার উপায় ছিল না। কারণ তুরস্কের সেলজুক বংশ (১০৩৭ খৃঃ) তখন খলিফার অনুমোদিত ইসলাম-সম্রাট হয়ে উঠছেন। অতএব ভারতই তখন তাঁদের একমাত্র ভরসা। ইব্রাহিমের সময় দেখা যায়, ইসলামিক শিক্ষায় লিপিবিদ্যা বিশেষ স্থান ক'রে নিচ্ছে। 'কোরাণের' অনুলিপি করা তখন শিক্ষার একটি অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়ে ওঠে।

ঘুর-বংশের আমলে শিক্ষার তেমন চর্চা দেখা যায়না। তবে আজমীরের মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করে তার স্থানে ইসলামিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত

হয়েছিল—এ সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু আজমীরে ইসলামিক শিক্ষা তখনও খুব একটা চালু হতে পেরেছিল ব'লে মনে হয় না। কারণ, মুসলমানের পক্ষে আজমীরে বাস করা তখনও নিরাপদ ছিল না।

ভারতবর্ষে মুসলমান সম্রাটেরা ইস্কুল কলেজের কোন্ আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন সে বিষয়ে একটু এখানে আলোচনা করে নেওয়া যাক।

আমরা জানি, আরবভূমির অধিবাসী ভৌগোলিক আর অর্থনৈতিক কারণে দলে দলে বহুদিন থেকে উত্তরের দিকে অর্থাৎ সিরিয়ার দিকে ছড়িয়ে পড়ছিলেন। সেমিটিক শাখা এইভাবে প্যালেস্টাইন, লেবানন, জুডাহ্ ইস্রায়েল প্রভৃতি রাজ্য সৃষ্টি করে। এই অঞ্চলটি ইয়োরোপ এশিয়া এবং আফ্রিকার সংযোগস্থল। কাজেই এখানে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মিশ্রণ চলছিল।

এখানে আসীরীয, মিশরীয় গ্রীক রোমক এসে পরবর্তীকালে প্রভাব বিস্তার করেছে। খৃষ্টধর্মও এখানে দৃঢ় হয়ে বসে পড়ে। আবার মুসলমান যুগে মরুবাসী তাদের নতুনধর্মের এবং সমাজনিয়মের প্রতিষ্ঠাও এখানকার দামাস্কাসে ক'রে তোলে। দামাস্কাস রোমকযুগের এ্যান্টিয়ক এবং বেরিটাস-এর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী নগরী হ'তে চেষ্টা যে না করেছিল তা নয়। বেরিটাস-এর রোমক-আদর্শে পরিচালিত ল'ইস্কুলের গৌরব দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত। এই ল'-ইস্কুল ইসলামিক 'ফিক'-কে যে প্রবোচিত করেছিল তা হিট্টি স্বীকার করে গেছেন (Roman law, directly or through the Talmud and other media, did undoubtedly affect certain phases of Islamic Laws, especially in Umayyad Syria and Egypt Page 492—History of Syria)। এই অঞ্চল থেকেই তাঁদের শিক্ষার আদর্শ, পদ্ধতি এবং বিষয়বস্তু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। নতুবা প্রথমদিকে প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁদের মধ্যে ছিল না। সামান্য পড়তে লিখতে এবং তীরধনুক ব্যবহার করতে এবং সাঁতার কাটতে পারলেই তখনও লোকে তাকে শিক্ষিত মনে করত।

বেদুইনদের জীবনে শিক্ষা কি, না—সাহস, বিপদের সামনে ধৈর্যধারণ, প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে অবহিত হওয়া, পৌরুষ, ঔদার্য আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণ অর্জন করা।

কিন্তু হজরত আলীর যে মেদিনার শিক্ষা সে অনেকটা কলেজী শিক্ষার

মতো। সাধারণ মানুষের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে মসজিদ-সংলগ্ন ইস্কুল। তারা কোরাণ শুনবে, পড়বে আর হাদিস পড়বে। মুসলমানদের মধ্যে আদি-শিক্ষক কোরাণ-পাঠক। তারপর কুফা নগরীতে দেখা গেল প্রাথমিক ইস্কুল বা কুত্তাব (Kuttab)। এখানে কোনপ্রকার বেতন নেওয়া হ'ত না।

পাঠ্যবস্তুর মধ্যে আছে বিজ্ঞান। মুসলমান শাস্ত্রে বিজ্ঞান দুরকমের, যে-বিষয় ধর্ম সম্পর্কে কিছু বলে, আর যে বিষয়ে শরীর সম্পর্কে জ্ঞান দেয়।

কাজেই একদিকে বিজ্ঞান হিসাবে শাস্ত্রচর্চা বাড়ছে অন্যদিকে শরীর-চর্চা হিসাবে চিকিৎসা ও কিমিয়া বিদ্যার অভ্যাস চলছে। মসজিদে বিজ্ঞান হিসাবে হয়ত শাস্ত্রচর্চাই আসবে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হ'তে লাগল। এর পরিচয় আমরা 'হমা'র (Hamah) শাহানশাহ নূর-অল-দীন এবং সালাহ-দীনের আমলে দেখতে পাই। দামাস্কাস, আলেপ্পো, হমা-তে যে হাসপাতাল তাঁরা তৈরী করেছিলেন সেগুলি একরকমের মেডিক্যাল স্কুল, এখানে গ্রন্থাগার পর্যন্ত ছিল। ডাক্তারেরা এখান থেকে সার্টিফিকেট পর্যন্ত পেতেন (ইযাজহ্)। চিকিৎসা করবার আগে এই সার্টিফিকেট লাভ করতে হত। নূরীদ-রাই এখানে মাদ্রাসা কলেজ (দ্বাদশ শতকে) প্রতিষ্ঠা করলেন। বোগদাদেও এইরকম মাদ্রাসা মামুন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বটে (বেত অল হিক্‌মা -জ্ঞানাগার) ৮৩০ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু সে ছিল অনেকটা সাধারণের জন্য বিজ্ঞান ও কলা আলোচনার স্থান। নূরীদ্‌দের মাদ্রাসা অনেকটা সালজুক্‌-সুলতানদের আমলের নিজামীয়াহ্ (Nizamiyah)-র মত। নিজামীয়াহ্ ১০৬৭ খৃষ্টাব্দে বোগদাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গজনী এই বোগদাদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। আর ভারতবর্ষে সেই তরঙ্গ এল। কেউ বোগদাদ থেকে প্রেরণা নিলেন, কেউ বা নিশাপুরের আদর্শ অনুকরণ করলেন।

মাদ্রাসাহ্-ও হচ্ছে মসজিদ-ইস্কুল। সুলতান প্রতিষ্ঠা করতেন, ওয়াকফ্-এর ব্যবস্থা করে ব্যয় নির্বাহ করা হ'ত। এখান থেকে প্রচার করা হ'ত (শিক্ষার মাধ্যমে) ইসলাম শাস্ত্র, ইসলাম আইন বা ফিখ্, ধর্ম-নিষ্ঠা। সাধারণত সুন্নীদের মতবাদই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ছাত্র ও শিক্ষক এই মাদ্রাসাতেই বাস করবেন, ওয়াকফ্ থেকে তাঁরা বৃত্তি পেতেন। এই মাদ্রাসায় না পড়লে রাজকীয় বিভাগে কাজকর্ম পাওয়ার আশা দুরাশা। দামাস্কাসে অল-মাদ্রাসা অল-নূরীয়াহ্-র ইস্কুল-গৃহের সৌন্দর্য তো জগদ্বিখ্যাত ছিল।

স্পেনের পতনের পর মুসলমান-জগতে দামাস্কাস এবং কায়রোর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই আদর্শের মতো ছিল ; স্বপ্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশেও যে সেই প্রভাবই পড়বে মুসলমান যুগে তা খুব বিস্ময়ের নয়।

সিরিয়ার শিক্ষা-ইতিহাসের আর একটু পরিচয় নিতে হয়। লিবানিয়াস নামে একজন প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক ছিলেন (৩১৪-৩৯৩ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় :

ইস্কুলে শীত এবং বসন্ত কাল ধরে পড়া চলত। গ্রীষ্মকালে ছুটি। এই সময় নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হত। ইস্কুল বসত সকাল থেকে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত। উচ্চতর শিক্ষা ছিল আলঙ্কারিকদের তত্ত্বাবধানে। এই শিক্ষকেরা বেতন নিতেন নগর এবং ছাত্রদের কাছ থেকে। এই শিক্ষকদের সঙ্ঘ ছিল তার সভাপতিও ছিল। পড়ানো হ'ত গ্রীক, আব কিছু কিছু লাতিন। আর ছিল তর্কশাস্ত্র। কিন্তু ভাববার কথা এই, তিনি বলছেন এই সব বিদ্যালয়ে ১৬ বছরেব অল্পবয়স্ক ছাত্রও ছিল। আর শিক্ষকেরা নগরবাসী কর্তৃক নির্বাচিতও হ'তেন। দুটি কথা মাদ্রাসার পক্ষে প্রণিধানযোগ্য ' মাদ্রাসা বা কলেজ যেন উচ্চশিক্ষা আর প্রাপ্তবয়স্কদের কথাই ভেবেছে। বক্তৃতা-পদ্ধতি আলোচনা-পদ্ধতি ঠিক অল্পবয়স্কদেব উপযোগী নয। প্রাথমিক ইস্কুল থেকে মাদ্রাসার এত প্রসার দেখে মনে হয, ধর্মপ্রচার এবং দামাস্কাসের সিরিয়াক-অভ্যাসই কি সুলতানদের মনে কাজ করছে ?

বেরাইটাস বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা যায়, শনিবারের অপরাহ্ন এবং রবিবার ইস্কুল বন্ধ থাকত। সন্ধ্যাবেলা ছাত্রেরা দিনের-বেলার পড়া পুনরভ্যাস করত। আবার এখানে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার জন্য নানাপ্রকার সঙ্ঘও ছিল। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আলোচনা-চক্র মুসলমান আমলে আমাদের ভারতবর্ষেও দেখা গেছে।

সিরিয়ার ইস্কুল-ব্যবস্থা আমরা আলোচনা করে নিলাম এই জন্য যে, খৃষ্ট-যাজকদের মধ্য দিয়ে এবং ইসলামী শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের ভারতবর্ষে আসা স্বাভাবিক বলে। কারণ এখানকার ইস্কুল ইয়োরোপ আর মধ্য-এশিয়ায় সত্যিকারের খ্যাতিসম্পন্ন ছিল।

সেলজুক বংশ ১০৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেলজুক বংশ নূরীদদের মাদ্রাসাতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন আমরা পূর্বে দেখেছি, আর তাঁদের পাল্লা মার্ভ (Merv), নিশাপুরে সরে গেল। মালিক শাহ'র সময়ে এই

বংশ গৌরবের শীর্ষে ওঠে (১০৭২-১০৯২)। তাঁর সময়েই বোগদাদকে ইস্পাহান নগরী ম্লান ক'রে দিতে থাকে। আবার নিশাপুরের ইস্কুলও বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এখানেই নিজাম-উল-মুলক, ওমার খৈয়াম এবং হাসান সাবাহ্ ছেলেবেলা লেখাপড়া শিখেছেন এবং পরবর্তীকালে নিজাম-উল-মুলক সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, তার মধ্যে মানমন্দির একটি। এই মানমন্দিরেই ওমারখৈয়ামের বিজ্ঞানসাধনার পীঠ বিশেষ হয়ে পড়ল। ওমার খৈয়াম একাধারে কবি এবং বৈজ্ঞানিক (জ্যোতির্বিজ্ঞান)। কাজেই ভারতবর্ষের সুলতানদের কাছে যেমন ফেদৌসী তেমনি ওমার খৈয়াম অতি পরিচিত। তাঁদের প্রতিভার জন্যও বটে আবার রাজনৈতিক নৈকট্যের জন্যও বটে। বোগদাদ নিশাপুর এবং তূস নগর তিনটি আল-গজ্জালীর জন্যও (জন্ম ১০৫৮) খ্যাতি অর্জন করে।

সেলজুক বংশের সুলতান সঞ্জরের আমল থেকেই ঘুর-বংশের আবির্ভাব হয় (১১৪৮-১২১৫)।

✓ কুতুব-উদ্দীন আইবাকই বলতে গেলে ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমে তাঁর রাজধানী ছিল গুহরামে, পরে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী নগরীতে তার রাজধানী তুলে আনলেন। অবশ্য তিনি ওখানে থাকতেন না। ইনি ছিলেন দাস। তিনি নাকি নিশাপুরে লেখাপড়া ক'রেছিলেন। আর আইবাকের সেনাপতিই হচ্ছেন বক্তিয়ারের পুত্র ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ। ইখতিয়ার উদ্দীন বিহারের ওদন্তপুরা এবং তার মঠ ও বিশ্ববিদ্যালয় নষ্ট ক'রে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হত্যা ক'রে দিল্লীতে ১১৯৩ সালে ফিরে এলেন। শ্রীযুক্ত লাহা বলেছেন, বখতিয়ার বিহার ধ্বংস করেছিলেন: কিন্তু অন্যত্র দেখা যাচ্ছে বখতিয়ারের পুত্র ইখতিয়ার (The Cambridge History of India Vol III, 1958, Page 42। আবার উপরোক্ত গ্রন্থের, Cambridge History-এর, ৬০০ পৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশ বখতিয়ার খান কবলিত করেছিলেন)। এই তারিখ দিয়েই মনে হয়, যাঁরা বলেন বৌদ্ধ বিহারের নৃশংসতা হচ্ছে বৌদ্ধরাজা হলাগুর বোগদাদের নৃশংসতার প্রতিশোধ তাঁরা অযথা দোষারোপ করেন—কারণ হলাগু বোগদাদে আসেন আরও পরে। শ্রীযুক্ত লাহা বলেন, বখতিয়ার (ইখতিয়ার হবে) এই ধ্বংস সাধনের ক্ষতিপূরণ করেছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদ আর মাদ্রাসা নির্মাণ করে। ইখতিয়ার-উদ্দীন নদীয়া আক্রমণ করেন ১২০২ খৃষ্টাব্দে (সম্ভবত)। ইখতিয়ার-

উদ্দীন অতঃপর গৌড় বা লক্ষ্মণাবতীর নবাব হয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা নির্মাণ করেছিলেন বলে অন্যত্রও প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুতুবউদ্দীনের পর তুর্কী ইলবারী বংশীয় ইলতুতমিস মসনদে বসলেন। ইনিও বহির্ভারতে প্রতিপালিত। আবার তাঁর সময়েই দুটি ঘটনা ঘটল, একটি চিঙ্গিস খাঁর আক্রমণ, অপরটি ১২২৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমান ধর্মের ধারক বলে বোগদাদের খলিফার স্বীকৃতি। এই সুলতানই উজ্জয়িনীনগর ধ্বংস করেন, সেখানকার মহাকালী-মন্দিরের লিঙ্গমূর্তি নিয়ে এলেন। এই ধ্বংসের মধ্যে উজ্জয়িনীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কি হয়েছিল অনুমেয়।

কিন্তু দিল্লী-পাঞ্জাবে তখন চিঙ্গিসখাঁর প্রকোপে বাহিরাগত শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ মুসলমানের আগমন ঘটছে। কাজেই সেখানকার শিক্ষা-দীক্ষাই ঐ অঞ্চলে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে বলে মনে করা স্বাভাবিক। আবার ফখর-উল-মুলক হলেন সুলতানের প্রধান মন্ত্রী। তাঁর বোগদাদে কেটেছে ৩০ বছর। সাহিত্য রসিকও ছিলেন। এদিকে ইলতুতমিস একটি মাদ্রাসা করেছিলেন যার পুনঃ সংস্কার করলেন পরবর্তীকালে ফিরোজশাহ তুগলক। এই মাদ্রাসাও হয়ত বোগদাদের অনুকরণে পরিচালিত হ'ত বলে মনে করা যায়। সুলতানা রাজিয়া দিল্লীতে আর একটি মাদ্রাসা করলেন, মুইজ্জি মাদ্রাসা বলে। সুলতান বলবনের সময়ে তাঁর পুত্রেরা আর একটি নতুন জিনিস করলেন—তা হচ্ছে বিভিন্ন সাহিত্য-গোষ্ঠী ও সাহিত্য-সভা। সিরিয়ার প্রভাব এখানেও দেখা যাচ্ছে।

আমরা আর ইতিহাস আলোচনা না করে মোটামুটি এই কথাই বলতে পারি, অনেক কারণে সুলতানদের এই শিক্ষা-উৎসাহ দেখা যায়। তার মধ্যে (১) বহির্ভারতের মুসলমান শিক্ষার গৌরব, (২) দামাস্কাস, বোগদাদ রাজধানীর প্রভাব, (৩) বহির্জগতের মুসলমান-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এখানেই তার পরিপূর্তি, (৪) সুলতানদের অতীত স্মৃতি।

এবং এই শিক্ষার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাই একান্ত। হিন্দু-বৌদ্ধ-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে মাদ্রাসা নির্মাণ করে যে ইসলাম শিক্ষার খুব প্রসার হচ্ছে না তা অনুমান করা যায়, ফিরোজশাহর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা-সংখ্যা দেখেই। এই সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে। ফেরিশতার তালিকা থেকে দেখা যায়, সুলতানেরা সব চেয়ে বেশী নজর দিতেন শহর নির্মাণে, সেতু নির্মাণে, হাসপাতালে, সরাই-খানায়, সাধারণ স্নানাগারে, মাদ্রাসা অনেক

পরে। এই তালিকা দেখে মনে হয়, আসলে তাঁরা নতুন দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনেই বেশী উদ্যোগী ছিলেন। সৈন্য-চলাচলের পক্ষে যেগুলি প্রধানত দরকার তাই বেশি করে করতে হবে। এই রাজনৈতিক কারণেব সঙ্গে আছে, সম্প্রদায়গত বোধ। মাদ্রাসাতে হিন্দুরা পড়তে পারতেন না। ওখানে ইসলামী-শাস্ত্র পাঠই অবশ্য কর্তব্য, এবং হিন্দুদেব প্রবেশ নিষেধ। আর আছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে অবিরাম খণ্ড যুদ্ধ। কুতুবউদ্দীন আইবাক থেকেই সুরু হয়েছে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নবাবদের বিদ্রোহ।

স্বসম্প্রদায়ের লোক বিদ্রোহী হলে বড় বিপদ। এই বিপদ কাটানো যায় যদি ইসলাম ধর্মের রক্ষক বলে আস্থা পাওয়া যায়। সে আস্থা খলিফা দিতে পারেন। কিন্তু চিঙ্গিস্খাঁ আর হলাগুর দৌরাত্ম্যে খলিফা নেই। কাজেই ধর্মের জন্য কিছু করাই একমাত্র উপায়।

ধর্মের জন্য সহজে কিছু করা যায় মন্দির নষ্ট করে, মসজিদ আর মাদ্রাসা তৈরী করে। সাহিত্য আর সঙ্গীতর মাধ্যমে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কিভাবে সম্পন্ন হয় তা আমরা পূর্বে দেখেছি। আর একটি উপায় আছে, হিন্দু পণ্ডিত সম্প্রদায়কে বজন কবে সাধারণ লোককে আকৃষ্ট ক'রে। এই প্রবণতার মধ্য দিয়েই বিভিন্ন অঞ্চলের দেশীয় ভাষার বৃদ্ধি ঘটল। ওস্মাযেদরাই চান নি যে, অমুসলমানেরা দলে দলে মুসলমান হোক। কারণ ইসলামের বিধান অনুযায়ী তাতে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসেছিল। যে কিষাণেরা মুসলমান হবে তাদের কাছ থেকে খাজনা নেও নিষেধ বলে। কিন্তু ভারতে পাঠান-আমলে সেরকম বিপযয় আসবার কারণ তেমন দেখা যায় নি। যে-ভাবেই হোক মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ঘটল যখন তখন মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা জনপ্রিয় হল একথা আমরা ইংরেজ শাসনের সুরুতে পাই। প্রথমদিকে মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যাহত যেসব কারণে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শহর নির্মাণের ঝোঁক।

তারিখ-ই-ফিরোজশাহীর উক্তি থেকে দেখা যায় মুহম্মদ তোগলক দেবগিরিতে যখন রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন তখন এই পৌনে দুশবছরের দিল্লীতে বিপযয় এল। যে দিল্লী বোগদাদ-কাইরোর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল (লেখকের উক্তিতে এখানেও অতীত-গৌরব স্মৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়) তা একেবারে বিনষ্ট হল। এর মধ্যে সবচেয়ে নষ্ট হল মাদ্রাসা আর মসজিদ ইস্কুল।

এত বড় শহর না হলেও ছোটোখাটো শহর নির্মাণ খুবই চলত। কারণ শহর হচ্ছে একরকমের উপনিবেশ। রাজ্য যত বড় হবে তার

প্রশাসনিকের জন্য তত শহর নির্মাণ করতে হবে। প্রাচীন মধ্য-এশিয়া সভ্যতা থেকেই দেখা যায় এক স্থানের জনতাকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা একটি প্রশাসনিক নীতি। এমনি ঘটনা ঘটেছিল নেবুকাডনিজারের হাতে ইস্রায়েল-আর জুডাহ্-বাসীদের। এখানে স্থানান্তরীকরার প্রশ্ন নেই, কিন্তু নতুন উপনিবেশ করা দরকার।

এইভাবে একদিক যেমন নতুন মাদ্রাসা বাড়ে অন্যদিকে তেমনি অন্য মাদ্রাসা পরিত্যক্ত হয়; পুরানো সমাজের মধ্যে যতক্ষণ এই মাদ্রাসার শিক্ষা প্রবেশ না কববে, ততক্ষণ নতুন শিক্ষার এই ইস্কুল যাযাবর হ'তে বাধ্য।

আর একটি বিপর্যয় ঘটল, বক্তিগত পরিবার কর্তৃক গৃহশিক্ষক বাথবার রেওয়াজ। সুলতানের মসনদী সাহিত্য-সভা, তাঁব গৃহশিক্ষক অন্যান্য আমীর ওমরাহ্ এবং সম্ভ্রান্ত মুসলমানকে প্ররোচিত করল। তাঁরাও গৃহশিক্ষক রাখতে সুরু করলেন। এই গৃহশিক্ষক আবার বহিভারতের শিক্ষা নিয়েই আসতেন। এই গৃহশিক্ষকের প্রাবল্যেও মাদ্রাসার শিক্ষা পরিপুষ্ট হতে পারল না।

ফিবোজ শাহ্ তুঘলকের আমল থেকেই ইসলামিক মাদ্রাসার চিন্তাধারার একটু একটু ক'রে পরিবর্তন আসতে থাকে। সামারকান্দ থেকে অধ্যাপকেরা আসতে থাকেন। সূফী মতবাদ ফিরোজশাহী মাদ্রাসায় স্থান ক'রে নিচ্ছে। ফিরোজাবাদ নতুন শহর, তাকে কৌলীন্যে দাঁড করবার জন্য ফিরোজশাহ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ছাত্র-শিক্ষক মাদ্রাসাতেই থাকত, পর্যটকদেব আস্তানাও ছিল। দরিদ্র ছাত্রেরা এখানে বৃত্তি পেত। হিন্দুবা রাজকার্যে প্রবেশ করিতে লাগল। তাবা মাদ্রাসায় না পড়তে পাবলেও, আরবীভাষায় দক্ষতা অর্জন করল। ফিবোজশাহ্র ঔদার্য হিন্দু মুসলমানের শিক্ষাকে পাশাপাশি বাড়তে সাহায্য করেছিল।

এরপব আসে তৈমুবেব আক্রমণ। ভারতবর্ষ তৈমুরের কাছ থেকে শিক্ষাদীক্ষায় তেমন কিছু না পেলেও বহির্ভারতে সামরকান্দে শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটে। বহির্ভারতে মুসলমান-সমাজে সূফীদের কবিতা, জালালুদ্দীন রুমী, হাফিজ, সাদী, প্রভৃতি প্রভাব বিস্তার করেছে, তাঁদের দেওয়ান ভারতেও অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে।

লোদীবংশের সেকান্দার-লোদীর লেখাপড়ায় বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। তিনি রাজধানী বদল করলেন আগ্রাতে। ইনি নিজে কবি

ছিলেন, ছদ্ম নামে লিখতেন (গুলরুখ), তাঁর কবিতা-সংগ্রহ কম নয়। তিনি নির্দেশ দিলেন প্রত্যেক সৈনিককে লেখাপড়া করতে হবে। এঁর রাজত্বকাল আর একটি কারণে স্মরণীয়। তাঁর সময়েই হিন্দুরা প্রথম পারসী শিখতে সুরু করল। উর্দু ভাষার জন্মও তাঁর সময় থেকেই হয় বলে অনেকের ধারণা। সেকান্দারের রাজত্বকালে অনুলিপি, অনুবাদ প্রভৃতির বহু সমাদর ছিল। 'বেলে লেটার' বা রম্য-রচনাও সমাদৃত হ'ল। কিন্তু যতই হোক এ সব তাঁর মসনদী সাহিত্য বিশেষ; মাদ্রাসায় স্থান না পাওয়ায় ভারতের শিক্ষা ও সাহিত্য খুব আশ্রয় পেল না।

সেকান্দার লোদীর জৌনপুরের গ্রন্থাগার এবং মাদ্রাসা ধ্বংস করার ব্যাপারে তাঁর সত্যিকারের শিক্ষাপ্রীতির প্রতি সন্দেহ জন্মে। তিনি করেছেন অনেক কিছু, কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্য থেকে তৎকালের সুলতানদের চরিত্রের একটি বড় প্রমাণও মেলে। সুলতানেরা কি সত্যিই শিক্ষার প্রসার চেয়েছিলেন, না, অভ্যাসের দরুণ এসব করতেন, বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করতেন। একমাত্র ফিরোজশাহ ছাড়া পাঠান আমলে আর কারও ভেতর শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা তো দেখা গেল না।

বরং দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মনী-রাজ্যে মাহ্‌মুদশাহ বাহমনীর মধ্যে শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা দেখা যায়। ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে একটি মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। শিরাজের কবি হাফিজকে এখানেই আনয়ন করা হয়। অনাথ ছাত্রদের জন্য গুলবার্গ, ি ার, দৌলতাবাদ, দাবুল প্রভৃতি স্থানে বহু ইস্কুল খোলা হয়। বাহ্‌মনীরাজ্যে ফিরোজশাহ বাহমনীর সময়ে উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, জ্যামিতি প্রভৃতির আলোচনও হ'ত। আর আছেন মাহমুদ-গাওয়ান। গদ্য-পদ্য আর অঙ্কে ইনি নিজে ছিলেন পারদর্শী। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যে অনেক ইস্কুলই প্রতিষ্ঠিত হল। বিদর নগরীতে যে-মাদ্রাসা তৈরী করেছিলেন সারা ভারতে তার তুলনা মেলা ভার। ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ৩০০০ পুস্তক-সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার ছিল এই কলেজে।

এমনি ক'রে বিজাপুরে, আহম্মদনগরে, গোলকুণ্ডায়, মালবাতে হিন্দু ইস্কুলের বদলে ইসলামী ইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্য হিন্দুরীতির শিক্ষার যে অবলুপ্তি ঘটেছিল তা নয়, তবে মুসলমানদের শিক্ষারও সুযোগ হ'ল। গোলকুণ্ডাতে প্রাথমিক ইস্কুলের প্রবর্তন হয়। ছাত্রেরা কাঠের আসনে বা মেঝেতে আসন গেড়ে বসত। চীন থেকে আমদানী কাগজে

তারা লেখা অভ্যাস করত বলে পর্যটকেরা বলে গেছেন (Promotion of Learning··· , N. Law, Page 96)।

মালবাতে গিয়াসুদ্দীনের আমলে দেখা যায়, হারেমের মহিলাদের শিক্ষার জন্য শিক্ষিকা নিযুক্ত করা হচ্ছে (১৪৬৯ খৃঃ—১৫০০ খৃষ্টাব্দ)।

এইসব ইস্কুল-কলেজ সুলতানদের মর্জির উপর নির্ভর করত। সেকান্দার লোদীর সময়ে যা দেখেছি জৌনপুরে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ নবাব সাদাৎখান নিশাপুরীর বেলাতেও তাই দেখেছি। যেহেতু তিনি মাদ্রাসায় গিয়ে পছন্দ মতো অভ্যর্থনা পান নি সেই হেতু ছাত্র ও শিক্ষকদের জায়গীর এবং অন্যান্য বৃত্তি বন্ধ করে দিলেন। অর্থাৎ ইস্কুল কলেজ একেবারে সুলতানদের কুক্ষিগত।

এই সব নগর দিল্লী সমেত বোখারা সামারকান্দ নিশাপুর বোগদাদ কায়রোর সমকক্ষ বলে যতই প্রচার করা হোক, বাবর কিন্তু হিন্দুস্থানে কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে বলে স্বীকারই করেন নি। এর কারণও আছে। বাবর এমন এক স্থানে প্রতিপালিত যেখানে কাব্য সাহিত্য এবং ইস্কুল মাদ্রাসার খ্যাতি এশিয়া-আফ্রিকা স্পেনের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ছিল। চিঙ্গিসখান এবং হলাগুর আক্রমণে যা বিনষ্ট হয়েছিল তৈমুরলঙ আবার তার ক্ষতিপূরণ করে দিলেন। কাজেই বাবরের চোখে ভারতের মাদ্রাসা বিশেষ শ্রদ্ধা জাগাতে পারে নি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান শ্রদ্ধা তখনই জাগাতে পারে, তার অভাব তখনই অনুভূত হয় যখন সমগ্র জনসাধারণ না হোক অন্তত কিছু সংখ্যক লোক সেই শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয়। পাঠান আমলে অনেক কারণে তা সম্ভব হয় নি, তার কিছু কিছু পূর্বে বলেছি। মসনদী-শিক্ষা আর মাদ্রাসার-শিক্ষা যদি এক হয়ে যেতে পারত, যদি অন্তত সমগ্র মুসলমান সমাজও এই শিক্ষা গ্রহণ করত, তবু বাবর হয়ত এই মাদ্রাসাকে গণনার মধ্যে আনতে পারতেন।

মুঘল আমলে শিল্প, স্থাপত্য এবং সঙ্গীতে সুলতানদের নজর গেল। গ্রন্থের মধ্যে জীবনস্মৃতি এবং ইতিহাস প্রাধান্য পেল। তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে তিক্তভাব সৃষ্টি হয়েছিল ধর্ম নিয়ে, তা অনেকটা কমে গেল নানা প্রকার ইসলামী দর্শন এবং সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়ায়। হিন্দুর দেব-দেবালয় নষ্ট ক'রে মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ করবার বেপরোয়া ঝোঁক আর নেই। বিদেশী হিসাবে মুসলমানেরা আর পরিগণিত হ'ত না। ধন-রত্ন লুট ক'রে সৈন্য পোষণ করবার দিনও চলে গেছে। রাজনৈতিক ব্যাপারে

খুব বড অভিযাত্রী আর সৃষ্টি হয় নি। সময় তখন এসেছে দেশের লোকদের আস্থাভাজন হয়ে বিদ্রোহ করা। কাজেই মুঘল সম্রাটেরা প্রশাসনিক কাজে নিজেদের বেশি নিয়োগ করলেন।

হুমায়ুন শিক্ষিত সমাজের মর্যাদা স্থির করে দিলেন। সম্ভ্রান্তদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী হ'ল—আহলি সাদত অর্থাৎ পণ্ডিতব্যক্তি, আহলি দৌলত বা ধনিক শ্রেণী, আর আহলি মুরাদ অর্থাৎ গুণী। তাঁদেব সঙ্গে বিশেষ বিশেষ দিনে হুমায়ুন সভা করতেন। হুমায়ুন নিজে গ্রন্থপ্রিয় ছিলেন। তিনি দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা নির্মাণ করলেন।

শেরশাহ খাঁটি ভারতবাসী। তিনি পারসী সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন। হিসার আর জয়পুরের কাছে নারনাউলে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করলেন (১৫২০ খৃষ্টাব্দ)।

আকবরের আমলেই দেখা গেল ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে। তাঁর সময়ে নানা সম্প্রদায নানা দর্শন যেন একটি স্রোতে মিলতে চাইল। সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হতে থাকল পারসী ভাষায় সেই কথাই বড নয়, তিনি যেন প্রত্যক্ষ ভাবে ইসলাম আর হিন্দু শিক্ষাকে মিলিয়ে খাঁটি ভারতীয় শিক্ষা করে তুলতে চাইলেন। ইস্কুল-কলেজের শিক্ষার অঙ্গীভূত হল (১) হাতের লেখা (২) সাহিত্য রচনা বা রচনাশক্তির বিকাশ।

আকবর হিন্দু এবং মুসলমান দুই ধর্মের ছাত্রদেরই একই ইস্কুলে পডবার সুযোগ দিলেন। নতুন ইস্কুলের পক্ষেও এ যেমন আশাপ্রদ হ'ল, ভারতের নতুন জাতি গঠনের পক্ষেও এই ব্যবস্থা সহায়ক হল।

ইস্কুলের পাঠরীতি সম্পর্কে আকবরের সময়ে ব্যবস্থা হল, প্রথমে ছেলেরা আরবী বর্ণমালা শিখবে এবং ছেদ চিহ্ন বা কোথায কোথায ছেদ পডবে তা শিখবে। ভাষা শিক্ষায়, বিশেষ ক'রে বিদেশী ভাষা শেখার পক্ষে এই ছেদ এবং ধ্বনি সংযোগ করতে পারা একান্ত আবশ্যক। লিখিত ভাষা কথ্যভাষার ধ্বনিতে এবং প্রতীক লিপি কথার সুরে স্থাপন করতে হলে এই ছেদ জ্ঞান লাভ করা দরকার। তারপর তারা যুক্তবর্ণ শেখে। এক সপ্তাহ পর তারা ছোট ছোট কথা বা রচনা পডতে চেষ্টা করবে। এই সব রচনা নীতিকথার অংশ বিশেষ; এবং নীতিকথায় বেশিবার যে-সব শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলি পুনঃপুনঃ প্রত্যক্ষ করবে। শিক্ষক যে সাহায্য করবেন

না তা নয়, কিন্তু স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হওয়াই এ সময় ছাত্রের কর্তব্য। শিক্ষক চারটি ক'রে অনুশীলনী দিতেন, বর্ণমালা, বর্ণসম্পর্ক, নতুন বর্ণসংযোগ, এবং যা পড়ল তা আবৃত্তি। বিজ্ঞানের মধ্যে ছিল—নীতি, অঙ্ক, হিসাব, কৃষি, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রশাসনিক নিয়ম, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—ইত্যাদি। হিন্দুদের পড়তে হত—ব্যাকরণ, বেদান্ত, পতঞ্জলি।

ফতেহ্‌পুর সিক্রিতে আকবর একটি বৃহৎ মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। এই সময়ে ধনিকশ্রেণী ব্যক্তিগত চেষ্টায়ও মাদ্রাসা বা শিক্ষায়তন নির্মাণ করতে উদ্যোগী হলেন। শিরাজ থেকে অধ্যাপকদের এনে আগ্রার মাদ্রাসায় নিযুক্ত করা হ'তে লাগল। দিল্লীর মাদ্রাসা এখন আর আবাসিক নয়, বাইরে থেকেও এখানে পড়তে পারা যেত। আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সব মাদ্রাসার ছাত্রেরা নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হল, কারণ আকবর তাদের বিশেষ সামাজিক মর্যাদা দিতেন। এ ছাড়া আকবরের ধাত্রী মার (মাহম অনগ) নামেও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোটকথা, আকবর হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করায় ইসলাম সংস্কৃতি ভারতের দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রতিফলিত হ'তে পেরেছিল।

জাহাঙ্গীর একটি নিয়ম করলেন, যখনই কোন ধনী উত্তরাধিকারী না রেখে মারা যেত তখনই তার সম্পত্তি বাদশাহ গ্রহণ করে সেই টাকায় মাদ্রাসা নির্মাণ ক'রে দিতেন। জাহাঙ্গীর ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং পরিত্যক্ত মাদ্রাসা গুলিকে সংস্কার করে পুনরায় চালু করলেন। এই মনোভাব থেকে মনে হয়, বাদশাহের এদিকে একান্ত আগ্রহ ছিল, এবং জনসাধারণের কাছ থেকে শিক্ষার চাহিদা বাড়ছে। পাঠান আমলে কিন্তু এই লক্ষণটি দেখা যায় নি। দেখা যায় নি বলেই বেশীর ভাগ মাদ্রাসা পশু পাখীর বিচরণ ক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল।

শাহ্‌জাহান, মনে হয়, ইস্কুল-কলেজের লেখাপড়ার দিকে একটু উদাসীন ছিলেন। অবশ্য তিনিই দিল্লীতে ইম্পিরিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

কিন্তু রাজনৈতিক সঙ্ঘর্ষে এবং অন্যান্য কারণে ঔরঙ্গজেব হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে পড়েন। তিনি প্রথম যুগের মতো ঢালাও নির্দেশ দিলেন, হিন্দুদের দেবালয় এবং ইস্কুল ভূমিসাৎ ক'রে দিতে। তবে তিনি মুসলমানদের জন্য প্রচুর ইস্কুল কলেজ তৈরী করে দিলেন। গুজরাতের বোহরা সম্প্রদায়ের লেখা-

পড়ার জন্য প্রচুর বৃত্তি প্রদান করতেন, এবং তাদের মাসিক পরীক্ষার ফলাফল তাঁকে জানাতে হ'ত। ঔরঙ্গজেবের সময় শিয়ালকোটই ছিল ইসলামিক শিক্ষার কেন্দ্রস্থল। অবশ্য শিয়ালকোটের নাম আকবরের সময়েও শোনা গেছে। চীনের কাগজের পর শিয়ালকোটের কাগজের কদর ছিল বেশী।

সংক্ষেপে এই হচ্ছে ভারতে ইসলামিক শিক্ষার ইতিহাস। আমরা মাদ্রাসার কথা বেশি বলেছি। মক্তব সম্পর্কে একটা কথা বলার দরকার। মক্তব অর্থও শিক্ষালয়। মক্তব ব'লে শিক্ষার একটা অনুষ্ঠান ছিল। হুমায়ুনের বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন তখন এই মক্তব অনুষ্ঠান করা হয়। হিন্দুদের যেমন হাতে-খড়ি, মুসলমানদের তেমনি মক্তব, প্রথম শিক্ষকের হাতে সমর্পণ করা হয়। এই জন্য মনে হয় প্রাথমিক ইস্কুলকেও পরবর্তীকালে মক্তব নামে অভিহিত করা হয়।

ইয়োরোপ আরব-সভ্যতার কাছ থেকে যতখানি পেয়েছে, ভারত হয়ত ততখানি পায়নি। কিন্তু মুসলমান যুগে ভারতবর্ষ বহুকাল পরে এই নতুন শিক্ষার জানালা দিয়ে একবার বহির্ভারতের সংস্কৃতির দিকে নজর দেবার সুযোগ পেল একথা মানতেই হবে। ইসলামিক শিক্ষা হিন্দুর নানা ধরণের ইস্কুল-মন্দির নষ্ট করেছে সত্য, কিন্তু তাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতেই ইংরেজ আমলে নতুন শিক্ষা যখন এল তখন সে সবের দরকার হয় নি। মুসলমান আমলের শিক্ষার প্রভাবেই ভারত প্রত্যক্ষভাবে আরবী, পার্সী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষার সাহচর্যে আসতে পেল। ভারতে আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটল। একদিকে টোল চতুষ্পাঠী, অন্যদিকে প্রাচীন মহাজনী ইস্কুল মহাজনদের আওতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সাধারণের বোধ্যভাষার ইস্কুলে দাঁড়াল। আবার মক্তব মাদ্রাসা ভারতবর্ষের টোল-চতুষ্পাঠী এবং বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝামাঝি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রূপ দেখিয়ে দেয়। গ্রীক-রোমক ভাবের আলোকে সিরিয়া পারস্যে যে-ধরণের নাতিবৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরব-সভ্যতায় এসেছিল, সেই ধারাতেই মক্তব মাদ্রাসা। বাইরের দিক দিয়ে মনে হয়, সেই তো ধর্ম-উপাসনালয়ের ইস্কুল। কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়ে তো তা নয়। বর্তমান কালে আমরা ইস্কুল-কলেজের যে রূপটি দেখতে পাচ্ছি—অনেকটা তাই-ই তো মাদ্রাসা। বিশেষজ্ঞের বক্তৃতাধর্মী পাঠ—আমরা এই মাদ্রাসাতেই

দেখতে পাই। ছোটখাটো পরিসরে যে উচ্চশিক্ষালয় হতে পারে তা বোধ হয় মাদ্রাসাই ভারতে প্রথম প্রমাণ করল। ইস্কুল কলেজের এ এক নতুন রূপ। এই রূপটির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ইংরেজি ইস্কুলের জন্য আমরা তত আগ্রহ প্রকাশ করতে পারতাম না। ঐতিহাসিক ভারতে মক্তব, মাদ্রাসাই প্রথম বাহিরিক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক শক্তি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সাধারণের ইস্কুল প্রতিষ্ঠান।

ইংরেজ আমলে

কোম্পানী চায়নি, ভারতে রাষ্ট্র-পরিচালনায় ইস্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ বিলাতেও রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ব বা উৎসাহ তখন আসে নি। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তারা এ সব ঝামেলায় জড়াতে চায় না। মিশনারীদের ছিল ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্য, তারা চায় ইস্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে ইংরাজীর মাধ্যম থাকুক। ১৬৫৯ সালের 'কোর্ট-অব-ডাইরেকটারস' এর নির্দেশ (Daspatch) এ বিষয়ে স্পষ্ট ক'রেই বলছে—যে 'গস্‌পেল' বা খৃষ্টধর্মশাস্ত্র প্রচার করা দরকার। ১৬৯৮ এর চার্টারেও সে বিষয়ে আরও স্পষ্ট করা হল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর নির্দেশে পরিষ্কার করেই লিখিত হল যে, নেটিভ্ বা দেশীয় লোকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ করা দরকার; ইংরেজি ভাষার জ্ঞানের মধ্য দিয়ে তা ফলপ্রসূ হবে এবং তাঞ্জোরের ভূতপূর্ব রেসিডেন্ট জন সুলিভান রেভারেণ্ড মিষ্টার সোয়ার্জ (Rev. Mr. Swartz) এর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করছেন বলে পরিচালকেরা খুসী হয়েছেন ইত্যাদি (The utility and importance of establishing a free and direct communication with the Natives, having been sensibly experienced during the late war in India, and their acquiring a knowledge of the English language being the most effectual means of accomplishing this desirable object···)। ব্যবসায়ী হয়েও কোর্ট অব ডিরেকটর্স এ সব পছন্দ করে কেন? না, দেশীয় লোক ইংরেজ জাতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতে শিখুক, এবং ইংরেজ জাতি যে মানুষের অধিকার এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেয় তা বুঝতে শিখুক (to enlighten the minds of the Natives and to impress them with sentiments of esteem and respect for the British nation, by making them acquainted with the leading features of our Government so favourable to the rights and happiness of mankind.)। কিন্তু স্বদেশে কোম্পানীর সঙ্গে মিশনারীদের বিবাদের জন্যই হোক আর দেশীলোকের খৃষ্টধর্মের প্রতি বিরূপতার

জন্যই হোক, চাকা ঘুরে গেল। ১৮০৮ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কোর্ট অব ডিরেকটার্স মিশনারীদের সংযত করল, তাদের বিরুদ্ধে কোম্পানীর একরকম অভিযান চলল। যে-রাজনৈতিক কারণে ইংরেজীভাষা কোর্ট অব ডিরেকটার্স অনুমোদন করেছিলেন, সেই রাজনৈতিক কারণেই মিশনারীদের কার্যকলাপ বন্ধ করবার কথা উঠল।

১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কোচিন থেকে জেস্যুইট সম্প্রদায়ের যাজকেরা হুগলীতে এসে পূর্বে-স্থাপিত গির্জাতে একটি ইস্কুল এবং হাসপাতাল খুললেন। বাংলা দেশে মিশনারীদের এই ইস্কুলই প্রথম বলে মনে হয় (**Pimenta sent in 1598 two Jesuits named Francisco Fernandes and Domingo de Souza from Cochin and two more in the following year, Melchoir da Fonseca and Andre Boves. They arrived in Hooghly in May of the same year and preached in the bigger Church which was built before their arrival. They erected a School and a hospital, evidently the first one in Bengal—History of the Portuguese in Bengal by J. J. A. Campos, Butterworth and Co Ltd. 1919, Page 101**)। কিন্তু এর অনেক আগে থেকেই পর্তুগীজদের শিক্ষা বাঙালী ছেলেমেয়েরা লাভ করছিল গোয়াতে গিয়ে। জেস্যুইটেরা বাঙলার ছেলেদের যে কেবল ধর্মান্তরিতই করত তা নয়, তারা গোয়ার জেস্যুইট কলেজ স্যান্তা ফে (Santa Fe)-তে পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে নিত। এই স্যান্তা ফে-র নাম পরে হয় সাও পলো (Sao Paulo)। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দের তালিকা থেকে বাঙালী ছাত্রের নাম হিসাবে পাওয়া গেছে ফিলিপ (Filipe), গ্যাসপার ডে ডিউস (Gaspar de Deus) অ্যানটানিও ডো আরমো (Antonio do Ermo) এবং আর দুজন পেড্রো। এইসব ইস্কুলে পর্তুগীজ ভাষাই শেখানো হ'ত বলে মনে হয় (History of the Portuguese in Bengal—Campos; Page 102)। রাণী এলিজাবেথ তখন জন্মগ্রহণ করেন নি, বাবর তখনও ভারতবর্ষে আসেন নি, এই সময় (১৫১৭ খৃষ্টাব্দে) রাজা ম্যানুয়েল (পর্তুগালের রাজা) এর সময়ে ভারতবর্ষে পর্তুগীজরা আসতে সুরু করে। পর্তুগীজ কম্যাণ্ডার সিলভেইরা (Silveira) ভেনিসের নিকোলো কোন্টি নন, যা বোলোনের

ভাদেমার মতো পর্যটক নন, খাঁটি রাজত্ব করবার জন্তই আরাকানে নামলেন (১৫১৭ খৃঃ)। তার আগে ভাস্কো ডা গামা (১৪৯৮ খৃঃ) কালিকটে নেমে প্রচার করলেন, (মতান্তরে পস্তালনিতে নেমেছিলেন) 'আমরা এসেছি ক্রীশ্চান এবং মসলা নিতে।' এঁদের কিন্তু মুসলমান-বিদ্বেষ ছিল প্রচণ্ড রকমের। কাজেই এ দেশে এসে মুসলমান নবাবদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে হিন্দুদের আশ্রয় যে তারা নেবে তা অনুমান করা যায়।

ষোড়শ শতকের প্রথম দিকেই তারা মুর বা মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাত থেকে অস্ত্রবলে ইউরোপ-এশিয়া-আফ্রিকার বাণিজ্য কেড়ে নিল। তিনটি ঘাঁটি এবং বন্দর ১৫১৫ খৃষ্টাব্দের দিকে তারা স্থাপন করল; ভারত-চীন পথে মালক্কা, পারস্যের পথে অরমুজ, আর মালাবারে গোয়া। অরমুজে পর্তুগীজকে খাজনা না দিয়ে কোন ব্যবসায়ীর নিস্তার ছিল না। এর আগে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজদের প্রথম-দুর্গ কোচিনে স্থাপিত হল। কেবল মসলার বাণিজ্য নয়, জাপান থেকে রূপো, চীন থেকে সোনা, সিল্ক এবং কস্তুরী, মোলাক্কাস থেকে লবঙ্গ, সুন্দা থেকে মসলা, সিংহল থেকে দারুচিনি, সোলার থেকে কাঠ, বোর্ণিও থেকে কর্পূর, বাঙলা থেকে মসলিন, পেগু এবং মসলিপতন থেকে হীরা মুক্তো জওহর—প্রভৃতি কত কি।

বাঙলাদেশে চাটগাঁ, সাতগাঁ, হুগলী, ব্যাণ্ডেল (বন্দর), সন্দীপ, কর্ণফুলী তীরের ডিয়াং, ঢাকা, শ্রীপুর, চন্দ্রকোণা, বাকলা, নারিকুল, ভুলুয়া, হিজলী, তমলুক, এবং পিপলি বালেশ্বর (উড়িষ্যায়) তারা উপনিবেশ তৈরী করে ফেলল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলা দেশে এঁদের পরাক্রম দেখা গেল। কিন্তু বাঙালীকে, বাঙলার মুসলমানকে তারা পছন্দ করে নি। বাঙালীকে তারা বলেছে, "মিথ্যাবাদী, শঠ, বিশ্বাসঘাতক, দস্যু এবং যুদ্ধভীরু। কাউকে যদি কোথাও মারতে চাও তবে আগে তার নাম দাও 'বাঙালী' বলে।" পর্তুগীজ-ঐতিহাসিক অনেক বিশ্বাসঘাতকতা পেয়েছে এদেশে এসে হয়ত, বিশেষ ক'রে তাদের জাতীয় যোদ্ধা কার্ভালোকে বিশ্বাসঘাতকতা করে প্রতাপাদিত্য হত্যা করেছিলেন ব'লে তারা মনে করে। কিন্তু এই পর্তুগীজদের সম্পর্কেই ইংরেজ লেখক জনস্টন (Pioneers in India—Johnston) যা বলেছিলেন তার শতাংশও পর্তুগীজেরা বাঙালী সম্পর্কে বলতে পারে নি। অন্ধ জাতীয়তার এই স্বরূপ সর্বযুগেই প্রকাশ পাচ্ছে।

যাইহোক সে ইতিহাস থাক। আমাদের শুধু জানবার দরকার,

পর্তুগীজেরা এদেশী লোকের প্রতি বিদ্বেষ নিয়ে এসেছিল। কালক্রমে দেশ জুড়ে তাদের বিরুদ্ধে সেই বিদ্বেষই বাঙালী এবং ভারতবাসীর মনে জলে উঠল।

কিন্তু যত বিদ্বেষই থাকুক, পর্তুগীজেরা অন্তত বাঙলাদেশে তাদের ভাষা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। সপ্তদশ এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও পর্তুগীজ ভাষা একরকম প্রধান ভাষা হয়ে পড়ল বাংলা দেশে। রাজসভায় চালু ছিল পারসী কিন্তু সাধারণ্যে ছিল পর্তুগীজ। এ ভাষা যে কেবল পর্তুগীজ এবং তাদের বংশধরদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। ইংরেজ ডাচ, ফরাসী প্রভৃতি সমস্ত জাতিই ব্যবসা-বাণিজ্যে এই ভাষাই ব্যবহার করত। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ঘেরা অঞ্চল এবং অন্যত্রও এই ভাষা একমাত্র অবলম্বন। চাকর-বাকরেরাও যে এই ভাষাতেই কথা বলে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে-সনদ দেওয়া হয়, তাতে একথা স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, প্রত্যেক গ্যারিসনে (garrison) এবং কারখানাতে একজন করে সচিব থাকবে (minister) এবং ভারতবর্ষে পৌঁছানোর এক বছরের মধ্যে তাঁকে পর্তুগীজ ভাষা শিখেই নিতে হবে (The Charter granted to the East India Company, at the beginning of the 18th Century, contained a provision that they should maintain one Minister at each of their garrisons and superior factories and that he should be bound to acquire the Portuguese language within a twelve-month of reaching India—History of the Portuguese in Bengal—Campos, Page 205)। ক্লাইভকেও দেখা গেছে তিনি কোন আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেও জানতেন না। কিন্তু পর্তুগীজ ভাষা অনর্গল বলতে পারতেন। প্রথম যে তিনটি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ ছাপানো হয় (রোমক হরফে) তাও লিসবনে পর্তুগীজ কর্তৃক মুদ্রিত হয় (১৭৪৩ খৃঃ)।

অন্যান্য দেশের বণিকেরা পর্তুগীজদের একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। পর্তুগীজরা রোমান ক্যাথলিক, তা ছাড়া তাদের ছিল সাম্রাজ্য গড়বার বাসনা। উপরন্তু তারা ভারতে বড় অপ্রিয় হয়ে উঠল। এই অবস্থায় পর্তুগীজ প্রভাব খর্ব করা একান্ত দরকার। দেশীয় নৃপতিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তারা অন্য ব্যবসায়ীদের উৎপীড়ন করত। ইংরেজ কোম্পানী এদেশে

পাত্তা না পেয়ে পারসী-তুর্কীদের সঙ্গে মিশে হরমুজে কর্তৃত্ব আনল। ইংরেজ প্রভাবের এইই হচ্ছে প্রথম পথ। প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইয়োরোপের লোক ইংরেজী ভাষাকে আশ্রয় করল। অবশ্য এ বিষয়ে একেবারে বিরুদ্ধতা যে না ছিল তা নয়। কিন্তু ডেনমার্ক এ বিষয়ে ইংরেজের সুযোগ এনে দিল। অষ্টাদশ শতকের শেষে প্রোটেস্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় ডেনমার্কের রাজার সহায়তায় ইংরেজিভাষাকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম ব'লে স্বীকার করে নিল। আব ইংরেজ সম্প্রদায় ডেনমার্কের মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে শুধু কেন, শিক্ষাদীক্ষায়ও অধিকার দিল। (The Danish intervention in the affairs of India produced one remarkable effect—the introduction of Protestant Christian missionaries in the latter part of the eighteenth Century, missionaries who used the English language as their vehicle of instruction. This action on the part of the King of Denmark led to the East India Company being obliged to recogonise the lawfulness not only of teaching Christianity, but of spreading a European Education amongst the natives; and this in its turn has gradually changed the whole political future of India—Pioneers in India by Johnston; Blackie & Son Limited, London & Glasgow. Page 249 foot note)।

কিন্তু কি ক'বে এই ইংবেজের সঙ্গে ডেনমার্কের মিলন ঘটল? সে এক বিচিত্র ইতিহাস।

১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় উইলিয়ামেব রাজত্বকালে ধর্মীয় মত ও শিক্ষাদীক্ষা প্রচারের জন্য একটি সমিতি বিধিবদ্ধ হল, নাম সোসাইটী ফর প্রোমোটিং ক্রিশ্চিয়ান ন'লেজ (Society for Promoting Christian Knowledge)। এই সমিতি আধা-মিশনারীর কাজ গ্রহণ করল। আর মিশনারী কাজের জন্য এঁরাই ১৭০১ খৃষ্টাব্দে Society for Propagating of the Gospel in Foreign parts প্রতিষ্ঠা করলেন। দুটি সমিতি মিলেমিশে কাজ করত। প্রথম সমিতি দ্বিতীয় সমিতিকে পুথিপুস্তক দিত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার টাকা পয়সাও দিত। প্রথম প্রথম এরা অবৈতনিক (Charity) ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে এই ব্যাপারে তারা ছাপাখানাও

খয়রাতী করল। কেবল ছাপাখানা কেন, লেখাপড়ার যাবতীয় সরঞ্জাম (কাগজপত্র ও)। এই সমিতির উদারতায় মিশনারীদের আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে জিগেনবলগ (Ziegenbalg) এই ব্যাপারে ইয়োরোপে গিয়ে ডেনমার্কের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন; তারপর ইংলণ্ডে এসে প্রথম জর্জের সঙ্গে। সমিতির কর্তৃপক্ষেরা জিগেনবলগকে লুফে নিল। জিগেনবলগ অনেক কিছু প্রাপ্তির স্বীকৃতি নিয়ে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে নামলেন। এখানে তাঁর সহকর্মী স্টিভেনসনের সহায়তায় মাদ্রাজ এবং কুড্ডালোর দুটি যায়গায় ইস্কুল খুললেন। কিন্তু জিগেনবলগের অকালমৃত্যুতে (৩৬ বৎসর বয়সে, ১৭১৯ খৃঃ) এবং স্টিভেনসনের দেশ-প্রত্যাবর্তনে ইস্কুল দুটি বন্ধ হয়ে গেল। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে সমিতির আস্থাভাজন হয়ে স্যুলজ্‌ (Schultze) মাদ্রাজে এসে তামিলপল্লীতে একটি বাড়ী করলেন (১৭২৮ খৃঃ)। তারপর স্যুলজের প্রভাবে মাদ্রাজের অন্যত্রও ইস্কুল খোলা হ'ল। মাদ্রাজের ইস্কুলে থাকলেন স্যুলজ আর কুড্ডালোরে 'গেলেন আর দুজন মিশনারী, সার্টোরিয়াস আব গেইসটার। (Sartorius and Geister)। একবছরে সমিতি খরচ কবল ৩,২০০ পাউণ্ড। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা মাদ্রাজে গোলা ছুঁড়ে অনেক অঞ্চল নষ্ট কবে। এই সময়ে দেখা গেল, চার্চ বারুদ রাখবাব জায়গায় পরিণত হয। সেই নালন্দা বিক্রমশীলার কথা। দোষ কেবল বৌদ্ধদের নয়, সমগ্র মানব জাতিরই; বৌদ্ধদের দোষ, কারণ তারা হেরে গিয়েছিল। এরপর ডুপ্লে মনে ভাবলেন, ইংরেজরা আর ফিবে আসবেনা। আর্মেনিয়ান রোমক চার্চকে হুকুম দিলেন ভিপেরীতে চার্চ এবং মিশনারী কাজ স্থরু করতে। ফরাসীদেব যুদ্ধে ইংরেজের সঙ্গে সমস্ত দেশের মিশনারীবাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ইংরেজেরা ফিরে এলে আর্মেনিয়ানদের উপর অত্যাচার স্থরু হল, তাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ল। ভেপারীর যায়গা-জমি চার্চ ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে প্রোটেস্ট্যাণ্টদের হাতে তুলে দেওয়া হ'ল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে আবার লালী এলেন। এই ডামাডোলে না-থেকে এবার মিশনারীরা অন্যত্র পালিয়ে গেলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে 'অল কোয়ায়েট' অবস্থায় তাঁরা আবার মাদ্রাজে ফিরে এসে ছাপাখানা বসিয়ে জেঁকে বসলেন। এরই মধ্যে ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দে গোইস্টারের প্রভাবে ইংরেজীভাষা মিশনারীদের ভাষা হিসাবে পরিগণিত হয়ে গেল। কাজেই অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উভয় কারণেই ইংরেজিভাষা অন্যান্য মিশনারীরা

মেনে নিতে বাধ্য হল। মাদ্রাজই এই ভাষার স্বীকৃতির উৎস ক্ষেত্র ব'লে মনে করা যায় এবং ডেনিসেরাই এ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে পড়লেন প্রথম। সাময়িক সমস্যা সমাধানের জন্যই যে শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষা-নীতি গ্রহণ এবং বর্জন ঘটে সেই কথা মনে রেখেই পরবর্তীকালের মিশনারীদের মনোবৃত্তির আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

মিশনারীদের শিক্ষা-প্রবর্তন ভারতে সমগ্র অঞ্চলে ঘটলেও মাদ্রাজেই তার ব্যাপকতা বলে মাদ্রাজের কথাই আমরা বিশেষ ক'রে আলোচনা করছি।

মাদ্রাজে কয়েকটি সম্প্রদায় কাজ করছে—(১) ডেনিস মিশন, (২) সমিতি, (৩) ১৮০৫ থেকে লণ্ডন মিশনারী, (৪) সিংহল প্রত্যাগত ওয়েসলিয়ান মিশনারী (Wesleyan Missionary Society) (৫), এবং স্কটিশ মিশন ১৮৩৭ থেকে। ডেনিস মিশন ১৭১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে কাজ সুরু করে। কুড্ডালোরে তারা ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে দেশীয় লোকের জন্য ইস্কুল খোলে। একেই মনে করা হয়, মাদ্রাজের এ্যাঙ্গলো-ভার্ণাকুলার ইস্কুল ব্যবস্থার সূত্রপাত। কিন্তু মালাবারের এই দেশীয় ইস্কুল ১৭৩২ থেকেই বন্ধ হতে চলল, কারণ খৃষ্টধর্মের প্রচণ্ড আলোক বোধ হয় দেশবাসী সহ্য করতে পারেনি। স্যুলজে এসে নতুন উৎসাহে শিক্ষায ধর্মের মধ্যপথ অবলম্বন ক'রে ইস্কুলটি আবার খুললেন। উৎসাহী খৃষ্ট-যাজকেব অগ্নিগভ খৃষ্ট আলোক যে দেশীয় লোক সহ্য করবে না তার প্রমাণ থেকে গেল।

সমিতির কাজ ১৭৬১ থেকে শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেখা গেল ফেরঙ্গদের শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের ইস্কুল অনেক এগিয়ে গেছে। সমিতি নিজদেব কাযপদ্ধতি ঢেলে সাজতে থাকেন। সৈনিকদের অনাথ শিশুর শিক্ষার জন্যই যে প্রভুত অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এখানকার মিলিটারী মেল অর্ফান এসাইলাম (military male orphan Asylum)-এর অধ্যক্ষ হয়ে এলেন ডঃ বেল। এই ডক্টর বেলই মাদ্রাজের শিক্ষাপদ্ধতিকে জগতের সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টেনে আনলেন। তিনি বেতন নিতেন না। উৎসাহী। সর্দার-পোড়ো প্রথা প্রবর্তন ক'রে শিক্ষকের খাতের ব্যয় কমিয়ে দিলেন। এরপর তাঞ্জোরের রেসিডেণ্ট স্থলিভান সোয়ার্জকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদের সহায়তায় ইংরেজি ইস্কুল খুললেন। তাঞ্জোরে ইস্কুল শিক্ষকদের জন্য একটি 'সেমিনার' খোলা

হল। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রদেশের ইস্কুলগুলোতে নিযুক্ত হলেন। মনে হয় তাঞ্জোরের সেমিনারীই (১৭৯০ খৃষ্টাব্দের দিক) ইংরেজি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ের অঙ্কুর। রামনাদের রাজা গদগদ ভাষায় এই ইস্কুলকে প্রশংসা করলেন, শপথ নিলেন 'ইস্কুল' প্রতিষ্ঠা করতে।

শিবগঙ্গার রাজাও তাই। আর্কোটের নবাবই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন। এমনি ক'রে দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু। ইংরেজ শিক্ষকই বেশি নিযুক্ত হত। তামিল ইস্কুলের জন্য হয়ত দেশী মাস্টারও থাকতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দী পড়তে-পড়তেই ইংরেজ ইস্কুলের ঘটে স্থাপিত আম্রপল্লবটি যেন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে মহীরূহে পরিণত হল। কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দ থেকে মিশনারীদের আর্থিক অনটন ঘটে। তাই ১৮১৫তে এই কায-ব্যবস্থাপকদের সম্পর্কে কিছু পরিবর্তন ঘটাতে হয়। 'নেটিভ এডুকেশন ফাণ্ড' স্থাপিত হ'ল, বই পত্তর প্রাথমিক ইস্কুলে দেওয়া হ'ল। কিন্তু সমিতির নিয়ম অনুযায়ী খৃষ্টধর্ম শাস্ত্র কেন্দ্রিক হয়ে উঠল ইস্কুলের পড়ানো। কারণ গসপেল সোসাইটী অপর সমিতির কাছ থেকে শিক্ষা কায ছাড়িয়ে নিল (১৮২৫ খৃষ্টাব্দে)।

লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী শ্রীরামপুরের কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়ে মাদ্রাজেও শিক্ষাকায সুরু করল ১৮০৫ থেকে। কিন্তু তাদের বিখ্যাত আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের ইস্কুলটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বন্ধ হয়ে গেল।

ওয়েসলিয়ান মিশনারী সোসাইটী সিংহল এবং তামিলপ্রদেশে একযোগে কাজ সুরু করল ১৮১৯ থেকে। বর্তমানে রাযাপেত্ত কলেজটি তাদেরই ইস্কুলের পরিণতি।

স্কটিশ মিশন ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে সেন্ট এণ্ড্রুজ ইস্কুল খুলল। এর আগে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ডাফ সাহেব কলকাতা ইস্কুল খুলেছেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে রেভারেণ্ড এণ্ডার্সন কলকাতা ডাফ ইস্কুলে এসে তার শিক্ষাপদ্ধতি দেখে গেলেন। কলকাতার ডাফ ইস্কুল তখন খ্যাতির শীর্ষে। এণ্ডার্সন ১৮৩৭ এ মাদ্রাজে এসে ডাফের অনুপ্রেরণায় এণ্ড্রুজ ইস্কুলকে ঢেলে সাজতে সুরু করলেন। নেলোরের ডাক্তার ফ্রেডারিক কুপার এর আগে তেলেগু আর ইংরেজি পড়ানোর জন্য নেলোরে ইস্কুল খুলেছেন। এণ্ডার্সন ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীভেরামে মাদ্রাজের শাখা-ইস্কুল খুললেন। এ দিকে নেলোরের শিক্ষাদর্শ স্কটিশ মিশনকে চিন্তিত করল। এই ভাবে স্কটিশ মিশন থেকে মুক্ত

:হয়ে এঁরা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে 'ফ্রি চার্চ' খুলে এই দেশী শিক্ষার জন্য কিছু কিছু প্রতিকার করতে সুরু করলেন।

মাদ্রাজে ইংরাজি শিক্ষার আর একটি ধারা এল পাচাইয়াপ্পার অর্থ-সম্পদ থেকে। ভদ্রলোক জাতিতে হিন্দু এবং বিত্তশালী। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁর সম্পত্তির এক দানপত্র করে দেন এই মর্মে, ধর্ম-সংক্রান্ত সৎকার্যে ব্যয় করা হবে এই টাকা। অনেকদিন টাকাটি পড়ে থাকে, পরে এ্যাডভোকেট জেনারেল স্যার হার্বার্ট ক্যাম্পটন এর সদ্গতি করতে বদ্ধপরিকর হন। এমনি ক'রে একটি হিন্দু ট্রাস্টি তৈরী করে শিক্ষা কার্যে ব্যয় করবার জন্য স্থির করা হ'ল। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হল দাতারই নামে। এই ইস্কুলে দরিদ্র মাদ্রাজবাসী পড়তে পারবে; প্রাথমিক ইস্কুল; পড়বে ইংরেজি সাহিত্য, বিজ্ঞান, তামিল এবং তেলেগু। এই ইস্কুলের আদর্শ নানা কারণে জনপ্রিয় হ'ল। প্রধান কারণ, তখন মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ বিদ্যালয়টি নিতান্ত শিশু, কিন্তু 'হাঁ-টি ইংরেজির।' বেশ ভালো ইংরেজি না জানলে এখানে ভর্তি হওয়া যেত না। দরিদ্রদের ইংরেজি পড়বার মতো আর কোন প্রাথমিক (ইংরেজি ভাষার) ইস্কুল নেই। কাজেই ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে তামিল তেলেগু সম্প্রদায় এই ইস্কুলকে সাদরে গ্রহণ করল। তা ছাড়া এ তো অবৈতনিক ইস্কুল। অবৈতনিক এবং জনপ্রিয় বলে এত ভীড় বাড়তে লাগল যে অতঃপর এখানে কিছু বেতনের ব্যবস্থা করা হল। এই সাফল্যে কাঞ্চীভেরামেও একটি শাখা-ইস্কুল খোলা হল (১৮৪৬)। পাচাইয়াপ্পার দৃষ্টান্তে এই ট্রাস্টীর হাতে ১৮৮৬ এর দিকে আরও অনেক দাতা টাকা ঢাললেন। পরবর্তীকালে দেখা যায় (১৮৮৬তে) এঁদের তত্ত্বাবধানের ইস্কুলে বাণিজ্যবিষয়ও পড়ানো হচ্ছে।

মিশনারীদের ইস্কুলের সঙ্গে সঙ্গে পাচাইয়াপ্পার ইস্কুল এই জন্যই লক্ষ্য করা দরকার যে, দেশে ইংরেজি শিক্ষাও যেমন চাই, মাতৃভাষায়ও চাই এই ভাবটি এসে পড়ছে। ইংরেজি ইস্কুল যে নিজের কক্ষপথ থেকে কেমন ক'রে বড় পথ ধরছে, দেশে বাণিজ্য-বিষয় (শর্ট হ্যাণ্ড, প্রভৃতি) যে কেমন ক'রে মধ্যবিত্তের কামনার বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই কথাই বলে মাদ্রাজের ইতিহাস।

মিশনারীদের ইস্কুলের চেহারা ও চরিত্র একই প্রকার। মাদ্রাজে, বাঙলাতে, বোম্বাই প্রদেশে, পাঞ্জাবে। মাদ্রাজে সেণ্ট মেরীর চ্যারিটি ইস্কুল দিয়ে সুরু হ'ল (১৭১৫) বোম্বাইতে সুরু হল ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে রিচার্ড

কোব-এর (Richard Cobbe) চ্যারিটি ইস্কুল নিয়ে, ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে কলকাতা সুরু হ'ল পি. সি. কে সমিতি কর্তৃক (Society for the Promotion of Christian Knowledge)। অবশ্য এর ভেতর থেকে আমরা পর্তুগীজ যুগকে বাদ দিয়ে ধরছি। উদ্দেশ্য ছিল, ফিরিঙ্গির ছেলেমেয়েদের ভেতর এবং সৈনিকদের অনাথ শিশুদের ভেতর ধর্ম প্রচার করা। উনবিংশ শতাব্দীতে বৃত্ত একটু বড় হ'ল—এল দেশীয় ছেলেমেয়ে। এই বৃত্তটি আরও বড় ক'রে দিল পাচাইয়াপ্পার ইস্কুল, এবং কলকাতার হিন্দু বিদ্যালয় (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে)। পাঞ্জাবের সিমলায় কোট-গড ইস্কুল চার্চ মিসনারী সোসাইটীর তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হয় ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে, এটিকে প্রাথমিক ইস্কুল বলা যায়। তারপর আমেরিকান মিসন্ জলন্ধরে উচ্চ বিদ্যালয় খুলল ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে। পরের বছর এরাই লাহোরেও একটি ইস্কুল খুলল। পাঞ্জাবে এত পর মিশনারীদের কাজ সুরু হওয়ার কারণ—ইংরেজ এই প্রদেশকে শাসনভুক্ত করেন ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে। তৎপূর্বে পাঞ্জাব ইংরেজের শাসনভুক্ত না হলেও প্রভাবে ছিল।

কিন্তু খৃষ্টান আর মধ্যবিত্ত সমাজ ভারতীয় সমাজের কতটুকুই বা। সমাজের অন্যঅংশ গতিহীন ছিল? প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা (Indigenous Schools) গতিহীন হয়ে পড়েছিল—এই কথাই শিক্ষাবিদেরা বলেন। আমরা নিজদের মতামত জানাবার আগে সেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সন্ধানই একটু নিই। বলা বাহুল্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত এই প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থাই ভারতের অগণিত জনসমাজকে চালিত ক'রে রেখেছিল। হয়ত এ সব ইস্কুল প্রখর নয়, কিন্তু মুখর বটেই।

স্যর টমাস মুনরো ইংল্যণ্ডের প্রভুদের মত যথা 'এ দেশবাসী অজ্ঞ, এই এই অজ্ঞদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করা দরকার' প্রভৃতি কথায় অসহিষ্ণু হয়ে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে একটি বিবরণী (minute) লিখেন এই মর্মে যে, দেশবাসীদের মধ্যে কত ইস্কুল আছে, কি তার পড়ানোর নীতি প্রভৃতির অনুসন্ধান করা হোক। কোর্ট অব ডিরেক্টার্স এই বিবরণী গ্রহণ করায় অনুসন্ধান কাজ সুরু হ'ল। এস, সত্থিয়ানাধান সেই সন্ধানের কথা তাঁর পুস্তকে যা বলেছেন (History of Education in the Madras Presidency—S. Satthianadhan, publishers—Madras, Srinivasa Varadachari & Co, 1894 Pages 2—10) তার সারমর্ম থেকে জানা যায়:

কলেজ প্রভৃতি বাদ দিলে প্রায় সাড়ে দশ হাজারের মতো ইস্কুল প্রদেশে ছিল। আমরা সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করব না। আমাদের আলোচনার বিষয় কি ধরণের ইস্কুল, আর কি ধরণের পাঠ্যরীতি।

এই ইস্কুলকে বলা হল বৈদিক পাঠশালা। পূর্বে এই পাঠশালা প্রত্যেক মণ্ডপের (উপাসনা কেন্দ্রের) অঙ্গ ছিল। এই সব ইস্কুল সরকার কর্তৃক পরিচালিত নয়, কোন বৃত্তিও পায় না। ছাত্রদের অভিভাবকেরাই এর পৃষ্ঠ-পোষণা করত। প্রাচীন জমিদারদের বৃত্তি বা জায়গীরে এই পাঠশালায় ব্রাহ্মণেরাই শিক্ষা দিতেন। বেতন ছিল—এক আনা থেকে চার টাকা মাসিক, ছাত্র পিছু। দরিদ্রেরা সাধারণত চার আনা থেকে আট আনায় বেতনে ভর্তি হ'ত। হিসাব ক'রে দেখা গেছে, শিক্ষকেরা মাসে একুনে ছ সাত টাকা পেতেন। এই সব ইস্কুলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র এবং মুসলমানেরা পড়ত (Satthianadhan—Page 3)। লেখাপড়ায় ব্রাহ্মণ সন্তানের আনু-পাতিক সংখ্যা বেশি।

বেলারীর কালেক্টর ক্যাম্পবেল জানাচ্ছেন, পাঠ্যপুস্তক তেলেগু এবং কান্নাডী ভাষার কবিতায়। আবার এই ভাষা দুটি প্রচলিত বা বোধ্য ভাষার স্তরের নয়। দুটি ভাষার বর্ণমালাই এক বটে, কিন্তু এক ভাষাভাষী অন্য ভাষা পড়তে পারলেও বুঝতে পারে না। অসুবিধা আর একটি। কবিতার ভাষা তারা পড়ছে, কিন্তু সাধারণ কাজ-কারবার গদ্যে এবং বৈষয়িক পরিভাষায়। কাজেই তারা কেবল অক্ষর (syllables) উচ্চারণ করাই শিখত, অর্থবোধ জন্মাত না। স্মৃতি একমাত্র অবলম্বন, আর কিছু নয়। এই কারণে তারা নতুন জ্ঞান আহরণ করতে অক্ষম, চরিত্রের উপর শিক্ষার প্রভাবও হয় না। সথিয়ানাধান ক্যাম্পবেলের এই উক্তি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এতটাই সত্য কিনা তা সেই জনসাধারণের অন্তর-দেবতাই বলতে পারেন। বাইরের দেখা আর বিশ্লেষণ সব ঠিক না-ও হতে পারে।

নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি বিশ্লেষণ শক্তি জন্মায়. একটি বিমূর্তকে মূর্ত ক'রে তোলে। ব্যক্তিক দৃষ্টিই বলতে পারে উপলব্ধির কথা, সেই দৃষ্টিই বিচার করবে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী কতটা সত্য। আমাদের এ সন্দেহ আছে এই কারণে যে, উপাসক হিসাবে হিন্দুদের যে-অর্থে পৌত্তলিক বলা হয় সেই অর্থে আদিবাসীদেরও বলা হয়। কথাটা আমরা মেনে নিতে পারি নি। স্মৃতি বিষয়ে মনোবৈজ্ঞানিকেরা অন্তর্দর্শনের উপর জোর দিতে বাধ্য হয়েছেন,

বাইরের ব্যবহার (আচরণবাদীদের) সম্পূর্ণ জ্ঞান দিতে পারে নি। তেমনি আমরাও নতুন শিক্ষার আলোকে পুরাতন শিক্ষার অন্তর্দৃষ্টি জন্মানোর ক্ষমতা আছে কিনা বিচার করতে বোধ হয় অক্ষম। তবে আমরা এর উলটো কথাও পেয়েছি। কোর্ট অব ডিরেকটার্স-এর ১৮১৩ সালের নির্দেশ পত্রে (Despatch) স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে, হিন্দুদের এই শ্রদ্ধেয় এবং হিতকর ইস্কুল এত বিপ্লবের উত্থান পতন সহ্য ক'রে টিকে আছে; এই বিদ্যালয় থেকে দেশবাসী লেখক হিসাবে এবং গণিতক বিদ্যায় সাধারণ জ্ঞান এবং বুদ্ধি অর্জন করে আসছে; এই ইস্কুলের প্রয়োজনীয়তায় আমরা অত্যন্ত বিশ্বাসী—ইত্যাদি (This venerable and benevolent Institution of the Hindoos is represented to have withstood the shock of revolutions, and to its operation is ascribed the general intelligence of the natives as scribes and accountants. We are so strongly persueded of its great utility............Quotation taken from Vernacular Education in Bengal from 1813 to 1912 by H. A. Stark 1916, Page 5)। বাদানুবাদ দীর্ঘ হযে যাবে মনে করে আপাতত এ প্রসঙ্গ এখানেই স্থগিত রাখলাম। শুধু এইমাত্র বলতে পারি, বিদেশী রাষ্ট্র যখন কায়েম হয়ে যায় এবং দেশের লোকের মধ্যে যখন নানা রকম নতুন মর্যাদা-স্তর খোলা পড়ে যায় তখন পক্ষ-বিপক্ষ উভয়ের কথাই বিশেষ বিবেচনা করে গ্রহণ করা উচিত। মানুষ দেবতার চেয়ে কম সত্যবাদী নয় কিন্তু লোভ আর আকাঙ্ক্ষায় তার সৎকার্য এবং সত্য আর শুভ্র থাকে না, নানা বর্ণে রঞ্জিত হ'য়ে পড়ে।

ক্যাম্বেল সাহেবও তাঁর চিঠির উপসংহারে যে কথা কযটি বলেছেন মনে হয় তাও উদ্দেশ্য পূর্ণ। তাঁর চিঠিটি অনেক বড। শেষের দিকে উপরোক্ত কথা বলেছেন। তাঁর আবেদন হচ্ছে, এই সব ইস্কুলের প্রধান ত্রুটিগুলি—পাঠ্য পুস্তকের চরিত্র, পডানো পদ্ধতি এবং সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব। এই তিনটি দিকের খাতেই অর্থ বরাদ্দের কথা আসে। অথচ তাঁর আগের বর্ণনা যা তা পরিষ্কার করে দেয়, পডানোর পদ্ধতি এবং পুস্তক তৎকালের ইয়োরোপের কোন দেশ থেকে অগৌরবের ছিল না। ক্যাম্পবেল সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণা না হয় তার জন্য আমরা বক্তব্যের প্রধান কথা তুলে দিচ্ছি (Selections from Educational Records Part I—H. sharp, 1920, Pages 65-68)।

পাঁচবছর বয়সে হিন্দুদের শিক্ষা সুরু হয়। এই বয়স পড়তেই তাকে যে-ইস্কুলে পাঠানো হবে সেখানকার গুরুকে অভিভাবকের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হয়। সিদ্ধিদাতার সামনে তাঁরা সবাই গোল হয়ে বসলেন আর ছেলেটি তাঁদের ঠিক উলটো দিকে। ধূপ পোড়ানো হ'ল, পূজা করা হ'ল আব ছেলে বারবার সিদ্ধিদাতার নাম উচ্চারণ করতে থাকে। তিনি জ্ঞানের দেবতা। তারপর ছেলেটিকে গুরু চালের উপব দেবতাদেব নাম লিখতে সাহায্য করেন। পরের দিন থেকে তাব পড়াশুনা সুরু হ'বে।

কেউ কেউ পাঁচ বছর কাল পড়ে, দাবিদ্রেব জন্য কাবও বা আগে থেকেই ছাড়িযে নেওয়া হয়। ১৪-১৫ বৎসর বযস পযন্তও বিত্তশালীদেব ছেলেরা ইস্কুলে পড়তে যেত।

ইস্কুলের কাজ সুরু হয় সকাল ৬টায়। যে প্রথমে আসবে তার হাতেব তেলোয় সরস্বতী লিখে সম্মান দেওয়া হয। দ্বিতীয় জনকে শূন্য, অর্থাৎ ভালোও নয় মন্দও নয়। পরবর্তী কালেব ছাত্রদেব কিছু কিছু শাস্তি দেওয়া হয়।

এবা শ্রেণীতে ভাগ হযে গেল। উঁচু ক্লাসেব ছেলেরা নীচু ক্লাসের ছেলেদের পড়াতে থাকে। আব গুরুর নিজেব তত্ত্বাবধানে উঁচু ক্লাসের ছেলেরা। চারটি শ্রেণী ইস্কুলে। শিক্ষক সবার উপবেই তীক্ষ্ণ নজর বাখেন।

ইস্কুলে প্রথম এসে ছাত্র সুরু করে বর্ণমালা আযত্ত ক'রে; এই আয়ত্তি-কাব সম্পন্ন হয়,—মাটিতে বালুকাস্তরের উপব অঙ্গুলি ঘুরিয়ে, কিন্তু বর্ণমালা সে উচ্চারণ করবে না। অঙ্গুলিগুলো আয়ত্তে এলে সে কাগজে বা গাছের পাতায় খাগের কলমে বা লোহার শলাকা দিয়ে আঁচড়ে লিখতে থাকে। একরকমের স্লেট-পেন্সিলও ছিল। স্লেট হচ্ছে কাঠেব তক্তা, ১ফুট পবিমাণ চওড়া আর তিন ফুট লম্বা, তক্তা ভালো ক'রে পালিস করে একটু চাল আর কাঠকয়লা দিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে পলেস্তারা করা হয়। আব এক রকমেব স্লেট কাপড়ের তৈবী, ভাঁজ করা অনেকটা বইয়ের মতো; এই বস্ত্রখণ্ডও কাঠকয়লা আর নানারকম আঠা দিয়ে মাখান। এই দুই রকমের স্লেটের লেখাই ভিজা ন্যাকড়ায় মুছে ফেলা যায়। বুলতপ (?) (bultapa) বলে এক বকমের সাদা পেন্সিল দিয়ে তারা এর উপর লেখে।

বর্ণমালা আয়ত্ত করার পর, যুক্তবর্ণ শেখে, স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মিল

শেখে। তারপর—মানুষের নাম, গ্রামের নাম এবং তারপর কিছু গণিত শেখে। এরপর নামতা। এমনি ক'রে সাধারণ গণিত শিখতে থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের হাতের লেখাও পড়তে শিখতে হয়। শিক্ষকেরা এগুলি নানাভাবে সংগ্রহ করেন। তারপর অনেক কথা-কাহিনী, কবিতা মুখস্থ করতে হয়। উচ্চারণ স্পষ্ট হবে, আবার ঠিক মতো লিখতেও পারবে।

তিনটি পাঠ্যপুস্তক, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত। মহাজনের ছেলেরা এ ছাড়া শিখবে—তাদের সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ যেমন নাগলিঙ্গায়ন, কথা বিশ্বকর্মা, পুরাণ—এই রকম আরও ধর্মগ্রন্থ ছাত্রের সম্প্রদায় ভেদে।

লঘু গল্প ও পাঠ্য, যেমন—পঞ্চতন্ত্র, মহাস্তরুঙ্গিনী। ব্যাকরণের মধ্যে নিঘণ্টু, উমব, সুব্দমুমবুবী, দর্পণ, ব্যাকবণ, অন্নদীপিকা ইত্যাদি অভিধান। এই পুস্তকগুলি হয়ত সব সময় পাওয়া যেত না। কিংবা পাণ্ডুলিপির মূল্যও বেশি, অথবা পাণ্ডুলিপি ভুলে ভরা।

মোটামুটি এই হচ্ছে ক্যাম্পবেল সাহেবের বর্ণনা। এই বর্ণনায় শিক্ষকের পদ্ধতিতে, শিক্ষকের যোগ্যতায় খুব একটা অপরাধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটি অপবাধ এই হতে পারে যে, ইয়োরোপেব মতো এখানকার ছাত্রদের লিপি শিক্ষাব সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি যোগ করতে দেওয়া হ'ত না। কিন্তু বর্ণেব সঙ্গে ধ্বনি উচ্চারণ কেন করতে হবে, আব না কবলে ক্ষতি হয় কিনা তাতো স্পষ্ট ক'বে কোন মনোবৈজ্ঞানিক বলেন নি। লিপি শেখানে আর লিপিকে ভাষায় কপান্তরিত করা নিশ্চয়ই এক কথা নয। আর একটি অপরাধ, ধর্মেব সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ধর্মবিবর্জিত শিক্ষাই কি নিরপেক্ষতা? নাকি, সম্প্রদায় বিশেষে ধর্মগ্রন্থ বাছাই করা সুস্থ শিক্ষা! কোর্ট অব ডিরেকটার্স বা আরও হর্তা কর্তারা নৈতিক চরিত্র উন্নতিব জন্য ইংরেজি শিক্ষার কথা বারবার বলেছেন, কিন্তু সেই নৈতিক চরিত্র কি আকাশ থেকে পডবে, জাহাজে ক'রে আসবে না বর্তমান সমাজ থেকেই আহৃত হবে। সমাজ থেকেই যদি আহৃত হয়, তবে সম্প্রদায় নির্বিশেষে ধর্মপুস্তক অধ্যয়ন একান্ত কর্তব্য। আর একটা ধুয়া উঠেছিল, বিজ্ঞান পডাতে হবে। বিজ্ঞান কাকে বলে? ১৮১৪ সালে কোর্ট অব ডিরেকটার্স বলল, বিজ্ঞান অর্থ প্রাচ্য-বিজ্ঞান অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় যে ধর্মসূত্র আছে, উদ্ভিদ সম্পর্কে জ্ঞান প্রভৃতি। অর্থাৎ ইয়োরোপের ব্যবসায় এবং কারিগরিতে যাতে হাত না পড়ে তার জন্য প্রথম থেকে চেষ্টা।

মনে হয়, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে উৎসাহ দিচ্ছেন যে সব ইংরেজ এবং

যাঁরা দিচ্ছেন না তাঁরা একই স্থানে আসন গেড়ে। যাঁরা বলছেন, এই সব ইস্কুলকে উন্নত করতে হবে—তাঁরা একবার অর্থবরাদ্দ মঞ্জুর ক'রে মাতৃভাষা আর ইংরেজি মিশিয়ে ইস্কুল করতে চান। হলও বোধ হয় তাই।

স্যার টমাস মুনরো মাদ্রাজে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে সব পরামর্শ দিলেন তার মধ্যে—(১৮২৬ এর পত্র)

(১) সরকারী বিদ্যালয়ে নিয়োগ করবার জন্য যে শিক্ষক নেওয়া হবে, তাদের শিক্ষণের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

(২) প্রত্যেক জেলায় দুটি ক'রে প্রধান ইস্কুল থাকবে—হিন্দুর এবং মুসলমানের

(৩) প্রত্যেক তহ্‌শীলদারীতে একটি করে নিম্নস্তরের ইস্কুল থাকবে। প্রত্যেক জেলায় ১৫টি করে তহশীলদারী থাকবে।

তহ্‌শীলদারী ইস্কুল সাধারণ দরিদ্রদের অনেক উপকার করতে পারবে বটে, বিশেষ ক'রে কারিগর শ্রেণীর। বৃটিশ পণ্যের প্রতিযোগিতায় মাদ্রাজে কারীগরদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক সমস্যাকে যে বিদ্যার আলোর ঝলকানি দিয়ে সমাধান করা যায় না, তা তহ্‌শীলদারী ইস্কুলের বিপর্যয় থেকেই কিছুদিন পর বোঝা গেল।

মাদ্রাজে শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য যে ইস্কুল তৈরী হ'ল, পরবর্তীকালে তাই মাদ্রাজ হাই ইস্কুল এবং তারও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়।

যাঁরা শিক্ষক হবেন, তাদের মধ্যে চল্লিশজন ক'রে আসতেন এই ইস্কুলে। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক একজন ইংরেজ। কিন্তু এই শিক্ষক স্থানীয় সম্রান্ত ব্যক্তি মনোনয়ন করতেন। এই শিক্ষক তো জেলা ইস্কুলে গেল। তহ্‌শীলদারী ইস্কুলে এই শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা হ'ল না। সব ছাত্র ইংরেজি শিখবে, আর শিখবে ইয়োরোপীয় সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের প্রথম সূত্র। এছাড়া হিন্দুরা শিখবে আঞ্চলিক মাতৃভাষা, মুসলমানেরা হিন্দুস্থানী, পারসী এবং আরবী। অবশ্য ইংরেজি পঠন পাঠন জেলা ইস্কুলেই মাত্র, তহশীলদারীতে নয়। ১৮২৮ এর নির্দেশ অনুযায়ী ইস্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার থাকবে কালেক্টরদের হাতে।

কিন্তু ১৮৩২ এ গণনা ক'রে দেখা গেল, তহশীলদারীর ইস্কুলের অবস্থা শোচনীয়। প্রত্যেকটি ইস্কুলে গড়ে ৩৩ জন ছাত্রও নেই। কেবল তহশীলদারী কেন জেলা ইস্কুলের দুর্দশাও কম নয়। কারণ স্বরূপ ঐতিহাসিকেরা বলেন,

-কালেক্টরদের তত্ত্বাবধানে গাফিলতি এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্তদের শিক্ষক মনোনয়নে ·দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতা। সন্ধানকার্য এবং উপসংহার ঐতিহাসিক সত্য বটে, কিন্তু কেন এমন হয়? আন্তরিকতার অভাব কি সমাজের মধ্যে এবং কর্মকর্তাদের ব্যবহারে একেবারেই অহেতুক এসেছে? ইতিহাস এখানে নীরব।

কিন্তু কর্মকর্তারা ১৮৩০ এর পত্র-নির্দেশ নামায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। মাদ্রাজ সরকারকে প্রেরিত কোর্ট অব ডিরেক্টার্স-এর এই নির্দেশ মেকলের পথ পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। অর্থাৎ দেশের কিছু শ্রেণীর জন্য মাত্র ইস্কুল, সাধারণের শিক্ষা নিয়ে ভাবনার দরকার নেই। উচ্চ শ্রেণীর জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এঁদেরকে শিক্ষা দিয়েই দেশের ভোল পালটে দেওয়া যাবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করলেন, (By raising the Standard of instruction among these classes you would eventually produce a much greater and more benefical change in the ideas and feelings of the community, than you can hope to produce by actually directing on the more numerous class—Satthianadhan Page 11), এইই হচ্ছে ইংরেজ সরকারের অপকীর্তির সুরু। অথবা বলতে পারি, ইংরেজী শিক্ষার দ্বারা দেশের মধ্যে সমাজের মধ্যে যে নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করা হয়েছিল তারই সূত্রপাত। এইখানেই তাদের উৎসাহ, মাতৃভাষা সম্পর্কে তারা অনেক বললেও তাকে অবজ্ঞা করে চলাই ধর্ম বলে অন্তরে মেনে চলল।

কিন্তু এই আঞ্চলিক ভাষা আর ইংরেজি ভাষার পিছনকার রহস্য লেইট্নার সাহেব কিছু উদ্‌ঘাটিত করেছেন (History of Indigenous education in Panjab—G. W. Leitner : Calcutta, printed by the Supdt. of Govt Printing, India—1882) ; "আমরা নিরাপদ মনে করেছিলাম বলে (১৮৫৭ এর পর) অজ্ঞাতসারে দেশবাসীর কুসংস্কার নিয়ে আর তত মাথা ঘামাইনি, আর আমাদের বিজ্ঞ কর্মচারীরা তাঁদের সমস্ত উৎসাহ তথাকথিত ইয়োরোপীয় কৃতিত্বের প্রচারের জন্য এই অকর্ষিত ভূমিতে অনুপ্রবিষ্ট করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে সুরু করলেন; এতে তাঁদের সময়ের অপচয় হলেও খ্যাতি বাড়ল; প্রচলিত সভ্যতা যা এখনও দেশে প্রবাহিত, যে সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রগতি সাধন করা দরকার তা তাঁরা করলেন না (Introduction—Page II)।

আরও তিনি বললেন, এইসব কর্মচারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বৈচিত্র্য প্রয়াসী ; অনেকে আসছেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে, তাঁদের জ্ঞান পারসী-জাত উর্দু ভাষায় ; ইংরেজদের জ্ঞানও তাই। আর, এই ভাষা দ্বারাই তাঁরা প্রদেশকে প্রবঞ্চিত করবার রহস্য আবিষ্কার করলেন ; ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম যে, ইংরেজীর বুকুনি শিখে একটি সুবিধা-ভোগী শ্রেণী সৃষ্টির মতো। এমনি ক'রে তারা কি চায়, না—সামাজিক মর্যাদা আর রাষ্ট্রিক ক্ষমতা। আর এই শ্রেণী কারা? দেশের অবজ্ঞাত মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্য থেকে আমরা ইংরেজরা এই নতুন শ্রেণীকে তৈরী করেছি।

আর এইভাবেই উর্দু এখানে 'শিক্ষা'র প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়াল (Unconsciously no doubt, as we felt safer, we began to think less of the prejudices of the people, and the energies of our best officers were devoted to the introduction on a virgin field of reforms of doubtful success in Europe, which wasted their time but gave them a reputation, rather than to the natural development of what elements of progress already existed in indigenous civilisation. These officers were surrounded by ambitious and needy adventurers, many from the North-Western provinces, whose knowledge of Perso-Urdu, which they shared with us, was the key to the mysteries of government and to the exploitation of the Province, just as a smattering of English is a coveted possession of the class, eager for place and political power, which we have created out of the rejected members of chiefly the middle and lower class. Urdu, therefore, became synonymous with education. Introduction. Page 11)।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, উর্দুকে শিক্ষার বাহন করায় ক্ষতি কি ? উর্দুও তো ভারতেরই ভাষা! কিন্তু ভাষা স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক তাকে চালু করার পিছনে শাসকগোষ্ঠীর বা কর্তৃপক্ষের যে মনোভাব থাকে, সেই মনোভাব বিশ্লেষণ করেই আমাদের দেশ হিতৈষণা এবং শিক্ষা বিপর্যয় বুঝতে হয়। সেই জন্যই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন

আছে। পঞ্জাবের এই উর্দু ভাষা নিয়েই আমরা শিক্ষাব অপকারিতা আরও অন্য দিক দিয়ে বুঝতে পারব।

পঞ্জাবে পাবসী পড়ানো হ'ত: এবং আববী সংস্কৃতের মতো এই পারসীও নানা আঞ্চলিক ভাষাকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু উর্দু কিভাবে যেন ইউরোপীয় সম্প্রদায় আয়ত্ত কবল। ফলে, দেশবাসী থেকে বিদেশীরা এই উর্দুকে ববণ করল শিক্ষায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে দেশবাসী কর্তৃক এই উর্দু চর্চা অবহেলিত হ'ল স্বভাবের নিয়মে। ভদ্রলোকেবাও আর উর্দুকে কথ্য বা লিখন বীতিতে ব্যবহার করতে পরাঙ্মুখ। কিন্তু কারা গ্রহণ কবল?

এতকাল সমাজে যারা অবহেলিত হয়েছিল সংস্কৃত, আববী, পাবসী শিখতে না পেবে তারাই। সমাজে প্রতিষ্ঠা স্থাপন করবার এই নতুন সুযোগ তারা পেল। এরা বৃটিশ শাসকেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই তারা উর্দু আব ইংরেজিকে ববণ কবল। এদেবই মধ্যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তাবা এই নতুন সবকাব নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা চায। কাবণ, এ একটা সুযোগ। এই নতুন ধাবাব লেখাপড়া শিখে রাজকর্মচারী হয়ে ঐ হিন্দু এবং মুসলমানদেব উপব আধিপত্য বিস্তাব কবতে চায়। এই উপবেব শ্রেণীর (জাতিগত) জন্যই তারা এতকাল অবহেলিত ছিল। নতুন শিক্ষায় মুসলমানদেব শিক্ষকেব স্থান থেকে অপসৃত কবা যাবে। এ ব্যাপাবে হিন্দু সম্প্রদায়ও হাত মিলাল। মুসলমানদেব ন্যস্ত মর্যাদা থেকে সরে আসা আর সরিয়ে দেওয়া এই দুটি সুযোগই মিলল নতুন শিক্ষায়। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং উচ্চ মর্যাদা অভিলাষী ব্যক্তি উর্দু আর ইংরেজিকে অস্ত্র হিসাবে ববণ করল ইংরেজদের অভিপ্রায়ে তাদেরই স্বসমাজের লোকের বিরুদ্ধে। ইংরেজী শিক্ষার এবং ইংরেজ কর্তৃক মাতৃভাষা পৃষ্ঠপোষণাব এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য দুষ্ট শিক্ষা সমগ্র ভারতকেই বিদীর্ণ কবে দিয়েছিল। লেইট্‌নার বলেন, এমনি করে আমরা মানসিক এবং নৈতিক-শিক্ষা সহায়ক ব্যবস্থাকে টেনে নামিয়ে এনে তুলে দিলাম পার্থিব সুখসুবিধার প্রলোভন জাগানোব শিক্ষাকে; ধর্মীয়-শিক্ষা-ধারকদের বিরুদ্ধে সন্দেহ জাগিয়ে সমাজের কাছে তাদের আমরা হেয় করে তুললাম (Thus, education was first degraded by us from an object of mental and moral culture to a means for purely wordly ambition. The religious basis of education

was similarly undermined ; for, looking upon Maulvis, Pandits, and Gurus as possible leaders of disaffection, we treated them and their learning with suspicion. Leitner)।

আরও মজার কথা হচ্ছে এই, এই অবহেলিত বণিক বা মহাজন সম্প্রদায়ের কাছেই ইংরেজরা প্রিয় হয়ে উঠল। ইংরেজ যেন তাদের কাছে পরিত্রাতা; ইংরেজরা করের দিক দিয়েও এই মহাজনদের অনেক সুবিধা করে দিল। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শাসকদের হাত মিলানোর ইতিহাস আমরা ইয়োরোপে পেয়েছি এক কারণে, এখানে পেয়েছি অন্যকারণে। এখানকার ব্যাপার দুরভিসন্ধিমূলক নিঃসন্দেহে।

আর আছে ধনিক শ্রেণী। এরাও বৃটিশ শাসনের ভক্ত। তবে তারা ক্যানিংএর কাছে চিঠি লিখল, 'লাহোর-সরকার পরিচালিত এমন একটি ইস্কুল হোক যেখানে আমাদের ছেলেরা মর্যাদার সঙ্গে পড়তে পারে।' দয়ার অবতার ক্যানিং তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে লাহোরে সেই নিয়ম প্রবর্তন করলেন। তাদের এই সুযোগ পরে অপহরণ করা হয়েছিল অবশ্য (১৮৬৪ এর দিকে)।

প্রচলিত শিক্ষায়তন তথা গ্রামের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইংরেজসরকার কি ভাবে আঘাত করেছে, তার ইতিহাস প্রসঙ্গে লাড্‌লো সাহেবের উক্তি কিছু স্মরণ করা যেতে পারে (Ludlow's British India):

"বাংলা দেশের মতো যেখানেই আমরা গ্রাম-নীতিকে ধ্বংস করেছি, সেইখানেই গ্রামের ইস্কুলও বিনষ্ট হয়েছে।...হিন্দু সভ্যতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের মিউনিসিপ্যাল ইস্কুল, এই ইস্কুল গ্রামীণ সভ্যতাতেই দেখা গেছে। এই ইস্কুলের চরিত্র হচ্ছে সঙ্গত ব্যক্তিগত ভাবে ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ (deals with the soil in an essential personal way)। প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের ভোগদখলকারী সমবেত মানবগোষ্ঠীর এককই নয়, এরা নিয়মবদ্ধ সমাজ-গোষ্ঠীর মতো। সমাজের প্রতি এই গোষ্ঠীর কিছু করণীয় আছে, আবশ্যিকভাবে কর্তব্য আছে—এবং এই সেবার বিনিময়েই তারা জমির উপর অধিকার পেয়ে থাকে—যদিও এই অধিকার সময় সময় সর্বময় কর্তৃত্বের আকার নেয়। গ্রামের জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক হিসাবে সর্বত্রই গ্রাম-গোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে কিছু কিছু ব্যক্তির উপর কিছু কর্তব্য ন্যস্ত হয়। প্রথম হচ্ছে, গ্রাম প্রতিনিধি—ইনি রাজার কাছে গ্রামের

লোকের প্রতিনিধি হিসাবে সকলের কথা জানান: তাঁর নীচেই হিসাব-রক্ষক—ইনি গ্রামের জমির বিবরণ, মালিকের বিবরণ প্রভৃতি রক্ষা করেন; তা ছাড়া তাঁর উপর দলিল প্রভৃতি করবার ভারও থাকে; তারপর আছেন, শান্তিরক্ষক—ইনি কেবল মাইনে-করা চৌকিদার মাত্র নন, উত্তরাধিকার সূত্রে এই পদ তিনি পেয়ে থাকেন, গ্রামেরই অধিবাসী—কিছু জমি এই জন্য তাঁর চাকরাণ হিসাবে দেওয়া হয়; পুরোহিতও—এই রকম উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পদ, তাঁরও ব্রহ্মত্র জমি আছে। তারপর ইস্কুল মাস্টার—অনেক সময় এঁর কাজ জ্যোতিষ-গণনাও বটে। হিন্দুদের যে গ্রামেই এইরূপ প্রথাবদ্ধ সমাজ সেখানেই শিক্ষার প্রাথমিক দিক অনুষ্ঠিত হয়; নিতান্ত অন্ত্যজ হিসাবে পরিগণিত না হলে গ্রামের সকলের ছেলেমেয়েই লিখতে পড়তে এবং অঙ্ক কসতে সক্ষম এই ব্যবস্থায়। এই সব গ্রামে এমন একটি ছেলে পাওয়া যাবে না, যে লিখতে পড়তে বা অঙ্ক কসতে অক্ষম। উচ্চ শিক্ষাও অনেকে এই ভাবেই গ্রহণ করে থাকে। এ ছাড়া আছে, মুদ্রাবিনিময়কারী, কুশীদ, কর্মকার, স্বর্ণকার, ছুতোর বা সূত্রধর, ক্ষৌরকার, কুম্ভকার, চর্মকার, ব্যবসায়ী বা মহাজন, দরজি, ধোবা, গোয়ালা, বৈদ্য, এবং সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতি গ্রামের সমাজের সর্বদিকের জন্য বিভিন্ন কায-সহায়ক শ্রেণী। এই যে, উত্তরাধিকার সূত্রে জমি ভোগ এইটিই হচ্ছে গ্রামের সমাজের সুলক্ষণ আর স্থায়িত্বের নিদর্শন। এই যৌথ-গ্রাম সমাজ-প্রথা ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। এখনও ভারতবাসীর ভাষায়, কথাবার্তায় এই ইতিহাসের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়" (উদ্ধৃতি অনুবাদ ক'রে দেওয়া হল লেইটনারের পুস্তক থেকে—পৃষ্ঠাঙ্ক ১৮)।

এই সব ইস্কুল বসত ধনীদের বাড়ীতে অথবা চণ্ডীমণ্ডপে। কারণ, শিক্ষকের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়াই এই সভ্যতার রীতি। শিক্ষকদের মধ্যে যাঁরা অন্যভাবে সংসার নির্বাহ করতে পারতেন তাঁরা ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা দিয়ে আনন্দ পেতেন। শিক্ষাদান মূলত তাঁদের কাছে ধর্মের অঙ্গস্বরূপ।

লেইট্‌নার বলেন, এঁদের শিক্ষাপদ্ধতি, পোষাক-আষাক দেখে উপহাস করা যত সহজ, তেমনি শিক্ষার ফলের গভীরতা পরিমাপ করাও কঠিন। এই শিক্ষা প্রথাতেই এঁদের মধ্যে জ্ঞানী, দার্শনিক সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তাঁদের গৌরবের আলোকে নিষ্প্রভ।

লেইট্‌নার বলেন, আধুনিক কালে কিণ্ডারগার্টেন নিয়ে আমরা যে বড়াই করি সেই-ইস্কুল ব্যবস্থাও ভারতবর্ষে পাওয়া গেছে অনেক আগে থেকে। ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণ কি ভাবে করা যায়, তাদের নীতিশিক্ষার দ্বারা কিভাবে চরিত্রের উন্নতি ঘটানো যায়, জীবনের বিভিন্নদিকের সঙ্গে কিভাবে পরিচয় করানো যায়—সে সব সম্পর্কে অতি যত্নের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, শিক্ষকেরা অবহিতও ছিলেন। কবিতায় আগ্রহ, দর্শনের পরিচয়, ধর্মের ব্যাখ্যা—প্রভৃতি সমাজের নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যেও ছিল। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলেছেন—কবীর ছিলেন জোলাহ রামদাস—চামার, নাম দেও—ধোবি, এমনকি বাল্মীকিও তো দস্যু! শিক্ষা যদি কুক্ষিগতই থাকবে—তবে এঁদের মধ্যে শিক্ষার সেই জ্যোতি দেখা গেল কেন?

একথা হয়ত সত্য ইয়োরোপীয় ইস্কুলের মতো শ্রেণীগত পাঠনা এখানে ছিল না। কিন্তু শ্রেণীগত পাঠনার পরিণতি কি? না, তীক্ষ্ণধী আর মন্দ ছেলেদের একই স্তরে এনে সমান করে দেওয়া, এই তো। কিন্তু ভারত শ্রেণীগত পাঠনার এই ত্রুটি গ্রহণ করে নি, এ ত্রুটি জন্মে নি। নতুবা শ্রেণীগত পাঠনার অনুরূপ আছে। সবাই মিলে নামতা মুখস্থ করা, আলোচনাচক্র করা, চিন্তাকে প্রসারিত করা—এ সবই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' এর যে ধর্ম—সেই ধর্ম দেখা গেছে হিন্দুদের আচার্য এবং মুসলমানদের হাকিমদের মধ্যে। লেইটনার ইস্কুলের গঠন প্রকৃতির প্রতি নজর না দিয়ে শিক্ষার পরিণাম আর চরিত্রের দিক মিলিয়ে ভারতবাসীর প্রচলিত শিক্ষাকে ইয়োরোপীয় শিক্ষাপ্রথা থেকে কোন অংশেই নিকৃষ্ট মনে করেন নি। মোটের উপর এই কথাই সত্য হয়ে দাড়াচ্ছে, ইংরেজ-বণিক এদেশের বণিকদের সমাজ-ব্যবস্থার মর্যাদান্তরের উচ্চদিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে—ভারতের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক যে-শিক্ষায় পুষ্ট হচ্ছিল সে শিক্ষা অপসারিত করা। পুরনো শিক্ষা মুছে দিতে পারলেই পুরনো সমাজ-প্রথা এবং সমাজ-মানুষের মর্যাদা ক্রমের পরিবর্তন ঘটবে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি প্রকাশ পেতে পেতে বেন্টিঙ্কের আমলে এসে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

সমাজ বড় হয়, জটিল হয়—সমাজের অগ্রগতি কাকে বলে বলা শক্ত। কাজেই নতুন সমাজ একটা নতুন পরিবর্তন ঘটাবে—তা স্বীকার ক'রে নিলে দুঃখ থাকে না। কিন্তু সমাজের রূপের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্বভাবের সুস্থ

দিক এসে যেত তবেই মানুষে সমাজ-মানুষ বা সামাজিক হ'তে পারত।' বর্তমানকালে মানুষকে সমাজীয় বা সামাজিক করবার জন্য যে সমাজ-বিদ্যা পাঠ্যক্রমে আসছে—এবং যে-ব্যাপার নিয়ে জগতের সভ্য-জাতি আজ মাথা ঘামাচ্ছে সেই সমস্যা কি সেই সভ্যজাতির অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই সৃষ্টি হয় নি! অনুষ্ঠান-গত পাঠ্যক্রম (co-curricular activities) বা সমাজ-বিদ্যা (social-studies) পড়ালেই কি মানুষ সমাজীয় হয়? জগতে বর্তমানেও বহু আদি-মানব সমাজ বেঁচে আছে, তারা আছে অস্ট্রেলিয়ায় বা তারও পূর্বে দক্ষিণ আমেরিকায় বা উত্তরের সমুদ্রের তটে তটে, পূর্ব আফ্রিকায় বা দেশের সর্বাঙ্গে, দক্ষিণ-ভারতের পাথরে মুখ থুবড়ে বা পূর্ব-ভারতের অরণ্যে। তারা মাথা ঘামায় না-মানুষকে কি ভাবে সমাজীয় করা যায় ভেবে, তারা সামাজিক, তারা সামাজিক অথচ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বাদী; তারা তাদের সমাজ মত বা ধর্মমত নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা-গারে যায় না যাচাই করতে কতখানি এ বৈজ্ঞানিক ধর্ম। তারা অদ্ভুত তারা অপূর্ব, তাবা অসভ্য, তারা অবৈজ্ঞানিক কিন্তু তারা সুস্থ তারা সামাজিক। তারা জীবন্ত, তাদেব বলা যায় না,

এ যেন মৃত্যুর পৃষ্ঠে বেঁচে থাকিবার দুর্বিষহ বোঝা।

এক কথায়, আমরা স্বার্থে আর শক্তিতে মানুষের সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছি, আর পরিতাপ করছি—মানুষের সমাজ থাকল না। ঐ পরিতাপ হচ্ছে সাহিত্য; আর ঐ 'স্বার্থ' আর 'শক্তি' হচ্ছে ইতিহাস আর বিজ্ঞান। সব জড়িয়ে নাম দিচ্ছি—সভ্যতা।

ভারতবর্ষও এই অর্থে বৈজ্ঞানিক-সভ্যতা ইংরেজের কাছ থেকে কুড়িয়ে নিল, শিখে নিল। হয়ত কথা উঠতে পারে, দ্রাবিড়, আর্য, মুসলমানও কি আদিম মানব-সমাজের গঠনকে ভেঙে দেয় নি। দিয়েছে, কিন্তু গ্রামীণ সভ্যতার সঙ্গে আদি-মানব সমাজের প্রকৃতির খুব তফাৎ ছিল না বলেই দুটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখতে পাইনি। আর, বিদেশী নাগরিক সভ্যতা ইংরেজর আমলে এল ব'লেই এর পুরনো রূপ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল।

যাই হোক, পাঞ্জাবে আমরা প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার ইস্কুল হিসাবে পাচ্ছি,

(১) **গুরুমুখী ইস্কুল** ৫ বছর থেকে ৭ বছরের মধ্যে ছেলেরা

পড়তে আসত। ছেলে-মেয়ে একই ইস্কুলে পড়ত। অঙ্গুলী দিয়ে লেখা সুরু করত তারা। কারণ, কলমের আগে অঙ্গুলী এসেছে। মাটিতে 'পিণ্ডল' ছড়িয়ে তার উপর লিখত। এই ভাবে অঙ্গুলী সঞ্চালনে দক্ষতা জন্মালে লিখত কাঠের 'পটি'তে। তক্তার উপর কালো ঝুল মাখিয়ে, রোদ্দুরে বা আগুনে শুকিয়ে তারপর পণ্ডু বা পিণ্ডল ছড়িয়ে লিখত। এবার আর অঙ্গুলী নয় সর্কেবা দিয়ে (কলমীর ডাঁটা বা ঐ জাতীয় আর কিছু থেকে তৈরী), এখানে শিখত তারা অঙ্ক এবং পরিমাণ পদ্ধতি। নামতা কেউ শিখত, কেউ শিখত না। কিন্তু 'জপজী' পড়তেই হত। জপজী শিখ-গ্রন্থ থেকে ঈশ্বর সম্পর্কে স্তুতি, স্তোত্র এবং নীতি কথা। নীতিকথার মধ্যে অনেক আছে: বই-বাস (রাহ্-রাস্ত্), অতি সইলা, সিদ্ধ্ গোষ্ঠ্, উঙ্কার, বাইবার প্রভৃতি। তারপর হনুমান নাটক (গুরুমুখী হরফে হিন্দী-পাঞ্জাবী ভাষায় রামায়ণ-কথা), খাঁটি হিন্দীতে তুলসী রামায়ণ (গুরুমুখী হরফে), ভাগবত জনমসখী, গুরবিলাস (প্রথম ৬ জন গুরু এবং দশম গুরুর জীবনী), এছাড়া চিকিৎসা শাস্ত্র যারা পড়বে তাদের জন্ম নিগস্ত (ওষুধ) সরিঙ্গধর, নিদান প্রভৃতি গ্রন্থ গুরুমুখীতে লেখা। এই সঙ্গে পড়তে হ'ত ছন্দ অলঙ্কার প্রভৃতি।

শিখেরা গুরু বলতে তিন রকম শ্রেণীর বোঝাতেন—শিক্ষাগুরু, ধর্মগুরু এবং আধ্যাত্মিক গুরু। ইস্কুলের গুরুদেব আয় ছিল জমি থেকে, কিংবা, সঙ্ঘ থেকে অথবা ধর্মশালার বৃত্তি থেকে, এছাড়া ছাত্রদের উপঢৌকনও ছিল। রঞ্জিৎ সিংহ এ বিষয়ে মুক্ত হস্ত ছিলেন, তিনি গুরুমুখী ভাষার পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন।

(২) ছাত্‌শালাঃ মহাজনী এবং লহণ্ডী ইস্কুল

মহাজনী পাঠশালা আমরা সমগ্র ভারতেই দেখতে পাই। বাণিজ্যিক বিষয় শিক্ষা এই ইস্কুলের পাঠ্যক্রমে প্রধান। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের তিন রকম হাতের লেখা দেখতে পাওয়া যায়, মহাজনী, লহণ্ডী এবং সরাফী। লেইট্‌নার এ সব লেখা অকিঞ্চিৎকর মনে করেন নি। তিনি অনুসন্ধান ক'রে এ সব ভাষায় অনেক সাহিত্য-সম্ভার পেয়েছেন। অনেকটা নাগরী হরফের মতো এই ভাষার হরফ; সাধারণের অবোধ্য হলেও, সেই সম্প্রদায়ের কাছে অতি সহজ।

সাধারণত আমরা 'সহজ বা কঠিন' ব'লে থাকি তাকেই যা বিদেশীর

পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন, কিন্তু শিক্ষার্থীর কাছে যা সহজ এবং স্বাভাবিক তাকেই তো সহজ বলা উচিত।

এখানকার গুরুদের পাণ্ডাও বলা হয়ে থাকে। মুসলমান হ'লে 'মিঞা'। লেখাপড়ার পদ্ধতি গুরুমুখী ইস্কুলের মতোই, তবে এখানে মানসাঙ্ক এবং মৌখিক অঙ্ক বেশী শিখতে হ'ত।

পাঞ্জাবের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ (১৮৫৭ সালের দুই জুলাই-এর রিপোর্টে) লিখেছেন, যে-ইস্কুলে দোকানদারের ছেলেরা পড়ে, যেখানে হিসাব-নিকাশের ঘোর-প্যাঁচ শেখানো হয়, এবং হিসাব-নিকাশের বিধি বহির্ভূত রহস্য কুহেলী সদর-ওয়ালাদের বিভ্রান্ত ক'রে দেয়—ইত্যাদি। আর লেইটনার বলেন, "I regret to find this sneer by an officer, for whose name I have respect, against an excellent system of book-keeping and of accounts, acceptable to the trading community, such as one naturally expects would be made by the educational chief of the province."

এইসব ইস্কুলে এই সময় অনেক দোষ দেখা গেছে। তা'র মধ্যে বড় ত্রুটি ছেলেদের বুদ্ধি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা জন্মেনা, অবুদ্ধিমানের মতো সব কিছু মুখস্থ ক'রে যায়। কিন্তু এ দোষ কি আদৌ ইস্কুলের, না, অন্য কিছুর? ইংরেজদের দোষটা বেশি মনে হয়। পুরণো প্রথা রাখতে চায় নি। তারা দেশের লোককে চাকুরীতে নিয়োগ করতে চায়। পদ্ধতি মাফিক সংস্কার করবার বদলে তারা দিয়েছে প্রলোভন। কাজেই দেশের সম্প্রদায় বুদ্ধিমান হ'তে পায় নি; তারা হয়েছে অশান্ত, চঞ্চল। (The fact is that whilst indigenous education is based on religious sanction, fortified by considerations of the practical requirements of life and, above all, by the ever persent personal influence of the teacher, the personal influence of the teacher is wanting under our system, and its place is supplied by the more artificial stimulus of the chance of employment under Government. We have at great expense sown dragon's teeth, with the inevitable result. We have not made the new generation more intelligent, but more restless and, unless we restore the traditional teacher, the

Moulvi, Pandit or Bhai, to his Cathedra, and arm him with disciplinary power, the whole future generation of India will become a source of mischief to itself and to us.—Leitner Page 42) ।

আমরা মহাজনী, ল্যাণ্ডি বা লহণ্ডী এবং সরাফী হরফ সম্পর্কে একটি তথ্য পাচ্ছি এই যে, মহাজনী হচ্ছে বণিকদের হরফ, লহণ্ডী দোকানদারদের, এবং সরাফী হচ্ছে ব্যাঙ্ক বা সুদকারবারীদের। এই থেকেই ইস্কুল গুলোর তফাৎ অনেকটা বোঝা যাবে। তবে ছাত্রদের মধ্যে বোধ হয় এমন শ্রেণীভেদ ছিল না।

(৩) **উর্দু এবং হিন্দী ইস্কুল:** উর্দু-ভাষা পারসী-ইস্কুলের একটা অঙ্গ ; আর হিন্দু ইস্কুলে হিন্দী ভাষা শেখানো হ'ত। দিল্লীর পশ্চিমে তৎকালে হিন্দীর প্রচলন ছিল না। দুটি ইস্কুলের পাঠ্যক্রম, ভাষা বাদ দিলে, প্রায় এক প্রকার। অর্থাৎ লেখাপড়ার উদ্দেশ্য প্রায় এক। এখানে বর্ণমালা, চিঠি-পত্র গণিত, কথা-কাহিনী, কবিতা প্রভৃতি স্ব স্ব ভাষায় শেখানো হ'ত।

(৪) **পারসী ইস্কুল:** সহজ কথায় পারসী ভাষা শেখানোর ইস্কুল। কিন্তু অত সহজ কথা নয়। পারসী শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টে এক সময় মন্তব্য করা হয়েছিল, "দেশীয় লোকের মধ্যে যেখানেই সৌন্দর্য ও রুচিবোধ দেখা গেছে, এবং এখনও যা আছে, তা পারস্য সংস্কৃতি থেকে জাত। পণ্ডিত ও মৌলভীদের মধ্যে শিক্ষা-উপযোগী মানসিক অবস্থা এবং পাণ্ডিত্যের অভ্যাস রয়েই গেছে—আমরা তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে কি দিয়েছি না, নানারকম বিষয়ের মুখস্থ বিদ্যা বা তোতা-পাখীর বুলি, আর তাও অপমানকর ভাবে।" পাঞ্জাবে তো পারসী ছিল রাজভাষা। ১৮৫৭ সালের (জুলাই মাসের) শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে উল্লেখ ছিল, 'অনেক ঘটনা থেকেই মনে হয়, শিক্ষাদান কাযে মুসলমানদেরই একমাত্র হাত ছিল।'

এতে হিন্দুদের যে খুব ঈর্ষা হ'ত তা নয়। বরং হিন্দুরাও পারসী শিক্ষার জন্য আগ্রহান্বিত ছিল। তবে তারমধ্যে একটা কারণও আছে। হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ করে ক্ষত্রীরা রাজকীয় পদে নিযুক্ত হতে চাইত, এবং এই বৃত্তিই ছিল তাদের ঐতিহ্য আর সামাজিক সুযোগ। এই রাজপদ এবং রাজশক্তি যে-ভাবেই পাওয়া যাক না কেন তাতে তারা পেছপা হ'তো না। তাই পারসী এমন কি কোরাণ পড়বার ইস্কুলেও তাদের

পাঠ নিতে আপত্তি ছিল না। আর লেইট্নার বলেন, এই একই কারণে তারা ইংরেজি উচ্চতর শিক্ষা নিতেও আগ্রহী হ'ল; সে শিক্ষা যদি সরকারী খরচে হয় তবে তো ভালই, নতুবা নিজেদের খরচেও পড়বে।

কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহকে যেহেতু মনে করা হয়েছিল মুসলমানদেরই প্ররোচনায় (যদিও আর্গিল প্রমাণ করেছেন এ বিদ্রোহ হিন্দুদেরই বিদ্রোহ) সেই হেতু শিক্ষাবিভাগ থেকে এবং ইস্কুল থেকে কিভাবে মুসলমানদের সরিয়ে দেওয়া যায়—সেই কথা এবং সেই মতবাদ অনুসারে কায করতে শিক্ষাবিভাগ মনস্থ করল। প্রথম আঘাত দেওয়া হ'ল, মুসলমানদের শিক্ষকতার পদ থেকে সরিয়ে হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ করা। এবং দ্বিতীয় আঘাতে পারসী ইস্কুলগুলো ইংরেজি ইস্কুলের কবলিত ক'রে নেওয়া হ'ল। এ অবস্থায় মুসলমান এবং হিন্দুদের মধ্যে ভালো শিক্ষককে ইংরেজ সরকার আকৃষ্ট করতে পারল না। আকৃষ্ট হ'লে অস্বাভাবিক হ'ত। পাঞ্জাবে, পাঞ্জাবে কেন সমগ্র ভারতবর্ষে, এই ভাবে ইস্কুল হয়ে উঠল সুযোগ-সন্ধানীদের তীর্থক্ষেত্র। ফলে দেখতে পাই, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশে ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'তে থাকল। তবে মানুষ মাত্রেরই সমাজ থাকে, নতুন ইস্কুলের পৃষ্ঠপোষক, শিক্ষক, ছাত্র—ইংরেজদের স্বতন্ত্র-পরিবার-গোষ্ঠিবাদের (particularisation) উপর ভিত্তি ক'রে পিতৃতন্ত্র-প্রথা-বদ্ধ সমাজকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে থাকল। ইংরেজি শিক্ষা যদি ভারতবর্ষকে কোন প্রকারে অনিষ্ট ক'রে থাকে সে হচ্ছে, তাদের স্বতন্ত্র-পরিবার গোষ্ঠীবাদ দ্বারা আমাদের পিতৃতন্ত্র সমাজকে নষ্ট ক'রে দেওয়া। সম্পূর্ণ সক্ষম হ'লে মন্দ হ'ত না। কিন্তু অসুবিধা হয়ে গেল। দেশের কিছু সংখ্যক লোক নতুনকে না-বুঝে বরণ করল। আরও অত্যধিক সংখ্যক পুরনোকে আঁকড়ে থাকল। নতুনরা ক্ষমতাশালী হয়ে এই জন্যই দুর্নীতিপরায়ণ এবং স্ব-সমাজবিরোধী হয়ে উঠল। এই নতুন দলে নাম লেখালো শিক্ষিত সম্প্রদায়, অর্থাৎ ইংরাজি শিক্ষার্থী। আজও দেখা যায়, শিক্ষা পেয়ে আমরা ক্ষমতা চাই, ঐটিই পরমার্থ, কারণ ক্ষমতা অর্থ অন্যকে ত্রস্ত করা, প্রবঞ্চিত করা, আমাদের মধ্যে প্রাচীনকালের সেই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী এল না। আমরা 'জ্ঞান' কথাটির অর্থ চাই না, বুঝিওনা। আমরা চাই পরিশ্রমী, শ্রমজীবী। আমরা বর্তমান শিক্ষকেরা সামাজিক মর্যাদা নিয়ে ভাবি, কিন্তু সমাজের কাজে আসি না। মাঠে যারা চাষ করে তারা আমাদের সমাজের লোক নয় বলে তাদের মধ্যে

যাই না। রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে কত খেদোক্তিই না করেছেন। আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা-ভাষণ দিয়ে আমরা শিক্ষককে এখন ইস্কুলের কর্মী হিসাবে তৈরী করতে চাইছি। সবচেয়ে করুণ দিক হচ্ছে আমরা 'সোস্তাইলাইজেসন' কথাটির আমদানী ক'রে ভাবতে বসেছি।

একটু প্রসঙ্গান্তরে আমাদের যেতে হ'ল এই জন্য যে, এই কথাটিই আমাদের বুঝতে হবে—শিক্ষকদের অনুপযুক্ততা, শিক্ষকদের ভিক্ষুক-অবস্থা, শিক্ষকদের সমাজ বিমুখীনতার জন্ত শিক্ষকরা দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে আমাদের নতুন সমাজকর্তা সেই ইংরেজরা; দায়ী হচ্ছে ইংরেজদের সমাজ-মতবাদ। দায়ী হচ্ছে আমাদের অল্পবুদ্ধির বা অন্ধ নয়া-সমাজসংস্কারকেরা।

পারসী ইস্কুলে হাতের লেখা শেখা প্রধান বটে, তবে দেখা-শোনা এবং পড়াও বড; সকালবেলা পারসী বর্ণমালা সকাল ৬টা থেকে ১১টা পর্যন্ত, এইভাবে শিখতে হ'ত। বেলা ১টা থেকে ৪টা পর্যন্ত ঐ লেখাই লিখতে হ'ত; আর সন্ধ্যা থেকে (৬-৭ টা) আবার পড়া সুরু। যারা শিখতে অপারগ হ'ল—তারা রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আটক থাকত। বর্ণমালার শেখানোর বিশেষ পদ্ধতিও ছিল। কারণ পারসী বর্ণমালা এমন যে, তার কিছু কিছু অন্য বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় না; আবার কিছু কিছু ভিতরে বা শেষে বসে চেহারা বদলে ফেলে।

তারপর পড়ত খুসরুর লেখা খালিক-বারি। তারপর সাদীর পন্দনামা। তারপর পত্রলেখা, গুলিস্ত।—ইত্যাদি।

শাস্তির মধ্যে জরিমানা ছিল না। ছিল, কোণে দাঁড়িয়ে থাকা, হাঁটুর মধ্য দিয়ে হাত ঘুরিয়ে নিজের কাণ ধ'রে থাকা, ওঠ-বস করা, খাবার দিতে দেরী করা—ইত্যাদি।

জরিমানা ছিল না, একথাটি প্রণিধান যোগ্য। কারণ আমাদের নয়া সভ্যতার সর্বক্ষেত্রে জরিমানা প্রধান। জরিমানা প্রথা এল, যখন বুঝলাম 'টাকার পোড়ানী বড় পোড়ানী'। কেবল তাই নয়, অন্তের পরিশ্রমলব্ধ টাকা কিভাবে নিজের পকেটে আনা যায়—বণিকের সেই অপকীর্তিতে যখন আমরা উল্লসিত হয়ে উঠলাম। ইস্কুলে আসনি 'ফাইন-এক আনা', লাইব্রেরীর বই দিতে দেরী, ফাইন-এক আনা; এমনি ক'রে জরিমানা সভ্যতা আমরা আষ্টে-পৃষ্ঠে গড়ে তুলেছি

পারসী ইস্কুলের শিক্ষক হচ্ছেন—মির্যা বা ওস্তাদ; ছাত্ররা ডাকত

মিঞাজী বা মৌলভী সাহেব বলে। মুদ্রায় বা অন্যভাবে ইস্কুলের বৃত্তি দিতে হ'ত।

পারসী ইস্কুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের কথা এবার উল্লেখ করি। এখানে শিক্ষক ছাড়া শ্রেণীর সর্দার-পোড়ো নিযুক্ত হ'ত, একে বলা হ'ত খলিফা। লেইটনার বলেন, এই রীতি কোরাণ ইস্কুল থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে আমরা এই সর্দার পোড়ো প্রথা প্রাচীন ভারতে দেখেছি, মাদ্রাজেও দেখেছি।

পারসী ইস্কুলের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আর একটি হচ্ছে, সহবৎ শিক্ষাই এই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। জীবনযাত্রার পক্ষে কি কি সৌজন্য মান্য করতে হয়, তাই ইস্কুল থেকে ছাত্ররা শিখত। এই দিক দিয়ে পারসী ইস্কুল সমাজকে অনুসরণ করে চলত, অর্থাৎ প্রকৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সম্ভ্রান্ত পরিবার এই সৌজন্য বা সহবৎ শিক্ষার জন্য আতালিক নিযুক্ত করতেন। 'আতালিক' হচ্ছেন—ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন-কারী। ইনি শেখাতেন, কি করে ছাত্রবন্ধুদের সঙ্গে আচরণ করতে হয়; সমান মর্যাদার যারা, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন যারা, বা নিম্ন শ্রেণীর যারা তাদের সঙ্গে কেমন ভাবে আলাপ পরিচয় করতে হয়, কি সম্বোধন করতে হয়, বাড়ীতে কি ভাবে প্রবেশ করতে হয়, কি ভাবে সংবাদ কুশল নিতে হয়—ইত্যাদি। এই আতালিকেরা অনেক সময় বাটীস্থ প্রধান ভৃত্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হ'ত। অনেকটা প্রাচীন গ্রীসের পেডাগগ ধরণের। আবার কেবল এই কাজের জন্যও আতালিক নিযুক্ত হ'ত। এই জন্যই কথা আছে পারসী ইস্কুলে সুজন তৈরী হয় আর আরবী ইস্কুলে পণ্ডিত। ইংরেজি ইস্কুল এই সহবৎ শিক্ষাকে একেবারে পরিবর্জন করল।

তাতে তত দুঃখ নেই। দুঃখ হয় যখন এই শিক্ষাবিদেরা বলেন, আমাদের ইস্কুলের শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকের সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা একটা ইস্কুলের কর্তব্যের মধ্যে আসা উচিত; নতুবা ছাত্রদের নৈতিক অধঃপতন ভীষণভাবে ঘটছে। তখন মনে হয়, হয় এই তত্ত্ব কুম্ভীরাশ্রু-বিশেষ, না হয় এর পিছনে কোন রাজনৈতিক চাল আছে। নতুবা, আতালিক ব্যবস্থায় এই দিকটি এমনভাবে সুনির্বাহিত হ'ত যে, একে আর সমস্যাই মনে করা যায় না। ইংরেজিশিক্ষায় ভদ্রলোক তৈরী করা যে গেল না তাতো সরকারী কাগজ পত্রেই উল্লেখ করা হয়েছে, (Nor has the System

which produces few Scholars been more successful in producing gentlemen.—Parliament proceedings No 606 dated 18th February 1873—quotations taken from Leitner's History of Indigenous education in the Punjab , page 65) ।

কিন্তু পার্লামেণ্টের সদিচ্ছা প্রসূত মন্তব্যকে আমরা তত স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারিনা, যখন দেখি এদেশের সরকারী চালে এই শিক্ষা অপসৃত হ'ল। ১৮৫৭ সালের শিক্ষাবিভাগের মন্তব্যের কয়েকটি সার তুলে দেওয়া যাক—

'যেভাবে মুসলমান প্রভাব পাঞ্জাবের শিক্ষায় দেখা যাচ্ছে তাতে সরকারের সর্বশক্তি নিয়োগ করে একে বাধা দেওয়া উচিত' (অনুচ্ছেদ ১২)।

১৮৮১ সালে ২২শে সেপ্টেম্বরে লিখছেন,

'এই ইস্কুলের পড়ানো যেমন তেমন গোছের, ছেলেরা পারস্য বই মুখস্থ করে শুধু, অর্থ বোঝেনা।' কিন্তু মাতৃভাষায় বা চলতি-ভাষায় পড়ানোর একটা সুবিধে তারা উপেক্ষা করলেন যে, ঐ ভাষা বাড়ীতে সমাজে সে বহুবার ব্যবহার করে এবং এইভাবে তার অর্থবোধ স্বাভাবিক ভাবে হয়। এই ব্যাপারটি বিদেশীভাষা শিক্ষায় হয় না।

'তারপর আবার বই পড়ে, কথায় কথায় অনুবাদ করে মাতৃভাষায়, কিন্তু ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো হয় না। এই রকম পদ্ধতিতে বুদ্ধির ব্যবহার নেই। কিন্তু যারা অনেকদিন ধ'রে এই ইস্কুলে পড়াশোনা করতে পায় তারা পারস্য ভাষায় বেশ বড় পণ্ডিত হয়ে ওঠে একথা নিশ্চিত।' আর ইংরেজি ইস্কুলে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতিতে প'ড়ে, বুদ্ধি ব্যবহার ক'রে ইংরেজির প্রায় কিছুই শিখতে পায় না। তবু তারা বললেন—এ ইস্কুলের পড়ানোর কায়দা খারাপ। এই যুক্তি শক্তিগর্বীদের পক্ষেই সম্ভব। দেশীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে আঘাত করবার জন্য এবং দেশবাসীর অবহেলা দেখেই রাজতন্ত্রের সমর্থনকারী ব্যক্তিদের সাহায্যে লাহোর থেকে সরিয়ে দিল্লীতে ইংরেজিশিক্ষার মহোৎসব সৃষ্টি করলেন। এর্থাৎ সবার পিছনে একটু কঠিন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র কাজ করছে যেন। অবশ্য এই ষড়যন্ত্রে আমরাও অংশগ্রহণ করেছি।

কোরাণ ইস্কুল :

প্রকৃতপক্ষে কোরাণ ইস্কুল ব'লে কোন এক বিশেষ শ্রেণীর ইস্কুল ছিল না। কিন্তু মসজিদ সংলগ্ন ইস্কুলে যখন কেবল কোরাণই পাঠ করানো হ'ত এবং

তার উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং যথাযথ আচরণ করতে শেখা তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ একে কোরাণ ইস্কুল ছাড়া আর কিছু বলতে চায়নি।

ছেলে বা মেয়ের বয়স যখন ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিন তখন আত্মীয় স্বজন সমবেত হয়ে তাকে ভালো পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়ে বই এবং লিখবার সরঞ্জাম হাতে তুলে দিয়ে একটি ধর্মঅনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম পাঠ স্থরু করে। এই উপলক্ষে পারিবারিক উৎসবের মতো একটি অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হয়; মিষ্টি বিতরণ ক'রে সকলকে তৃপ্ত করা হয়। ছেলে বা মেয়েকে ধর্ম-সমাজে গৃহীত ক'রা হ'ল।

একটি আসনে শিশুটি উপবেশন করল, আরবী বর্ণমালা, ফাতিহা পাঠ করা হ'ল, পাঠ করা হ'ল সমগ্র ৯৬ সংখ্যক ছুরা, ৫৫ সংখ্যক ছুরার কিছু কোন সময় বা ৮৭ সংখ্যক ছুরা। যদি শিশুটি পড়তে অনিচ্ছুক বা নারাজ হল তবে উচ্চারণ করতে হয় বিসমিল্লাহ্। যারা দরিদ্র তারা এই অনুষ্ঠান করতে পারে না তারা সোজাসুজি কিছু মিষ্টি দিয়ে মোল্লার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

এমনি অনুষ্ঠান হিন্দুদের মধ্যেও আছে। এই অনুষ্ঠানের একটি তাৎপর্য শিক্ষাব্যাপারে বেশ উপলব্ধি করা যায়। শিশুর মনে, অভিভাবকের মনে লেখাপড়া সম্পর্কে একটা মধুর স্মৃতি-জট তৈরী করে। এই অনুষ্ঠানের বদলে আমরা বর্তমানে এনেছি ভর্তি-পরীক্ষা (admission test)। এই ভর্তি পরীক্ষায় উদ্বেগ আছে, জনতার ভীড় আছে আর পরিশেষে আছে 'এই ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে আমরা ঘোষণা কচ্ছি যে অমুক-অমুক যথেষ্ট বুদ্ধির খেলা দেখাতে পারে নি, তারা পড়াশুনার উত্তরাধিকার গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, অতএব আমাদের ইস্কুলে তার স্থান নেই!' শৈশবেই শিশুর চিত্তে এঁকে গেল, সে খারাপ ছেলে, তার মাথা নেই। সে বুঝে গেল সমাজ বড় নিষ্ঠুর, সমাজের মানুষের মধ্যে সে পরিগণিত হ'তে পারে না, অথবা তার সমাজ অন্যত্র। আমরা এই জটিল সভ্যতাকে জটিলতর ক'রে তুলছি, সমস্যা নিজেরাই তৈরী করছি আর তা সমাধানের জন্য ব্যয়বহুল আড়ম্বর সৃষ্টি করছি। ইংরেজরা এদেশের শাসনভার নেওয়ার প্রাক্কালে দেশে হয়ত অনেক দুর্নীতি ছিল, কিন্তু সমাজের চরিত্রে এমন কতগুলি গুণ ছিল যা আমরা অবহেলায় নষ্ট ক'রে এখন পরিতাপ করি কিন্তু আর ফিরে পাবার উপায় নেই; সে সব মৃত।

মসজিদ সংলগ্ন এই ইস্কুল। এই ইস্কুলে ৭৮ সংখ্যক ছুরা দিয়ে সুরু করে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পাঠক্রম রচিত হ'ত। হয়ত এই ইস্কুলের মোল্লারা খুব বড পণ্ডিত নন। কিন্তু এঁদের স্মৃতিশক্তি ছিল বিস্ময়কর। এই মোল্লাদের হয়ত কোন কোন স্থলে নিম-মোল্লা বা কাট-মোল্লা বলা হয়; কারণ তাঁরা শিক্ষকতা ছাডা বিবাহ-সাদী বা অন্যান্য সামাজিক কর্ম নির্বাহ করে থাকেন। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, সমাজের চাহিদাকে তাঁরাই মিটিয়েছেন।

কোরাণ ইস্কুলের দুটি উদ্দেশ্য। প্রথম, মুসলমানদেব মধ্যে ইসলাম ধর্ম জীবন্ত ক'রে তোলা, দ্বিতীয় উচ্চতর আরবী শিক্ষায় ছাত্রদের তৈরী করা। অনেকে বলেন, কোরান ইস্কুলে ঠিক যাকে লেখা আর পড়া বলে তা হ'ত না। কিন্তু লেখা আর পডা না থাকলে আরবী ভাষা তারা আয়ত্ত করবে কি করে? পদ্ধতির মধ্যেও তো দেখতে পাই, প্রথম তারা কায়দা-বাগদাদী শিখত, তারপব কালিমা প্রভৃতি। এ ছাডা অনেক পাঠ্যপুস্তকের নামও পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত পরিবাব বাডীতে গৃহশিক্ষক রাখতেন বটে। কিন্তু 'বডা-মিয়াঁ-কা দারস' প্রভৃতি আববী-পণ্ডিতদের ইস্কুলের নামও পাওয়া যায়।

শৃঙ্খলা-বিধান সম্পর্কে পারসী ইস্কুলে যা দেখা গেছে—এখানেও অনেকটা তাই। শিক্ষার্থী বড হয়ে এই সব শিক্ষককে মনে রাখত। দেখা যায়, রমজানে তারা তাদের আরবী শিক্ষককে বৃত্তি দিচ্ছে। অথবা ধর্মঅনুষ্ঠানে বা বিবাহ ইত্যাদিতে তাঁদের বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ করছে। এ ছাডা ব্যক্তিগত পরিচর্যাও ছিল। ছাত্রেরা তাঁদের জল তুলে দিত, বাজার ক'রে দিত। শিশু পরিচর্যা করত। অর্থাৎ, শিক্ষক যেন সমাজ-ধর্মের একটি স্বীকৃতি, এবং তাদের বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল সমাজ। আর ইংরেজ আমলে এই সব ইস্কুলের বিরুদ্ধতা কি ভাবে করা হয়েছিল? যদি কেউ কোরান ইস্কুলে পড়তে যেত—তবে মুহুরীর (শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী) তহশীলদার লম্বারদার প্রভৃতি তাকে ব্যঙ্গ করত, ধমক দিত—বলত, "এ হে হে! কোথায় যাচ্ছিস! ও ইস্কুলে পড়ে কি আর আহার সংস্থান হবে রে নির্বোধ (Hear thou wilt get no credit by going to this School)। কেউ যদি এই প্রচলিত ইস্কুলে যেত তবে রাজ-কর্মচারীদের গাত্রদাহ উপস্থিত হ'ত। সরকারী ইস্কুলের শিক্ষক লম্বারদারকে ধমকে বলত, সরকারী কানন তুমি মানছ না কেন?

মিঞাজীকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দাও নচেৎ তোমার নামে আমি নালিশ ক'রে দেব।" (If the chief muharrir or Zaildar sees a boy read in an indigenous School, he gets a burning in his body and when the Government schoolmaster sees the boy, he abuses the teacher and tells the lumberdar, "Will you not obey the order of Government? Bring the teacher to his senses, or else I will complain against you."......... . he will certainly abuse and put down the indigenous teacher and tell him, "What do you know? Tell me "Where is God, and how do the heavens and earth go round?" When the teacher can make some suitable reply, then the chief muharrir turns on the lumberdar and says, "You are not fit to be a lamberdar, I will report you"......... The result is that no indigenous school can continue to exist" —Leitner, page 71-72)।

আরবী ইস্কুল ঃ আরবী ইস্কুলে স্বভাবত বয়স্ক ব্যক্তিরা পড়তেন। একে অনেকটা কলেজ-মতো বলা চলে। এই ইস্কুল সম্পর্কে সরকারের একটা বিকৃত মনোভাব দেখা গেছে। সে সময় সরকারী বিভাগ থেকে মন্তব্য করা হয়েছিল, এখানে ব্যাকরণ পড়ানো হয় না, যা পড়ানো হয় তার কোন পদ্ধতি নেই। একথা সর্বৈব মিথ্যা বলেই মনে হয়। কারণ, তৎকালে বিশেষ ক'রে পাঞ্জাবে আরবী চর্চা সমগ্র মুসলমান সমাজের গৌরবের বিষয় ছিল। বিশেষ ক'রে এখানকার দেওবন্দ আরবী ইস্কুল তো আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ছিল। আরবী ইস্কুলে ব্যাকরণের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত। প্লেতো আরিস্ততল গাজ্জালী পর্যন্ত দর্শন শাস্ত্র পড়ানো হ'ত। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখাই এই আরবী-ইস্কুলে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। আরবী ব্যাকরণের মধ্যে নাম পাওয়া যায়—মিজান উস্‌সার্ফ, মুনসাইব, সর্ফমীর, সর্ফি বহাই, পঞ্জগুঞ্জ, জুবদা, জব্‌রাদি, জারিরি, শাফিয়া, মারা-উল-আরোয়া প্রভৃতি। সাহিত্যের মধ্যে—আলিফ্ লাইলা, মুতনব্বী প্রভৃতি এমনি ক'রে—যুক্তি-বিজ্ঞান-দর্শন, ইসলাম-বিধি, (ফিক), বিচার-বিধি, অলঙ্কার শাস্ত্র, হাদিস্ জ্যোতির্বিজ্ঞান—প্রভৃতি। পাঞ্জাব, দিল্লী, আলিগড়, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, শাহারানপুর, দেওবন্দ্ প্রভৃতি স্থানে আরবী-ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেওবন্দ্

সম্পর্কে কাহিনী আছে, এখানে অন্ধ ছাত্রও অঙ্ক শিখছে, বোর্ডে জ্যামিতি রেখা অঙ্কন করছে।

তবু সরকার বলেছেন, এখানে ব্যাকরণ পড়ানো হয় না। বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ পুরনো ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে হলে তার বদনাম দিতেই হ'বে। মেকলের পথ এঁরা প্রস্তুত করে রাখছেন।

সংস্কৃত-ইস্কুল ঃ

পাঞ্জাবে শিখ ইস্কুলকে পাঠশালা বলত, আবার বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃত শিক্ষা-কেন্দ্রকেও পাঠশালা বলা হ'ত। প্রথমে নাগরী বা গুরুমুখী বর্ণমালা সাহায্যে পাঠ সুরু করে পরে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় ছাত্রেরা অগ্রসর হ'ত। ব্যাকরণ, কবিতা, অলঙ্কার শাস্ত্র, পুরাণ ইতিহাস, জ্যোতিষ, বেদান্ত ন্যায়, মন্ত্র-তন্ত্র, পূজা পাঠ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি পাঠ্য তালিকায় ছিল।

এই টোল বা পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা নিজেদের বাড়ীতেও শিক্ষাদানকার্য চালাতেন। শিক্ষার্থীদের পোষাক-আশাকও তাঁরাই দিতেন। বিষয় অনুসারে গুরুমাশয়দের ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেত,

(১) ব্যাকরণ, হেতুবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, সাহিত্য অথবা দর্শন এর যে কোন একটি পড়াতেন

(২) হিন্দু শাস্ত্র পড়াতেন

(৩) হিন্দু জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং জ্যোতিষী

(৪) আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

আমরা সংস্কৃত শিক্ষা সম্পর্কে পূর্বে বলেছি, এখানে বললাম এই জন্য যে, ইংরেজ আগমনের প্রাক্কালেও সংস্কৃত শিক্ষা প্রবল ভাবে দেশে চলছিল—সেই কথা বোঝাতে।

সংস্কৃত বিদ্যালয় সম্পর্কে এ্যাডাম সাহেব বাংলাদেশের অবস্থা যা বর্ণনা করেছেন (১৮৩৫-) তাই বোধ হয় তৎকালে ভারতের পক্ষে সত্য।

পণ্ডিতদের তিনি পেয়েছেন ২৫ বছর বয়স থেকে ৮২ বছর বয়স পর্যন্ত। তাঁদের বিদ্যার গৌরব ছিল।

ছাত্রদের দু রকম শ্রেণী ছিল। যারা গ্রামবাসী, আর যারা বহিরাগত। গ্রামবাসীরা তাদের বাড়ী থেকেই পণ্ডিতদের টোলে পড়তে আসত আবার ফিরে যেত। কিন্তু বহিরাগতরা পণ্ডিত মশায়ের গৃহেই বাস করে পড়াশুনা

করত। সমগ্র পাঠক্রম শেষ করতে অনেক ক্ষেত্রেই ২২ বছর লাগত। তারা যদি ১০ বছর বয়সে পড়াশুনা সুরু করত তা হ'লে তাদের ৩২ বছর বয়সে পড়া সমাপ্ত হ'ত। তিন রকম বিষয় অনুসারে উপাধি ছিল—(১) শাব্দিক (২) স্মার্ত, (৩) নৈয়ায়িক। নৈয়ায়িকের সম্মান সর্বোচ্চ, তারপর স্মার্তদের, তারপর শাব্দিকের। পুস্তক ইত্যাদি খরিদ-খাতে খরচ ছিল তাদের বৎসরে ৭ টাকা। পুস্তক ব্যবসায়ী বিশেষ ছিল না, পুরুষানুক্রমে তারা পুস্তক সংগ্রহ করত, অথবা নকল ক'রে নিত। অ্যাডাম সাহেব সংস্কৃত শিক্ষাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন :

(১) সাহিত্যের বিদ্যালয়—৭ থেকে ১৫ বছর বয়সের মধ্যে ছাত্রেরা এখানে আসত, আর বেবিয়ে যেত ২০ থেকে ৩২ বছর বয়সে।

তারা এর পূবে শিখে আসত—লেখা, একটু পাঠকরা, একটু অঙ্ক। কাজেই সংস্কৃত বিষয়ে তারা এক বকম অজ্ঞই ছিল।

প্রথমেই তারা ব্যাকরণের বিভাগে যোগ দিত। নানাপ্রকার ব্যাকরণ ছিল—পাণিনি, কলাপ, মুগ্ধবোধ এবং রত্নমালা। বিশেষ পদ্ধতি এবং জীবেশ্বরী এবং প্রভাব প্রকাশিকার ব্যাখ্যা অনুসারে এগুলো পড়ানো হ'ত। এর পর শব্দতত্ত্বের মধ্যে অমর কোষ (রঘুনাথ চক্রবর্তীর টীকা সমেত)।

কাব্যের মধ্যে প্রথমেই ভট্টি কাব্য ; তারপব রঘু কাব্য, মাঘ কাব্য, নৈষাধ কাব্য, ভৈরবী কাব্য ইত্যাদি।

অলঙ্কার শাস্ত্রে—ছন্দোমঞ্জরী, কাব্য প্রকাশ প্রভৃতি।

(২) **স্মৃতি-র বিদ্যালয় :** সুরু করত ৯ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে, সমাপ্ত করত ১৮ থেকে ৩২ বছর বয়সে।

(৩) **তর্কশাস্ত্রের ইস্কুল :** ১০ থেকে ১২ বছরের মধ্যে যোগদান করত, ২৪ থেকে ৩২ বছর বয়সে সমাপ্ত করত। ভাষা পরিচ্ছেদ, ব্যাপ্তি-পঞ্চক, ব্যুৎপত্তিবাদ প্রভৃতি পড়ানো হ'ত।

(৪) পুরাণ শাস্ত্রের বিদ্যালয় :

পুরাণের মধ্যে মহাভারত, জ্যোতিষের জ্যোতিষতত্ত্ব, জাতকচন্দ্রিকা ইত্যাদি। এই সঙ্গে তন্ত্রও পড়ানো হ'ত, অথবা তন্ত্রের জন্য ভিন্ন বিদ্যালয়ও ছিল। তন্ত্রের পাঠে ব্যাকরণ মোটামুটি, বেদান্তও তাই, কিন্তু 'তন্ত্র সার' বিশেষ ভাবে পড়তে হ'ত।

(৫) **আয়ুর্বেদ :** ২২ বছর থেকে ২৫ বছরের মধ্যে ছাত্রেরা আসত. পড়বার কাল ৫ থেকে ৮ বছর। নিদান, চক্রদত্ত, দ্রব্য গুণ, রত্ন মালা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করতে হ'ত।

যাই হোক—সংস্কৃত শিক্ষার কাল অনুযায়ী এই ধরণের বিদ্যালয়কে তিনটি বিভাগে ফেলা যায়—প্রথম ৪ বৎসর প্রাথমিক, পরবর্তী দুবৎসর মাধ্যমিক, আর তারপরের তিন বছর উচ্চতর বিদ্যালয়। ইস্কুল বসত সকাল ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ; ১১টা থেকে ১টা—দুপুরের এই দুঘণ্টা বিশ্রাম। পাঞ্জাবের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা বিশেষ ক'রে আলোচনা করবার কারণ এই যে, পাঞ্জাবই ধরতে গেলে অন্যান্য থেকে পরবর্তীকালে ইংরেজের আওতায় আসে। সেই সময়ে ইংরেজরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ দেখেছিল এবং কিরূপ ছিল, তাকে কিভাবে অপসারিত করা হ'ল—তার মোটামুটি ধারণা থেকে আমরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ধারণাও করে নিতে পারি।

তারপর অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও সুরু হ'ল মিসনারীদের শিক্ষা অভিযান (সিমলার কাছে কোট গড়ে ১৮৪৩ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটীর প্রথম ইস্কুল), জলন্ধরে এল আমেরিকার মিশন (১৮৪৮), তারপর লাহোর, লুধিয়ানা, অমৃতসর, আম্বালা।

এরপর সরকারী ইস্কুল। প্রথমদিকে এই ইস্কুলের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ ছিল না (প্রাথমিক, মাধ্যমিক প্রভৃতি শ্রেণী নেই)। তখন প্রবেশিকা পরীক্ষা নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ও নেই। প্রথম সরকারী ইস্কুল স্থাপিত হল ১৮৪৮ সালে সিমলাতে ; সেই বছরেই দ্বিতীয় ইস্কুল হোসিয়ারপুরে। ১৮৪৯ সালের মধ্যে আরও ১৩টি ইস্কুল খোলা হ'ল। এমনি করে অমৃতসরে, রাওলপিণ্ডিতে, গুজরাট, শাহপুর, মূলতান, ঝিলাম, জলন্ধরে। অর্থাৎ ১৮৫৪ সালের মধ্যে ৮টি ইস্কুল স্থাপিত হ'ল উচ্চতর শিক্ষার জন্য। এর মধ্যে অমৃতসরের ইস্কুলটি প্রসিদ্ধ ছিল। সমগ্র জেলাসহরে নতুন ইস্কুল স্থাপিত হয়ে গেল, তাছাড়া থাকল তহ্‌শীলদারী ইস্কুল।

এই প্রসঙ্গে আমরা বাংলা দেশের বাংলা-শিক্ষাটির অবস্থা একবার আলোচনা ক'রে নিই।

এ্যাডাম সাহেব ভারতবর্ষে আসেন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের নির্দেশে তিনি বাংলাদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে অনুসন্ধান করবার জন্য অধিকার প্রাপ্ত হ'ন (special commission হিসাবে)। সহর

এবং গ্রামে তিনি সন্ধান কার্য চালালেন। ১৮৩৫ থেকে ১৮৩৮ এর মধ্যে তিনি মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, হুগলী, বর্ধমান, যশোর, নদীয়া, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, ময়মনসিং, শ্রীহট্ট, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, চব্বিশ পরগণা, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুব, পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, দক্ষিণ বিহার, এবং সহর কলকাতা, চুঁচুড়া, ঢাকা, বর্ধমান, এবং মুর্শিদাবাদের সংবাদসংগ্রহ করেন। তিনি ইস্কুলেব কয়েকটি শ্রেণী করে নিলেন।

(১) প্রচলিত প্রাথমিক ইস্কুল, (২) প্রাথমিক কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, (৩) এবং প্রচলিত শিক্ষাকেন্দ্র।

প্রথম শ্রেণীর ইস্কুল হচ্ছে—যে গুলোতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ দেওয়া হয়, এবং যেগুলো দেশীয় লোকেব মধ্য থেকে জাত এবং তাদের দ্বাবা পরিচালিত।

দ্বিতীয় শ্রেণীব ইস্কুলের মধ্যে পড়ে, বিদেশী পদ্ধতি এবং দেশীয় শিক্ষা-পদ্ধতি মিশিয়ে পড়ানো হয় এবং যে সব ইস্কুল বিদেশী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পবিচালিত।

তৃতীয় শ্রেণীব মধ্যে পড়ে, টোল চতুষ্পাঠী, পাবসী, আরবী, মাদ্রাসা প্রভৃতি। পাঞ্জাবেব ইস্কুল প্রসঙ্গে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর ইস্কুল সম্পর্কে আলোচনা কবেছি। প্রথম শ্রেণীব ইস্কুলকে আবাব তিনি দুটো ভাগে ভাগ করলেন—(১) গোষ্ঠীগত পাঠনা যেখানে হয় (communal school) (২) এবং গৃহে এনে পড়ানো হয় অর্থাৎ পারিবারিক ইস্কুল।

ভাষা পড়ানোব মাধ্যম হিসাবে আবাব এগুলোর ভাগ কবা হয়, (ক) বাংলা (খ) হিন্দী (গ) সংস্কৃত (ঘ) পারসী, আববী।

রাজশাহীব একটি প্রাথমিক ইস্কুল দেখে তিনি স্থিব করলেন, এখানে মুদ্রিত পুস্তকই যে কেবল নেই তা নয়, এখানে কোন বকম হাতে-লেখা বইও নেই। গুরুমশায় সব স্মৃতি থেকে পড়ান। লেখার মধ্যে একটা খুব গতানুগতিক সরস্বতী বন্দনা যথা,

সরস্বতী বন্দনা

রাগিণী ভৈরবী।

যা কুন্দে তুষারহারধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা,
যা বীণা বরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা,
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষ জাড্যাপহা।

এই বন্দনা মুখস্থ করতে হ'ত লিখতেও হ'ত। মাটিতে হাঁটু গেড়ে ইস্কুল থেকে যাওয়ার আগে সর্দার পোড়োর সঙ্গে সঙ্গে বন্দনা করতে হত। উচ্চারণ, ধ্বনি সব দিক নজর দিতে হবে। এ ছাড়া নামতা, কিছু শুভঙ্করীর আর্যা।

এ্যাডাম সাহেব যদি এখানেই শেষ করতেন তাহলে, আমাদের একটা সমস্যার মীমাংসা হ'ত এই ভেবে যে সত্যিই আমাদের প্রচলিত ইস্কুল অকেজো ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যা বললেন তাতে মনে হয়, নানা অবহেলাতেও প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিব শেষ অগ্নিই যদি এই হয় তবে তো পদ্ধতি নিয়ে আমাদের লজ্জা পাওযার কিছু ছিল না। তাঁর বর্ণনা নিম্নরূপ।

শিক্ষাকালকে ৪টি স্তবে ভাগ করা যাক। প্রথম স্তর দশ দিন মাত্র। এই সময় ছাত্র মাটিতে খড়ি পেতে (বাঁশেব শলাকা বা চটা) অক্ষর সাজাত। দ্বিতীয স্তর আড়াই বছর থেকে চাব বছর পযন্ত চলত। এই সময় তালপাতায় শিখতে হ'ত; কেবল বর্ণের গঠন এবং ধ্বনি শেখানো হ'ত; এই বর্ণ লেখায় বড ছোট প্রভৃতি দিক তত নজর দিতে হ'ত না; কিন্তু শিক্ষক তাঁর লৌহ-শলাকায় তালপাতায় কোন্ বর্ণ কত বড বা ছোট হবে তা দেখিয়ে দিতেন; ছাত্র সেই লেখার উপর খাগেব কলম দিয়ে, খড়িমাটি দিয়ে দাগা বুলাত বারবার এইরূপ করতে হ'ত। তারপর সে স্বাধীনভাবে কোন রকম আদর্শ না নিয়ে লিখবে। তারপর সুরু হল, যুক্ত ব্যঞ্জন লেখা, উচ্চারণ করা, বর্ণ বিশ্লেষণ করা এবং ব্যক্তিব নাম লেখা। ব্যক্তির নাম, জাতির নাম, নদীর নাম, পাহাড়ের নাম লিখ'তে লিখতে সে অগ্রসর হবে। তারপর লিখতে আর পডতে, ধারাপাত প'ড়তে মুখস্থ করতে আরম্ভ করবে।

তৃতীয় স্তরে—তিন বছর ধরে। এবার কলাপাতায় লিখবে। এই সময় পত্র লিখন, বচনার বাক্য সমন্বয় করতে এবং কথ্য ভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার পার্থক্য নির্ণয কবতে শিখবে। কথা বলেও অনেক সময়ই লেখার ভাষাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে ফেলা হয়, ক্রিয়ারূপে তো বটেই, কোন সময় ব্যঞ্জনবর্ণ বা স্বরবর্ণ বাদ দিয়ে কথা বলা হয়—এই সব পার্থক্য সম্পর্কে সে অবহিত হবে; তা ছাড়া অঙ্কের যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ কিন্তু পৃথকভাবে শেখানো হ'ত না। কুড়ির ঘর পযন্ত নামতা মুখস্থ করে সেই জ্ঞান এবং যোগ বিয়োগের জ্ঞান নিয়ে তারা গুণ ভাগ অঙ্ক করত। অঙ্কের এই ভিত্তির পর অঙ্ককে দুটো বিষয়ে ভাগ করা হয়; কৃষিবিষয়ক এবং বাণিজ্য বিষয়ক। কৃষি বিষয়ক অঙ্কে—হিসাব নিকাশ, দিন বা মাসের মুজুরী নির্ণয়, কাঠাকালি, বিঘাকালি, কর-

নির্ধারণ প্রভৃতি। বাণিজ্য বিষয়ক অঙ্কে—সেরকষা, মণকষার মধ্য দিয়ে মূল্য নিরূপণ; ছটাক কাঁচ্চার মূল বের করা, সুদকষা প্রভৃতি।

চতুর্থ স্তর দু বছর। পূর্বে যে সব অঙ্ক বা পত্র লিখন শিখেছে সেইগুলির উচ্চতর শিক্ষা এই স্তরে দেওয়া হয়। তারপর কাগজে লেখার অভ্যাস এক বছর করে; তারা পড়া যখন সাঙ্গ করে রামায়ণ, মনসামঙ্গল পড়তে সক্ষম হয়।

হয়ত এই ইস্কুলের শিক্ষকেরা যন্ত্রবৎ পড়িয়ে যেতেন। এ্যাডামের কথা হয়ত সত্য যে তারা জানে না—ছাত্রের মনের উপর তারা কতখানি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু পদ্ধতির মধ্যে যে বিশ্লেষণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে কোন কালে যে শিক্ষকেরা পড়ানো-শোনানো বিষয়ে ভেবেছেন তার প্রমাণ মেলে। শুধু পদ্ধতির কথাই যদি ভাবা যায়, তবে মনে হয় বহু বিদেশী শিক্ষার্থীদের সান্নিধ্যে এসে আমরা এখনও পর্যন্ত বোধ হয় ঐ স্তর থেকে এগোই নি, বরং তারা দেশজ পদ্ধতিতে যতখানি সফল হয়েছেন আমরা দেশকে পরিত্যাগ করে যেসব 'ডাইনামিক' পদ্ধতি এনেছি তাতে এ দেশের জলহাওয়া ম্যালেরিয়া লাগিয়ে দিয়েছে। এই গুরুমশায়েরা দোরে দোরে ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ করতেন। অন্নচিন্তা তাঁদের চমৎকার। তবু তাঁরাই তো সাগ্নিকের মতো শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

তাঁদের ইস্কুলঘর ছিল না। কোন ইস্কুল বসত চণ্ডীমণ্ডপে, কোন ইস্কুল জমিদারের বৈঠকখানায় অথবা পোড়ো বাড়িতে। তবু শিক্ষক ছিলেন, ছাত্র আসত।

পারিবারিক ইস্কুল ছিল, সাধারণত জমিদার, তালুকদার প্রভৃতি একটু সমৃদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত গৃহস্থদের জন্য। বাংলা দেশে হিন্দুদের জন্যই এই ইস্কুল বেশি প্রচলিত ছিল। এখানকার শিক্ষক কাকা, মামা, দাদা বা পূজারী ব্রাহ্মণ হ'তেন।

এ্যাডাম সাহেব সমস্ত জড়িয়ে এই ধরণের ইস্কুলের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হবে বলে সিদ্ধান্ত করেন।

এ্যাডাম সাহেব বলেন, পদ্ধতি নিয়ে বা বিষয়বস্তু নিয়ে মন্তব্য না করে এই কথাই বলতে হয়—এই সব ইস্কুলের শিক্ষায় চিত্তের প্রসারতা ঘটায় না। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করতে সাহায্য করে না।

এ্যাডাম সাহেব এই ইস্কুল সম্পর্কে যে-ত্রুটির কথা বলেছেন তা সর্বাংশে স্বীকার্য; আরও স্বীকার্য এই ইস্কুলের শাস্তিদান প্রথা যা রেভারেণ্ড লাল বিহারী

দে তাঁর পুস্তকে লিখে গেছেন (Bengal Peasant's Life)। শাস্তিদানে বাংলার ইস্কুল একটু নৃশংসতার পরিচয়ই দিয়েছে। কি যে সে সামাজিক কারণ জানি না। কল্পনায় আসতেই পারে না। পড়ুয়াকে গাছের মগডালে ঝুলিয়ে নিচুর দিকে মুখ করিয়ে রাখতে হয় ; ভাবা যায়না এর পরও জলবিছুটি গায়ে লাগানো যায়। ১৮৪৪ সালে ডাক্তার আলেকজান্দার ডাফ্ পাঠশালার এই চিত্র ক্যালক্যাটা রিভিয়ুতে অঙ্কিত ক'রে দিয়েছেন। সমাজকর্মীরা হয়ত সেকালের গুরুমশায়দের সামাজিক মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে পারেন কেন এমন হয়। কিন্তু বর্তমান কালেও কোন কোন মিশনারী ইস্কুলে দেখেছি —বেত্রাঘাত প্রথা নৃশংস ভাবেই চলে। তবু মন্দ যা তা মন্দই।

এ্যাডাম সাহেব এই প্রচলিত ইস্কুলকে সংশোধন করবার জন্য কিছু মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু লর্ড বেন্টিঙ্ক, মেকলে মাতৃভাষায় মূলেই কুঠারাঘাত ক'রে বসলেন। অকল্যাণ্ড (১৮৪০ সালে) টালবাহানা করলেন, এদিকে পাবলিক ইনস্ট্রাকসন বিভাগ মেকলের নীতি আঁকড়ে থাকলেন। যুক্তি হল, "শুধু শুধু টাকা খরচ করব কেন ?" জেনারেল কমিটির অনেক সভ্য বললেন—অ্যাডাম সাহেবকে একটা সুযোগ দেওয়া হ'ক যে, কলকাতার আশেপাশে ২০টি ইস্কুলকে কেন্দ্র করে তাঁর পরীক্ষাকার্য চালান। কিন্তু তাও স্বীকার করা হ'ল না। অ্যাডাম সাহেব বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করলেন। সরকারী কর্তৃপক্ষের জিদটা লক্ষ্য করবার মতো। এর পিছনে কি ইতিহাস আছে ? শুধু কি কেরাণীই তারা সৃষ্টি করতে চায়, না আরও কিছু ?

জেনারেল কমিটি কিন্তু একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। এই জন্যই তারা এ্যাংলো-ভার্ণাক্যুলার নামে আর-এক রকম ইস্কুলের প্রবর্তন করে। এই ইস্কুল কোথায় স্থাপিত হবে? সহরে এবং প্রভাবশালী সমাজ-ব্যক্তিদের সুবিধার্থে (their efforts would continue to be directed to the establishment of Anglo-Vernacular schools in the principal towns and to the improvement of education among the more influential classes of the people. Stark—Vernacular education in Bengal, 1813—1912 Page ; 57)।

এই প্রস্তাব দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কারণ, প্রধান প্রধান নগর গড়ে উঠেছে লব্ধ-মর্যাদা অভিলাষী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা। এই মর্যাদার প্রত্যাশী ব্যক্তি দেশের সনাতন ব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগ করতে পারে না। তাদের

আভিজাত্য, তাদের বিত্ত-সম্পদ সমস্তই অর্জিত হয় শাসকবর্গের মতবাদ অনুযায়ী। কাজেই, এ একরকম জানা কথা যে, এখানে মাতৃভাষা সাদরে গৃহীত হতে পারেনা; অ্যাটালাণ্টা সোনার ফল কুড়োতে বসে গেল।

এঁরা বললেন, ইংরেজি খুব সাধুভাবে মাতৃভাষাকে অপসারিত করছে না, কাজেই এই 'নষ্টামি' কিছুটা সংযত করা দরকার (they admitted the importance of vernacular education, and resolved to prevent English studies from unfairly displacing vernacular studies. Stark. 57)। অসতর্ক মুহূর্তে ইংবেজির অপকীর্তি এঁরা স্বীকার ক'রে বসেছেন। এই স্বীকৃতি সত্যদ্রষ্টার ব'লে মনে হয়না, কারণ কয়েকবছর আগেই তো এই নিয়ে অ্যাডাম পদত্যাগ করলেন। মনে হয়, মাতৃভাষাকে নিজদের সাজানো ঘরে এনে পরীক্ষাকায ক'বে অমনোনীত করবার অভিলায। কি করলেন তাঁরা ?

তাঁদের নিয়ন্ত্রিত ইস্কুলে একদল শিক্ষক থাকবেন ইংরেজি পড়ানোব জন্য, আর একদল থাকবেন মাতৃভাষা শেখানোর জন্য। এই নতুন ইস্কুলে তাদের মাতৃভাষা শেখানো হবে, শুদ্ধ ক'বে লিখতেও শিখবে। ইংরেজি ও বাংলা বর্ণমালা একই সময়ে শিখতে সুরু করবে—আর দুটি ভাষা যুগপৎ চলতে থাকবে। শিক্ষায় এবার একটা দ্বিধা এসে গেল। এই প্রাথমিক অবস্থায় ছাত্রেরা ইংরেজি শব্দেব অর্থ মাতৃভাষায় বলবে। বর্তমান কালের ইংরেজি পড়ানোর সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক। আমরা এখন, হয়ত, এই পদ্ধতিকে 'বুদ্ধিদীপ্ত পদ্ধতি' নয় বলে গালাগালিও দিতে পারি। এই থেকে একটি অভিজ্ঞতা জন্মাচ্ছে, কোন পদ্ধতিকেই নিন্দা করা উচিত নয়; যে কোন ইস্কুল, সেই যুগের প্রয়োজন মেটাতে কিছু কিছু পদ্ধতির আবিষ্কাব করে। কাজেই, কোন পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা যেন সার্বিক পদ্ধতি ব'লে কিছু একটা মনে না করি। পরবর্তী স্তরে ছাত্রেরা ইংরেজি আর বাংলা রচনাংশ বাংলা বা ইংরেজিতে যথাক্রমে অনুবাদ করবে। অনেক সময মৌলিক সাধুরচনাকে গ্রাম্য বা চলিত ভাষায়ও রূপান্তরিত করবে। কিন্তু পড়ানোর কার্যক্রমে এর 'ওজন' কতখানি। নিম্নশ্রেণীতে কার্যতালিকার $\frac{1}{3}$ অংশ, উপরের শ্রেণীতে $\frac{1}{4}$ সময় মাতৃভাষা পড়ানোয় নিযুক্ত হবে। এ ছাড়া বাংলাভাষার আরও একটু মর্যাদা দেওয়া হ'ল। নিম্ন ছাত্রবৃত্তি এবং উচ্চ ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় মাতৃভাষা সম্পর্কে ককটি প্রশ্নপত্র থাকবে।

মর্মার্থ হচ্ছে এই ঃ বাংলা আর ইংরেজিকে এক সঙ্গে জুড়ে দেওয়ায় বাংলা বা ইংরেজি শিক্ষা দ্বারা ছাত্রদের মানসিক এবং বৌদ্ধিক যে উন্নতি ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজি শিক্ষাবিদেরা হৈ-চৈ করলেন তা পেছিয়ে পড়ল। থাকল শুধু মুখস্থ বিদ্যা, যার বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসক শিবনেত্র হয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন। ফলে দাঁড়াল এই, ছাত্রেরা কেরাণী হ'তে চাইল; রামমোহন রায়ের ইংরেজিশিক্ষা প্রবর্তনের আসল উদ্দেশ্যকে এই ভাবে মাটি চাপা দেওয়া হ'ল। এমনি ক'রে ইংরেজের কূটচালে রামমোহনরায়কে বাঙালী ভুল বুঝল। আমরা ইংরেজি শিক্ষাকে পরবর্তীকালে এই ব'লে গাল দিচ্ছি যে, তারা আমাদের কেবল চাকুরীজীবী বা কেরানীতে পরিণত করে দিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার এই দোষটুকু দেশকে ধ্বংস করতে পারত না। কেরানী সৃষ্টি কবা হল উপজাত (by product) হিসাবে।

এই কথাটি বোঝা যাবে আর একটি ঘটনা থেকে। প্রথম লেপ্টন্যাণ্ট গবর্ণর (আগ্রার) টমাসন সাহেব অ্যাডামের সন্ধান এবং মন্তব্যকে দেশের মঙ্গলকর ব'লে স্থির করলেন। তিনি অ্যাডামের পরিকল্পনা উক্তপ্রদেশে চালু করবেন ব'লে মনস্থ করেন। তিনি বুঝেছিলেন দেশের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যদি লেখাপড়া ছড়িয়ে না পড়ে তবে দেশের উন্নতি নেই। তিনি কি উদ্দেশ্যে কৃষকদের জাগিয়ে ইংরেজ সরকারের ভক্ত তৈরী করতে চেয়েছিলেন জানিনা, কোন রাজনীতির চাল ছিল কিনা বলতে অক্ষম— অর্থনীতিবিদেরা বলতে পারেন। কিন্তু ভারতের স্বভাবটি তিনি ফিরিয়ে আনতে উপক্রম করেছিলেন। সেই কথাই বলছি। তাঁর পরিকল্পনা—

একটি বিশেষ আয়তনের প্রত্যেক গ্রামে একটি ক'রে ইস্কুল থাকবে। গ্রামবাসীদের জমির বরাদ্দ থেকে শিক্ষককে ন্যূনপক্ষে ৫ একর জমি বৃত্তি স্বরূপ দেওয়া হ'বে—এর আয় বার্ষিক ২০ থেকে ৪০ টাকা তৎকালে। এই প্রদত্ত জমি সম্পর্কে আর লোকের কোন কথা বলবার থাকবে না—সরকার তা দেখবেন।

কোর্ট অব ডিরেক্টর টমাসন সাহেবের সব কথাই মানলেন, ইস্কুল খোলা হোক, প্রত্যেক গ্রামেই হোক—কিন্তু ভূমি ব্যবস্থার কথা যা হ'ল তা নয়। ওতে উত্তরাধিকার সূত্রে শিক্ষকের একটা দাবী জন্মে যাবে—এমন হবে, পরবর্তীকালে ঠিকমতো শিক্ষাদান না করলেও জমি ভোগ করতে চাইবেন। না, ও হবে না। টমাসন সাহেবকে পরিকল্পনা বদল করতে হ'ল। তাঁরা

শিক্ষককে বেতন দিবেন, ভালো কাজ করলে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু জমি নয়। শিক্ষকের মাহিনা, ইস্কুল-ব্যয় প্রভৃতি তদারক করবার জন্য একজন শাসকশ্রেণীর লোককে নিয়োগ করা হ'ল, নাম হ'ল ভিজিটর জেনারেল (Visitor General) বেতন হ'ল বছরে ১২০০ পাউণ্ড এবং উপযুক্ত সফর ভাতা। হিসাব করে দেখা গেল, এই বাবদ ২০,০০০ পাউণ্ড মতো ঐ প্রদেশে খরচ পড়ে। প্রাথমিক কাজ সুরু হ'ল বছরে ৩৬০০ পাউণ্ড ব্যয় পরিমাণ নিয়ে। ১৮৫০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী আইন পাশ হ'ল।

এই যে পাল্টা ব্যবস্থা—এর কারণ কি? মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপারটি ঘটছে আমেরিকা আবিষ্কৃত হওয়ার প্রায় ৪০০ বছর পর। ভারতবাসী যে রেড-ইণ্ডিয়ান বা নিগ্রো হয়ে যায়নি তা বোধ হয় কপালের জোরে কিংবা ১৮৫৭ সালেব সিপাহী বিদ্রোহে। বণিক চেয়েছিল নতুন সাম্রাজ্য গঠন কবতে কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী সে অভিপ্রায়ে বাধ সাধলেন, কারণের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহ অন্যতম। কোম্পানী আগাগোড়া এই পথে চলছিল। কাজেই ম'নে হয়, তারা কেরানী চায় নি, তারা চেয়েছিল উৎসন্ন ক'রে দিতে। বাঙলা দেশের কবি কত যে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন বোঝা যায় যখন পড়ি—

'নিজ বাসভূমে পরবাসী হয়ে।'

স্থাবর-সমাজ করতে দিতে তারা চায় না। জঙ্গম সমাজ আমাদেরকে সেই অর্থে জঙ্গমও করতে চায় নি। তারা চেয়েছিল অনেকটা ক্রীতদাস ক'রে তুলতে। আমরা ক্রীত হয়ত হয়েছিলাম কিন্তু কপাল জোরে দাস ব'নে যাইনি কারণ ঐ গুটিকতক সিপাহী আর গোঁড়া লোকদের তেজস্বিতায়। টমাসন চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের গ্রামীণ সমাজকে প্রতিষ্ঠা করতে। বিলেতের বণিক সহজাত-প্রবৃত্তির বশে তাই তারা আপত্তি করল।

টমাসন ছিলেন শিক্ষা-প্রেমী। হার্ডিঞ্জ সাহেব (১৮৪৪ খৃঃ ১১ই অক্টোবর) প্রস্তাব করলেন, যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদেরই সরকারী চাকরী দেওয়া হবে—অপরদের নয়, তখন টমাসন প্রতিবাদ করলেন। "এমনি ক'রে কি দেশের বুদ্ধিমান ছেলেদের সরকার-আশ্রিত ক'রে তোলা হবে না? এতে কি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে না? সেই 'পরিস্রুতি মতবাদের' (Filtration theory) বিরোধী কাজ করা হবে না? কারণ, এমনি করে যদি সরকারী কাজে তাদের আকৃষ্ট করি, উচ্চ মধ্যবিত্ত যদি এমনি করে দেশ ছেড়ে চলে আসে তবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করবে কে—যা আমরা

চেয়েছিলাম ? শিক্ষা তো তা হ'লে সেই অজ্ঞ কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের হাতে পড়ে থাকবে ? (Is it not possible that the Resolution wrought in part, the destruction of the 'filtration theory' by attracting to the Services of Government those members of the middle and upper classes whom it had all along been a fond desire to convert into teachers of the masses—that it made straight the path of escape for those who, under the influence of caste prejudice, shrank from becoming schoolmasters to the profanum vulgus ?—Stark, page 65).

পলাতকই সৃষ্টি করতে চায় এরা। বুদ্ধিমান সমাজ পলাতকই হ'ল কেবল তাই নয়, বণিকের দরজায় বাঁধা পড়ে থাকল। ঔপন্যাসিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পলাতকদের সম্পর্কে 'দেনাপাওনা'তে লিখে গেছেন। তাদের যদি ভূমি নির্মোক ক'রে দেওয়া যায় তবে নীলচাষ, চা আবাদ এবং আরও প্রবঞ্চনার কষণা ঠেকাবে কে ? (১৭৮৩ সালে মালদহের কমার্সিয়াল রেসিডেণ্ট গ্রাণ্ট সাহেব সরকার প্রদত্ত জমিতে গোয়ামাটি নামক স্থানে নীল বুনছেন)।

অকল্যাণ্ড শিক্ষা-খাতে অধিক বরাদ্দের ব্যবস্থা করার পর থেকে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাক্‌সন সম্পর্কে ভাববার সময় এল। কাজেই ১৮৪২ সালে তার বদলে কাউন্সিল অব এডুকেশন স্থাপিত হয়। ডক্টর মোয়াট হলেন সম্পাদক, আর দুজন হিন্দু সভ্যের মধ্যে থাকলেন—রসময় দত্ত ও রাধা কান্ত দেব। অন্যান্য সদস্য হচ্ছেন— সি. এন. ক্যামেরণ; জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড ; এফ. মিলেট ; এফ. জে. হ্যালিডে ; এচ. ভি. বেইলি ; সি. সি. এগারটন। অর্থাৎ পূর্বের মতো এটিও একটি বেনামী শিক্ষা বিভাগ মাত্র।

১৮৪৩ সালের সরকারী সাহায্যকৃত ইস্কুল হচ্ছে—হিন্দু কলেজ ও পাঠশালা, হেয়ার ইস্কুল (তখন স্কুল সোসাইটির ইস্কুল) সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা, মেডিকেল কলেজ, হুগলীর মহসীন কলেজ, হুগলীর ব্রাঞ্চ ইস্কুল, ইনফ্যাণ্ট ইস্কুল, সীতাপুর ইস্কুল ও উমরপুর ইস্কুল, যশোহর ইস্কুল ; ঢাকা কলেজ কুমিল্লা ইস্কুল, চট্টগ্রাম ইস্কুল, রামপুর বোয়ালিয়া, বরিশাল প্রবেশনাল, বাঁকুড়া প্রবেশনাল, শ্রীহট্ট ও মেদিনীপুর ইস্কুল। বাংলা দেশে তখন লোকসংখ্যা বোধ হয় ৫ কোটি।

যাই হোক, হার্ডিঞ্জ সাহেবের মত তো কাউন্সিল মেনে চলতে থাকেন। কিন্তু 'চাকরী দেওয়া হবে' বলায় চাকরীবাজ (?) তো ইস্কুল চাইবে! ইস্কুল খুলতে হ'ল। বলা হল জিলা ইস্কুল তো আছে সেখানে তো বাংলা পড়ানো হয়। অর্থাৎ সাধারণ বাঙালীর ভূমি-ব্যবস্থা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের দুর্দশা এমন স্তরে এসে পড়েছে যে, তাদের ঘর ছেড়ে তারা বাইরে আসতে চাইছে। 'লেখাপড়া করলে' এই সর্তটার মধ্যে সে একটু আশার আলোক দেখতে পেল। সবার পক্ষে ইংরেজি শেখা সম্ভব নয়, অত ইস্কুলও তো নেই; সবাই তো আর হাকিম হ'তে চায় না! ফলে বাংলা ইস্কুলের দাবী উঠে। হার্ডিঞ্জ সাহেব কাউন্সিল অব এডুকেসনের বিরুদ্ধতা ক'রে এই ধরণের ইস্কুল খুলতে চাইলেন। এইসব ইস্কুলের নাম হ'ল হার্ডিঞ্জ ইস্কুল।

হার্ডিঞ্জ সাহেবের সঙ্গে কাউন্সিলের বিরোধ কেন ঘটল জানিনা, কারণ মূলনীতিতে দুদলের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা। সেই কথাই একটু বলি। হার্ডিঞ্জ সাহেবের সিদ্ধান্ত সূত্র—

১) 'মাননীয় বাংলার গভর্ণর সঙ্কল্প করেছেন গ্রামের ইস্কুল স্থাপনা করতে; বাঙ্গলা, বিহার এবং কটকের অনেকগুলো জেলা নিয়ে কাজ করতে হবে।'

২) 'যে টাকা আছে তাতে ১০১ টি ইস্কুল স্থাপন করতে হবে। শিক্ষক নিযুক্ত হবেন। এই শিক্ষক মাতৃভাষায় পড়ানো, লেখানো, অঙ্ক কসানো, ভূগোল শেখানো, এবং ভারতের এবং বাংলা দেশের ইতিহাস পড়ানোয় সক্ষম হবেন।

শিক্ষকদের বেতন—	২০ জন শিক্ষকের	মাসমাহিনা ২০ টাকা
	৩০······	······২০···
	৫১······	······১৫··· '

৩) 'ইস্কুলগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে প্রতি জেলার দুটি কি তিনটি বড় বড় সহরে। এই সহরের অধিবাসী উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ক'রে দিতে প্রতিশ্রুত থাকবেন, এবং সেগুলো মেরামতের ভারও বহন করবেন। হাকিমেরা এই ইস্কুলের উপকারিতা বুঝিয়ে দেবেন এবং জনবহুল সহরেই এই ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে নজর দেবেন।' যত কমই হোক ছাত্রদের বেতন দিতে হবে, তা ছাড়া পুস্তক খরিদের পয়সা দিতে হবে (এই বই সাধারণত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটী প্রকাশ করতেন)।'

এই সঙ্কল্পের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট। গ্রামের ইস্কুল, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবে জনবহুল সহরে। অর্থাৎ সহরের গ্রাম্য ইস্কুল। তাহলে বোধ হয় প্রচলিত ইস্কুলের পাঠ-পদ্ধতি রাখা হ'ল! দেখা যাক,

বানান এবং পড়া শেখানোর প্রত্যেক পাঠের পর ছাত্রেরা পুস্তক থেকে কতগুলি শব্দ বারবার খাতায় নকল করবে। যতদূর সম্ভব মুখস্থ বিরোধী পদ্ধতি হবে। মুখস্থ প্রক্রিয়ার প্রতিষেধক বলা হল—শব্দ বানান করা, এবং শব্দগঠন পযবেক্ষণ কবা। কতক্ষণ কববে? যতক্ষণ পযন্ত ছাত্রেরা স্বাধীনভাবে শব্দ বুঝতে না শেখে ততক্ষণ শিক্ষক ধীরে ধীবে তাদের সামনে পড়ে যাবেন। শ্রেণী বিভাগ ক'রে পড়ানো হবে। যে ছাত্র পংক্তির পরে আছে সে যদি পংক্তিব সামনের ছাত্রেব ভুল সংশোধন করে দিতে পারে তবে তারা পরস্পর স্থান পরিবর্তন ক'রে নেবে।'

এরপর বড বড শব্দের বানান শিখবে। শ্রুতলিপি থাকবে। মানসাঙ্ক করবে। আর বইয়ের মধ্যে পড়বে—

(১) কীথ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ
(২) হার্লি „ (বাংলা) অঙ্কের বই
(৩) ইয়েট „ („) পাঠমালা।

(ব্যাকরণ কিন্তু মুখস্থ করতে হবে। পদ পরিচয় করতে শিখবে।)

(৪) মার্সমানে. (বাংলা) বাংলার ইতিহাস
(৫) পিয়ার্সের („) ভূগোল।

তারা অবিরাম রচনা, পত্রলিখন এবং অঙ্ক অভ্যাস করবে। অনেক সময় লিখিত-পরীক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। উচ্চ শ্রেণীর ছেলেবা সপ্তাহে তিনবার রচনা এবং পত্র লিখবে। এগুলির উদ্দেশ্য প্রাসঙ্গিক ক'রে এবং শুদ্ধভাষায় লিখতে জানা।

বেতন ছিল মাসে এক আনা। আর পুস্তক খরিদ।

এই ইস্কুল উঠে যাবেই ধবে নেওয়া যায়। কারণ বেতন না দিয়ে পড়ার দল সহরে বেশি নেই বটে, কিন্তু সহরের লোক বেতন দিয়েই যদি পড়বে তবে ইংরেজি ইস্কুলেই পড়বে! তা ছাড়া এ যেন এক শিক্ষা-কর। সহরের দু এক জন জমিদার সরকারকে খুসী করবার জন্য ইস্কুল-বাড়ী তোলে বটে, কিন্তু খুব আগ্রহ থাকল না। ইস্কুলের প্রতি প্রীতি জন্মাল না। জিলা

ইস্কুলে মাতৃভাষা পড়ানোর ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পুনরায় সহরে এইগুলি চালু করবার সার্থকতা কোথ.য় ?

কাউন্সিলের কর্তৃপক্ষ এইবার হার্ডিঞ্জ ইস্কুলের বিরূপ সমালোচনা ক'রে উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। এই ব্যবস্থার প্রথম ধাপ ইস্কুলের পরিদর্শক পদ সৃষ্টি কবা। ১৮৪৪ সালে বিদ্যালয় পবিদর্শক হিসাবে প্রথম বৃত হলেন ঢাকা কলেজেব অধ্যক্ষ জে. আযালর্ল্যাণ্ড। কিন্তু কাজে যোগ দিতে না দিতেই পরলোক গমন করেন। তার যায়গায এলেন ই. লজ। ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত পরিদর্শকের পদ থাকল।

পরিদর্শক দেখবেন ইস্কুল ভালোভাবে চলে কিনা, এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি। কিন্তু ইস্কুল যে ভালোভাবে চলবেই সেই নীতিটুকু কোথায়? মানবসভ্যতার সৃষ্টি শাসন-বিভাগ। এই বিভাগের কর্তৃপক্ষের একটা ব্যবসায এই "পরীক্ষামূলকভাবে দেখাই ষাক না কেন?" মানুষের বুদ্ধি আছে। সে প্রথম থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পারে কোনটি সমাজে চলবে আর কোন্‌টি চলবেনা। সব কিছুই পরীক্ষা করে সমাজের চিন্তাধারাকে বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে, টাকাপয়সার ছিনিমিনি খেলে পশ্চাৎপদ হওয়ার দরকার পড়ে না। কিন্তু লেন-দেন আর বাজনৈতিক অভিসন্ধি যদি থাকে তবে সমাজের কথা কর্তৃপক্ষ মানতে চান না। লেন-দেনের মধ্যে থাকে আশু স্বার্থ আর রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে থাকে সামাজিক প্রবঞ্চনা। এই কাবণেই হার্ডিঞ্জ ইস্কুলের পতন ঘটল, কিন্তু ঘটোৎকচের মতো সমাজ থেকে কিছু নিয়ে গেল; জমা কিছু পড়ল কোম্পানীর শাসন-নীতির কোঠায়। কাউন্সিল অব এডুকেশন ইংরেজি শিক্ষার নিশান গেড়ে বসল, 'প্রচলিত শিক্ষা-যে দেশ চায় না' সেই যুক্তিতে।

প্রশ্ন উঠতে পারে হার্ডিঞ্জ-এর এই ব্যর্থতাব পর লর্ড ড্যালহৌসি এ্যাডাম এবুং টমাসনের নীতিকে চালু করবার জন্য মিনিট লিখে কাউন্সিলকে আহ্বান করলেন কেন (১৮৫৩ সালের ২১শে অক্টোবরের মিনিট)? মনে হয সাধারণের শিক্ষা সম্পর্কে এই ভাবনা এল তাঁদের দুটো সমস্যা থেকে। একদিকে ইংল্যাণ্ডের গণ-শিক্ষা আন্দোলন আর একদিকে এই দেশের উচ্চ মধ্যবিত্তদের মর্যাদা গৃধ্নুতা। ইংল্যণ্ডের গণ-শিক্ষা আন্দোলনের সমর্থনকারী এদেশে আগত ইংরেজদের মধ্যে যেমন দেখা গেল, তেমনি যে নীতিতে কোম্পানী সমাজ ভাগ করতে চেয়েছিল সেই নীতি ব্যুমেরাঙের মতো

তাদের ঘাড়েই এসে পড়ছিল। রাজপদ চাই, চাকুরী চাই, বিত্ত চাই। কাজেই কোম্পানীকে সাধারণের দিকে হাত বাড়াতে হ'ল যাতে অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি হতে পারে।

১৮৫৪ এবং '৫৯' সালের শিক্ষা-নির্দেশ তারই প্রতিরূপ। এই দুটি নির্দেশে নতুন কিছু বিশেষ নেই। এ্যাডাম-হার্ডিঞ্জ-টমাসনের নীতিই মান্য করা হ'ল। কেবল শিক্ষক-শিক্ষণে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় আর শিক্ষা বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবার সম্পর্কে একটু নতুন কথা। ১৮৫৪ সালের লিপিকা শিক্ষা-বিভাগকে সন্তুষ্ট করল, শাসক শ্রেণীকে সন্তুষ্ট করল, দেশের দুটি সমাজ-গোষ্ঠীকে শর্করা বিতরণ করল। অনেকে বলেন এই লিপি লিখেছিলেন স্যার চার্লস উড (পরবর্তীকালে ভাইকাউণ্ট হ্যালিফকস), পিছনে আর একজনের হাত ছিল ব'লে অনুমান করা হয়, তিনি জন স্টুয়ার্ট মিল। এই জন্যই উডের ডেসপ্যাচ বুঝতে হ'লে তৎকালে এদেশের সরকারী নীতি ও-দেশের শিক্ষা-আন্দোলন এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের অনুভাবনা তিনটি মিশিয়ে বুঝতে হয়।

লর্ড স্ট্যানলির নির্দেশনামা ১৮৫৯ সালে। অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের পর; এবং ইংল্যণ্ডের নিউ ক্যাসল কমিসনের অনুসন্ধান কার্যের (১৮৫৮) পর। এই জন্যই 'শিক্ষকদের গুণাগুণ বা কার্যপদ্ধতি ভালো কি মন্দ বোঝা যাবে পরীক্ষায় পাশের হার দেখে' (payment by result) নীতির প্রবর্তন হল; প্রবর্তন হ'ল লো (Mr. Lowe) সাহেবের শিক্ষায় রাষ্ট্রকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার নিয়ম।

এই সময়ে বাংলাদেশে শিক্ষা-কর প্রবর্তন করা হবে কিনা তা নিয়ে বাংলাসরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের কিছু তর্কবিতর্ক চলল। তবে বাংলা সরকার কর প্রবর্তন করেন নি।

বাংলা শেখানোর ইস্কুল থেকে কিন্তু ছাত্রেরা ধীরে ধীরে ইংরেজি ইস্কুলের দিকে সরে পড়ল। ইংরেজি পড়বার উৎসাহে নয়, ভালো চাকরী পাবার লোভে (It must, however, be confessed, that the hope of lucrative employment, rather than any real desire for education itself, mainly induces parents to pry for their children's instruction. Stark, Page 82)। অনগ্রসর জেলায় হ্যালিডে সাহেব কিছু বাংলা ইস্কুল খোলার উৎসাহ দিলেন। হার্ডিঞ্জের ইস্কুলের পর আদর্শ বাংলা ইস্কুলগুলোকে হ্যালিডে ইস্কুল বলা হ'ত।

এই ইস্কুলের উন্নতির জন্য গুরুমহাশয়দের শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হ'ল। পাঠশালার গুরুমহাশয়দের কাজ-কর্ম পরিদর্শনের জন্য ১৮৬২ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে অতিরিক্ত পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়—বর্ধমান, নদীয়া আর যশোহর জেলার জন্য।

ইস্কুল গুলোকেও একটা নতুন ব্যবস্থার মধ্যে আনা হ'ল। কাছাকাছি কয়েকটি ইস্কুলকে ঘিরে একটি বৃত্ত করে তার মধ্যে একটিকে কেন্দ্র-ইস্কুল করা হ'ল। কেন্দ্র ইস্কুল অনেকটা আদর্শ ইস্কুলের মতো। একে ইংরেজীতে বলা 'সার্কল স্কুল সিস্টেম' (Circle School System)। একজন প্রধান পণ্ডিত থাকেন কেন্দ্র ইস্কুলে, তিনি পাশের অন্যান্য ইস্কুলের শিক্ষকদের উপদেশ দেবেন। উপরের শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে এই প্রধান পণ্ডিত প্রায় ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক বা উপদেষ্টা-গোষ্ঠী গড়ে তুললেন।

এই কেন্দ্রবৃত্ত ব্যবস্থার ইতিহাস আছে। প্রথমে এই ব্যবস্থা ক্রিশ্চিয়ান নলেজ সোসাইটী প্রবর্তন করে। ১৮৫৯ সালের নিদেশে স্ট্যান্‌লি এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। ১৮৪৩-৪৪ সালে সাহারানপুরেব দিকে টমাসন সাহেব এই ব্যবস্থার নাম দিলেন হালকাবন্দী সিস্টেম। ১৮৫৬ সালে উড্রো সাহেব বঙ্গদেশের পূবাঞ্চলে এই প্রথার প্রবর্তন করেন। ১৮৬৩-৬৪ সালের দিকে তো শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই বৃত্ত-কেন্দ্র ব্যবস্থাব প্রতি পঞ্চমুখ। সেকালের একটা তালিকা থেকে দেখা যায়, ১৮৫৫ সাল থেকে ১৮৬৩ সালে বাংলা ইস্কুল এবং তার ছাত্র অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এ্যাংলো-ভার্ণাকুলাব ইস্কুল বেড়েছে ৪ গুণ কিন্তু বাংলা শিক্ষার ইস্কুল হয়েছে ৪০ গুণ বেশি।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবার অসুবিধায় পড়লেন। কি উপায়? পুনরায় 'পরিস্রুতি' মন্ত্রটি কীর্তন করা হল। বাঙালীর মধ্যেও ঝগড়া বেধে গেল। কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তি মেকলের নস্য নিযেছেন নাকে, ওদিকে রেভারেণ্ড লাল-বিহারী দে বিপক্ষে দাঁড়িয়ে উপনিষদ আর বাইবেল একত্রে ছুঁড়ে মারলেন।

১৮৭৭ সাল পযন্ত আমরা দু ধরণের ইস্কুল (মোটামুটি) পাচ্ছি—এ্যাংলো ভার্ণাকুলার ইস্কুল, এখানে ইংরেজীই পড়ানোর মাধ্যম যদিও পাশাপাশি বাংলা আছে, আর হার্ডিঞ্জ বা হ্যালিডের বাংলা-ইস্কুল, মাতৃভাষা এখানে মাধ্যম।

এইবার মধ্য-ইংরাজী এবং মধ্য বাংলা ইস্কুল গুলোকে এক কোঠায় এনে ফেলা হল এই নির্দেশে যে, উভয় ইস্কুলই বাংলাভাষাকে মাধ্যম হিসাবে মেনে

নেবে, বৃত্তি পরীক্ষায় উভয় ইস্কুলই সুযোগ পাবে, বই-পত্তর সবই বাংলায়, ইংরেজীটা কেবল ভাষা হিসাবে পড়বে অর্থাৎ ঐচ্ছিক।

১৮৮৩-৮৪ সালে ক্রফ্‌ট (Croft) সাহেব (শিক্ষা অধিকর্তা) পাঠশালাকে ঢেলে সাজলেন। মিডল-ভার্ণাকুলারের কৌলীন্য বেড়ে যাচ্ছে, ছাত্রেরা সমান সুযোগ পেয়ে বাংলাভাষার দিকে ধেয়ে চলছিল। কাজেই তাঁর নীতিতে বেধে গেল। বললেন, 'কোন কারণই থাকতে পারে না মিড্‌ল ভার্ণাকুলার ইস্কুলের ইংরেজী পড়ানোর; কারণ ইংরেজি ভাষার প্রতি দেশের চাহিদা এখনও আছে। যেখানে ইংরেজির চাহিদা নেই, সেখানে মধ্য বাংলার ইস্কুল না চালিয়ে উচ্চ প্রাথমিক (Upper primary) ইস্কুল রাখলেই চলে।' তাঁর নির্দেশে উচ্চপ্রাথমিক ইস্কুল খোলা হল। মধ্য বাংলা ইস্কুলে ভাঙন ধরল।

পূর্বে যুক্তি ছিল দেশী বা বাংলা ইস্কুলে পড়াশোনা হয় না তাই তুলে দাও। বাঙ্গালী সমাজ উত্তর দিয়েছিল, সমান সুযোগ পেলে বাংলা ইস্কুলই ভালো চলবে। ভালো চলল দেখে সরকারী সাহায্যের হুমকী দেখিয়ে সেগুলিতে জোর করে ইংরেজী চালু করা হ'ল। ইংরেজী ভাষার উপর এত আকাঙ্ক্ষা কেন—তা পশ্চিম খণ্ডে ভাষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছি।

ইস্কুল এবার নতুন ভাবে শ্রেণীবদ্ধ হ'ল, উচ্চ প্রাথমিক এবং নিম্ন প্রাথমিক। জেলায় জেলায় শিক্ষা-অধিকারের আঞ্চলিক গোষ্ঠীও প্রবর্তিত হ'ল (District Committee of Public Instruction)।

১৮৭০ এর দিকে ভারতের শিক্ষার জন্য কতিপয় সংস্কারক 'জেনারেল কাউন্সিল অব এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া' নামে এক সমিতি গঠন ক'রে ভারত থেকে নিরক্ষরতা দূর করবার জন্য উঠে-পড়ে লাগলেন।

এমনি রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে লর্ড রিপণ গভর্ণর জেনারেল হয়ে এদেশে আসেন। ইংল্যণ্ডের আন্দোলন এদেশে আসতে সুরু করল সেখানকার আইনসভার মধ্য দিয়ে। বণিকের হাত থেকে রাজার হাতে দেশ যাওয়ায় এইটেই হ'ল সুবিধে। এদেশে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের কথা ভাবা হচ্ছে এমন সময় ১৮৮২ সালে একটি এডুকেশন কমিসন বসল, সভাপতি ডব্লিউ ডব্লিউ হাণ্টার, সম্পাদক মহীশূর এবং কূর্গের শিক্ষা অধিকর্তা বি. এল. রাইস। এই কমিশনের অধীনে প্রাদেশিক কমিটি থাকল খবর যোগাবার জন্য। বঙ্গ প্রদেশ ভার নিল বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুর অঞ্চলের।

এখানকার খবর বড বিচিত্র। এঁদের কথায়, বাংলার গ্রামে তখন শতকরা ৯৪ জন লোক বাস করে লোকসংখ্যা প্রায় ৭ কোটি। বেশিরভাগ লোক নাকি শাকসব্জী খেয়ে বাস করত। তাঁদের অভিমত, কৃষিপ্রধান দেশে যে-হারে গ্রামে লোক থাকা উচিত তার চেয়ে এখানে অনেক বেশি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই লোক জমির বরাদ্দ পরিবার প্রতি কমিয়ে দিচ্ছে। আরও আশ্চর্য এরা কিছুতেই সহরে যাবে না, সাগর পার তো হবেই না। সমাজে গতি-প্রভাব (mobility) নেই-ই।

সমাজ বদ্ধ জলাশয়ের মতো হয়ে পডেছে। তাঁদের কথা অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে সমভৌমিকগতি (horizontal mobility) নেই, তাই আলম্ব গতি (veritical mobility,) বাডছে এবং তা বিকৃত। আমেরিকার স্থাপত্যের মতো ইমারতের প্রস্থ নেই উচ্চতা আছে। শুধু তাই-ই নয়, পূর্বে দুটি সমাজগতির একটিও ছিল না। তবে সমাজ এতকাল টিকল কি করে? খাদ্য নেই, মানুষের অভিলাষ নেই, সমাজের জীবন চাঞ্চল্য নেই। এ অবস্থায় সমাজের কাজ চলল কি করে? তাতে তারা বিচিত্র কথা বললেন—হিন্দুদের গ্রাম ব্যবস্থায় যদি সাম্যবাদের নীতি না থাকত যদি জাতিভেদ প্রথা না থাকত, যৌথপরিবার প্রথা না থাকত, তা হলে ভালো ফসলের বছরেও তারা এই জনসংখ্যার চাপ সহ্য করতে পারত না (Had it not been for the communistic principles which underlie the Hindu Social organisation in its village system had it not been for the caste guilds and joint family system, the masses could not have upborne against the pressure of over population even in years of an average harvest. Stark, Page 111)। সমাজের অদ্ভুত ব্যাখ্যা। সমাজ থাকে তার কতগুলো প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সমাজ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজ ব্যক্তি ও ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক কার্য-সম্বন্ধের গ্রহণযোগ্য বা সিদ্ধ আদর্শ (Standardised mode of Coactivity)। সমাজে উত্তরপুরুষ আসে, সে নতুন ক'রে এগুলো শিখে নেয় মেনে নেয়। এই ভাবে আদর্শের রদ বদল হয়। এগুলো যদি মনে রাখা যায়, তা হলে কোন সমাজকেই অচল মনে হবে না। ভারতবর্ষের সমাজও অচল ছিল না।

তবু এই ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন পড়ল। হয়ত সমাজ শাস্ত্রে অজ্ঞতা।

বেশি হচ্ছে ধূর্ততা। ভারতবর্ষের সমাজ যে 'স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ভিত্তি'র উপর দাঁড়িয়ে এই কথা প্রমাণিত করা। প্রমাণ করা হল বটে, কিন্তু গ্রাম-সভ্যতার আদর্শ না নিয়ে তার বিকৃত রূপ চালু করা হ'ল। মিউনিসিপাল আর লোকাল বোর্ড স্থাপন করা হ'ল। ঘোষণা করলেন, ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত' ব্যবস্থাই আমরা স্বীকার করলাম (Both these instruments of represntative government proceeded upon the recogontion of the Panchayat System which had furnished the folkmotes of India from the earliest times . Stark, pag 117)।

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন এবং বোর্ড প্রথা যে পঞ্চায়েত প্রথা নয়, তা একটু অনুধাবন করলেই বোঝা যায়। বোর্ড বা স্বায়ত্তশাসন প্রথায় সভ্য হওয়া হচ্ছে ঐচ্ছিক, ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, এই প্রথাকে বলা যায় সর্তমূলক সমিতি (Contractual Association)। পঞ্চায়েত কিন্তু তা নয়, এ অনেকটা স্থির নিয়ম মেনে চলে, গ্রামের ঐতিহ্যকে সাক্ষী রেখে এর গঠন। প্রথমটি স্বতন্ত্রবাদী সমাজের আর দ্বিতীয়টি পিতৃতন্ত্র বা মাতৃতন্ত্র সমাজের। ইংরেজদের মধ্যে স্কাণ্ডিনেভিয়ার স্বতন্ত্রবাদ এসেছে, সেখানেই এই স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন খুঁটি গেড়েছে। এর সঙ্গে ভারতের অনেকাংশেই মিল নেই।

দ্য তুরভিল ১৯০৭ সালে বই লেখেন (De Tourville—The Growth of Modern Nations, a History of the Particularist Form of Society) তাঁর বক্তব্য অংশ সোরোকিন তুলে দিয়েছেন, তার মর্মার্থ,

অন্যের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া (পিতৃতান্ত্রিক প্রথার) বিলুপ্ত হ'ল না; কিন্তু বাধ্যতামূলক সঙ্ঘের বদলে (পিতৃতান্ত্রিক প্রথার) ঐচ্ছিক সামাজিক প্রথা স্থান ক'রে নিল, কেবল যেখানে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই অবস্থাই সৃষ্টি করল সর্তমূলক সঙ্ঘ, সৃষ্টি করল সমাজ-নায়কের নির্বাচন ব্যবস্থা, অথবা কর্মকর্তার নির্বাচন, স্বাধীন এবং স্ব-শাসন এই গুলোই স্বতন্ত্রবাদী সমাজের স্পষ্ট লক্ষণ, (Association with other men did not disappear, but, in place of the enforced association of the patriarchal community, free social organisation was substituted and "only where it was absolutely necessary." This led to the establishment of contractual associations, to the elections of leaders or public

authorities, to independence and to self-government, the conspicuous characteristics of the particularist society.—Quotations taken from Contemporary Sociological Theories by Pitirim Sorokin, Harper & Brothers, 1928, Page 80)। সমাজ-তাত্ত্বিকদের এই গোষ্ঠির সঙ্গে সোরোকিনের অনেক যায়গায় আপত্তি করবার আছে, কিন্তু ঠিক এই অংশের ব্যাখ্যায় আপত্তি তাঁর নেই।

মোটকথা লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড ক'রে ভারতের পঞ্চায়েত প্রথা পাওয়া গেলনা। কোন্ ব্যবস্থা ভালো সে বিচার আমরা করছি না। কিন্তু দুটির স্বভাব যে পৃথক সেকথা মানতেই হবে।

তবে এ গোঁজামিল কেন? হান্টার কমিশনের মন্তব্য পড়লেই তা বোঝা যাবে।

প্রাদেশিক কমিটিতে ক্রফ্ট সাহেব উপদেষ্টা ছিলেন। কাজেই একথা ধরে নেওয়া যায়, তাঁর কাযাবলীর সমর্থন তিনি এতে রাখবেন। অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক এবং উচ্চ প্রাথমিক ইস্কুল থাকবে।

আরও কিছু আমাদের মনে রাখা দরকার, হার্ডিঞ্জের আমল থেকে বিদ্যালয় গৃহের খরচ এবং শিক্ষা-করের অনুরূপ কিছু দেশবাসীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। নানাকারণে তা সফল হয় নি। এই সঙ্গে মনে পড়ে, প্রকৃত গ্রামের দিকে শিক্ষা অধিকারের যাওয়ার ইচ্ছা নেই।

এবার দেখা যাক হান্টার কমিশনে কি পেলাম।

হান্টার কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে দুটো ভাগ করল (১) প্রচলিত পাঠশালা (২) প্রাথমিক ইস্কুল।

প্রচলিত পাঠশালার সংজ্ঞা—যে-সব ইস্কুল দেশী-প্রথায় দেশের লোক দ্বারা পরিচালিত। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা হ'লে এদের অনুমোদন করা হবে। অনুমোদন পাওযার জন্য শিক্ষা বিভাগে পণ্ডিত বা মৌলভীর তদারক করতে হবে। আর পরীক্ষার ফল দেখে ইস্কুলকে সাহায্য করা হবে। গুরু-মহাশয়কে শিক্ষণ শিক্ষা নিতে হবে। সাহায্য প্রাপ্ত ইস্কুলগুলোকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে পড়াতে হবে। যেখানে মিউনিসিপ্যাল বা লোকাল বোর্ড থাকবে—সেখানে তারাই এই ইস্কুলের তদারক করবে। অবশ্য সবার উপর কর্তা থাকল শিক্ষা-বিভাগ।

(খ) প্রাথমিক ইস্কুলের দুটো ভাগ করা হ'ল; নিম্ন প্রাথমিক আর উচ্চ

প্রাথমিক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা মুখাপেক্ষী হয়ে এসব ইস্কুল চলবেনা। সাধারণের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়াই হবে কর্তব্য। কোন পর্যায়ের ইস্কুলের পরীক্ষাই আবশ্যিক নয়। এখানেও ফন্ড থেকে সাহায্য করবার ব্যবস্থা। করদাতাদের ছেলে ব'লেই মাহিনা মকুব করা হবে না। মাহিনা দিতেই হবে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন মুকুব করা যেতে পারে। নৈশ ইস্কুলও খোলা যেতে পারে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা দেওয়া হবে। সম্প্রদায়ের চাহিদা মতো ভাষা-শিক্ষা (বিভিন্ন ভাষা) পাঠ্য হবে। প্রাথমিক ইস্কুল আবার মক্তব, আদিবাসী প্রভৃতির জন্য নাম নিল 'স্পেশাল' বা বিশেষ। মোটকথা, ইস্কুলবাড়ী শিক্ষকের মাহিনা প্রভৃতি নির্বাহ হবে বোর্ড থেকে। বোর্ড টাকা পাবে করদাতাদের কাছ থেকে এবং কিছু সরকার থেকে। বোর্ডের খরচ কেমন দাড়াল—

বৃটিশ ভারতের জনসংখ্যা তখন, ২০ কোটি। শতকরা ১৫টি ছেলে যদি ছাত্র ধরা যায় তবে হচ্ছে ৩০০ শত লক্ষ। প্রতি ছাত্র পিছু তখন খরচ হওয়া নিয়ম হ'ল ৪টা—৬আনা—৫ পাই ; এর মধ্যে সরকার দেবে ১৫ আনা ৪ পাই, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দেবে ২ টাকা ৯ আনা ১১ পাই, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড থেকে পাবে ৪ আনা ৬পাই। সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুলে খরচ ৩ টাকা ৭ আনা ১ পাই, সরকার এবং বোর্ড দেবে এর মধ্যে ১ টাকা ২ আনা। ১৮৮২ সালে প্রাদেশিক সরকারের খরচ ছিল (প্রাথমিক শিক্ষায়) ১৬·৭৭ লক্ষ টাকা আর স্থানীয় সংস্থার খরচ ২৪·৮৮ লক্ষ টাকা। নতুন প্রস্তাবে খরচ বৃদ্ধি পাবে সরকারের ১৭ লক্ষ টাকা থেকে ১২২ লক্ষ আর স্থানীয় কোষ থেকে ২৫ লক্ষের যায়গায় ২২৪ লক্ষ টাকা (Nurullah & Naik's—A student's history of education in India, Macmillam, 1949 Page 155)।

এই থেকে আমরা অনুমান করতে পারি প্রাথমিক শিক্ষায় পূর্বে সরকারী নীতি যা ছিল, এখনও পেঁচিয়ে তাই-ই করা হ'ল। উপরন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় নূতন নীতি এল যে, একরকমের প্রাথমিক থাকবে যা স্বয়ং সম্পূর্ণ, এইগুলো প্রাইমারী ইস্কুল, আর অন্য প্রকার হ'ল উচ্চশিক্ষার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা।

আর একটি হিসাব উল্লেখযোগ্য। ইস্কুলের এবং ছাত্রের বৃদ্ধি প্রসার বা আগ্রহঘটছে ঃ

খৃষ্টাব্দ	সংখ্যা		সংখ্যা	
	প্রাথমিক	ছাত্র	নিম্নপ্রাথমিক	ছাত্র
১৮৮৫	২,৯৮৩	১০৯,০২৯	৬৪,৮৭৯	১,১৫২,৯৮৭
১৯০০	৪,৪৭৩	১৮৪,০৪৯	৪৬,৩২৮	১,১১৭,৩৩৪
১৯০৬ (কেবল পশ্চিমবঙ্গ)	২,৯০৮	১৩২,৫৬৪	৩১,০৫৬	৭৩৬,৬৪৭
১৯১২ (যুক্তবঙ্গে)	৩,৭৬৪	২০৪,১৮৮	৩৫,১৮৬	১,০২২,৯৯২

উপবের তালিকা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে উচ্চপ্রাথমিক ইস্কুল বাড়ছে, নিম্ন প্রাথমিক কমছে। ছাত্র সংখ্যাও তাই। শুধু পশ্চিমবঙ্গের ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রাথমিক ইস্কুল যা ছিল, যুক্তবঙ্গে তার চেয়ে বিশেষ বাড়েনি। উচ্চ প্রাথমিক ইস্কুলের সংখ্যা অনুপাতে ছাত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় ইস্কুল গুলোয় ভিড বাড়ছে। নিম্ন প্রাথমিক ইস্কুলের প্রতি আগ্রহ চলে যাওযাব কাবণ কি? হয়ত রাজনৈতিক ইতিহাস এবং ইংবেজেব শিক্ষানীতিতে মিলবে।

তবে লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষায সবকাবী সাহায্য বাডাতে চেষ্টা কবে ছিলেন একথা স্বীকার্য।

যাই হোক প্রাথমিক এবং প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে আমবা ইতিহাসেব এই টুকু জানলেই ইংবেজ আমলেব প্রাথমিক ইস্কুলেব পরিচয় জানতে পাবব। এ ছাডা গোখেলের 'বিল' বা ১৯৩৭ এব আইন ইস্কুল সম্পর্কে নতুন কিছু দেয় নি, কেবল আবশ্যিক হবে কিনা কিংবা সরকারী সাহায্য কতখানি হবে এই নিয়ে বিতর্ক। বর্তমানেও আমবা প্রাথমিক ইস্কুলেব সেই রূপটি বেখেছি। তবে প্রাথমিক ইস্কুলেব শিক্ষা উদ্দেশ্যের যে দ্বিধা ছিল তা কার্জনেব আমল থেকেই একরমক কেটে গেছে। এখন প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বলা যায় না।

প্রাথমিক এবং প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের এত বিস্তৃত বলবার কারণ এই যে, এর মধ্য থেকেই ইংরেজ-নীতি সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারব। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কি ছিল, ইংবেজ কোম্পানী কি করতে চেয়েছিল এবং সম্রাট বা আইন সভা কি করেছিল। হাই ইস্কুল বা উচ্চ বিদ্যালয় সম্পর্কে আমাদের এত বিস্তৃত আলোচনা আর না করলেও চলতে পারে।

আমরা কয়েকটি মাধ্যমিক ইস্কুলের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করলেই এই ইস্কুল সম্পর্কে ধারণা ক'রে নিতে পারব।

হিন্দু কলেজ :

কলকাতার সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয় ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে। কিছু বাঙালী আইন ব্যবসায়ীদিগেব 'করণিক' হ'লেন, সামান্য ইংরেজি শিখতে হ'ত। ইংরেজি শিখবার একখানা বইও ছিল—(Forsyth's Dialogue) ফরাসাথস্ ডায়ালগ ; দ্বিতীয় পুস্তক ইংলিশ প্রাইমাব (English Primer)। এতে ছিল কিছু ইংরেজী শব্দ আর পরিশেষে বাইবেলের দশটি আদেশের (Ten Commandments) ছন্দোবদ্ধ লেখা। রাম বাম মিশ্র নাকি ইংবেজীতে প্রথম পণ্ডিত। তাঁর ছাত্র রাম নারায়ণ মিশ্র আইন ব্যবসায়ীও ছিলেন। সদাগরী অফিস বা সরকারী অফিসে চাকরীর জন্য ইংরেজী শেখা দরকাব। ইংরেজেরও দরকার। তবে তাদের কাজ অনেকটা পর্তুগীজেরা সম্পন্ন করত। যাই হোক অভাব যেখানে আছে, তার প্রতিকারও আছে। বামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, শিবু দত্ত, ভূষণ দত্ত, আরাটুন পিটার্স, শেরবোর্ণ এঁরা ব্যক্তিগত পরিচালনায় ইংরেজি শেখাতে সুরু করলেন। সেরবোর্ণের ইস্কুলে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালী ইংরেজী শিখতে যেত।

১৮১০ সালে বর্ধমানেব মহাবাজা, বাম মোহন রায়, কালীনাথ রায়, কৃষ্ণ মোহন মজুমদার, দ্বারিকা নাথ ঠাকুব, জয় নারাযণ ঘোষাল, তাঁরা সঙ্কল্প কবলেন ইংরেজি শেখাব জন্য ইস্কুল দরকার। কিন্তু কেমন ক'রে খুলতে হবে সে এক সমস্যা। ইস্কুস আমাদেব দেশে আছে, কিন্তু যাকে বলে ইংরেজী ইস্কুল অর্থাৎ তাব চেয়াব, বেঞ্চ, টেবিল, গ্লোব, ম্যাপ, রেজিস্টারী প্রভৃতি আসবাব পত্র এবং ইস্কুলেব কাজকর্ম কেমন ক'বে তৈবী এবং নির্বাহ করতে হয়, তা তো জানা নেই।

সার হেনরী হাইড্ ঈষ্ট (Sir Henry Hyde East) ১৮১৩ সালে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হযে আসেন। বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ঈষ্ট সাহেবের সঙ্গে আলাপ ক'রে বুঝলেন, এ দেশবাসীর ইংরেজি শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ আছে।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দ। তারিখটি ১৪ই মে। বাঙালীরা টাউন হলে একটি সভা আহ্বান করেন শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা কববার জন্য। ঈষ্ট সাহেব সভাপতি। এই সভার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, অনেকে বাঙলাতেই বক্তৃতা করেন। এই

প্রসঙ্গে একজন বক্তার বক্তৃতা কিছু বিশ্লেষণ করলে তৎকালের শিক্ষা-প্রেমী--দের উদ্দেশ্যটি ধরা যাবে।

"আমাদের যুগে আমরা পণ্ডিতেব জাতি হিসাবে পরিণত হয়েছিলাম, এখনও আমাদের মধ্যে কিছু কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন। কিন্তু এই শিক্ষা-বিজ্ঞান বর্বর শাসকদেব দ্রুত এবং অবিরাম ধারাবাহিকতায় পর্যুদস্ত হল, এবং শিক্ষার আলোক নির্বাপিত হয়ে গেল। যাই হোক অধুনা আমরা বিশ্বাস করি সেই নিভন্ত অবণি পুন প্রজ্জ্বলিত হবে, এবং আমরা আবার শিক্ষিত জাতি হিসাবে দাডাতে পাবব।"

বর্বর শাসক বলতে বক্তা কাদেব বোঝাতে চেয়েছেন তা যেমন স্পষ্ট নয়, তেমনি খুব অস্পষ্টও নয়। জাতিব ইতিহাস থেকে সাতশ' সাডে সাতশ' বছর মুছে ফেলে কিছু চিন্তা করা যায় কিনা জানি না। কিন্তু হিন্দু আমলের শিক্ষার সঙ্গে মুসলমান আমলেব শিক্ষা মিশে যে শিক্ষালয়ের কি পরিবর্তন ঘটেছিল তা আমরা পূবে আলোচনা কবেছি। আবও আমবা দেখেছি, ইসলামিক শিক্ষায় হয়ত ধর্ম নিযে ভাষা নিযে কিছু অনভিপ্রেত ব্যাপার ঘটে থাকতে পারে কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থায় কোন আত্যন্তিক পবিবর্তন ঘটেনি. সমাজ-চরিত্রে যে বিরোধী ভাব ঘটেনি, তা শিক্ষা-ইতিহাস এবং বাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা কবলেই আমবা বুঝতে পারব। বিশেষরূপে আমরা একটা দিকে উন্নতি দেখেছিলাম তা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। পূর্বেব আলোচনা আমরা আর পুনরুক্তি কবব না। কিন্তু বহু বিশ্লেষণ না ক'রেও বক্তার উদ্দেশ্য আমরা বুঝছি এই ভাবে।

(১) ইংরেজি শিক্ষা তিনি চান,

(২) হিন্দুর সংস্কৃত শিক্ষা চান,

(৩) হিন্দু জাতি হিসাবেই শুধু গর্ব করেন,

(৪) নতুন শাসককে রক্ষাকর্তা এবং সদাশয় ব'লে ঘোষণা করেন। সে যুগে জাতি-বিদ্বেষ স্বাভাবিক। জাতি-কৌলীন্য প্রচারক আর্থার দ গোবিনো (Arthur de Gobinau) ঠিক ঐ ১৮১৬ সালেই জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই ঘোষণা করেন জগতে হীন এবং উচ্চ দু ধরণের মানব জাতি আছে। আর্যদের তিনি উচ্চ মানবজাতিতে ভূষিত করেছিলেন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আর প্রাচীন ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক আলোচনার সাধুতায়। এচ. এস. চেম্বারলেন (Houston Stewart Chamberlain 1855-1926)

ঐ শতকেই জন্মগ্রহণ করেন, তিনিও অনেকটা গোবিনোর মতের অনুসারক। অর্থাৎ ঐ শতকে রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণে মানুষের মনে জাতি কৌলীন্য বোধ এসে গেছে। কিন্তু ইয়োরোপের প্রচারকেরা নিজদের বাঁচিয়ে কাজ করেছেন। আমাদের এখানে ভারতবর্ষকে বাঁচাতে পারিনি। কারণ কোন জাতিকে বর্বর বলে কাবু করার কৌশল আমরা রাজনীতি থেকেই আয়ত্ত ক'রেছি।

রাজনীতির কাব হচ্ছে, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক স্থাপনার নিয়ম স্থির করা। স্বসমাজের এবং বাইরের সমাজের। রাজনীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই দেখেছে, স্বসমাজের মধ্যেকার জাতীয়-সংহতি দৃঢ় করতে হলে বাইরের সমাজের লোককে হেয় করতে হয়। বাইরের সমাজ যখন অনু-প্রবিষ্ট হয় তখন বিজয়ী হিসাবে তারা স্থানীয় সমাজকে ঘৃণা করে। বৈদিক যুগে এরকম হয়েছে, তার আগেও হয়েছে, পাঠান যুগে হয়েছে, মোঙ্গোল যুগেও। পর্তুগীজ যুগে হ'ল, ইংরেজ যুগেই বা হবে না কেন। ফল কথা এই, দেশ-প্রেমিকতা এমনিতেই মানবিকতা থেকে খাটো। তার সঙ্গে যদি অর্থনৈতিক দিক জড়িত হয়ে পড়ে তবে বৃত্তটি কেন্দ্রবিন্দুর দিকে পেছিয়ে যেতে চায়। কেন্দ্রবিন্দুর অস্তিত্ব বড কম। বৃত্তটি না থাকলে তার কোন অস্তিত্ব নেই। তখন সেই নাস্তিকতা থেকে বৃত্তটি আবার এমন বড়ো হয় যে, পরিধি আছে কিনা ঠাহর হয় না। তারপর হয়ত আবার সংহতিতে স্পষ্ট হযে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে বলেছিলেন, We have known the primitive Mongols, the most terrible cruel horde of mankillers and we have the habit of calling them barbarous but the unalloyed sign of barbarism is revealed when all through the tapping of so-called civilisation comes out of the treason against humanity and that has been shown in the late history—(নির্মল কুমারী মহলানবিশ, বাইশে শ্রাবণ, পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৭; মিত্র ও ঘোষ, কালকাতা দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৬৭)।

ইতিহাসে বারবার এই কাণ্ড ঘটেছে, ঘটছে।

এই সঙ্গে লুকিয়ে আছে আর একটি দিক, রোমান্টিকতা। হিন্দু-বৌদ্ধদের সংস্কৃতিকে অক্ষুণ্ণ রেখে মুসলমান শাসকেরা তাদের নতুন সংস্কৃতি দিতে পারেন নি। পূর্বের ঐতিহ্য ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই বৃহৎ এবং প্রাচীন দেশে তা কখনও সম্ভব নয়। ইংরেজরাও তাই পারেন নি।

ফলে উলটো হল। যখনই নিপীড়িত সম্প্রদায় স্বযোগ পেল তখনই তাকে মুছে ফেলবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। হয়ত সম্পূর্ণ সম্ভব নয়। ইংরেজরা চলে গেলেও ভারত ইংরেজদের সব কিছু মুছে ফেলে দিতে সঙ্কল্প নিয়েছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক হাঁক-ডাকে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মাঝে মাঝে হয়ত বিরোধ আসবে, মারামারি কাটাকাটি হবে কিন্তু সংস্কৃতির অনেক কিছুই খোঁটিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে না।

পূর্বে যে বক্তৃতা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যেও দেখছি রোমান্টিকতা, বেপরোয়া স্বাজাত্যবোধ। কিন্তু চরিত্র নেই। কেমন যেন যাচঞার মনোবৃত্তি থেকে ভীরুতা থেকে তোষামোদের মতো ভাব আছে। অথচ এই বক্তব্যের মধ্যে হিন্দুজাতির এক ব্যক্তি-মানবের আবেগ যতটা নেই, তার চেয়ে বেশি রয়েছে অর্থনৈতিক মর্যাদালাভের আকাঙ্ক্ষা।

ইংরেজি কলেজ খুলবার জন্য রামমোহন রায়ও ছিলেন একজন উদ্যোক্তা। কিন্তু নানা কারণে তিনি নিজকে প্রকাশ করেন নি।

প্রথমে গরাণহাটার গোরা চাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজ খোলা হয় ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারী সোমবার। পরে চিৎপুরে রূপচাঁদ রায়ের বাড়ীতে। এরও পরে কমল বোসের বাড়ীতে। কমল বোসের পিতা ফরাসীদের চাকুরে ছিলেন ব'লে তাঁকে ফিরিঙ্গী কমল বোস বলা হ'ত। এঁদের বাড়ী চন্দননগরের বোড়োগ্রামে।

১৮২৫ সালের জানুয়ারীতে বর্তমান হিন্দু ইস্কুলের স্থানটিতে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের জন্য টাকা ওঠে ১১৩১১৯ টাকা। কে কে পৃষ্ঠপোষক ? বর্ধমানের মহারাজা, গোপীমোহন দেব, চন্দ্র কুমার ঠাকুর, গঙ্গানারায়ণ দাস, জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, রসময় দত্ত প্রভৃতি। টাকা থাকত ব্যারেটো ব্যাঙ্কে। লেফ্‌টন্যাণ্ট আরভিন হলেন ইংরেজি বিভাগের সম্পাদক, মাহিনা ২০০৲ টাকা, আর বাঙলা বিভাগের সম্পাদক রসময় দত্ত, ১০০৲ টাকা। ঈষ্ট সাহেব দান করেছিলেন ১০০৲ টাকা, বিশপ মিডলটন ১০০৲, ব্যারেটো ব্যাঙ্ক ১০০৲ বাকী টাকা সমস্তই বাঙ্গালীরা দান করেন। ইংরেজরা কিন্তু পরিচালনা সমিতিতে যোগদান করল না। গভর্ণর হলেন—বর্ধমানের মহারাজা এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর। ডিরেকটরস—হলেন গোপী মোহন, জয়কৃষ্ণ, গঙ্গানারায়ণ, রাধাকান্ত এবং রাধামাধব।

ইংরেজরা যে প্রকৃত পক্ষে অসহযোগ করল এটি লক্ষ্য করবার মতো। ইংরেজি শিক্ষায় ইংরেজ যোগদান করেনা কেন? আহ্বান উপেক্ষা করে কেন?

যাইহোক বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত ইস্কুলে বাঙালীরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করেন প্রায় দশ হাজার। এটি ১৮২০ সালের হিসেবে। এই ঘটনাটি ইংরেজের চোখে নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা। আর এই দুর্ঘটনা সন্দেহ-শাস্ত্রে পণ্ডিত ইংরেজ জাতি আগেই অনুমান করেছিল ব'লে মনে হয়, তাই এই অসহযোগ। হিন্দু কলেজের শিক্ষা উদ্দেশ্য ইয়োরোপ এবং এশিয়ার ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষায় হিন্দু সন্তানদের শিক্ষিত করা (to instruct the sons of Hindoos in the European and Asiatic Languages and sciences)। ইংরেজি, ফারসী এবং সংস্কৃত ভাষা শিখবার ব্যবস্থা থাকল। তবে সংস্কৃত কিছুদিনের মধ্যেই বর্জিত হ'ল। এই ইস্কুলের বিশেষ চরিত্র হচ্ছে বাঙালী হিন্দুর স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অথচ এই স্বাধীনতা থাকল না। ইংরেজরা সন্দেহ ক'রে অসহযোগিতা যেমন করল, তেমনি এসে জুটল অর্থাভাব। স্থানাভাবের জন্য প্রথম স্থির হ'ল একশত জন ছাত্র নেওয়া হবে। সকলকেই বেতন দিতে হবে। কিন্তু বেতন দিয়ে পড়ার প্রথা এদেশে তো নেই। কাজেই ঐ বিধান বদল করতে হ'ল। পড়ানোর জন্য ইংরেজি আর বাংলা দুটো বিভাগ থাকল। বাঙলা উচ্চ ও নিম্নবৃত্তি পরীক্ষাতেও সম্মান পেয়েছিল (রচনা পত্র হিসাবে), ইংরেজি বিভাগের সর্বোচ্চ ক্লাসে পাঠ্য ছিল—

Tegg's Book of knowledge

Enfield's speaker

Goldsmith's Geography

Murray's Grammar.

অঙ্কের পাঠ ত্রৈরাশিক নিয়ম পযন্ত।

এই সময়ে ব্যারেটো ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হয়ে পড়ে। তৎকালে এইটি ছিল প্রধান ব্যাঙ্ক। কর্তৃপক্ষেরা মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন।

কেবল ব্যারেটো ব্যাঙ্কই দেউলিয়া হওয়ায় হিন্দুকলেজের স্বাধীনতা গেল তা নয়। ইংরেজদের হিতৈষণার জন্যও এর বিপযয় ঘটল। সেই কাহিনীটি বলা যাক। ইংলণ্ডের বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী ভারতবর্ষের শিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য প্রদান করবে বলে মনস্থ করে। কেবল অর্থই নয়, পুস্তক এবং

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও সাহায্য করবে। ঠিক একালে যেমন, আমেরিকা আর বৃটীশ কাউন্সিল স্বাধীন ভারতের শিক্ষায় সাহায্য করবার জন্য ছুটে এসেছে 'টেস্ট' বা অভীক্ষা পত্র নিয়ে 'ইন-সার্ভিস ট্রেনিং' নিয়ে, 'অডিও ভিস্যুয়াল এড্‌স্' নিয়ে। যোগাযোগ দৃঢ় হ'ল সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেবের মাধ্যমে। তিনি শিক্ষা উৎসাহী। ১৮২৩ সালে তিনি এদেশে আসেন। ইনি আবার গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গঠিত (১৮২৩ সালের জুলাইতে) জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসনের সভাপতি। বৃটীশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী ১৮২৩ সালে তাকে লেখেন যে তাঁরা কলকাতার বাঙালীদের হিন্দু কলেজে একটি দর্শন পড়ানোর যন্ত্র (Philosophical apparatus) উপহার দিতে চান। বিনা খরচে তারা যন্ত্রটি কলেজে পৌঁছে দেবেন। কিন্তু এই শুভ ইচ্ছার একটা সর্ত থাকল। তাকে বলে শ্বেতহস্তী পোষণ। অর্থাৎ এই যন্ত্রটি ব্যবহার করবার জন্য ন্যায়সঙ্গত বেতনে হিন্দুকলেজে একজন অধ্যাপক রাখবেন।

এদিকে অনেক নজির দেখিয়ে হিন্দু-কলেজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেছে ১৮২৩ সালের প্রথমে। কিন্তু যেভাবে শ্রীরামপুরের মিশনারী কলেজ, বিশপস কলেজ, বেনাভোলেণ্ট ইনস্টিটিউসন, স্কুলবুক সোসাইটীকে সাহায্য করা হয়েছিল, সরকার-ইংরেজ সরকার সেভাবে হিন্দুকলেজকে সাহায্য করবে কেন? অতএব হ্যারিংটন সাহেব আবেদন পত্রটিকে সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরে ১৮২৩ সালের অক্টোবর মাসে একজন ইংরেজ অধ্যাপক নিযুক্ত করান, ১৮২৪ সালে সাহায্য করবেন ব'লে আশা দিলেন। হিন্দু কলেজ আশায় আশায় শ্বেতহস্তী পোষণ করেছে, তারপর ভেঙে পড়ল। এই সময় জেনারেল কমিটি বলল, সাহায্য করব কিন্তু কলেজের কর্তৃত্ব আমাদের হাতে দিতে হবে।

কর্তৃপক্ষেরা প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু প্রতিবাদ করলে টাকা পাওয়া যায় না। কাজেই মানরক্ষা গোছের করে একটা রফা হ'ল। জেনারেল কমিটির পক্ষ থেকে ডাঃ উইলসন পরিদর্শক নিযুক্ত হলেন, পরিচালক সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্টও হ'লেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তার হুকুমে কলেজের ব্যবস্থাপনা চলত। ১৮২৪ সালে মাসে সরকার সাহায্য করত ২৮০৲ টাকা; ১৮২৭ সালে মাসে ৯০০ টাকা; ১৮৩০ সালে মাসে ১২৫০ টাকা। প্যাঁচের পর প্যাঁচ কসে হিন্দু কলেজকে সরকার ১৮৩০ সালে নিম্নরূপ দাঁড় করালো;

কৌলিক কর্তৃপক্ষ
(heritable governnors)

বর্ধমানের মহারাজা (মহারাজাধিরাজ তেজ চন্দ্র রায় বাহাদুর)

সভাপতি—চন্দ্রকুমার ঠাকুর

উভয়ের সাহায্যকারী ও পরিদর্শক—উইলসন।

পরিচালকগণ (Directors)

(সবাই বাঙালী)

পরিচালক সমিতি

৮ জন বাঙালী; তিনজন ইউরোপীয় (ডেভিড হেয়ার অন্যতম)

অধ্যাপক

৫ জনই সাহেব। (প্রধান শিক্ষক—G. T. F. Speed)

শিক্ষক

৮ জনের মধ্যে দুজন বাঙালী।

পণ্ডিত

জগমোহন ন্যায়বাগীশ, পার্বতীচরণ ন্যায়ালঙ্কার,
রামরতন বিদ্যালঙ্কার, পীতাম্বর তর্ক পঞ্চানন।

মৌলভী

ফরাঘত আলী।

গ্রন্থাগারিক

উলাস্টন (W. M. Woolaston।

সহকারী—নবকুমার চক্রবর্তী।

১৮৪১ সালে এই কলেজ সম্পূর্ণরূপে সরকারী হয়ে গেল।

১৮৩০ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে এই কলেজে শিক্ষা নিয়ে নানা পরীক্ষা করা হয়; কিন্তু কোনটিই সফল হয় নি। আইন শেখানোর জন্য টি. ডেকেন্স এলেন (১৮৩২ সালে), চলে গেলে এলেন পিটার গ্রান্ট, হয়ে গেলেন সুপ্রীম কোর্টের জজ। ড্রইং বা অঙ্কন শেখানো হ'ত, ১৮৩৬ সালে সার্ভেইং শিক্ষা সুরু করা হয়; Lessons on Object সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হ'ত; চার বৎসর পর এই শিক্ষা ব্যর্থ হ'ল; সঙ্গীত শিক্ষার জন্য ১৮৪৪ সালে হ্যারাডেনকে (Harradane) নিযুক্ত করা হ'ল। তিনি চলে যাওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে এ ক্লাস বন্ধ হয়ে গেল। অর্থাৎ বেশ বোঝা যাচ্ছে, শিক্ষিত ভাগ্যান্বেষী ইয়োরোপীয়দের প্রাপ্তিযোগেন একটি আশ্রয় স্থল বা হোটেল হিসাবে হিন্দু কলেজ পরিণত হ'য়ে গেল। বর্তমান যুগের এক্সটেনসন সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের মতো।

১৮৫০ সালের মধ্যে আমরা যে সব সরকার নিয়ন্ত্রিত কলেজ ও ইস্কুল তৎকালের বঙ্গপ্রদেশে পেয়েছি তার একটি তালিকা দিতে চেষ্টা করি।

হিন্দু কলেজঃ স্থাপিত ১৮১৭ সাল; পূর্বেকার 'বিদ্যালয়' হয়ত ১৮১৬ সালে। কিন্তু সরকারী রিপোর্টের বিভিন্ন সংখ্যায় (General Report on Public Instruction in the Lower provinces of the Bengal Presidency, Calcutta: W. Palmers, military Orphan Press, MDCCCLI) যে উল্লেখ দেখতে পাই তাতে ১৮১৪-১৫ সালে স্থাপিত বলে দেখা যায়; যেমন ঐ রিপোর্টের Session 1849-50 তে লেখা আছে 35th year; এমনি অন্যান্য সংখ্যায়। অধিকন্তু, এফ. জে হ্যালিডে (Secretary to the Govt of India) জে, পি, গ্রাণ্টকে (Secretary to the Govt of Bengal) যে চিঠি লেখেন (১১ই এপ্রিল, ১৮৫০) তাতেও মনে হচ্ছে হিন্দু কলেজ ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় (Thirty-five years have elapsed, since the establishment of the Hindu College gave the first impulse to that desire for European Knowledge, which is now so general throughout the country)। তারিখের এই গোলমাল ঐতিহাসিকদের গবেষণা সাপেক্ষ। হিন্দুকলেজ পাঠশালা (১৮৪০), ব্রাঞ্চ ইস্কুল, সংস্কৃত কলেজ (১৮২২-২৩) কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১); হুগলী কলেজ (১৮৩৬), ব্রাঞ্চ ইস্কুল (১৮৩৭); ইনফ্যাণ্ট ইস্কুল (১৮৩৯); হুগলী মাদ্রাসা; মক্তব, সীতাপুর মাদ্রাসা; ঢাকা কলেজ (১৮৪১-৪২) কৃষ্ণনগর কলেজ (১৮৪৬); চিটাগাং (১৮৩৬) ইস্কুল; কুমিল্লা ইস্কুল (১৮৩৬-৩৭); সিলেট (১৮৩৯) ইস্কুল; বোয়ালিয়া ইস্কুল (১৮৩৫-৪৬); মেদিনীপুর (১৮৩৫-৩৬); কটক (১৮৩৯); পাটনা (১৮৩৪-৩৫); ভাগলপুর (১৮২২-২৩)।

মজঃফরপুর (১৮৪২-৪৩); গয়া (১৮৪৩-৪৪); যশোর (১৮৩৬-৩৭, কিংবা ১৮৪০), বর্ধমান (১৮৪৪); বাঁকুড়া (১৮৪৪); বারাসত (১৮৪৪-৪৬); হাওড়া (১৮৪৩-৪৪); উত্তরপাড়া (১৮৪৫); বারাকপুর

রসাপাগলা (কলিকাতা টালীগঞ্জ অঞ্চলে); (এই তালিকা থেকে আসাম-আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলের ইস্কুল বাদ দেওয়া হল)। ইস্কুলের প্রতিষ্ঠিত তারিখ হিসাবে যা উল্লেখ করেছি—তাতে একটি অনুক্ত কথা থাকল, বেশীর ভাগ ইস্কুল অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল: তবে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আসে ঐ সময়ে।

এই সময়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, ইংরেজির সঙ্গে মাতৃভাষা পড়ানোর ব্যবস্থা। দেখা যাচ্ছে যারাই ইংরেজি পড়ছে তারাই—বাংলা (বাঙালী হলে) বা উড়িয়া বা উর্দু পড়ছে। আসামে বাংলাই পড়ানো হ'ত। হিন্দী আছে শুধু তখনকার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ইস্কুলে। আসামে দেখছি বাংলা পড়ুয়ার অনুপাতে ইংরেজী পড়ুয়ার সংখ্যা অতি নগণ্য। অবশ্য স্বীকার করতে হবে বাংলা ভাষা কতখানি আগ্রহের সঙ্গে পড়ছে।

হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ ইস্কুল পূর্বে ছিল স্কুল সোসাইটির স্কুল, পরে নাম হয় হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ ইস্কুল, পরবর্তী নাম কলুটোলা ব্রাঞ্চ, তারপর নাম হয় হেয়ার ইস্কুল (১৮৭২ সাল)। স্কুল সোসাইটির পাঁচটি ইস্কুল ছিল, আরপুলির ইস্কুলটি হেয়ার সাহেবের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়; কিন্তু ১৮৪২ সালে হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর পূর্বে এই ইস্কুলটি জি. সি. পি. আই-এর (General Committce of Public Instruction) অধীনে আসে। ১৮৪৭ সালে ভবানীচরণ দত্তের গলীতে ইস্কুলের গৃহ নির্মাণ হয়। স্থানটি ছিল, হিন্দু কলেজের অভিভাবকদের। বাড়ীটি তৈরী হয় ৯২৬০ টাকায়। সরকার ধার দেয় ৬০০০৲ টাকা। এই ইস্কুলই হেয়ার ইস্কুল হয়ে গেল।

নোয়াখালী ইস্কুলকে পরিচালনা করতেন মিষ্টার জোনস নামে এক ইয়োরোপীয়। ১৮৫৩ সালে এইটি জেলা ইস্কুল হয়। ফরিদপুর ইস্কুল স্থাপিত হয় ১৮৪৯ সালে; ১৮৫০ সালে এটি সরকারের সাহায্য কৃত ইস্কুলে পরিগণিত হয়। প্রথমে প্রধান শিক্ষক মহাশয় ছিলেন ভগবতী চন্দ্র গাঙ্গুলী, মাহিনা ৮৪৲ টাকা। ১৮৫২ সালে ইস্কুলটি গভর্ণমেণ্ট তালিকাভুক্ত হয়। রাজা বিশ্বনাথ সিংহ ইস্কুলটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ছাত্রদের মাহিনা ছিল এক টাকা ক'রে। ১৮৪৯-৫০ এ ছাত্র সংখ্যা ছিল—৭৫; তারমধ্যে ৬৩ জন হিন্দু, ১১জন মুসলমান, ১ জন খৃষ্টান।

জগৎচন্দ্র সেন ত্রিবেণীতে একটি ইস্কুল স্থাপন করেন। ১৮৪০ সালে

শিক্ষাসমিতি ইস্কুলকে 'probational' হিসাবে গ্রহণ করে। ১৮৪৩ সালে ইস্কুলটা উঠে যায়।

সীতাপুর ইস্কুল হুগলী জেলার ঝিক্‌ড়ে নামক গ্রামে। পার্শ্ববর্তী সীতাপুর গ্রামের নামে ইস্কুলটি হয়। তার আগে এখানে সীতাপুর মাদ্রাসা ছিল। ১৮৩৯ সালে সীতাপুর ইস্কুল হ'ল হুগলী কলেজের শাখা। ঐ বৎসর সরকারের তত্ত্বাবধানে আসে। ১৮৫১ সালে ইংরেজি বিভাগটি উঠে যায়, পুনরায় এটি মাদ্রাসা নাম নিল।

চট্টগ্রামে ব্যাপটিস্ট পাদ্রীরা ইস্কুল খুলেছিল, চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ড্যামপিয়ারের প্রচেষ্টায় ১৮৩৬ সালে ইস্কুলটি স্থাপিত হয়।

১৮৩৮ সালে দিনাজপুর ইস্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮৪১ সালে ইস্কুলটি উঠে গেল। ১৮৫৩ সালে আবার খোলা হ'ল। ১৮৫৫ সালে প্রধান শিক্ষক ছিলেন গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ময়মনসিংহে ১৮৩৩ সালে ইংরেজি ইস্কুল বেসরকারী ভাবে স্থাপন করা হয়। প্রধান পৃষ্ঠপোষক—কালীকৃষ্ণ রায়, ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী। ১৮৫৩ সালে এটি জেলা ইস্কুলে পরিণত হয়।

বর্ধমান ইস্কুল মহারাজা নিজে ১৮১৭ সালে স্থাপন করেন। ছাত্রেরা বিনা মাহিনায় পড়ত। ১৮৪৫ সালে বর্ধমানে আর একটি সাহায্যীকৃত ইস্কুল সরকার স্থাপন করেন; ওয়ার্ড নামে একজন ইয়োরোপীয় মহারাজার ইস্কুলে কাজ করত, তাকেই ভাঙ্গিয়ে নিয়ে এসে এখানে প্রধান শিক্ষক ক'রে দেওয়া হ'ল। ব্যাপারটি অনুধাবন যোগ্য। এই ইস্কুলে প্রথম কয় মাস ছাত্রদের মাহিনা নেওয়া হত না। পরে মাহিনা প্রবর্তিত হওয়াতে ছাত্রেরা সব সরে পড়ল। ১৮৫২ সালে মহারাজা প্রস্তাব করেন যদি গভর্ণমেণ্ট ইস্কুলটি উঠিয়ে দেন তবে তিনি নিজের ইস্কুলের আরও উন্নতি করবেন। কিরকম উন্নতি? প্রকাশ আছে যে যারাই বিনা বেতনে পড়তে চায় তাদের কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না (he would place his School upon a better footing and guarantee that no one really desirous of free education in Burdwan should be deprived of it) সরকার সেই ব্যবস্থাই করলেন। দুজন ইয়োরোপীয় প্রধান শিক্ষকের পর প্রথম বাঙালী প্রধান শিক্ষক হ'ল রামতনু লাহিড়ী।

অনুরূপ ইতিহাসই সর্বত্র। শ্রীহট্ট, বরিশাল, নাটোর, পাবনা, বীরভূম

পুরুলিয়া, বারাকপুর সব ইস্কুলেই একই ঘটনা। এগুলি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেল ১৮৫৫-৫৬ সালের মধ্যেই। তবে স্বাধীন ইস্কুলও তখন অনেক ছিল।

লর্ড ড্যালহৌসির সময়ে বাংলাদেশে প্রায় সমস্ত জেলাতেই একটি ক'রে ইস্কুল স্থাপিত হ'ল। ১৮৫৩ সালে পাই ৪০টি জেলা ইস্কুল, ১৮৫৯ সালে ৪৭টি। ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৬৫০০।

কতগুলি বিদ্যালয়কে বলা হ'ত Probational School বা সাময়িক চুক্তিবদ্ধ। জি. সি. পি. আই এ-সব ইস্কুলে অর্থ সাহায্য না করে শুধু পুস্তকাদি সাহায্য করত। যদি বিদ্যালয় ভালো ভাবে চলত তবে সরকার সে বিদ্যালয়কে তালিকাভুক্ত করত।

এই ব্যাপারের মধ্যে দেখা গেল শিশু পাঠশালা বা Infant School. হুগলীতে ১৮৩৮ সালে এইরূপ পাঠশালা স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজ পাঠশালাকেও এই শিশু পাঠশালা বলা যেতে পারে। এই ইস্কুল শিশুদের জন্য, কারণ ৫ বৎসর বয়সের বেশি বয়স্ক ছাত্রদের এই পাঠশালায় ভর্তি করা হ'ত না।

ইংরেজি ইস্কুলের ব্যবস্থাপনা :

১৮৪০ সালে সরকার সাহায্য কৃত ইস্কুল ও কলেজ পরিচালনার নিয়ম প্রকাশ করা হয়।

এই সময় তিন রকমের ইস্কুল ছিল। সাধারণ কথায় ইস্কুল, কলেজের সঙ্গে যুক্ত প্রিপারেটরী বা ব্রাঞ্চ, এবং সিনিয়র ইস্কুল বা কলেজ। সাধারণ ইস্কুলে ৬ থেকে ৮ বৎসরের ছেলেরা ভর্তি হত। পাঠকাল ৪ বৎসর। তারপর সিনিয়র ইস্কুল আসবে—এখানে পড়বে পাঁচ বৎসর। তারপর বৃত্তি পেলে আরও ৬ বৎসর শিক্ষা নিতে পারবে। অর্থাৎ সর্বসাকুল্যে পাঠকাল ৪+৫+৬=১৫ বৎসর। ২১ থেকে ২৩ বৎসর বয়সে তারা কর্মজগতে পণ্ডিত হয়ে বেরোত।

ভর্তি হওয়ার নিয়ম : ৮ বৎসরের বেশী বয়স নয়। যদি বেশি হয় তবে নিম্নরূপ যোগ্যতা অর্জন করে আসতে হবে :—

স্কুল বুক সোসাইটির ইংলিশ রীডারের দ্বিতীয় ভাগ শুদ্ধ ক'রে পড়তে এবং উচ্চারণ করতে জানা চাই।

১২ বৎসরের পর ভর্তি হ'তে হলে, স্কুল বুক সোসাইটীর ইংলিশ রীডার পঞ্চম ভাগ অনুরূপ ভাবে পড়তে পারা চাই; কেবল তাই-ই নয়, পদপরিচয়, ব্যাখ্যাও করতে হবে; অঙ্কের সাধারণ নিয়ম জানতে হবে; ভূপরিচয় জানতে হবে; প্রসিদ্ধ রাজ্য ও রাজধানীর নাম জানতে হবে এবং ঐ ইংরেজি পাঠ্য-পুস্তকের অংশ বাংলা বা হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করতে জানতে হবে।

শারীরিক শাস্তি রহিত করা হল। নিম্নবিভাগে ইস্কুলের পাঠ সময়ের ⅔ অংশ ইংরেজীতে এবং ⅓ অংশ সময় বাংলা পাঠে নিয়োগ করতে হবে। উচ্চ বিভাগে দিনের এক ঘণ্টা বাংলা আর অবশিষ্ট অংশ ইংরেজিতে।

পাঠ্য পুস্তক কিরূপ ছিল তার পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা ইংরেজিতে তালিকাটি দিলাম:

Junior Department

English & others	Bengali
4th Class	
Cards of letters, Syllables & words	Reading & writing on Boards
Cards of easy sentences	Burnomalla Nos I, II, III & IV
English Reader No I	Dharapat Nos I, II, III
Cards of figures	Neeticotha Nos I & II, Monorunjan, Dictation } Readers
3rd Class	
English Readers Nos I & II	Baycurran (Ram Mohan Roy)
Elements of Arthmetic (Chamier's)	Dictation
Elements of Geography (Clifit's)	Composition of Small Sentences
Writing on Slates	Translation of Short Sentences from English
	Outlines of Arith no IV
	Gyan Chandrica, Neeti Dursun } Readers

2nd Class

English Readers Nos II, III, IV
Elements of Grammar
(Woolaston's)
Arithmetic—the four simple and Compound rules.
Geography by reference to Globes & Maps.
Lessons on Objects

Gyanarnob—Reader
Parsing and exercises on Grammar.
Translation from English lessons into Bengali & to Compose there upon
Pattroqummudy—Letter writer
(Serampore Edition)
Composition of letters,
Dictation
Smyth's Zemindary Account.

1st Class

English Reader, IV & V
Azinghur Reader
Biography (Chamber's Course)
Poetical Reader, No II (Gay's (fables)
Grammar (McCulloch's)
Arith—(Fractions, Vulgar, Decimal) Proportion, Involution and Evolution.
Geography
by reference to Globes & maps and preparation of Maps.
Lessons on objects
Writing from Dictation
Translation from Vernacular into English

Selections from Probodh Chandrica (Readers)
Essay Writing on given subjects
Translation from English lessons.
Exercise and Parsing on Grammar
Dictation

Senior Dept.

5th & 4th Classes

1. Exercises in Syntax & Prosody
   (Lennie's and McCulloch's)
2. English Reader No 5
3. Malkin's History of Greece.
4. Poetical Reader, No III
5. Algebra—to Simple Equations (Hall's)
6. Use of Terrestrial Globe.
7. Physical Geography
   (Society for the Diffusion of useful knowledge)
8. Drawing (Chamber's)
9. Translation from the Vernacular into English.
10. English Composition

3rd Class

1. Same as above
2. Same Nos V & VI
3. Same
4. History of Rome from
   Lardner's Encyclopaedia
5. Hume's History of England.
6. Richardson's poetical Selections
7. Same.
8. Same as above in 5.

9. & 10. Same

11. First 4 books of Euclid.
12. Elements of Natural Philosophy
    (Introduction to the Sciences Mechanics, Hydrostatics, Hydraulics and Pneumatics—Chamber's Ed'nal Course)

2nd Class

1. English Reader no VI
2. Hume's History of England.
3. Marshman's History of India.
4. Russell's Modern Europe.
5. Richardson's Poetical Selections.
6. Algbra (Hall's & Hind's)
7. Geometry.
8. Plane Trigonometry & Conic Sections.
9. Natural Philosophy.
10. Drawing.
11. Perspective.
12. Mechanical & Architectural Drawing
13. Practical Surveying
14. Trans. from the Vern into Eng.
15. English Composition.

1st Class.

1. Bacon's Essays.
2. Same with Snowball's Continuation.
3. Robertson's India.
4. Same as in 2nd Class.
5. Same ... ...
6. Same ... ...
7. Smith's moral Sentiments.
8. Integral & Differential Calculus.
9. Astronomy
10. Mechanics, Hydrostatics, Hydraulics, optics.

11, 12, 13, 14, 15—Same as in 2nd Class (10. 11, 12, 13, 14, 15)

Bengali & Sanskrit in all Senior Classes

Essay Writing
Translation from English pieces
Exercise & Parsing on Grammar

Sanskrit

Grammar, Hithopodesha, Dictation, Composition etc.

এ ছাড়া পাঠ দেওয়া হ'ত নিম্ন বিষয়ে :—

Natural & Experimental Philosophy; Natural History; Jurisprudence, morals, Political Economy.

এই তালিকা থেকে অনুমান করা কঠিন হবে না যে, ছেলেরা কেবল যে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ত তাই নয়, মধুসূদনকেও তারা আবিষ্কার করেছিল। ২০ বৎসর বয়সের মধ্যে বা কোন শ্রেণীতে দুই বৎসরের বেশি না পড়ে তো এই পরীক্ষা দিতে হবে! অতএব, মুখস্থ বিদ্যা এবং নির্বাচনীবুদ্ধির প্রয়োগ তারা ব্যবহার করলই।

যে-ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বা শিক্ষাবিদের সমতা জ্ঞানের এতখানি অভাব তারাই আবার বলেছিল ভারতের শিক্ষায় কেবল মুখস্থ করা আছে, উপলব্ধি নেই। আবার এদেরই মাথায় তুলে নেচে বলা হয়েছিল—তোমরা এসেছ আমরা বর্বরের হাত থেকে বাঁচলাম. রাজা হিসাবে ইংরেজ কেমন ছিল সে আলোচনা আমার প্রসঙ্গে নেই, কিন্তু শিক্ষাবিদ হিসাবে যে তারা অসহিষ্ণু ছিল এ কথা জোর ক'রেই বলা যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তু মানুষেরই সৃষ্টি। প্রয়োজনে এগুলিকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ সবের কোনটিই অনাবশ্যক নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান যদি মানবসমাজের অভিজ্ঞতা হয় তবে প্রতি মানুষকেই সেই অভিজ্ঞতায় পরিচয় নিতে হবে। একথায় কারও আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সমস্যাটি আর এক দিক দিয়েও দেখা উচিত।

প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতা বিশেষ পরিবেশ সম্পৃক্ত। দেখতে হবে—ব্যক্তিটি সেই পরিবেশে আদৌ আসবে কিনা। আসতে যদি হয় কোনকালে, তখন সেইসম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করবার মতো তার যথেষ্ট মানসিকতা গঠন করা হ'ল কিনা। শিক্ষা-উদ্দেশ্যকে এই মাপকাঠিতেই কাল-পরিমিত করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিটি কেবল অভিজ্ঞতা নিয়েই আড়ে বহরে বেড়ে চলতে পারে না। পার্থিব সমস্যাকে বাদ দিয়ে, দৈনন্দিন কাজ কর্মকে, রুজি রোজগারকে বাদ দিয়ে যদি সে এমনি বেড়ে চলে তবে সে হবে ফানুস! যদি কেবল নিঃসম্পর্ক অভিজ্ঞতা নিয়েই সে দিন গুজরান করতে চায় তবে—টাক মাথায় চিরুণী চালানো হয়ে পড়বে।

আর-একটি ধুয়া আছে—সর্বাঙ্গীণ বিকাশ করতে হবে যে! কাকে বলে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ তাতো ঠিক হ'ল না। শঙ্করাচার্য যৌনজীবন পরিহার করে ছিলেন ব'লেই কি তাঁর জীবন বিকাশ হয় নি। বিদ্যাসাগর বা রামমোহন প্রচলিত সমাজের বিরোধিতা করেছিলেন বলেই কি তাঁরা অসুস্থ-মনা! মহাত্মাজী ফুটবল খেলেননি কিংবা রবীন্দ্রনাথ ক্রিকেট খেলেন নি বলেই কি তাঁরা অমানুষ! স্বামীজী থিয়েটার করেন নি বলেই কি তাঁর শিক্ষা সার্থক হয় নি!

ফলত সর্বাঙ্গীণ বিকাশ যদি কতগুলি বিষয় এবং বই দিয়ে ঘটানোর কথা হয় তবে স্পষ্ট ক'রেই বলা উচিত যে, এগুলি চালবাজ বা ফেরেববাজ শিক্ষাবিদের অহিতকর শ্লোগ্যান মাত্র।

ইংরেজরা চেয়েছিল, কি? চেয়েছিল, তাদের সংবাদ-বহুল বহু বিষয় নিয়ে এসে আমাদের মানসিক উৎকর্ষকে নষ্ট করতে। আমরা চকচকিয়ে গিয়েছিলাম, মোহাবিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মা ব'লে দিয়েছিল—মুখস্থ কর, অনেক বর্জন কর, কিছু রপ্ত ক'রে চাকরীতে লেগে যাও! বণিক হিসাবে ইংরেজ দিয়েছিল মদ, শিক্ষাবিদ হিসাবে তারা দিয়েছিল অব্যক্ত পুথি পুস্তক। আমরা ভয়ে ছোট হয়ে থাকলাম।

১৮৪২ সালে সরকার প্রতিষ্ঠিত জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন উঠে গিয়ে জেনারেল কাউন্সিল অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন গঠিত হয়। যদিও এই কমিটি বা কাউন্সিল সরকারের বেনামী প্রতিষ্ঠান, তবু সরকার মনে করল, সরকারের সা'‍য্যলব্ধ ইস্কুল কলেজকে সরকার নিজস্ব করে নেবে; ব্যয়ের ভার নিজেরা রেখে কাউন্সিলের উপর পরিদর্শনের ভার দেবে। কাউন্সিল অব এডুকেশন প্রবল আন্দোলন করায় ১৮৪৮ সালে সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হল। আর একটি ভাগ দেখা যায় বাংলা প্রদেশ নিয়ে। ১৮৪৬ সালের পূর্বে বঙ্গপ্রদেশ আসাম থেকে আগ্রা পর্যন্ত ছিল। ১৮৪৬ সালে, বাঙ্গলা-বিহার উড়িষ্যা থেকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ইস্কুলগুলি স্বতন্ত্র হয়ে গেল, এবং ঐ অঞ্চল আগ্রার লেপ্টন্যাণ্ট গভর্ণরের অধীন হ'ল।

বাংলা ইস্কুল (varnacular Schools) সম্পর্কে ১৮৪৪ সাল থেকে হার্ডিঞ্জ সাহেব বোর্ড অব রেভিনিউয়ের সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। এই ইস্কুল কাউন্সিলের অধীনে রাখতে তিনি চান নি। বোর্ড অফ্ রেভিনিউ রাজস্বের আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করে। অবশ্য হার্ডিঞ্জের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছিল তা আমরা পূর্বে দেখেছি।

সেকালকার বাংলা প্রদেশের ইংরেজি ইস্কুল সম্পর্কে আর একটি খবর আমাদের নেওয়া দরকার। কোন্ যন্ত্রটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালীদের সরকারী চাকরীতে টেনে আনল বা কোন্ যন্ত্রটি 'শিক্ষিত' বিশেষণটি প্রয়োগ করল। এই যন্ত্রটি হচ্ছে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা!

এই ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার দুটি শ্রেণী—নিম্ন ও উচ্চ (Junior and Senior)।

লর্ড বেন্টিকের আমলে (১৮৩৫) সরকারের সাহায্যীকৃত ইস্কুলে ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হবে, ছাত্রেরা বিনা বেতনে পড়বে এবং তারা মাসহারাও পাবে এই রকম নিয়ম ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর বেন্টিঙ্ক এই মাসহারা বন্ধ করবার প্রস্তাব করেন, প্রস্তাব অনুযায়ী কিছু কাজও করা হ'ল। এতে বাংলাদেশে না হলেও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছাত্র সংখ্যা কমে যায়। ১৮৩৭ সালে লর্ড অকল্যাণ্ড মাসহারা প্রথা উঠিয়ে দিয়ে বৃত্তি প্রথার প্রবর্তন করেন। ১৮৩৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বরে অকল্যাণ্ড শিক্ষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাই-ই দিল্লী মিনিট (Delhi minute)।

লর্ড অকল্যাণ্ড বেশ সমাজনীতিজ্ঞ ছিলেন বোঝা যায় তাঁর মন্তব্য থেকে। তিনি ধূর্তের চক্ষে লক্ষ্য করেছিলেন যারা ইংরেজি শিক্ষা নিয়েছে তাদের অবস্থা 'না ঘরকা না ঘাটকা'; বিদেশী-শাসক আর এই নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে সহমর্মিতা গড়ে উঠতে পায়নি, কারণ নব্যশিক্ষিতেরা মনে করেছে, সমাজের একস্তর থেকে তাদের তুলে আনা হয়েছে অথচ অন্যস্তরে তারা প্রবেশাধিকার পাচ্ছেনা (They had not received a good Native education, and the English education they have received finds little, if any, use. There is thus a want of sympathy between them and their countrymen, although they constitute a class from which their countrymen might derive much benefit. There is also little sympathy between them and the foreign rulers of the country, because they feel that they have been raised out at one class of society without having a recognised place in any other class.—)

উপরের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন লর্ড অকল্যাণ্ড তাঁর ১৮৩৯ সালের ২৪শে নভেম্বরের লিপিতে ১৫ সংখ্যক অনুচ্ছেদে। কিন্তু মন্তব্যটি এ্যাডাম সাহেবের, লংসাহেব কর্তৃক সম্পাদিত এ্যাডাম সাহেবের 'Reports on

Vernacular Education in Bengal and Behar' এর ৩০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। অকল্যাণ্ড এ্যাডাম সাহেবের উক্তির অনেক বিরোধিতা করলেও, মূল কথাটি উপেক্ষা করতে পারেন নি। কারণ ১৬ সংখ্যক অনুচ্ছেদে তিনি এ্যাডাম সাহেবের এই যুক্তিকে খণ্ডন না ক'রে কেবল ধামাচাপা দিয়েছেন। এই জন্যই বলেছিলাম, অকল্যাণ্ড সাহেব ধূর্ত শিক্ষাবিদ।

অকল্যাণ্ড এ্যাডাম সাহেবের অনেক কথা একটু ঘুরিয়ে স্বীকার ক'রে বাংলা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়া অনুমোদন করেন, অনুমোদন করেন ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী একই কর্মব্যাপারে লিপ্ত হবে। যাই হোক আমরা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

অকল্যাণ্ডের আদেশে মাসহারা উঠে বৃত্তি ব্যবস্থা হ'ল। প্রথমে প্রায় ৫২ হাজার টাকা এই বৃত্তির খাতে বরাদ্দ করা হ'ল।

পরীক্ষার ফল দেখে বৃত্তি। চারজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন বৃত্তি পাবে। (মাসহারা ব্যবস্থা ধরলে ১/৪ অংশ মাসহারা হল বলে অনুমান করা যায়। দুই প্রকার বৃত্তি নিম্ন ও উচ্চ.নিম্নবৃত্তি ৮৲ হিসাবে প্রাচীন ভাষার উচ্চবৃত্তি ২০৲ এবং ইংরেজি ভাষার উচ্চবৃত্তি ৪০৲। ইংরেজি বিভাগে ৭৭টি নিম্নবৃত্তি ও ৫৮টি উচ্চবৃত্তি; প্রাচীন ভাষায় ১০২টি নিম্ন ও ৭৭টি উচ্চ বৃত্তি নির্দিষ্ট হ'ল)।

ইংরেজি ভাষায় বৃত্তির অর্থ পরিমাণ লক্ষ্য করার মতো। তবে প্রাচীন ভাষার নিম্নবৃত্তির সংখ্যা বেশি কেন তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার। সে সময়ে ইংরেজি শিক্ষকের (বাঙালী) মাহিয়ানা মাসে ২০৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকা।

সংস্কৃত শিক্ষকের	মাহিয়ানা মাসে	১৬৲ টাকা থেকে		৬০৲ টাকা	
বাংলার	...	১৬৲	...	২০৲	...
পারসী	...	১০৲	...	২০৲	...
আরবী	...	৩০৲	...	৬০৲	...
হিন্দী	...	১৬৲	...	২০৲	...
উর্দু	...	১৬৲	...	২০৲	...

এই সময় ইংরেজি পড়ুয়া উচ্চ ছাত্রবৃত্তি পাচ্ছে ৪০৲ মাসে আর প্রাচীন ভাষায় পাচ্ছে ২০৲ টাকা মাসে। এই ছাত্রদের সম্মুখীন হয়ে শিক্ষকদের মুখের অবস্থা অনুভব করা যায় বৈ কি। এরই সঙ্গে একবার হিন্দু কলেজের বাঙালী শিক্ষক বা পণ্ডিতদের মাহিনা দেখা যাক (১৮৪৯-৫০ সালের হিসাব থেকে)।

উচ্চ শ্রেণীতে

রামচন্দ্র মিত্র,	অনুবাদ করাতেন—মাহিনা	২০০৲	যোগ দিয়াছেন	১৮৪৮	সালে
পীতাম্বর শর্মণ	পণ্ডিত ...	৩৫৲	...	১৮২৭	...
গৌরীচরণ শর্মা	" ...	২০৲	...	১৮৪৪	...

নিম্ন শ্রেণীতে

ঈশ্বর চন্দ্র সাহা—তৃতীয় শিক্ষক—	১২৫৲	...	১৮৪৪	...
বেণীমাধব ব্যানার্জী—চতুর্থ শিক্ষক—	৯৫৲	...	১৮৪৬	...
শ্যামাচন্দর দত্ত—দ্বাদশ শিক্ষক—	৫০৲	...	১৮৪৮	...
কালিদাস শর্মণ—প্রথম পণ্ডিত—	২০৲	...	১৮৪৪	...
বেচারাম গুপ্ত—চতুর্থ পণ্ডিত—	২০৲	...	১৮৪২	...

শিক্ষকের বেতনে বৈষম্য, শিক্ষক ও ছাত্রের বৃত্তিতে বৈষম্য লেখাপড়ার মানসিকতা কতখানি সৃষ্টি করতে পারে অনুধাবন করা যায়। কর্তৃপক্ষের টাকা খবচ কবা যত প্রেবণাব, তত প্রেরণা নেই ছাত্র শিক্ষক বা শিক্ষক-শিক্ষকে সুস্থ সম্পর্ক স্থাপন করায়। অর্থ অনর্থ বটেই। কিন্তু ব্যবস্থাপকদের এই অনর্থ সৃষ্টি করার মনোভিলাষ দুর্জ্ঞেয় যতই হোক, মহাকাল আর মানব-মন তা ঠিকই জানে, আর জানে বলেই কোন ইস্কুল-কলেজে আজ পর্যন্ত নৈষ্ঠিক শিক্ষক বা ছাত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু পেতেই হবে এমনই বা কোন্ কথা। বিদ্যার দেবী সরস্বতী। কিন্তু শিক্ষার অধিষ্ঠাত্রী রাজ-নটি না হলেও ইন্দ্র সভার নর্তকী। দেশের শাসকদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার জন্য সে কেমন সাজ গোছ করে তা আমরা পশ্চিমখণ্ডের গোড়ার দিকে বলতে চেষ্টা করেছি।

পরবর্তী কালে এই বৃত্তি সংখ্যা ৩১৫টি করা হয়, আর মাসিক ব্যয় হয় ১৭৮৪৲ টাকা। মাত্র দুটি কলেজ ছিল তখন হিন্দু আর হুগলী, তা ছাড়া ছিল মফঃস্বলেব কয়েকটি জেলা ইস্কুল। হিন্দু ও হুগলী কলেজ সংশ্লিষ্ট ইস্কুলে অধিক সংখ্যক নিম্নবৃত্তি গুলি দেওয়া হত। নিয়ম কি? নিম্নবৃত্তি প্রাপ্ত বালককে নিকটস্থ কেন্দ্র অনুযায়ী হিন্দু, হুগলী, ঢাকা বা কৃষ্ণনগর কলেজে পড়তে হবে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের ৫টি নিম্ন ও ৭টি উচ্চবৃত্তি নির্দিষ্ট ছিল। হিন্দু কলেজের শাখা হিসাবে বিশেষ কোন ইস্কুল ছিল না তখন। কাজেই ২টি নিম্ন ও ২টি-

উচ্চ বৃত্তি বাইরের ছেলেদের জন্য বরাদ্দ থাকল। কিন্তু হুগলী কলেজ সংশ্লিষ্ট ছিল—হুগলী ব্রাঞ্চ, সীতাপুর, ত্রিবেণী, উমরপুর, যশোর, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া। ঢাকার সঙ্গে—সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, রামপুর বোয়ালিয়া।

প্রথমদিকে উচ্চবৃত্তি পরীক্ষা জেনারেল কমিটির সদস্যেরা করতেন। ১৮৪৩ সালে হিন্দু ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ নিজ নিজ কলেজ-ইস্কুল ছাত্রদের বৃত্তি পরীক্ষা নিতেন। তবে কৃতকার্য ছাত্রদের পুনরায় মৌখিক পরীক্ষা দিতে হ'ত কমিটির সদস্যদের কাছে। লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে গভর্ণমেণ্ট হাউসে পরীক্ষা হ'ত। তাঁর পরে টাউন হলে পরীক্ষা হ'ত। মফঃস্বলের ইস্কুলের স্থানীয় সমিতি পরীক্ষা নিতেন। ১৮৪৭ সালে কমিটির সদস্যেরা আর পরীক্ষক হন নি।

১৮৩৯ সালে প্রথমে বৃত্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয়। দুর্গাপূজার কিছু আগে পরীক্ষাটা হ'ত। ১৮৪৯ সালে বৃত্তি পরীক্ষার নতুন নিয়ম কাউন্সিল (The Council of Education) করলেন। এই কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন—বেথুন সাহেব আর সম্পাদক ফ্রেড. জে. মোয়াট, এম ডি (Fred. J. MOUAT. M. D.)। বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে এই বৃত্তি পরীক্ষা একমাত্র ছিল। ১৮৪৯ সালের নিয়ম ও উদ্দেশ্য বিস্তৃত আলোচনা করছি।

"সরকারী কলেজগুলিতে আজ পর্যন্ত এই যে নিয়ম চলে আসছে এতে হয়েছে কি—সমগ্র উচ্চবৃত্তি যে-কোন রকম কলেজের ছাত্রদের কাছে অবারিত হয়ে পড়েছে। এর ফলে, অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছাত্র না হলে সাধারণ ছাত্রেরা তাদের বয়স্ক ছাত্রদের কাছে হেরে যাচ্ছে।

গত বৎসর সর্বপ্রথমে অঙ্কের শ্রেণীতে একটা স্বাতন্ত্র্য করা হল। খবর দেওয়া হ'ল, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পৃথক পৃথক অঙ্কের প্রশ্নপত্র করা হবে। বর্তমানে এই নীতিকে আরও ব্যাপক করা হবে। অঙ্ক শ্রেণীকে ৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা হবে; সাহিত্যের শ্রেণীতে ২টি। সাহিত্যের শ্রেণী বিভাগ কম হওয়ার উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের মতো অত সূক্ষ্ম শ্রেণী বিভাগ করার দরকার হয় না (so minute a subdivision not being deemed necessary in Literature as in Science)।

শেষের বিজ্ঞান শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'লে তাদের প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য শাখায় আসতে দেওয়া হবে (the students will be found competent

to be promoted into the first class of literature as soon as they are out of the last class of Science)। তাতে দাঁড়াচ্ছে—

প্রথম সাহিত্য বিভাগে থাকল—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় } শ্রেণী সমূহ।

দ্বিতীয় সাহিত্য বিভাগ— চতুর্থ শ্রেণী।

ফলে প্রত্যেক ছাত্র দু বছর করে একই শ্রেণীতে থাকবে। যদি কেউ একই শ্রেণীতে দু বছরের বেশী থাকে তবে বৃত্তি পরীক্ষা তাকে দিতে দেওয়া হবে না বা উপরের শ্রেণাতে যেতে পাববে না। এই নিয়ম করায় মোটামুটি একই বয়সী ছাত্রেরা একই শ্রেণীতে পড়বে।

এই পরিকল্পনায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন কলেজে নিম্নরূপ উচ্চবৃত্তি বণ্টন করা হবে।

	হিন্দুকলেজ	হুগলী	কৃষ্ণনগর	ঢাকা
প্রথম শ্রেণীতে	৬	৩	৩	৩
দ্বিতীয় শ্রেণীতে	৫	৩	৩	৩
তৃতীয় শ্রেণীতে	৫	৩	২	২
মোট	১৬	৯	৮	৮

নিম্নবৃত্তির বেলায় এতাবৎ উচ্চবৃত্তির বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটেছে। ইস্কুলের উচ্চবিভাগে তিনটি কবে শ্রেণী। সবাইকে এক সঙ্গে পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা বয়স্ক ছাত্রদের পর্যায়ে না হয়ে হয়েছে সর্বনিম্ন ছাত্রদেব পর্যায়।

এখানে পরীক্ষার মান উন্নীত করতে হবে। নিয়ম হবে যারা ইস্কুলের উচ্চ বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে তাদেরই পরীক্ষা দিতে হবে। তারা কলেজে পড়তে যাবে।

ইস্কুল আর কলেজের পরীক্ষার নিয়ম তা হলে দাঁড়াল—

ইস্কুলের তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা বৃত্তি পাবে না, তবে মেধাবীদের পুস্তক পারিতোষিক দেওয়া হবে। প্রথম শ্রেণীতে এক বছর থাকার পর তারা কলেজে ঢোকার পরীক্ষা দেবে। যারা মোট নম্বরের অর্ধেক পাবে তারাই কলেজে গিয়ে এক বছর কাল নিম্নবৃত্তি পাবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে

দু' বছর থাকলে তারা নিম্নবৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারবে না। অবশ্য জিলা ইস্কুলের বেলায় এ নিয়ম খাটবে না।

এক বছর পর নিম্নবৃত্তির ছাত্র কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দেবে। অধিক নম্বর প্রতি বিষয়ে পেলে তারা আর এক বছর বৃত্তি পাবে।

কলেজ দ্বিতীয় বর্ষে সেই শ্রেণীর বিষয়ে তারা আবার পরীক্ষা দেবে। যদি ১/৩ অংশ নম্বর পায় তবে তৃতীয় বর্ষের শেষে তাদের আবার পরীক্ষা করা হবে।

এরপর আর তারা নিম্নবৃত্তি পাবে না। কিন্তু তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষায় যদি অধিক নম্বর পায় তবে উচ্চবৃত্তি পাবে।

মোটামুটি এই হচ্ছে নিয়ম। কিন্তু একটু অসুবিধা থাকল। বৃত্তিধারী ছাত্রদের সঙ্গে শ্রেণীর সাধারণ ছাত্রের তারতম্য কি? তাতে বললেন,

অধ্যক্ষ মনে করলে শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রদেরই পরীক্ষা দেওয়াতে পারেন। তবে এক বছরের ছাত্র আর দুবছরের ছাত্রের নম্বরের বেলায় হিসাব করতে হবে এই ভাবে যে, এক বছরের ছাত্র যেমন অর্ধেক নম্বর পেলেই বৃত্তি পাবে দুবছরের ছাত্রকে ২/৩ অংশ নম্বর পেতে হবে।

উপরের শ্রেণীতে সাধারণ ছাত্রকে উন্নীত করতে হলে ১/৫ অংশ নম্বর পেতে হবে। অবশ্য পরীক্ষার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে অধ্যক্ষের বিবেচনার উপর নির্ভর করবে।

পরীক্ষার মান উন্নয়ন করায় জেলা ইস্কুল অসুবিধায় পড়ল। তাদের ছাত্র তো প্রতিযোগিতা ~~পেরে~~ উঠবে না! কাজেই তাদের নম্বরের হার কমিয়ে দেওয়া হ'ল। তারা অবশ্য কলেজে যেতে পারবেনা, যাবে ইস্কুলের উচ্চ বিভাগে।

এতে বোঝা গেল কলেজের পড়ানো, আর ইস্কুলের পড়ানোয় অনেক তফাৎ ছিল।

আর একটি স্বাতন্ত্র্য করা হল—যারা কলেজের সমস্ত পাঠ শেষ ক'রে বের হ'ল আর যারা অসমাপ্ত রাখল। অসমাপ্ত পাঠ রাখল যারা তাদের একটা সার্টিফিকেট দেওয়া হবে এই মর্মে যে, এত বছর কলেজে পড়েছে। আর পাঠ শেষ করল যারা তারা বিশেষ উপাধি পাবে এই মর্মে যে সে অমুক কলেজের স্নাতক (Graduate)। এটি উপাধি। আবার এই স্নাতকেরা দুই শ্রেণীর—(১) কাউন্সিলের তালিকাভুক্ত হওয়ার মতো যারা, (২) আর তা নয় যারা।

প্রাক্তন ছাত্রদের বেছে বেছে (হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবের পর) শোভা স্নাতকও করা হ'ল (honorary Graduate)।

উচ্চ বৃত্তি পরীক্ষার বিষয় হল—

গণিত—১০০	নম্বর।
মিশ্র গণিত—১০০	"
সাহিত্য—৭০	"
ইতিহাস—৭০	"
অর্থনীতি এবং দর্শন—৬০	"
ইংরেজি রচনা—৫০	"
বাংলা রচনা—৫০	"
৫০০	

পরীক্ষা হ'ত (১৮৫০ সালের) ১০ টা থেকে ১২½ টা একবার আর ২টা থেকে ৫½ অপরাহ্নে আর একবার।

নিম্ন ছাত্রবৃত্তির বিষয়—ইংরেজি গ্রামার, ইতিহাস, অঙ্ক, ভূগোল, মাতৃ-ভাষার অনুবাদ, মৌখিক পরীক্ষা। নিম্নবৃত্তির বাংলা পাঠ্য ছিল (১৮৫১) বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি (দ্বিতীয় সংস্করণ), এবং শ্যামা চরণ সরকারের ব্যাকরণ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর (১৮৫৭) নিম্নছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদের অন্তত দু বছর কোন কলেজে পড়তে হ'ত। সরকারী ইস্কুল বা জিলা ইস্কুলের ছাত্রদের এই বৃত্তি পরীক্ষার নিয়ম অনেকটা পূর্ববৎ ছিল, কিন্তু বে-সরকারী ছাত্রদের বেলায় কতগুলি নতুন নিয়ম হয় ;

১৮৫৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারীর নির্দেশে স্থির হল,

(১) বেসরকারী ইস্কুলের ছাত্রদের জন্য সর্বসমেত ৩৭টি বৃত্তি থাকল।

(২) কলকাতার সন্নিকটের কোন ইস্কুলের ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হ'তে হবে, আর যারা কলকাতা থেকে দশ মাইলের দূর থেকে আসছে তাদের দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(৩) বয়স ১৯ বছরের কম।

(৪) পরীক্ষার এক বছর পূর্ব থেকে নিয়মিত ইস্কুল করছে,

(৫) নৈতিক চরিত্র ভালো,

(৬) কলেজের দু বছর পাঠকাল পর্যন্ত বৃত্তি পাবে। তবে পড়াশুনা সন্তোষজনক হওয়া চাই,

(৭) বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ১০ টাকা অথবা ৮ টাকা অবস্থানুসারে

(৮) যে-ইস্কুল থেকে অন্তত চারজন ছাত্র পরীক্ষায় পাশ করে সেই ইস্কুলের ছাত্রই বৃত্তি পাবে, কোন ইস্কুলে দু জনেব বেশী বৃত্তি পাবে না।

(৯) কলেজ-সংলগ্ন ইস্কুলও বৃত্তিব আওতায় পডবে, তবে কলেজটি যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত হয়।

(১০) বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রকে শিক্ষা-অধিকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত দুজন পরীক্ষকের সামনে যে কোন সময়ে পবীক্ষা দিতে হ'তে পারে, অবশ্য সেই কলেজের অধ্যক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষ এই পরীক্ষক নিযুক্তি; যদি সেখানে অকৃতকার্য হয় তবে বৃত্তি কাটা যেতে পারে।

(১১) অধ্যক্ষ যদি তার কার্যকলাপ আচরণ এবং চরিত্র সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন তবে তার বৃত্তি কাটা যাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ তখন ছিল:

(সরকারী)

১। প্রেসিডেন্সী { সাধারণ বিভাগ, আইন বিভাগ }
২। কলিকাতা মেডিকেল কলেজ
৩। কলিকাতা সিভিল ইঞ্জিনায়ারিং কলেজ
৪। হুগলী কলেজ
৫। ঢাকা কলেজ
৬। কৃষ্ণনগর কলেজ
৭। বহরমপুর কলেজ

(বেসরকারী)

৮। ডাভটন কলেজ
৯। সেণ্ট পলস্ স্কুল
১০। ফ্রীচার্চ ইনস্টিটিউসন
১১। লা মার্টিনিয়ার
১২। লণ্ডন মিশনারী ইনস্টিটিউসন
১৩। শ্রীরামপুর কলেজ

এখানে লক্ষ্য করবার এই যে, এইসব নিয়ম হল সিপাহী বিদ্রোহের পর। দেশের ছাত্র সম্প্রদায়কে এইভাবে ইংরেজের আওতায় আনবার প্রচেষ্টা প্রথম থেকে সুরু হ'ল। সরকারী কলেজ বাদ দিলে বেসরকারী সমস্ত কলেজই ইংরেজদের। কাজেই ভাল ছাত্র অর্থই ইংরেজ মুখাপেক্ষী। দেশের সমাজ থেকে ব্যক্তিকে বিচ্ছিন্ন করবার আর একটি অধ্যায়। এই জন্যই বোধ হয় আমরা দেখছি সাধারণত বাঙালী রাজকর্মচারীর সঙ্গে ইংরেজ রাজকর্মচারীর

মনের অনেক মিল। উভয়েই বুট জুতো পরত। আবার এই অবস্থার প্রতি-ক্রিয়াই বোধ হয় সৃষ্টি করল বঙ্কিমচন্দ্রকে, দীনবন্ধুকে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, কলকাতার ইস্কুলের মেধা আর তার দশ মাইলের বাইরের মেধার পার্থক্য। একজনের বেলায় প্রথম বিভাগ, অন্যজনের দ্বিতীয় বিভাগ।

১৮৫৮ সাল পর্যন্ত পৃথক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা হ'ত, কিন্তু ১৮৫৯ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকেই ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হ'ত।

১৮৫৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগের ছাত্র ছিল ২৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৮২ জন।

১৮৫৯ সালে নিম্নলিখিত বিষয়ে ছাত্রদের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হত :

১। ইংরেজি এবং অন্য একটি ভাষা (গ্রীক, লাতিন, হিব্রু, আরবী, সংস্কৃত, বাঙলা, উড়িয়া, হিন্দী, উর্দু, বর্মী)।

২। ইতিহাস ও ভূগোল

৩। অঙ্ক ও প্রাকৃত দর্শন

৪। প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা (Natural History)

ইংরেজি বইয়ের মধ্যে ছিল—(১) গোল্ডস্মিথ—ভিকার অব ওয়েকফিল্ড।
(২) জনসন—ভ্যানিটি অব হিউমান উইশেস।
(৩) পার্নেল—দি হারমিট।

এ ছাড়া পোপ, কাউপার, স্কট, ক্যাম্পবেল এ্যাডিসন, সাউদে, ডেফো।

বাংলা বই— (১) রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের চরিত।
(২) রামায়ণ।

ভাষা বিভাগে ব্যাকরণ প্রভৃতির প্রশ্নও থাকতে পারবে।

১৮৬০ সালের বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজি পাঠ্য ছিল,

(১) সেক্সপীয়র—জুলিয়াস সিজার।
(২) স্পেন্সার—(রিচার্ডসনের সঙ্কলন)
(৩) স্কট—মারমিয়ন।
(৪) জনসন—জীবনী—(১) মিলটন, (২) ড্রাই-ডেন, (৩) এ্যাডিসন. (৪) পোপ, (৫) সুইফট।

বাংলা— বত্রিশ সিংহাসন, পুরুষ পরীক্ষা, মহাভারত প্রথম তিন খণ্ড।

১৮৫৭-৫৮ সালে উচ্চবৃত্তি পেয়েছিল—৩৮ জন ; নিম্নবৃত্তি—৬৬ জন।

তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরের পাঠ্যতালিকা সরকারী কর্তৃপক্ষের মতে অত্যন্ত কঠিন হওয়ায় পরবৎসর কমিয়ে ফেলা হয়। সে বৎসর ৪৬৪ জন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ১০৪ জন উত্তীর্ণ হয়, ৩৩৩ জন অকৃতকার্য এবং ২৭ জন পরীক্ষা অসম্পূর্ণ রাখে।

বাংলা দেশের ইংরেজি ইস্কুলের নিয়মবদ্ধ হওয়ার প্রাক্কালে এইই হচ্ছে মোটামুটি ইতিহাস। ইস্কুলের শ্রেণীবিভাগ ক'রে যে কয় প্রকারের ইস্কুল এখন মেলে তা হচ্ছে—

(১) কলেজ ও কলেজিয়েট ইস্কুল।

(২) জিলা ইস্কুল—স্থানীয় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত, এর মধ্যে অধিকাংশই সরকারী কর্মচারী।

(৩) বেসরকারী ইস্কুল।

(৪) সাহায্য প্রাপ্ত ইস্কুল, (৫) প্রবেশনাল বা সাময়িক চুক্তিবদ্ধ ইস্কুল, (৬) ভার্ণাকুলার (৭) পাঠশালা বা ইনফ্যান্ট (৮) প্রাচীনভাষা শিক্ষা দেওয়ার ইস্কুল (মক্তব মাদ্রাসা, সংস্কৃত প্রভৃতি) (৯) নর্মাল ও মডেল ইস্কুল (১০) ইঞ্জিনিয়ারিং (১১) কৃষি বিদ্যালয় (১২) শিল্প বিদ্যালয় (১৩) মেডিকেল (১৪) স্ত্রীশিক্ষার ইস্কুল (১৫) মিশনারী (১৬) আইন শিক্ষার ইস্কুল।

ইস্কুল কলেজ সম্পর্কে কতগুলি সাময়িক ঘটনা ও শিক্ষাব্রতীদের মতামত :

কলকাতার মাদ্রাসা (ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্তৃক স্থাপিত ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে) নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সেখানকার ছাত্র ও অধ্যাপকের একটা সঙ্ঘর্ষ বাধে ১৮৫০ সালে। মাদ্রাসার পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বিরূপ মন্তব্য করেন, ধর্মালোচনায় আপত্তি করেন, ধর্মানুষ্ঠান করাও বোধহয় অনুমোদন করেন না। ডকটর স্প্রেঙ্গার (Dr Sprenger) ১৮৫০ সালে এই সব ব্যাপারে বাধা দিতে চেষ্টা করেন। ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে এমন বিদ্রোহ সৃষ্টি হয় যে তাদের সঙ্গে বাইরের সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা যোগদান ক'রে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি করেন। পুলিশ ডেকে এই বিক্ষোভ প্রশমিত করা হয়। কর্তৃপক্ষেরা পরবর্তীকালে ইংরেজি বিভাগকে কলেজ থেকে পৃথক ক'রে ফেলেন। কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে দেখা গেল তাঁরা পারসী ভাষা শেখানো অনুমোদন করেন, কিন্তু আরবীকে মনে করলেন বিপজ্জনক বোধ হয় এই কারণে

' যে আরবী ভাষাভিজ্ঞ কোন ইয়োরোপীয়কে পাওয়া যাচ্ছেনা খবরদারী করার জন্য (To find Europeans in India acquainted with Arabic is now very difficult. The Government has long ceased to encourage the acquisition of such knowledge by its servants, and it is with great difficulty that an officer can be found capable of superintending the College—minute by the Hon'ble the Governor of Bengal, 15th Sept. 1858)।

লেপ্টন্যাণ্ট গভর্ণর এই জন্যই ইচ্ছা করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রেসিডেন্সী কলেজে একজন আরবী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করতে। তবে তিনি চান না, আরবী শিক্ষার প্রাথমিক ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে। কারণ ১৮৫২ সালের বীডন সাহেবের মিনিট অনুযায়ী মনে করেন, ওতে মাতৃভাষার কোন মঙ্গল হবেনা, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা-ই। বিহারে কিন্তু দেখা গেল সরকারী ইংরেজি ইস্কুল বা জিলা ইস্কুলে তারা উৎসাহী নয়। ছাত্রবৃত্তিতে তাদের ফাঁদে ফেলতে পারেনি। প্রধান কারণ, হিন্দী-উর্দু সাহিত্য সেখানে খুব সমৃদ্ধ এবং ইংরেজি ইস্কুলে এই মাতৃভাষা অপাংক্তেয় হওয়া তাদের মনঃপুত হয়নি (The people here have a literature worthy the name in a tongue almost vernacular; and our schools made, until very lately, the fatal mistake of entirely neglecting the verna cular. In consequence of this unfortunate error, the Mahommedam population and the Hindoos in a less degree are not inclined to send their children to them, and it will be long ere the effects of this mistake are eradicated.)

প্রতিকারের জন্য ১৮৫৯ সালে ব্যবস্থা করা হল' $\frac{1}{8}$ অংশ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ এদের মধ্যে যারা কিছু ইংরেজি জানে তাদের জন্য বরাদ্দ করা হবে। আরও প্রস্তাব করা হয়, ১৮৬৩ সাল থেকে যেন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর ফল দেখে $\frac{1}{2}$ অংশ মুন্সেফ দারোগা প্রভৃতি পদ এদের দেওয়া হয়।

সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে দেশের ইস্কুল কলেজ তথা শিক্ষা ইতিহাসের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল তা ক্লার্ক সাহেবের (Sir G. R. Clerk, K. C. B. Secretary of the India Board) স্মারকলিপি থেকে পাওয়া যায়। বিষয়টি

কৌতূহল জাগায় বলে কিছু কিছু উদ্ধৃত কবছি। অবশ্য শিক্ষা অধিকর্তা এসব মন্তব্যের অনেক ব্যর্থ উত্তর দিয়েছেন।

"ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের এই বিদ্রোহীদেব হাত থেকে যে বিপদ ঘনিয়ে এল সে সময় যাদের মধ্যে এই উচ্চশিক্ষা বণ্টন কবা হয়েছে বহু আশা ক'বে তাদের ঔদাসীন্য এবং নিষ্ক্রিয়তা দেখে ইত্যাদি (The dispositon with which we have by these and other means of an aggressive character inspired the people, including the classes amongst whom these projects have been forced, is sufficiently shown in their passiveness or misconduct during the difficulties in which rebellion has plunged the British Government.)। জাতীয় জীবনের বিবোধী যে এই ইংরেজি শিক্ষা সে কথা নব্য শিক্ষিতেরাও বুঝতে পেরেছিল।

কিন্তু ইংরেজদের শিক্ষা উদ্দেশ্য এখান থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। তারা চেয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায় সব সময় দেশেব জাতীয়তার বিরুদ্ধে থাক। সাধারণ সময়ে হয়ত তাই গিয়েছে তাবা, কিন্তু সত্যিকারেব বিপ্লবে তাবাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল।

'কি শিক্ষা এত খরচ ক'বে তাদের দিলাম, যাতে তারা কেবল মনে করল, এই ইংরেজ প্রবঞ্চক আব মতলববাজ? (After ten years' operation, by means of expensive and numerous establishments of every sort, the masses and intelligent classes consider its patrons to be dishonest and tricky?')

এই-ই হচ্ছে গণমন। তারা প্রতিদিন অভিযোগ করেনা, প্রবঞ্চকদের বুঝতে দেয়না তারা এদের কাজ অনুমোদন করে, কিন্তু মানুষেব সেই অন্তর-ঠাকুরটি ঠিক সময় আহ্বান করে। শাসকের পদে থেকে এই কথাটি বোঝা যায় না। শাসকদের এইই হচ্ছে চিরকালকের ট্যাজেডি। গণমন নিয়ে বহু কবি, বহু দেশের লোক, বহু মনোবিদ বিদ্রূপ করেছে, কিন্তু গণমনের এই বিশিষ্ট ব্যবহার আছে বলেই শাসকেরা চিরকাল বক্তৃতা দেওয়ার অবসর পায় না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের মুখপত্র মন্তব্য করল, "এই উর্বর ভূমিতে এবং পরিশ্রমী জনপদ বিহারে কেন বিদ্রোহ হ'ল (সিপাহী বিদ্রোহ)? বিহারীরা চিরকালই নির্বোধ (stupid) এবং অনেকটা অলস জাতি (?) উত্তেজিত হয়েছিল ১৮৫৫ সালের শিক্ষা আইনে।"

অন্য একটি জেলা সম্পর্কে কমিশনার লিখলেন, "কোন জমিদার ম্যাজিষ্ট্রেটকে সামান্যতম সাহায্যও এ ব্যাপারে করেনি। একজন বিদ্রোহীকেও ধরিয়ে দিল না।"

সেই জুলাইয়ের ব্যাপার সম্পর্কে এক কমিশনার লিখলেন, "সমস্ত রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা যেন বিদ্রোহীদের এক রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার এক সদস্য জুন মাসে লিখছেন, "এই গুপ্ত শত্রু কারা আমরা এখন পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারিনি। কিন্তু সন্দেহ করবার পক্ষে প্রবল যুক্তি পাওয়া যায় যে, উচ্চ শিক্ষিত বাঙালীদের দ্বারা দেশীয় রাজ্যের কতিপয় অধিবাসী সিপাহীদের কত কৌশলে উত্তেজিত করা যায় সেই ব্যাপারে শিক্ষিত হয়েছে।"

(Who these secret enemies are we have, unfortunately, not yet been able to discover, but there is strong reason to suspect some people from native states have been so occupied lately, aided and instructed how best to set about alarming our sepoys by some highly educated Bengalees.—Memorandum by G. R. Clerk, para 10); এই সদস্য স্বীকারোক্তি করছেন, "আমার উল্লেখ করা উচিত, আমাদের শাসনের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক বিক্ষোভ তার অনেকগুলো কারণের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে,—তাদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অভিপ্রায় আমাদের আছে বলে ভয়, এই ভয় ব্যাপক এবং সত্যিকারের 'ভয়', এবং ইস্কুলের ব্যাপারে সরকারের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ, বিশেষ করে এই ইস্কুলে মিশনারীরা পড়ায় অর্থাৎ এই ব্যাপারে আমরা সাহায্য করি, এবং পরীক্ষা এবং তত্ত্বাবধান আমরা সরকারী কর্মচারী দিয়ে করি; সরকার নিরপেক্ষ হলেও আমরা সরকারী কর্মচারীদের এবং দেশীয় বাহিনীর কমাণ্ডারদের অনুমতি দিয়েছি ধর্মনীতি প্রচার করতে—যেন তারা মিশনারী। ভবিষ্যতে এগুলি বন্ধ করতে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে সরকারী শিক্ষাবিভাগে পাদ্রীদের নিযুক্ত করা হয়েছে। কোন অবস্থাতেই এসব আর চলতে দেওয়া উচিত নয়।"

মাদ্রাজের বাহিনীর সর্বাধিনায়ক বললেন, "শিক্ষা ব্যাপারে বেশি টাকা খরচ ক'রে আমরা বড় বেশি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

এতটা বাড়াবাড়ি না ক'রে এই টাকা দেশের লোকের সত্যিকারের কল্যাণ হয় এমন কোন কাজে ব্যয় করা উচিত ছিল।"

হজসন প্র্যাট (Hodgson Pratt), "যে সমস্ত লোক ছেলেদের ইস্কুলের বেতন দিতে পারেনা তারাই ছেলেদের মিশনারী ইস্কুলে পাঠায়। যাদের একটু অবস্থা ভালো তারা কখনও পাঠায় না।"

গর্ডন ইয়ং (W. Gordon Young) তখন শিক্ষা অধিকর্তা (D. P. I), তিনি মন্তব্য করছেন,

"তারা ছেলেদের সরকাবী ইস্কুলে (মিশনারী ইস্কুলে নয়) পাঠায় অর্থনৈতিক কারণে। সরকারী ইস্কুলে পড়াশুনা ভালো হয় ভালো মাইনে দিয়ে শিক্ষক রাখা হয়। তারা ছেলেদের ইস্কুলে পাঠায় ভালো শিক্ষা পাবে বলে নয়, ভবিষ্যতে তারা সম্পন্ন হোক ধনী হোক সেই প্রত্যাশায়। তারা চায় ইস্কুল হবে এমন প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে বেরিয়ে টাকা রোজগার ভালো করবে, চরিত্র সমৃদ্ধ নয়। এবং এই রকম প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে সরকারী ইস্কুল, নিখরচায় এই রকম ইস্কুল ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হোক তারা তা কামনা করে (And what they desire are Schools which will lead to the earning of Rupees rather than to the implanting of moral or religious principle. Such, for good and sufficient reasons possibly, are the Governr nt Schools, and such schools the Natives would no doubt willingly see set up, at no cost to them, in every hamlet.)।

শিক্ষা-অধিকর্তা ক্লার্ক সাহেবের উত্তর কাটাতে গিয়ে সরকারী ইস্কুলের উদ্দেশ্য সে যে কি বস্তু—তা আমাদেব সামনে অসতর্ক ভাবে উপস্থিত ক'রে ফেলেছেন।

আমরা ইংরেজি শিক্ষায় দেশের অসন্তোষ কোথায় ছিল আর আগ্রহ কোথায় ছিল তা অনেকটা বুঝতে পেরেছি। এখন ইস্কুল সম্পর্কে অন্যান্য কাহিনী কিছু উল্লেখ করা যাক।

১। ক্যাপটেন কাউপার ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বরে পুণার এক কলেজের ইস্কুলের পরীক্ষা করতে গিয়ে একটি ব্যাপার উল্লেখ করেছেন,

"কতগুলি রচনাকে পূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে—প্রথম শ্রেণীর রচনা, আর তারই জন্য সেগুলো পুরস্কৃত হয়েছে এবং ছাত্রদের পাঠে উন্নতির দৃষ্টান্ত

হিসাবে সেগুলি ছাপানো হয়েছে। এসব রচনা দেখলাম কেবল যে কোন বই থেকে হুবহু নকল তাইই নয়, ক্লাসে যে বই পাঠ্য তাই থেকেই নকল করা।'

২। ১৮৫১-৫২ সালে হুগলী কলেজের ইস্কুলে কার (Kerr) সাহেব চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজি পরীক্ষা নিতে গিয়ে একজন নর্মাল পাশ করা শিক্ষকের উৎসাহের সামনে পড়লেন,

'আমি ইস্কুলের পঠন-পদ্ধতি একটু দেখাব স্যার।' কার সাহেব এর আগে নর্মাল ইস্কুলের শিক্ষণ-পদ্ধতি কি তা জানতেন না। সম্মতি দিলেন। শিক্ষকটি ছেলেদের ইংরেজিতে 'নাক দেখাতে বললেন' 'চিবুক দেখাতে বললেন।' ছেলেরা ঠিক ঠিক উত্তর দিল অর্থাৎ সেগুলি দেখাল। কার সাহেব মন্তব্য করলেন, "নতুন কিছু শিখল এই পদ্ধতিতে তা তো মনে হচ্ছে না। তবে ঐ পদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজি বলতে শেখালে কিছু উন্নতি হবে বৈ কি!'

তথাকথিত 'ডাইরেক্ট মেথড' সম্পর্কে এই হচ্ছে বাংলা দেশে প্রথম মন্তব্য।

৩। ঢাকা কলেজের (১৮৫১-৫২) অধ্যক্ষ গৌরব করছেন, আমাদের প্রাক্তন ছাত্রেরা অনেক ভালো ভালো কাজ করছে। কারণ, পূর্বে নিন্দা করা হয়েছিল এই ব'লে যে, সরকারী কলেজের ছাত্রেরা ভালো দারোগা হ'তে পারে না, (the students of the Govt. Colleges do not make good Darogahs) কিন্তু আজকাল তারা ভালো দারোগাগিরি করছে।

৪। ১৮৪৯-৫০ সালে হিন্দু কলেজে বাংলা পরীক্ষা ক'রে হেড পণ্ডিত পীতাম্বর শর্মা বলছেন, "দুর্ভাগ্যক্রমে, বাংলাভাষা পড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে না। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের কোন নিয়ম রক্ষা করা হয়নি। দুটো শ্রেণীতেই 'মনোরঞ্জন ইতিহাস' পড়ানো হচ্ছে, হিতোপদেশের একই অংশ অন্য দুটি শ্রেণীতে পড়ানো হচ্ছে। ফলে কোন শ্রেণীতেই বইটি সম্পূর্ণ পড়ানো হয় না। প্রমোশনের পরও ছেলেদের কোন উন্নতি ঘটানো যায় নি। এই যে ত্রুটি এর জন্য পণ্ডিতেরা নিজেদেরকে দায়ী মনে করতে চান না; আর তত্ত্বাবধায়ক নিজে বাঙালী নন বলে মনে করেন ছাত্রদের খুব ভালো আর সুন্দরভাবে পড়ানো হচ্ছে।"

৫। ১৮৫৭-৫৮ সালে পরিদর্শক উড্রোসাহেব লিখছেন,

(ক) একমাত্র যশোহরের ইস্কুলেই দেখা যায় প্রধান শিক্ষকের বাসা দেওয়া হয়েছে।

(খ) নতুন ভর্তি বেতন কোন জেলা ইস্কুলেই এক টাকার কম নেই।

(গ) প্রত্যেক ইস্কুলেই একটু ক'রে জমি আছে খেলবার মাঠ হিসাবে। কিন্তু বাঙালী ছেলে জানে না কেমন করে খেলতে হয়। তা ছাড়া তাদের অভিভাবক মনে করেন, যে কোন রকমের শারীরিক কাজ অপমানকর, খেলাও। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিকেট দিয়েছে, বল দিয়েছে—কিন্তু খেলবে কে?

(ঘ) ছেলেরা ক্লাসে বসে চতুর্ভুজের তিন দিক নির্মাণ ক'রে আর শিক্ষক চতুর্থ ভুজ (তাঁর টেবিল নিয়ে) 'টি' গঠন করেন। এই পুরনো নিয়মের বদলে যে নতুন মঞ্চ ব্যবস্থা (গ্যালারী) বা সামন্তরিক ডেস্ক ব্যবস্থা হয়েছে তা অনুসৃত হচ্ছে না কারণ আমাদের এমন শিক্ষক নেই যিনি এই নিয়মে কাজ করতে পারেন।

(ঙ) বারাসত ইস্কুলে দু-ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়; আবাসিক বিদ্যালয় এবং কৃষি বিদ্যালয়। দুটিই নতুন ধরণের ইস্কুল। প্রধান শিক্ষকের পক্ষে যে উৎসাহ থাকলে এই পরীক্ষা সফল হতে পারত তা তাঁর ছিল না বলেই ব্যর্থ হ'ল। কৃষি বিদ্যালয় ব্যর্থ হল। কারণ উচ্চশ্রেণীর লোক শারীরিক পরিশ্রম পছন্দ করে না, মনে করে ও-সব চাষাদের কাজ।

উড্রো সাহেবের মতে শিক্ষাগ্রহণ এঁদের কাছে আর কিছুই নয়, দুই উদ্দেশ্যে টাকা লগ্নী করা মাত্র, এক ছাত্রবৃত্তি দুই চাকরী। আবাসিক বিদ্যালয় ব্যর্থ হ'ল কারণ জিনিষ পত্তরের মূল্য বেড়ে যাওয়ার দরুণ বোর্ডিং এর খরচ মাসে দু-টাকা তাঁরা নির্বাহ করতে পরাঙ্মুখ। এ দেশী শিক্ষকেরা পরিবার নিয়ে কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানে থাকতেও নারাজ (বোধহয় তখনও ছেলে-বউ নিয়ে বিদেশে থাকা সমাজ অনুমোদিত নয়)।

(চ) বারাকপুর ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় লর্ড বেন্টিঙ্কের দ্বারা। কিছুকাল এর তত্ত্বাবধান করেন লেডি বেন্টিঙ্ক। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষকের ব্যাপার সব নিয়ন্ত্রণ করতেন কাউন্সিল অব্ এডুকেশন। কিন্তু অন্যান্য দিক দেখতেন বারাকপুর পার্কের সুপরিনটেণ্ডেণ্ট। শিক্ষা ভাণ্ডার থেকে (Education Fund) এক পয়সাও এই ইস্কুল নেয় না। দরবার ফণ্ড থেকে গর্ভর্ণর জেনারেল মাসে ৮০৲ টাকা ক'রে সাহায্য করেন। এই ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন মাত্র ৫০ টাকা।

উড্রোসাহেব বলেন, ভালো কাজ করতে হ'লে বেতনও যেমন বাড়াতে হয়, উচ্চপদেও তাঁদের নিযুক্ত করা দরকার।

(ছ) বরিশালের ইস্কুল-শিক্ষা গ্রহণ করা যায় (পূর্ববাঙলার মধ্যে) সবচেয়ে কম খরচায়। প্রতি ছাত্রের পিছনে খরচ মাত্র আট আনা দশ পাই। এই ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে ⅓ অংশ উকিল ও আমলাদের সমাজের, ⅓ অংশ জমিদার, তালুকদার এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের। ব্যবসায়ীদের ছেলেরা শতকরা ·৮জন। ২২৫ জনের মধ্যে মাত্র ২জন। নারায়ণগঞ্জের মতো ব্যবসায়-কেন্দ্রের ব্যবসায়ীরাও ইস্কুল খাতে মাসে ২০ টাকা ব্যয় করতে চান না।

৬। সরকারী সাহায্য-বৃত্তি দেওয়া হ'ত তিন ধরণের ইস্কুলে ; ইংরেজী ইস্কুল ইরেজি-বাংলা ইস্কুল (Anglo-vernacular), বাংলা ইস্কুল (vernacular)

ইংরেজি-বাঙলা ইস্কুলে ইংরেজি পড়ানো হ'ত কেবল ভাষা ও সাহিত্য অংশে। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বাংলাতেই পড়ানো হ'ত। আর ইংরেজি ইস্কুলের (জিলা ইস্কুল) সমস্ত বিষয়ই ইংরেজিতে পড়ানো হ'ত। কিন্তু দুধরণের ইস্কুলের চরিত্রে খুব তফাৎ ছিল না। দুই ইস্কুলের ছাত্রেরা অন্যান্য বিষয় উপেক্ষা করে ইংরেজি ভাষাতেই বেশি মনোযোগ দিত।

সরকারী কর্তৃপক্ষ ইংরেজি-বাঙলা ইস্কুলকে খুব উৎসাহ দিতেন না, বরং উঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু দেশেব লোকের আগ্রহ বেশি এই ইস্কুলে।

পরিদর্শকের মতে, ইংরেজি বাঙলা ইস্কুলের ছেলেরা অঙ্ক, ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয় অন্যান্য ইস্কুল থেকে ভালো জানত।

বাংলা ইস্কুলের সঙ্গেও এদের তফাৎ ছিল। বাঙলা ইস্কুলে সংস্কৃত ঘেঁষা বাঙলার উপর জোর দেওয়া হ'ত। এখানে বাঙলা ভাষা ততটা সংস্কৃত অনুযায়ী নয় বটে কিন্তু তারা বাঙলা শুদ্ধ করে লিখতে ও বলতে পারত।

৭। সাহায্যীকৃত ইস্কুল দুই শ্রেণীর

(ক) যে ইস্কুলের শিক্ষকেরা নিয়মিত বেতন পেতেন তা পরিচালিত হ'ত সম্ভ্রান্ত জমিদার ও তস্য আত্মীয় স্বজন কর্তৃক, এঁদের যে-কেউ যদি একবার মনে করেন, "অমুক শিক্ষক ভালো নয়" তবে আর কথা নেই চাকুরী যাবে। এই নিয়ে পরিদর্শকদের সঙ্গে তাদের সঙ্ঘর্ষ বাধত। কিন্তু পরিদর্শকদের কিছু করবার উপায় ছিল না, পরিচালকদের অপ্রতিহত ক্ষমতা। ফলে ভালো শিক্ষক এই সব ইস্কুলে পাওয়া যেত না। সরকারী ইস্কুলে

৩০৲ টাকার চাকুরী করতে যাবেন শিক্ষক কিন্তু সাহায্য প্রাপ্ত ইস্কুলে ৫০৲ টাকায়ও কেউ কাজ করতে রাজি নন। যদিও উভয় ইস্কুলেই অবসর কালীন বৃত্তি (Pension) প্রথা আছে। এই অবসরকালীন বৃত্তি (সাহায্য প্রাপ্ত ইস্কুলে) প্রথাই এই অত্যাচারের মূল কারণ।

টাকী ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হাওয়াটসন (১৮৫৬-৫৭ সালে)। তাঁর অমায়িক চরিত্র, সময় নিষ্ঠা প্রভৃতি আদর্শের মতো। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজের দুটি তরুণ পরীক্ষক এসে বললেন—প্রধান শিক্ষক 'কনিক সেকসন' জানেন না। ব্যস কমিটি তাঁকে বরখাস্ত করলেন যদিও ইস্কুলে জ্যামিতির ঐ অংশ আদৌ দরকার হয় না।

এই ভাবে চাকুরী যায় সৈদপুরের শীল্ড সাহেবের, কাশীপুরের ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ইস্কুলে শিক্ষকদের বেতন অনিয়মিত। এখানে শিক্ষকদের দুর্দশার আর অন্ত নেই।

(গ) ১৮৫৭-৫৮ সালে সরকার পূর্ববাঙলার বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য মাত্র ১৮৲ টাকা মাসে ব্যয় করতেন। কতগুলো ইস্কুল ছিল গুরুমহাশয়ের-চক্রের অধীন। এদের মধ্যে সৈদপুর, ঢাকার লালবাগ, বাঙলা বাজার, বেসরকারী কুমারখালি, বারাসাত এবং ধামরাই বালিকা বিদ্যালয় এবং সাহায্যপ্রাপ্ত যশোরের বাঢ়ুলী বালিকা বিদ্যালয় উন্নত ছিল। ঐ সময় নৈহাটী ও নিবোধয়ে নতুন দুটি বালিকা বিদ্যালয় কেবল স্থাপিত হয়েছে। কুমারখালি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মথুরানাথ কুণ্ডু।

তৎকালে সরকারের নিয়ম ছিল, যে ইস্কুল পরিদর্শক মনে করবেন বাঙালী মেয়েদের জন্য ইস্কুল করা দরকার—তিনি ইস্কুল স্থাপন করতে পারেন কিন্তু ইস্কুলের যাবতীয় ব্যয় তাঁর নিজের পকেট থেকে করতে হবে। কে আর এমন উদার পরিদর্শক থাকবেন?

কিন্তু একজন ছিলেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি পরিদর্শক হিসাবে চল্লিশটি ইস্কুল খোলেন, এবং এখানে উচ্চশ্রেণীর ১৩৪৮টি (বিদ্যাসাগরের রিপোর্টে) বালিকা পড়ত। আর বিদ্যাসাগরের খরচ পড়ত ৩০০০৲ থেকে ৪০০০৲। উড্রোসাহেবের মন্তব্য, "The rule now observed in Bengal is that an Inspector of Schools who wishes to see Native Females instructed must pay for his Schools himself. I have

been cautious in gratifying my wishes, but Pundit Ishwurchandra Bidyasagar opened forty femals schools, secured an attendance of more than 1300 girls of good caste, and soon found himself liable for between three and four thousand Rupees."

প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আর একটি খবর বলা যেতে পারে, তখন বাঙলা পাঠ্যপুস্তকের বড় দুর্ভিক্ষ। ব্যবসায়ের দিক দিয়ে ১৮৫০-৫২ সালেও বাঙলা বই ছাপানো দাতব্য করা ছাড়া কিছু নয়। বিদ্যাসাগর এই অভাব পূরণ করলেন। তবে সংস্কৃত প্রেস বইয়ের দাম বড় বেশি করল। আর এই বই সম্পর্কে শিক্ষাব্রতীরা (ইংরেজও) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বাঙালীকে বিদ্যাসাগর ঋণে চিরকালকের মতো আবদ্ধ করলেন। বইয়ের দাম বেশী; বাঙলাদেশে তখন যদি কোন মানুষ বইয়ের ব্যবসায়ে লাভ করবার অধিকারী থাকেন তবে তিনিই। উড্রোসাহেব বলছেন, I freely confess that if any one does deserve to profit by selling his books at a dear price, that person is Pundit Ishwurchandra Bidyasagar. He will be remembered as the man who first edited school books of such intrinsic worth and so acceptable to the people, as to have raised Bengali publications to a remunerating level. He is soon about to retire into private life, and to resign without a pension his appointments of Principal of the Sanscrit College and Assistant Inspector of Schools. Among several reasons assigned for this unprecedented step is his desire to devote himself unreservedly to the preparation of School books, by the sale of which the loss of his salary of Rs 500 a month is said to be amply compensated. His liberality to his country men is well known to have been bounded only by his means, and he retires from the service of Govt, rich in honour, but in nothing else." ইনিই বিদ্যাসাগর। এঁকেই বন্দনা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তিনি যে দয়ার সাগর তা আর কার পক্ষে জানা সম্ভব? এই অপ্রকাশ্য দিকটিতে কবি এতখানি জোর দিয়েছিলেন কেন তা বেশ বোঝা যায়।

(৯) ঢাকা নর্মাল ইস্কুলের একটি ঘটনা।

ললার (Lawler) সাহেব তখন এই শিক্ষক-শিক্ষণ ইস্কুলের তত্ত্বাবধায়ক। ইস্কুলে গ্যালারী ব্যবস্থা ছিল। প্রথমদিনেই ব্রাহ্মণ শিক্ষকেরা আপত্তি তুললেন, "আমরা কথনও সামনের সারিতে বসব না। আমরা ব্রাহ্মণ। শূদ্রেরা পিছনে আমাদের চেয়ে উঁচু আসনে বসবে এ কেমন কথা"? ললার বললেন, "আপনাদের ইচ্ছামতোই বসুন। তবে জানবেন, উপরের দিকে গেলে পাক্ষার সুবিধে পাচ্ছেন না, তা ছাড়া পড়ানো শুনতেও পাবেন না, দেখতেও পাবেন না কিছু বোর্ডে।"

যুক্তিটা কিছু কাজে লাগল। এক বছর পর দেখা গেল খেলার মাঠে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র শিক্ষক একসঙ্গে ফুটবল খেলতে প্রচুর আনন্দ পাচ্ছেন। বরং ব্রাহ্মণ শিক্ষকেরা খেলার আনন্দে এমন কথাও বলছেন, "স্যার বল্টায় একটু চর্বি মাখিয়ে দিন, যাতে বল ভালো গড়ায়।"

শ্রেণীভেদ তিরোহিত হল। ব্রাহ্মণদের মানাবৃত্তি সেকালে কিরূপ ছিল বেশ বোঝা যায়। কিন্তু যে গ্যালারী ব্যবস্থায় পিছনের ছেলেরা হাওয়া পায়না, পড়া শুনতে পায় না, বোর্ডের লেখা দেখতে পায় না—তাও তো অনুমোদন করা যায় না। শূদ্রদেরও তো ঐ সুযোগ থাকা উচিত!

(১০) দশমাইলের ভিতর দুটি সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুল অনুমোদন করা যেত না।

(১১) ১৮৫৭-৫৮ সালে বাঙলা বিষয় অধিগত করবার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি বিশেষ ক'রে অনুমোদিত হত :

শ্যামাচরণ সরকারের ব্যাকরণ, বাহ্যবস্তু; চারুপাঠ; কে. ডি. মৈত্রের ভূগোল বিজ্ঞাপক; কে. এম. ব্যানার্জীর অঙ্কের বই; পি. সি. ঠাকুর অনূদিত ভূমিমাপ বিজ্ঞান (Mensuration), ভূদেব মুখার্জীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (Naturul Philosophy), বিদ্যাসাগরের বাঙলার ইতিহাস, ঋজুপাঠ, নীলমণি বসাকের ভারতের ইতিহাস প্রভৃতি।

(১২) পুরীতে সম্ভ্রান্ত শ্রেণী শিক্ষার বিরোধী ছিল। তারা বেশীর ভাগ মন্দিরের আয়ে সমৃদ্ধ। তাই মনে করত, এই শিক্ষা মানুষের মনকে ধর্ম থেকে সরিয়ে নেবে।

(১৩) ১৮৬৪-৬৫ সালে। ভূদেব মুখার্জী বর্ধমান, নদীয়া ও যশোর জেলার ইস্কুল পরিদর্শক ছিলেন। সে সময় এই তিনটি জেলায় ৩৭৭টি পাঠশালা ছিল, ১২ জন ডিপুটি ইন্সপেক্টরের সাহায্যে তিনি পরিদর্শনের

কাজ সম্পন্ন করতেন। ছাত্রসংখ্যা এক বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হয়; ১৮৬৪ সালে ৫,৩৪৯ আর ১৮৬৫ তে ১১,৯৭৭ জন।

(ক) বর্ধমান জেলার বেচারহাট পাঠশালা তিনি দেখতে গেছেন। উচ্ছব পণ্ডিত ব'লে একজন ডোমজাতির লোক এই ইস্কুলের পরিচালক। ভূদেব বাবু তাঁর নোট বইয়ে কিছু লিখতে যাচ্ছেন এমন সময় একটি বৃদ্ধা তাঁর কাছে এসে আবেদন করল 'তার ছেলের নামটি লিখে নেওয়া হোক।'

'কেন, কি করেছে সে?'

'এই যে পাঠশালা ঘর খড়েব ছাওয়া, এ ঘরটি সেই-ই দিয়েছে।'

(খ) বুজরুক নবগ্রামের ইস্কুলটি বারোয়ারী ঘবে বসত। ভূদেব বাবুকে দেখে শিক্ষক দৌড়ে গিয়ে পাশের বাড়ী থেকে একটি টুল এনে দিল বসতে।

"ছেলেরা এত অনুপস্থিত কেন?"

"হুজুর কাল রাত্রে ধর্মঠাকুরেব উৎসব হয়েছে। ছেলেরা বাত জেগে উৎসব পালন করেছে, তাই এখনও ঘুম ভাঙেনি।"

(গ) নদীয়াজেলার দোগাছিয়া ইস্কুল ঘবটি বড নোংরা। তখনও যাত্রাওয়ালারা আশ্রয় নিয়ে আছে। সেখানে ম্যালেরিয়া রোগ প্রচণ্ড। শিক্ষক নিজে জ্বরে ধুঁকছেন।

"কেন ইস্কুলে এলেন জ্বর নিয়ে?"

"বাড়ীতে বসে থেকে কোন কোন লাভ নেই। এ জ্বর তো নিত্য নৈমিত্তিক, ইস্কুলঘর খারাপ বটে, কিন্তু আমার বাড়ী থেকে অনেক পরিষ্কার অনেক খটখটে, তাই এলাম।"

"কিন্তু আপনার জ্বর থেকে যে ছেলেদের জ্বর হবে।"

"তা হয়ত ঠিক। কিন্তু তারা তাদের নিজদের জ্বর নিয়েই ধুঁকছে, আমারটা নেওয়ার আর অবস্থা তাদের নেই।"

"কটি ক্লাসে পড়ান আপনি?"

"কোন ক্লাস আমার নেই!"

"কি রকম?"

"ডেপুটি তো আমাকে তেমন কোন নির্দেশ দেন নি!"

"সে কি! দেখি আপনার রুটিন!"

দেওয়ালের দিকে নির্দেশ করলেন শিক্ষক, 'ঐ যে'! ভূদেব বাবু দেখলেন দেওয়ালের গায়ে রুটিন একসময় ছিল হয়ত, এখনও কিছু কিছু চিহ্ন দেখা

যায়। আরশোলায় সমস্ত কাগজপত্তর নষ্ট ক'রে গেছে, শিক্ষক রুটিন পুনরায় লিখতে আর প্রয়োজন বোধ করেন নি।

আমরা আর তালিকা বাড়াতে চাইনে। সেকালের ইস্কুল সম্পর্কে এই যে সব বিচ্ছিন্ন ঘটনা এগুলি ইস্কুলের এবং ইস্কুল সমাজের প্রকৃতি উদ্ঘাটন করে। একদিকে আছে কোম্পানী, কোর্ট অব ডিরেক্টার্স, শিক্ষাবিদ আর অন্যদিকে আছে এ দেশী সমাজ। এদেশে কুসংস্কার আছে, এদেশে অজ্ঞতা আছে। কিন্তু সব কিছু আছে সমাজের উপর নির্ভর করে। ইংরেজিশিক্ষা আমাদের চোখ অনেকখানি খুলে দিয়েছে সেকথা শতবার স্বীকৃত, কিন্তু ইংরেজ চায়নি আমরা আমাদের সমাজের মধ্যে থাকি। এইখানেই হয়েছে বিপদ।

ভারতের শিক্ষা সম্পর্কে যে সব আলোচনা, নিদেশ এবং বিধান আমরা পেয়েছি তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় একটু নিই।

গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের মিনিট: ১৭ই এপ্রিল, ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ:

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান তার কাছে উপস্থিত হন এক আবেদন নিয়ে যে, ইসলাম শাস্ত্র সম্পর্কে মুসলমান ছেলেদের পড়ানোর জন্য তিনি যেন মাজিদ উদ্দিন (Mudgid O'dın) কে অনুরোধ করেন। এত বড় পণ্ডিত নাকি হিন্দুস্থান এবং দাক্ষিণাত্যে আর নেই। তাঁরা আরও বললেন, এই অবসরেই একটি মাদ্রাসা স্থাপন করা যায়।

হেস্টিংস তাঁদের অনুরোধ রাখেন। তাই তিনি বৈঠকখানা অঞ্চলের পদ্মপুকুরে জমি খরিদ করে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই মিনিটে তিনি এই মাদ্রাসার ব্যয় নির্বাহের জন্য কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্সের কাছে আবেদন করছেন।

বোর্ড সম্মতি প্রকাশ করে।

বেনারসের রেসিডেন্ট ডানকানের কর্ণওয়ালিশকে লেখা চিঠি: ১ লা জানুয়ারী ১৭৯২:

হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কাশীতে একটি হিন্দু বিদ্যালয় স্থাপন করবার অভিপ্রায় ডানকান জ্ঞাপন করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দরুণ কিছু আয় হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এবং সেই টাকা এইরূপ কাজে ব্যবহার করা সমীচীন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১৩ই জানুয়ারী ১৭৯২ সালে কর্ণওয়ালিশ তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করলেন।

চার্লস গ্রাণ্ট-এর তথ্য: লেখা ১৭৯২ তে, কিন্তু ১৭৯৭ সালের ১১ই আগষ্ট প্রকাশিত:

ইনি (১৭৪৬-১৮২৩) ১৭৬৭ সালে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত হয়ে ভারতে আসেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ফ্যাকটরীর ভার পান। অনেক টাকা পয়সা রোজগার ক'রে ১৭৯০ এ ইংলণ্ডে ফিরে যান। ১৮০২ সালে পার্লিয়ামেণ্টে যোগ দেন। ১৮০৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেক্রেটারী হন। শিক্ষা-ব্যাপারে পরবর্তীকালে মেকলে এঁর মতই গ্রহণ করেন। তাঁর মত—হিন্দুরা ভুল করে কারণ তারা অজ্ঞ। তাদের বিশৃঙ্খলা কাটাতে হ'লে আমাদের আলোক প্রদান করতে হবে। দুই উপায়ে এই যোগাযোগ রক্ষা করা যায়; হয় তাদের ভাষার মাধ্যমে। নতুবা আমাদের। বিদেশীরা শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের ভাষাই নিয়েছে। অনেক কারণ আছে তার।

কিন্তু আমাদের বেলাতে তা হবে কেন। তারা আমাদের, আমরা বহু পূর্বে তাদের অধিকার করেছি। আমাদের ভাষা তাদের অজানা নয়। কাজেই আমাদের ভাষাতেই তাদের মধ্যে সভ্যতা বিকিরণ করতে হবে।

বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা সংস্কৃতি সম্পন্ন লোকের পক্ষে (Cultivated mind) কঠিন কিছু নয়। ইংরেজ শিক্ষক খুব তাড়াতাড়িই তাদের ভাষায় শিক্ষা দিতে পারবে। অন্তত ভারত বাসীর পক্ষে আমাদের ভাষা গ্রহণ করা যত কঠিন, আমাদের পক্ষে তাদের ভাষা শেখা তত কঠিন নয়। কিন্তু বিষয় বস্তু নির্বাচন করার কথা আছে। এ অবস্থায় আমাদের শিক্ষককে সঙ্কীর্ণ পরিস্থিতিতে কাজ করতে হবে, এবং তা খুব ফলপ্রদ হবে না। কাজেই এ পরিশ্রম বাঁচবে যদি তাদের আমরা আমাদের ভাষা শিখিয়ে দিই। তাহলেই তারা সব কিছুই এই ভাষা পড়ে জানতে পারবে। ইংরেজি ভাষা শ্রেষ্ঠ ভাষা, পরিণামে সুযোগের দিকে লক্ষ্য রাখলে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করাই উচিত।......

ক্রমে ক্রমে আমাদের ভাষাই হিন্দুদের মধ্যে আরোপ করা হোক।...... সরকারের পক্ষে খুবই সহজসাধ্য যে অল্প খরচায় দেশের মধ্যে ইংরেজি লেখাপড়ায় ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা। দেখা যাবে, তরুণরা ঝাঁকে ঝাঁকে এই দিকে আসছে।

আমাদের ছাপাখানার মাধ্যমে যখন আমরা নানা ধরণের বই দিতে পারব যা পারসীতে পারেনি তখন হিন্দুরা ইত্যাদি।……

কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞান জনসাধারণের অনেক উপকারে লাগবে। যন্ত্র বিজ্ঞানের নীতি এবং কৃষিক্ষেত্রে তার প্রযোগ তাদের অনেক উপকারে লাগবে।

(কৃষিক্ষেত্রে যে বাঙালীবা এই যন্ত্র বিজ্ঞান শিক্ষায় কত উন্নতি করতে পারবে তার এক ফিরিস্তি দিংেছেন। গ্রান্ট সাহেব খৃষ্ট ধর্মের আলোকে যে এদেশের খুব উন্নতি হবে সে কথাও উল্লেখ করেছেন। গ্রান্টের তথ্য থেকে মনে হয়, এদেশেব কৃষিকাজে বিজ্ঞান প্রয়োগ করা দরকার ব'লে যন্ত্র বিজ্ঞান পাঠ্য হওয়া দরকার, এবং এর উপর তিনি খুব জোর দিয়েছেন)।

লর্ড মিণ্টোর মিনিট ঃ ৬ই মার্চ, ১৮১১ সাল।

লর্ড মিণ্টোর বক্তব্যে দেখা যায়, তিনি এদেশের বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষায় নিরাশ হয়েছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের তথ্যের দিক তাদের আকর্ষণ করতে পারছেনা। তারা ধর্মশিক্ষায় মত্ত। ফলে অমূল্য গ্রন্থরাজি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কাজেই সরকারের এদিকে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

বলছেন, শিক্ষার অভাবে তাদের নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন ঘটছে। প্রবঞ্চনা শঠতা অনেক বেড়ে গেছে।

কাজেই আর কিছু খরচ ক'রে এই দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। আর কিছু খরচ কারণ, সরকার কাশীর বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় খরচ এখনও করছে।

মিণ্টো প্রস্তাব করলেন বারাণসী ছাড়া নদীয়াতে এবং ত্রিহুতের ভোর-স্থানে দুটি হিন্দু কলেজ হোক, আর মুসলমানদের জন্য ভাগলপুর আর জৌনপুরে।

কোম্পানীর ১৮১৩ সালের আইন:

উপদেষ্টা পরিষদ সহ গবর্ণর জেনারেলের বিধি-সম্মতই হবে যদি উপনিবেশের যাবতীয় খরচ-খরচা নির্বাহ করে সেনাবাহিনীর বাণিজ্য ব্যবসায়ের রাজকর্মচারীর এবং অন্যান্য ঋণ পরিশোধ করে কিছু উদ্বৃত্ত করে

বছরে শিক্ষা ব্যাপারে অন্যূন এক লক্ষ টাকা খরচ করে। এই শিক্ষা অর্থ, সাহিত্য সমৃদ্ধি, দেশীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর উৎসাহ বর্ধন, বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ ঘটানো। বোম্বাই অথবা ফোর্ট সেণ্ট জর্জ বা ফোর্ট উইলিয়ম প্রদেশের মধ্যে অথবা ইংরেজ ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া যেতে পারবে। সর্ত থাকল, এই সব ইস্কুল-কলেজে সমস্ত রকমের পদসৃষ্টি এবং পূরণ শাসকদের হাতে থাকবে।

এই-ই হচ্ছে প্রথম আইন।

১৮১৭ সালের ৩রা জুনের এলফিনস্টোনের চিঠিঃ একে ১৮১৭ এর নির্দেশ পত্র বলে :

এই নির্দেশে দেখা যায়, ইংরেজ-জাতির পরিকল্পনা অনুযায়ী ইস্কুল-কলেজ গড়ার বিরোধিতা। সংস্কৃত ভাষায় গভীর আস্থা। প্রস্তাব হচ্ছে, এই দেশের প্রথাসম্মত বিদ্যালয়েই শিক্ষাব্যবস্থা করা হোক। এদেশের শিক্ষা পদ্ধতি যা মাদ্রাজ থেকে বেল সাহেব গ্রহণ ক'রে নিয়ে যান তা কোনক্রমেই খারাপ নয়। আরও প্রস্তাব করা হচ্ছে, এই দেশী পণ্ডিতদেরই শিক্ষার বিভিন্নপদে গ্রহণ করা উচিত।

লর্ড ময়রার মিনিট : ২রা অক্টোবর, ১৮১৫ সাল :

ইনি গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের উন্নতির কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলেন।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য বড় বড় সহরকে কেন্দ্র করতে বললেন। এই উপলক্ষ্যে ঢাকা, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, বেনারস, বেরিলি, এবং ফরাক্কাবাদে কমিটি গঠন করতে প্রস্তাব করেন।

ইতিমধ্যে প্রয়োগ মূলক বিদ্যালয় হিসাবে দুটি ইস্কুল একটি হিন্দুদের জন্য, অন্যটি মুসলমানদের—প্রত্যেক জেলা সদরে কমিটি গঠন ক'রে স্থাপন করতে বলেন। দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড় কলেজ করার চেয়ে ইস্কুল স্থাপনায় তিনি বিশ্বাসী এবং সেই মত প্রস্তাবও করলেন (I must think that the sum set apart by the Honourable Court for the advancement of science among the natives would be much more expediently applied in the improvement of schools than in gifts to seminaries of higher degree)।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাইতে 'গবর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিল' শিক্ষা ব্যাপারে এক কমিটি গঠন করলেন:

যে এক লাখ টাকা বরাদ্দ ছিল তা এঁদের মাধ্যমে খরচ করবার প্রস্তাব অনুমোদন করা হইল।

কমিটির নাম হল, জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন।

শিক্ষা ব্যাপারে এঁরাই গবর্ণর জেনারেলকে সব খোঁজ-খবর দেবেন।

প্রথম কমিটিতে ছিলেন:

টি, এচ, হ্যারিংটন; জে, পি, লার্কিন্‌স; ডব্লিউ, বি, মার্টিন;
ডব্লিউ, বি, বেইলি; এচ, সেক্সপীয়র; হোল্ট ম্যাকেঞ্জি;
এচ, টি, প্রিন্সেপ; এ, স্টার্লিং; জে, সি, সি, সাদারল্যাণ্ড;
এচ, এচ, উইলসন—সম্পাদক।

হোল্ট ম্যাকেঞ্জির প্রস্তাব: ১৭ই জুলাই, ১৮২৩:

উপরোক্ত কমিটির কার্যবিধি সম্পর্কে ইনি আলোচনা করেন। কে এই কমিটির সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করবে সে সম্পর্কে তিনি যে আভাস দেন তাই সরকার অনুমোদন করেন, অর্থাৎ সরকারের পারস্য ভাষা বিভাগের সম্পাদক এই ভার পান।

তিনি আলোচনা করেন, কি জন্য দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়া হবে—তা স্থির করে নেওযা। সরকাবের অনুগত প্রজা হওয়ার জন্যই শিক্ষা দিতে হবে একথা তিনি স্বীকার করেন না। তিনি খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী কাজেই তিনি মনে করেন, শিক্ষার আলোকে মনকে উন্নত করা। 'দেখতে হবে তাদের কি আছে, আর তাদের কি অভাব। কি আমরা তাদের দিতে পারি, কি তারা নিতে পারে; তারা কি আছে, আর তারা কি হবে।' ইত্যাদি।

তিনি আলোচনা করলেন শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে দেশে কি কি বিতর্ক আছে। কেউ চান প্রাথমিক শিক্ষা এবং ইস্কুল; কেউ চান কলেজ এবং উচ্চশিক্ষা; কেউ চান দেশে যা আছে তাকেই উন্নত করা; কেউ চান নতুন প্রতিষ্ঠান গডতে; কেউ চান কেবল শিক্ষকদেরই পডাতে হবে; কেউ চান কেবল পুস্তক সরবরাহ করা হোক; কেউ চান ইংরেজী ভাষা মাত্র শেখাতে; কেউ চান ইংরেজী দর্শন বিজ্ঞান অনুবাদ করে শেখাতে। কেউ চান পণ্ডিত শ্রেণীকে শেখাতে; কেউ চান ধনীদের, কেউ চান শিক্ষা হোক সর্বসাধারণের।

ম্যাকেঞ্জি চেয়েছেন, শিক্ষকদেরই শেখানো হোক এবং প্রয়োজনীয় পুস্তক

অনুবাদ করা হোক। প্রাথমিক ইস্কুলের চেয়ে, সর্বসাধারণ্যে শিক্ষা বিস্তার করার চাইতে উন্নত শ্রেণীকে শিক্ষিত করলেই তাড়াতাড়ি শিক্ষা স্বল্প ব্যয়ে ছড়িয়ে পড়বে। সর্বসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা এক অসম্ভব ব্যাপার বলে তিনি মনে করেন। সর্বসাধারণের শিক্ষা ধর্মগ্রন্থের উপর নির্ভর করে। সাধারণ জীবনযাত্রার বাইরে শিক্ষার ব্যবহার তাবা জানে না। আমাদের এমন কোন উপায় তো এদেশের জন্য সত্যিই নেই।

তিনি মনে কবেন, বিদেশী শিক্ষাব স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে, শিক্ষা উচ্চশ্রেণী থেকে সুরু কবে নীচেব দিকে নামতে থাকে ; এই হচ্ছে সমস্ত দেশের ইতিহাস। কাজেই তিনি প্রস্তাব করলেন—সঙ্কীর্ণ পরিধিতে শিক্ষা বিস্তার করা, মুষ্টিমেয় কতিপয় শ্রেণীকে দিয়ে কাজ করা। পবে যদি অর্থসঙ্কুলান হয় তবে দেশীয়দের সহযোগিতায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিক্ষাকে একত্রে শেখানোর জন্য প্রতিষ্ঠান গড়া যেতে পাবে।

নতুন কোন প্রতিষ্ঠান কবাব তিনি পক্ষাপাতী নন। সবকার যেগুলো স্থাপন করেছেন তাকেই উন্নত করুন।

পারসীভাষাব বিকল্প ইংরেজি কবা উচিত বলে তাঁর মনে হয়। দেশের লোক পাবসী যদি শিখে থাকতে পাবে, ইংরেজিও পারবে।

প্রেসিডেন্সীব (কলকাতা) জন্য পৃথক কোন কমিটি থাকার দবকাব নেই। এই কমিটিই সমস্ত ভাব নেবে তবে। মুসলমান আর হিন্দু তত্ত্বাবধায়কের সাহায্যে এই কায নির্বাহ করবে।

বেসরকারী ইস্কুলেব উপব এই কমিটি কোন কর্তৃত্ব কবেবেনা। কিন্তু এই কমিটি তাদেব পবামর্শ দেবে।

মাদ্রাসা ও হিন্দু কলেজ সম্পর্কে তিনি কমিটিকে অবহিত হ'তে বললেন। তখন হেস্টিংস-এব বাসস্থানে নতুন মাদ্রাসা খুলবার কথা হচ্ছিল ; হিন্দু কলেজের নকসা লেপ্টন্যাণ্ট বাকসটন (Buxton) যা করেছেন তা সেনা-বাহিনীর অধিকারে আছে। ইনি ইয়োরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান (সংস্কৃত ছাড়াও) পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

আগ্রার গঙ্গাধর পণ্ডিত যে সমাজ-কার্যে জমি প্রদান করেছিলেন তা কি করে কাজে লাগানো যায় সে সম্পর্কে যে মত বৈষম্য রয়েছে তা উল্লেখ করেন। আর একটি খোঁচা দিলেন, মাদ্রাসা আর হিন্দুকলেজের ব্যয় কি করে রাজস্ব বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হ'ল তাই নিযে।

১৮২৩ সালের ৩১শে জুলাইয়ের অনুমতি পত্রে কমিটি গঠন করা হ'ল। তার মধ্যে ম্যাকেঞ্জির অনেক কথা উল্লেখ থাকল, তবে মীমাংসার ভার কমিটির হাতেই ছেড়ে দেওয়া হল। কমিটির সদস্যদের নাম পূর্বে দেওয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হলেন হ্যারিংটন সাহেব। কমিটির সাহায্য করবার জন্য মাদ্রাসা এবং মুসলমান শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক লামসডেন তাঁর বৃত্তি সমেত, হিন্দু কলেজ ও ইস্কুলের সম্পাদক লেপ্টন্যাণ্ট প্রাইস ৩০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হলেন। সাধারণ সম্পাদক উইলসনের বেতন হ'ল মাসে ৫০০ টাকা।

জেনারেল কমিটির চিঠি, ১৮২৩ সালের ৬ই অক্টোবর :

এই চিঠির প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে হিন্দু ও সংস্কৃত কলেজ নিয়ে। তখন ফলিত দর্শন (Exprimental Philosophy) উচ্চ শিক্ষাব অঙ্গ হিসাবে ধবা হ'ল। যে-ভাবে পডানো হ'ত এই বিষয় তা নীচে দিচ্ছি :

যন্ত্রবিজ্ঞান (mechanics), জলবিজ্ঞান (Hydrostatics), গ্যাস বিজ্ঞান (Pneumatics), আলোক বিদ্যা (Optics), তড়িৎ-বিজ্ঞান (Electricity), জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy), রসাযন (Chemistry)।

এঁরা প্রস্তাব করেন রসায়ন শাস্ত্র পৃথকভাবে পডানো হোক। সপ্তাহে দুদিন পডানো হবে—বেলা ১০টা থেকে ১টা অথবা ২টা। ভালো ইংরেজি-জানা ছাত্রদেরই এখানে নেওয়া হবে। বছরে কোন কোন সময় সর্বসাধারণের জন্যও এই বক্তৃতা শুনবার সুযোগ দেওযা হবে। এই বক্তৃতায় পরিচালকেরা, শিক্ষকেরা এবং ভালো ছেলেরা উপস্থিত থাকতে পারে।

রসায়ন শাস্ত্রের বীক্ষণাগাব এবং এই বিষয়ের বক্তৃতা-ঘর ভালো হওয়া দরকার। ক্যাপটেন বাক্সটন এই রকম এক ঘরের জন্য যে আয়তনের পরিকল্পনা দিলেন, তা রূপ দিতে বার্ণ কোম্পানী—১৫,৯৯৮ টাকা খরচ পড়বে জানিয়েছে। ইয়োরোপ থেকে এক অধ্যাপক আনা হবে, মাইনে হবে বছরে ৫০০ পাউণ্ড।

বিচার বিভাগের প্রধান সচিব (Chief Secretary)-কে লেখা ফ্রেজারের চিঠি ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮২৩ :

ডব্লিউ ফ্রেজার দিল্লী থেকে লিখছেন। তিনি মনে করেন, বৃটিশ সরকার ভালো ক'রে শাসনকার্য চালাতে পারছেনা, কারণ দেশের লোক দুর্নীতি

পরায়ণ এবং অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা গোচারণ বোঝে না, কৃষিকার্য ভালো করে করতে জানেনা, বৃটীশ শাসন নীতি জানে না।

চাষীদের ছেলেদের জন্য তিনি পড়ানোর কাজ কিছু সুরু করেছিলেন এক সময়। কিন্তু এ চাষী চাষা নয়, জমিদার (as would be commonly called the Zamindars)। উদ্দেশ্য ছিল তাদের কিছু জ্ঞানস্পৃহা জাগবে।

১৮১৪ সালে ১৫ জন ছাত্রকে পারসী ভাষা লেখাতে ও পড়াতে সুরু করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ২০ জন করে ছাত্র নিয়ে দুটো ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮২০ তে তৃতীয়, ১৮২৩ এ চতুর্থটি। ইস্কুল সম্পূর্ণরূপে জমিদার তনয়দের জন্য। শেখাতে চেয়েছেন এমন জ্ঞান দিতে যাতে করে বৃটীশ বিচার-পদ্ধতি তারা নিজেরাও বুঝতে পাবে, জনসাধাবণকেও জানাতে পারে। তিনি এখন ইচ্ছা কবছেন শত শত ছাত্র নিয়ে ইংরেজি, পারসী এবং হিন্দী পঠন পাঠনেব। কিন্তু টাকা তো তাঁব নেই।

সহববাজাবে শিক্ষা দেওযা একটা বাড়তি কাজ ব'লে মনে হয়। কারণ তারা বাপ-মার কাছেই পড়াশুনা কবতে পায় (the majority of children of classes that inhabit cities and towns are educated by their parents)। শুধু জমিদাব তনয়দেব—যাবা উত্তবাধিকার সূত্রে জমি ভোগ করে তাদেরই পড়ানো দবকাব। হাজাবে হাজাবে। বর্তমানে তাঁর ছাত্রসংখ্যা ৮০, আব শিক্ষক ৪ জন। ছাত্র পিছু শিক্ষকেবা ১৲ টাকা ক'রে পান, আর ছাত্রেরা মাথাপিছু দৈনিক ১ সেব ক'বে গম। গম দিতে হয় কাবণ তা না হ'লে অভিভাবকেরা ছেলে ইস্কুলে পাঠায় না, বাড়ীর কাজ কামাই পড়ে বলে। তিনি নিজেই স্বীকার কবছেন শিক্ষাব জন্য শিক্ষক ও ছাত্রকে ঘুষ দিতে হচ্ছে, 'করব কি।'

কাজেই তিনি সরকাবী সাহায্য চাচ্ছেন।

জেনারেল কমিটি নভেম্বর মাসে জানালেন, তাঁরা নীতিব দিক দিয়ে এমন সাহায্য করবেন না। ফ্রেজার নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু ভাবছি, ফ্রেজারের এই বদান্যতার যুক্তি কি? সহরের ছেলেরা বাপ-মায়ের কাছে পড়ে, জমিদার তনয়দের বৃটিশ বিচার-পদ্ধতি আর রাজস্ব পদ্ধতি পড়াতে চান,—উদ্দেশ্য তাঁর কি? ব্যক্তিগত প্রবঞ্চনা হয়ত নয়, কিন্তু সমগ্র জাতিটাকে নিয়ে জুয়া খেলার উদ্দেশ্য ছিল না তো! ঐ সময় (১৮৭০ সালের আগে নিশ্চয়ই) বিলাতেও তো জ্ঞানের আলো খুব বিচ্ছুরিত

হয় নি। সেখানে গিয়েও তো এই শিক্ষা দাক্ষিণ্য করতে পারতেন। তবে একটা কথা সবার মধ্যেই ধ্বনিত হচ্ছে—শিক্ষা মুষ্টিমেয়দের মধ্যে বিতরণ ক'রে তাদের দিয়েই জনসাধারণের মধ্যে ছড়ানো।

দ্বিতীয় ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সরকারের সংস্কার দৌর্বল্যের উপর ব্যবসা করার রেওয়াজ প্রকাশ্যে এই-ই প্রথম দেখা যায়। দেশের উপকার করার ছদ্মবেশে সরকারী নীতির বন্ধু সেজে সরকারের তহবিল ভাঙার প্রলোভন সব কালেই এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায়ের চিঠি গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিল-কেঃ কলিকাতা ১১ই ডিসেম্বর ১৮২৩ঃ

রাজার প্রধান বক্তব্য যা ছিল তা হচ্ছে,

ভারতবাসীকে শিক্ষা দিয়ে উন্নত করবার জন্য নতুন সংস্কৃত ইস্কুল কলকাতায় যখন সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন—তখন এটি যেন আশীর্বাদের মতো। এর জন্য সরকারের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। মানবজাতির প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষী-ই চাইবে এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করবার জন্য এমন নীতির আলোক কাজ করবে যাতে প্রজ্ঞার স্রোত উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় খাতে বইবে।

যখন এই শিক্ষায়তন প্রস্তাব করা হ'ল, তখন আমরা বুঝেছিলাম ইংলণ্ডের সরকার ভারতের শিক্ষা খাতে বাৎসরিক কিছু টাকা বরাদ্দ করবার আদেশ দিয়েছেন। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, এই টাকায় ইয়োরোপের প্রতিভাশালী ব্যক্তি ভারতের লোককে অঙ্ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, রসায়ন, শরীর-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় বিজ্ঞান পাঠ দেবেন—যে বিজ্ঞান চর্চা করে ইয়োরোপের লোকে উন্নতি করেছে অন্যান্য অঞ্চলের লোক থেকে।

এখন দেখছি সংস্কৃত ইস্কুলে হিন্দু পণ্ডিত পড়াচ্ছেন যা এদেশে ছিলই।

(এরপর তিনি বলছেন, সংস্কৃত পড়া কত আয়াস সাধ্যঃ ব্যাকরণ, বেদান্ত, ন্যায় প্রভৃতির জটিলতা দৃষ্টান্ত হিসাবে দিয়েছেন। তিনি বলছেন বেকনের আগে ইংলণ্ডে যে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবস্থা ছিল সংস্কৃত শিক্ষায় এদেশেও তাই থাকবে।)

ইংরেজ সরকার চান দেশের উন্নতি করতে। তাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তা হলে তাঁকে আরও উদার আর প্রগতি সম্পন্ন নীতি শিক্ষায় অনুসরণ করতে হ'বে। আর সেই শিক্ষায় থাকবে অঙ্ক, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন,

শারীর বিজ্ঞান এবং অন্যান্য শিল্পবিজ্ঞান; শিক্ষা দেওয়ার জন্য আনতে হবে ইয়োরোপীয় পণ্ডিত, থাকবে উপযুক্ত পুস্তক, যন্ত্র-সরঞ্জাম ॥

রামমোহন রায়ের চিঠি ১১ই ডিসেম্বরে লেখা, আর জেনারেল কমিটি যে চিঠিতে গভর্ণর জেনারেলকে পাঠ্যক্রমের কথা জানিয়েছিল তা হচ্ছে সেই সনের ৬ই অক্টোবরে। যদি ধরে নেওয়া যায়, জেনারেল কমিটির চিঠি প্রস্তাব মাত্র তখনও কার্যকরী হয় নি, তবে হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট রামমোহন রায়ের তা না-জানবার হেতু কি। যদি মনে করা যায়, জেনারেল কমিটির সে-প্রস্তাব গভর্ণর জেনারেল অনুমোদন করবেন না ব'লে মনে হওয়ায় রাম মোহন রায় ঐ বিষয়েই জোর দিলেন—তা হ'লে ইংরেজ সরকারকে অতখানি অপরাধী সাব্যস্ত করার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া জেনারেল কমিটির ঐ চিঠি ছিল সচিব স্টার্লিং-এর ৩১ শে জুলাইয়ের চিঠির উত্তর। লণ্ডন সোসাইটিই এক বিশেষ যন্ত্র দিয়ে এই Experimental Philosophy বিষয় পড়ানোর প্রস্তাব করে, সেই প্রসঙ্গেই এই সব বিজ্ঞান বিষয়ের কথা জেনারেল কমিটি জানায়। ইয়োরোপীয় পণ্ডিত রাখার কথা হয়েছে। তবে রাজা রামমোহন রায় নতুন কি করতে বলছেন। রামমোহন রায়ের চিঠির অর্ধেক জুড়ে আছে সংস্কৃত কলেজ, সংস্কৃত ভাষা এবং দেশীয় পণ্ডিতদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। সেকালে মাদ্রাসা আর সংস্কৃত কলেজের বিরুদ্ধে বহু রকমের আপত্তি উঠেছিল। সেই আপত্তিরই কি এটি একটা অংশ? সংস্কৃতভাষা দুরধিগম্য সেই জন্যই কি পরিত্যাজ্য? যার সংস্কার বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়ার পর এক লহমায় করলেন, তা সুপণ্ডিত ও ভাষাবিদ রামমোহনের মনে এল না কেন! মোটকথা, রামমোহনের চিঠির দুটি নীতি রহস্যপূর্ণ—বিজ্ঞান পড়ানোর উপর জোর যা পূর্বেই প্রস্তাব করা হয়েছে, আর সংস্কৃত শিক্ষার বিরোধিতা। সমস্ত কাগজ পত্তর না পড়লে হয়ত এ রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়; তবে তিনি যে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসী সমান আসনে দাঁড়াতে পারে এমন শিক্ষাই চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

আরও একটা কথা যে, গভর্ণর জেনারেল কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন করছেন বলে জানালেন ১৭ই জানুয়ারী ১৮২৪।

গভর্ণর জেনারেল ইন কাউন্সিলকে ১৮২৪ সালে ১৮ই ফেব্রুয়ারীতে নির্দেশ (Despatch) ঃ

এই নির্দেশের কয়েকটি বক্তব্য প্রণিধান যোগ্য ঃ

বিজ্ঞানের ব্যাপারে প্রাচ্যের পুথি পুস্তকের যে অবস্থা তাতে সেগুলো পড়ানো বা পড়ার চাইতে সময়ের অপচয় আর কিছু নেই। ইতিহাসের দিক দিয়ে প্রাচ্যের গ্রন্থে যদি কিছু মেলে তা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের সাহায্যে অনুবাদ ক'রে নেওয়াই ভালো। এ ছাড়া ঐ ভাষায় আর আছে কবিতা; কিন্তু কবিতা পড়ানোর জন্য কোন কলেজ স্থাপন করার আবশ্যকতা নেই কারণ কবিতা পড়িয়েই শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হবে ব'লে মনে হয় না।

(৮২ অনুচ্ছেদ থেকে)

আমাদের মনে হয়, প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা যা করা হয়েছে, তা সব ভুল। প্রধান উদ্দেশ্য হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়া, হিন্দু শিক্ষা দেওয়া নয়। এই সার্থক শিক্ষা নিঃসন্দেহে হিন্দুদের বা মুসলমানের ভাষাতেই দেওয়া উচিত যে ভাষা ফলপ্রসবী হবে তাই-ই গ্রহণ করা উচিত; হিন্দু বা মুসলমান সংস্কার যা আছে তা আলোচনা করা দরকার। হিন্দু বা ইসলাম শাস্ত্রে যা প্রয়োজনীয় তাও বজায় রাখা কর্তব্য। এরই পাশাপাশি অন্য সার্থক শিক্ষা চালু করা খুব কঠিন নয়। তার বদলে কেবল হিন্দু শিক্ষা বা ইসলাম শাস্ত্র পড়ানো এবং তার জন্য প্রতিষ্ঠান গড়া ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছু নয়......।

(এই সঙ্গে জানানো হ'ল নদীয়া আর ত্রিহুতের বদলে কলকাতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ঠিকই হয়েছে।)॥ (৮৩-৮৪ অনুচ্ছেদ থেকে)।

জেনারেল কমিটির এই নির্দেশ পত্রের উত্তর: ১৮ই আগস্ট ১৮২৪

এঁরা বলছেন, কলকাতায় যে কলেজ করা হয়েছে (হিন্দুকলেজ) তা হিন্দু-শিক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়। নতুন যে সংস্কৃত কলেজ করা হল তা প্রস্তাবিত ত্রিহুত আর নদীয়ার দুটো কলেজের পরিবর্তে; এর প্রথম উদ্দেশ্যই ছিল হিন্দু শিক্ষাকে বজায় রাখা। কাজেই সরকার সেই মত অঙ্গীকারাবদ্ধ। যদিও মনে করিনা এই অঙ্গীকারে ক্রমশ ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সমন্বয়ে পাঠ্যতালিকা রচনা করায় কোন বাধা আছে।

কিন্তু সরকারের যদি এই উদ্দেশ্য থাকে যে, বুদ্ধিমান শিক্ষিত এবং প্রভাবশালী হিন্দুজাতিকে বিশেষ করে পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণ শ্রেণীকে উন্নত করে প্রথম আনা, তবে তাদের আকৃষ্ট করা সম্ভব মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা দিয়ে, অন্য কোন ব্যবস্থা বিপরীত ফল দেবে, ব্যর্থ হবে। ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান পড়ার চাহিদা তাদের মধ্যে নেই, সরকারের ক্ষমতাও তাতে নেই।

লোকেব মনকে উন্নত করবার ব্যাপারে তার বিশ্বাস উৎপাদন করা। এইটিই প্রথম কাম্য। আমবা যতই মনে কবিনা কেন যে, সরকারের দেশীয় প্রজাদের উন্নত ধবণের শিক্ষা দেওয়া উচিত কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিতদের সঙ্গে মেলামেশা কবে বোঝা গেছে তারা ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান বা সাহিত্যের প্রতি কোনপ্রকার শ্রদ্ধাই পোষণ কবেনা। ইংরেজি শিখলে তাদের জীবিকানির্বাহ হয়, সেই জন্যই শেখে। যারা ইয়োরাপীয়দের অধীনে কাজ কবে সেই কতিপয় লোক মনিবদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বুঝতে পেবেছে তাদেশ দেশবাসীর বিজ্ঞান পডানো উচিত। এই মতবাদ কেবল আংশিক সত্য।

(তবে তাঁবা ধীরে ধীবে এ কাজ কববেন জানালেন)।

তাঁবা প্রাচ্য বিষয় সম্পর্কে নির্দেশপত্রের সঙ্গে একমত নন। এই ভাষায় বিজ্ঞান নেই একথা সত্য নয়। আববী-পারসীতে যে অধিবিদ্যা আছে (Metaphysical science) তা অন্য যে কোন ভাষা থেকে সমৃদ্ধ। অঙ্ক ও বীজগণিত হিন্দু শিক্ষায় যা আছে তা ইয়োবোপেব নীতি অনুযায়ী, মাদ্রাসায় অঙ্কবিজ্ঞান ইউক্লিডেরই তথ্য নিভব। আইনশাস্ত্র যে কোন দেশেব সুসভ্য সবকারের অনুরূপ আর এই ভাষাবিজ্ঞানেব উপবই সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের অস্তিত্ব। এই জ্ঞানদানেব ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই সময়ের অপচয় নয়।

সাধারণ সাহিত্যেব কথা। ইতিহাস তাবা তাদেব নিজের ভাষায় পডতে পারবেনা কেন। নিজের ভাষায় অনুবাদ কবে পডবে না কেন বোঝা গেল না।

তাঁদের জানা নেই, ভাবতবর্ষে কেবলমাত্র কবিতা পডানোব জন্য কোন প্রতিষ্ঠান কবা হয়েছে কি না। কিন্তু কবিতা বাদ দেওয়াও সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থাপনা। একথাও অজানা, কেমন ক'রে ভাষা সাহিত্য শেখা যায় যদি এর কবিতা রচনা এবং তাব আঙ্গিক সম্পর্কে বিশেষ অবহিত না হওয়া যায়। সংস্কৃত আববী সাহিত্যের প্রধান দিক হচ্ছে, জাতিয় প্রতীকতার (imagery) বা চিত্রকল্পেব উৎস এরা, জাতীয় আবেগেব প্রকাশ এতে, ভাষার উন্নত শৈলী এবং বচন বিন্যাস উন্নত এই কবিতায়। কাজেই মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে তাদের কবিতা উপলব্ধির শেখা অঙ্গীভূত করা সম্পূর্ণরূপে বিধিসঙ্গত বলে মনে হয়॥

এই উত্তর প্রত্যুত্তব থেকে আমবা পরিষ্কাব বুঝতে পারি রামমোহন রায়ের চিঠিব উদ্দেশ্য কি ছিল। হিন্দু কলেজে তখনও বিজ্ঞান-পডানোর প্রস্তাব হয়ে থাকলেও তা কতিপয় ছাত্রেব মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রামমোহন বায় হযত চেয়েছিলেন বিজ্ঞান শিক্ষাকে ব্যাপক কবতে, তার অর্থনৈতিক

কারণ ছিল। সেই অর্থনৈতিক কারণের জন্যই কোম্পানী কারিগরী ও বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যাপক করতে চায় না। এইখানেই বিরোধ। আর এই বিরোধ কাটাতেই জেনারেল কমিটি অসতর্ক অবস্থায় ইংরেজ বিরোধী কথা বললেন যে প্রাচ্যের ভাষা-বিজ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধ। মেকলেকে পরবর্তী কালে এরাই হয়ত বলবে "শুধু কি মুখেরই কথা শুনেছ দেবতা
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা।"

টমাস মুনরোর মিনিট—১০ই মার্চ, ১৮২৬, মাদ্রাজ।

মাদ্রাজ প্রদেশে ইস্কুল-কলেজ মিলে তখন ১২,৪৯৮টি, লোক সংখ্যা ১২,৮৫০,৯৪১ জন। প্রতি এক হাজারে একটি করে ইস্কুল আছে ব'লে জানাচ্ছেন। 'বোর্ড অব রেভিন্যু'-এর উক্তিকে অর্থাৎ লোকসংখ্যা অনুযায়ী ইস্কুল হারকে তিনি সমর্থন করেন নি।

বাড়ীতে লেখাপড়া তখন শিখছে ২৬,৯০৩ জন ছাত্র অর্থাৎ তাঁর হিসাব মতে ইস্কুলে যে সংখ্যা পড়ে তার ৫গুণের বেশি। পূর্বকালে এখানে শিক্ষার অবস্থা ভালো ছিল ব'লে তিনি মনে করেন; অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই এই অবস্থা খারাপের দিকে গেছে। শিক্ষকেরা বেতন মাসে পান ৬।৭৲ টাকা এত কম বেতনে কাউকে এই বৃত্তিতে আকৃষ্ট করা যায় না।

কাজেই তিনি মাদ্রাজ স্কুল বুক সোসাইটির কথা প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, প্রথম দরকার শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তারপরের প্রস্তাব প্রতি কেতোয়ালীতে (collectorate) দুটো করে বড় ইস্কুল করা উচিত— হিন্দুর আর মুসলমানের। ২০টি কালেক্টরেট ছিল। তাহলে ৪০টি কালেক্টরেট ইস্কুল, আর ৩০০টি তহশীলদারী ইস্কুল গড়া দরকার। প্রথম ধরণের ইস্কুলের শিক্ষকের মাহিনা হবে ১৫৲ টাকা মাসে, আর দ্বিতীয় ধরণের ৯৲ টাকা।

তৃতীয় প্রস্তাব, একটি কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন গঠন করা দরকার॥

বোম্বাইয়ের গভর্ণর জে. ম্যালকল্‌ম এর মিনিট: ১৮২৮:

ভারতবাসীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁর মতে— শাসনবিভাগের সর্বত্র ভারতবাসীর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হবে। এর প্রয়োজন আছে তিন দিক দিয়ে—অর্থনৈতিক, সংস্কার, এবং শাসনকার্যের নিরাপত্তা। কিন্তু এই শিক্ষা উপকারী না হয়ে বিপজ্জনক হবে যদি শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং মর্যাদাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হয়।

তিনি মনে করেন না, এই সঙ্কল্প কাযে পরিণত করতে হলে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজন আছে। তবে ইংরেজি সাহিত্য-বিজ্ঞান অনুবাদ ক'রে তাদের দেওয়া উচিত। তিনি এলফিনস্টোনের নীতি পালন করতে প্রস্তাব করেন॥

এচ. টি. প্রিন্সেপের মিনিট : ৯ই জুলাই ১৮৩৪ :

মাদ্রাসা কলেজের সম্পর্কে ২৬ শে এপ্রিল ১৮৩৪এ উপসমিতি প্রস্তাব করেন। "কমিটির মতে মাদ্রাসায় ইংরেজি পড়ানো এবং উৎসাহ দানেব সময় এসেছে; কাজেই প্রস্তাব এই যে, এই তারিখ থেকে যদি কোন ছাত্র আরবীর সঙ্গে ইংরেজি অধ্যযন না করতে চায় তবে তাকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হবে না।"

এই প্রস্তাবের বিপক্ষে প্রিন্সেপ সাহেব তাঁর অভিমত জানান; বলেন মাদ্রাসার শিক্ষার উদ্দেশ্য নষ্ট হবে, প্রতিশ্রুতি নষ্ট হবে! যদি এই প্রস্তাব প্রত্যাহার না কবা হয় তবে তিনি আর কলেজের সাবকমিটির সদস্য থাকবেন না ব'লে জানান॥

এইভাবে ইংরেজি আব প্রাচ্য ভাষাব পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ বাধল। এই সংঙ্ঘর্ষের অবসান জোর করে ঘটালেন মেকলে এবং বেন্টিঙ্ক।

টি. বি. মেকলের মিনিট ; ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫

পার্লিয়াণ্টের আইনে ছিল (১৮১৩)—কিছু টাকা বরাদ্দ করা হল কেন, না বৃটীশ অধিকৃত এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচার করতে এবং ভারতের পণ্ডিতদের শিক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং সাহিত্যের সৃষ্টি এবং প্রচার করতে।"

তিনি বলেন, এই ধারার অর্থ এ কখনও মনে করা যায় না যে, হিন্দুদেব শাস্ত্র যাতে কেবল কুশ ঘাস কি ক'রে ব্যবহাব করতে হয় তাই লেখা আছে এবং দেবতাদের রহস্যবাদ প্রচলিত হয়েছে—তাই পড়াতে হবে। (তিনি মিশরের যুক্তিও দিয়েছেন) তিনি মনে করেন ধারার প্রথম অংশটির উপর জোড় পড়বে।

সরকারের প্রতিশ্রুতিব কথা তোলা হয়েছে। এই প্রতিশ্রুতি অবস্থানুসারে কি পরিবর্তিত হবে না। যে-শিক্ষা অকেজো প্রতিশ্রুতি আছে ব'লে তাই চালিয়ে যেতে হবে এ তো অর্থহীন কথা!

ভারতের লৌকিক ভাষায় সাহিত্য নেই, বিজ্ঞান নেই। সেই ভাষায় ভালো কিছু অনুবাদ করা চলে না। কাজেই জনসাধারণের বুদ্ধি-গত শিক্ষা দিতে হ'লে তাদের মাতৃভাষা বাদ দিতে হবে, অন্য কোন ভাষা শিখতেই হবে। সেটি কোন্ ভাষা? কেউ বলেন আরবী অথবা সংস্কৃত। এদের মধ্যে দেখতে হবে কোন্‌টি প্রকৃতপক্ষে শেখার মতো।

"আমার সংস্কৃত বা আরবীতে কোন জ্ঞান নেই। কিন্তু নিঃসন্দেহে আমি তাদের মূল্য নিরূপণ করতে পারি। কারণ আমি আরবী সংস্কৃতের নাম করা বই গুলো অনুবাদের সাহায্যে পড়েছি। এই বিষয়ের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনাও করেছি। এই পণ্ডিতদের মধ্যে একজনও অস্বীকার করবেন না যদি বলি—ভালো ইয়োরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি তাক আরব ও ভারতের সমগ্র সাহিত্যের সমকক্ষ।"

সবচেয়ে মর্যাদা পায় এই ভাষার কবিতা। কিন্তু প্রাচ্য ভাষাবিদ কেউই অস্বীকার করবেন না যে, আরবী সংস্কৃত কবিতা পাশ্চাত্ত্য জাতির সমকক্ষই। এ ছাড়া জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভাগে পাশ্চাত্য-ভাষার মূল্য নির্ণয়ই করা যায় না।

(গ্রীক সাহিত্য কত কি পাশ্চাত্য সাহিত্যকে দিয়েছে তার গর্ব করছেন) ইংরেজি হচ্ছে ভারতের শাসকদের কথ্য ভাষা, সরকারী চাকুরে উচ্চ শ্রেণীর ভারতবাসীরও কথ্যভাষা। কাজেই সমগ্র পূর্বভূমণ্ডলে এই ভাষাই ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা হয়ে দাঁড়াবে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায়, ইয়োরোপীয় উপনিবেশেও এই ভাষা ব্যবহার করে। এই দুটি দেশ ভারতের সর্বব্যাপারে প্রতিবেশী।

(পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডের অবস্থার কথা বলছেন। সে সময়ে গ্রীক আর রোমান ভাষা পাঠ্য ছিল, সে সময় যদি সেখানকার লোকে এই ভাষা না শিখত তবে আজ ইংরেজি ভাষা এত উন্নত হতে পারত না—ইত্যাদি বলছেন। রুশিয়ার কথা বলছেন—অসভ্যস্তর থেকে সভ্য কেমন ক'রে হল? তারা রুশিয়ার লৌকিক শিক্ষা নিয়ে বড় হয়নি, বড় হয়েছে বিদেশী ভাষা শিখে, বড় হয়েছে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখে নিয়ে। রুশিয়া সম্পর্কে মেকলে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন—There is reason to hope that this vast empire which, in the time of our grand-fathers, was probably behind the Punjab, may in the time of our grand-children,

be pressing close on France and Britain in the career of improvement।

রুশিয়া যদি পাশ্চাত্যভাষা নিয়ে সুসভ্য হতে পারে, হিন্দুরাও পারবে।

ভারতের লোক আরবী সংস্কৃত যে পড়তে চায় না, পড়তে চায় ইংরেজি তার প্রমাণ এই, প্রথম শিক্ষায় আমাদের খরচ করতে হয় আর ইংরেজি শেখার আগ্রহে তারা বেতন দেয়; আরও প্রমাণ, আরবী সংস্কৃত বই ছাপাতে সরকার এক লাখ টাকা খরচ করল—কিন্তু ক্রেতা একটিও পাওয়া গেল না।

সংস্কৃত-আরবী কোটি কোটি লোকের প্রিয় হ'তে পারে। কিন্তু এতে তো আছে যত কুসংস্কার, মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভুল চিকিৎসাবিদ্যা, অসত্য ধর্ম।

গ্রীক ভাষা ইংরেজের পক্ষে যত কঠিন, ইংরেজি ভারতবাসীর কাছে তত কঠিন বলে কেউই স্বীকার করবে না।

অর্থসামর্থ্যের কথা? আমরা মাত্র চাই একটি সম্প্রদায় তৈরী করতে যারা রক্তে এবং গায়ের রঙে ভারতীয় কিন্তু রুচিতে, বুদ্ধিতে, মতবাদে নীতিতে ইংরেজ। এদের হাতেই ভার থাকবে মাতৃভাষাকে উন্নত করতে॥

মেকলে ইংরেজিতে কতবড় রচনাকার বর্তমান লেখকের বিচার সেখানে নয়, কিন্তু একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ পণ্ডিত ব'লে সরকারের কাছে মর্যাদা পেয়েছেন যে ব্যক্তি, তিনি কি করে এত অপরিণত চিন্তাশক্তি নিয়ে দম্ভ করতেন সেইটি রহস্য। তাঁর যুক্তি-প্রমাদ সেই সময় প্রিন্সেপ সাহেবই দেখিয়ে গেছেন।

এচ. টি. প্রিন্সেপের চিঠি, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৫ঃ

মেকলের আইনের ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা ব'লে প্রিন্সেপ যুক্তিবিজ্ঞান দিয়ে দেখালেন।

মিশর আর ভারতের ভাষা-শিক্ষার যে তুলনা করেছেন—তা ঠিক নয়। কারণ, ভাষা ও সাহিত্যের নবোন্নয়ন মানে এ নয় যে, অতীতের 'মামী' সাহিত্যকেই এনে খাড়া করা।

কাল এবং অবস্থানুসারে প্রতিশ্রুতি পরিবর্তনের কথায় বললেন, এ রকম নীতি যদি খাস ইংলণ্ডে ঘটত তবে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নিতান্তই লড়াই সুরু করত। প্রত্যেক সরকারই কি কতগুলি কাজকর্মকে স্থায়ী ব'লে চিহ্নিত করে না? এবং সেই সব পরবর্তীকালে অনুসরণ করতে বলা হয় না?

লাতিন-গ্রীক ভাষা ইংলণ্ডে কি করেছিল তার তুলনায় বললেন—তুলনাটি ঠিক হয়নি। কারণ, ইয়োরোপে লাতিন গ্রীকের যে স্থান এখানে মুসলমানদের মধ্যে আরবী-পারসী এবং হিন্দুদের কাছে সংস্কৃতের সেই স্থান। ভারতের ভাষায় যদি উন্নতি ঘটাতে হয় তবে এই সব ভাষার সাহায্যেই।

রুশিয়ার দৃষ্টান্ত আরও প্রমাদ বহুল। তারা ইয়োরোপীয়দেব সঙ্গে মেলামেশা করে অনুকরণ করে অনুবাদ করে নিজদের ভাষার উন্নতি করেছে।

বেতন দিয়ে ইংরেজি পড়ে ব'লেই কি ইংরেজিতে আগ্রহ প্রকাশ পায়?

তাহলে মাদ্রাসাব ছাত্রদের ইংরেজিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে কেন? মেকলের গালাগালি হয় সর্বত্র প্রযুক্ত হোক নতুবা নস্যাৎ করুন।

আরবী-সংস্কৃত বই কেন বিক্রী হয় না, ইংবেজির কেন হ, তার কারণ অন্য। মেকলেব ভুলযুক্তির মধ্যে আরও আছে এই, অনুবাদের সাহায্যে কোন মূল ভাষার গুণাগুণ, প্রভাব, চরিত্র বোঝা যায়না। তিনি অনুবাদ পড়েই আরবী-সংস্কৃতের উপর অত কঠিন মন্তব্য না করলেই পারতেন। এ যুক্তি হাস্যকর॥

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সঙ্কল্প ৭ই মার্চ, ১৮৩৫

মত এই যে, ভারতবাসীকে ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়াই বৃটীশ শাসকের মুখ্য উদ্দেশ্যঃ কেবল ইংরেজী শিক্ষার খাতেই সরকারের সমস্ত ব্যয় করাই সার্থক ব'লে মনে করা হবে।

কিন্তু এও উদ্দেশ্য নয় যে, দেশীয় শিক্ষার কোন ইস্কুল কলেজ উঠিয়ে দেওয়া; এখানে যে-শিক্ষা দেওয়া হবে তার সুযোগ তারা নিতে পাবে; কমিটির অধীন সমস্ত অধ্যাপক এবং ছাত্র তাদের বৃত্তি পাবে। কিন্তু যেভাবে তাদের অধ্যয়ন কালকে পরিপোষণ করা হচ্ছে তাতে আপত্তি আছে। মনে করা হচ্ছে যে, এ কেবল কৃত্রিম উপায়ে এমন শিক্ষার সাহায্য করা হচ্ছে যা পরবর্তীকালে উন্নততর শিক্ষা নিশ্চিতরূপে অপসরণ করবে; কাজেই নিদেশ থাকে যে, যারা এরপর এই শিক্ষালয়ে প্রবেশ করবে তাদের কোন বৃত্তি দেওয়া হবে না, যখনই প্রাচ্য-শিক্ষাব কোন অধ্যাপকের পদ খালি হবে তখন কমিটি সরকারকে জানাবেন যে ছাত্রদের শ্রেণী এবং ছাত্র সংখ্যার অবস্থা তার উপর নির্ভর করে সেই রকম অধ্যাপক নিয়োগ করা হবে কিনা বিবেচনা করা হবে।

প্রাচ্যবিদ্যার অনেক বই ছাপানোর খাতে কমিটি অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন ; পুনরায় এরূপ করা নিষেধ।

সরকারী টাকা কেবল ইংরেজিভাষার মাধ্যমে ইংরেজি সাহিত্য বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই ব্যয়িত হবে ॥

লর্ড বেন্টিঙ্ক প্রথমে লিখলেন, ঐ সব ইস্কুল কলেজ তুলে দেওয়া উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু পরে লাট সাহেব যে নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন, তাতে পূর্বকথা অস্বীকাব করা হল। একেই বলে লাটসাহেব।

লর্ড অকল্যাণ্ডের মিনিট, ২৪শে নভেম্বর, ১৮৩৯ :

অকল্যাণ্ড বুঝেছিলেন—প্রাচ্যবিদ্যাব আর পাশ্চাত্যবিদ্যার সঙ্ঘর্ষ সবকারী টাকা নিয়ে। তিনি চাতুর্যের সঙ্গে উভযকে সন্তুষ্ট কবলেন।

প্রাচ্যবিদ্যা-শিক্ষালয় বজায় রাখলেন। কৃতী অধ্যাপকদের ভালো মাসোহারা দিলেন। ছেলেদেব বৃত্তিব্যবস্থা কবলেন। প্রাচ্যভাষার ভালো বই প্রকাশ করতে দিলেন। তবে এই বিদ্যালয়কে প্রথমে প্রাচ্যবিদ্যা শিখিয়ে পরে প্রযোজন বোধে ইংরেজি শেখাতে বললেন।

পাশ্চাত্যশিক্ষাব্রতীদের সম্পর্কে বললেন—সংস্কৃত বা আববী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা খুব সুফল দেয় না। ইংবেজি ভাষাই নিতে হবে। উচ্চশ্রেণীর লোককে শিক্ষা দিয়েই অগ্রসর হতে হবে। একেই বলে, "downward filtration theory" অবসব যাদেব আছে তারাই পাশ্চাত্য শিক্ষা নেবে। এই ভাবেই সমাজে ইংরেজি শিক্ষা তাবাই ছড়িয়ে দেবে।

জেলা ইস্কুল ইত্যাদিতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজিই থাকল।

এ্যাডাম সাহেবের প্রস্তাব তিনি তেমন অনুমোদন করলেন না ॥

১৮৪১ সালের নিদেশপত্রে (Despatch) অকল্যাণ্ড সাহেবের নীতিকে অনুমোদন করা হ'ল।

হার্ডিঞ্জের সঙ্কল্প : ১০ই অক্টোবর, ১৮৪৪

প্রকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেই সরকারী চাকবী দেওয়া হবে ব'লে ঘোষণা করা হ'ল। কাউন্সিল অব এডুকেসনকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকা করতে বলা হল। নিম্নতম চাকবীর জন্যও বলা হ'ল যে কিছু লেখাপড়া জানে তার আবেদনই সর্বাগ্রে গ্রাহ্য করা হবে ॥

১৮৫৪ সালের (উডের ডেসপ্যাচ) ১৯শে জুলাই, ১৮৫৪

(এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ এবং সদ্যপ্রতিষ্ঠিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা দেশে প্রতিষ্ঠার জন্য 'কাউন্সিল অব এডুকেসনের' সম্পাদক ফ্রেড. জে. মোয়াট ১৮৪৫ সালের ২৫শে অক্টোবর একটি প্রস্তাব দেন)।

(১) স্বীকার করা হয়েছে যে, ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করাই উদ্দেশ্য, কিন্তু অনাবশ্যক ভাবে মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ইংরেজিকে কখনও দেশের মাতৃভাষার পরিবর্ত ভাষা হিসাবে দেখা বা পরিণত করার ইচ্ছা ঠিক নয়। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাই প্রধান উপকরণ হবে।

(২) শিক্ষাবিভাগ প্রবর্তন করার কথা থাকল (Department of Public Instruction)। ৫টি প্রদেশেই এমন বিভাগ থাকবে—বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে। একজন শিক্ষা অধিকর্তা থাকবেন, তাঁকে সাহায্য করবেন পরিদর্শকেরা। বছরে একবার করে শিক্ষার খবর ছাপানো হবে।

(৩) বোম্বাই ও কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। মাদ্রাজের জন্য শিক্ষাবিভাগের উপর ভার দেওয়া হ'ল। কাজ হবে—পরীক্ষা নেওয়া এবং উপাধিপত্র দেওয়া। বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর জন্য অধ্যাপকও নিয়োগ করতে পারে বলে আভাস দেওয়া হ'ল।

(৪) নানাশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, অনুমোদিত কলেজ, উচ্চ বিদ্যালয় (ইংরেজির মাধ্যমে বা ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে) দেশীয় প্রাথমিক ইস্কুল। ইংরেজি-বাংলা (Anglo vernacular) ইস্কুল আর বাংলা ইস্কুলকে তাঁরা এক পর্যায়ে ফেললেন। প্রাথমিক ইস্কুলে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করা হবে।

(৫) ভালো ছেলেদের বৃত্তিব্যবস্থা করতে বলা হ'ল।

এই নির্দেশপত্র 'downward filtration theory' (শিক্ষার নিম্নাভিমুখী পরিস্রুতি মতবাদ) অগ্রাহ্য করল।

(৬) সরকারী সাহায্যের কিছু নিয়ম জানালেন। ছাত্রদের বেতন প্রথাও প্রবর্তন করলেন। ধর্মীয় হ'লেও মিশনারী ইস্কুল সাহায্য পাবে।

(৭) শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য নর্মাল ইস্কুল স্থাপিত হবে।

(৮) শিক্ষা পেলে সরকারী চাকরী পাবে এমন নীতি হওয়া উচিত।

(৯) স্ত্রীশিক্ষার জন্য ইস্কুল খোলা হবে, তাতে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা থাকবে।

(১০) ভারতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লিখতে উৎসাহিত করা হবে।

(১১) বৃত্তিশিক্ষার কলেজ এবং কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে॥

এই ডেসপ্যাচে কতগুলি তথ্য ছিল যার মধ্যে অন্যতম,

(ক) ভারতের অন্য যে কোন অঞ্চল থেকে বাংলাদেশে ইংরেজিভাষা পড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষা উচ্চশীর্ষে পৌঁছেছে,

(খ) প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই তিনটি করে জেলা ইস্কুল এবং ৫টি ইংরেজি বাংলা কলেজ আছে,

(গ) সাধারণের জন্য বিশেষকরে মাতৃভাষার সাহায্যে পড়ানোর কাজ প্রায় কিছুই হয়নি ; ১৮৪৪ সালে যে কতিপয় বাংলা ইস্কুল খোলা হয়েছিল তার মধ্যে মাত্র ৩৩টি টিকে আছে এবং ছাত্রসংখ্যা ১৭০০। ১৮৫২ সালে বোর্ড অব্ রেভিন্যুযের হাত থেকে এগুলো কাউন্সিল অব এডুকেসনের হাতে যাওয়ায় এগুলির চরম দুর্দশা হয়েছে

(গ) মাদ্রাজের দেশীয় ইস্কুলের অবস্থাও বাংলার অনুরূপ। তবে এখানে মিশনারীরা তামিলদের মধ্যে শিক্ষার সাড়া এনেছে, তারা এবিষয়ে অনেক কাজ করছে।

(ঘ) বোম্বাইয়ের ইংরেজিযুক্ত মাতৃভাষার কলেজের অবস্থা প্রায় বাংলার মতো। দেশীয় ভাষার শিক্ষা এখানে কার্যকরী হয়েছে। ২১৬টি এই জাতীয় ইস্কুল বোর্ড অব এডুকেসনের অধীনে ছাত্রসংখ্যা ১২০০০। এখানে তিন জন জেলা পরিদর্শক আছে, তারমধ্যে একজন ভারতীয় মহাদেও গোবিন্দ শাস্ত্রী।

মোটকথা উডের ডেসপ্যাচ-এ এতাবৎকালের শিক্ষাসম্পর্কে বিভিন্ন মতকে সমন্বয় করল।

১৮৫৯ সালের নির্দেশ পত্র : ৭ই এপ্রিল :

(১৮৫৪ সালের পর সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেল, কোম্পানীর হাত থেকে ভারত সম্রাজ্ঞীর হাতে ভারতবর্ষ এল, কাজেই এই অনুজ্ঞাপত্র সম্রাজ্ঞীর আমলে প্রথম।)

শিক্ষা-অধিকর্তার বিভাগে যে-খরচ হচ্ছে তার হিসাব দেওয়া হল :

বাংলা উঃ পঃ প্রদেশ পাঞ্জাব বোম্বাই (সিন্ধু সমেত) মাদ্রাজ	৪৪, ৯০৮ টাকা প্রতি মাসে।

ইস্কুলের শ্রেণীভেদ, পর্যায়ক্রমে—কলেজ ; সরকারী ইস্কুল। সরকারী ইস্কুলের বিভিন্ন নাম ছিল—প্রাদেশিক ইস্কুল ; কলেজিয়েট ইস্কুল ; হাই ইস্কুল ; জিলা ইস্কুল ; সরকারী ইঙ্গ ভারতীয় ইস্কুল (Anglo-Vernacular School)।

ভারতীয় ইস্কুলের (বাংলা বা Vernacular School) প্রায় অধিকাংশ প্রদেশেই দুর্দশা।

নর্মাল ইস্কুলে বিলাত থেকে অধ্যাপক নিয়ে যেতে হ'ত। এতে অসুবিধা দেখা গেছে। ১৮৫৪ সালের আগে বোম্বাইতে একটি নর্মাল ক্লাস ছিল মাত্র, মাদ্রাজেও ঐ রূপ।

এই সময়ের নর্মাল ইস্কুলে ভারতীয় ভাষার শিক্ষককেই শিক্ষণ দেওয়া হ'ত। এর মধ্যে ৪টি ছিল বাংলা দেশে। ছাত্র ২৫৮ জন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বেনারসে একটির কাজ চলছে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে আগ্রাতে একটি এবং অন্যত্র দুটি অনুরূপ ইস্কুল স্থাপনার অনুমোদন করা হয়েছিল। বোম্বাইতে পৃথক কোন শিক্ষক-শিক্ষণ ইস্কুল নেই তবে ইংরেজি-ইস্কুলের অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ শ্রেণী পরিচালিত হ'ত। এখানকার শিক্ষক ইঙ্গ-ভারতীয় এবং ভারতীয় ইস্কুলে নিযুক্ত হ'ত।

স্ত্রীশিক্ষার জন্য ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন (কাউন্সিল অব এডুকেসনের সভাপতি) নিজের খরচায় হিন্দু মেয়েদের শিক্ষার জন্য ইস্কুল খোলেন ; ১৮৫০ সালে ড্যালহৌসি (Marquis of Dalhousie) বেথুনের মৃত্যুর পর ইস্কুলের ভার নেন ; তিনি চলে আসায় সরকার হাতে নেয়। প্রথমে ছাত্রী ছিল ৩৪। পরবর্তীকালে ১৮৫৬ সালে বীডন সাহেবের সভাপতিত্বে (one of the Secretaries of the Govt. of India) হিন্দু ভদ্রলোকেরা পরিচালনার ভার নেন।

১৮৫৪ সালের পর ঢাকা এবং হাওড়াতে মেয়েদের ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই প্রদেশে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। আহমেদাবাদে

এবং পুনায় বেসরকারী পৃষ্ঠপোষণায় বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৪টি প্রদেশে সরকারী ইস্কুল কলেজের ছাত্রসংখ্যা তখন—

কলেজে—২৮৭৩ ; উন্নত ইস্কুলে—৯১৬৮ ; নীচের ইস্কুলে—৩৯২৯০ জন ; এর মধ্যে কলেজের ছাত্র সবচেয়ে বেশি, উঃ পঃ প্রদেশে (১৩৭০ জন,) আর নিম্নধরণের ইস্কুলে বেশি বোম্বাইতে (২৩,৮৪৬)।

এই অনুজ্ঞাপত্র নর্মাল ইস্কুল, বালিকা-ইস্কুল এবং উঃ পঃ প্রদেশ ছাড়া অন্যত্র ভারতীয় ইস্কুলের পরিচালনা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন॥

১৮৮২ সালের শিক্ষা আয়োগ বা কমিসন (Education Commission 1882)।

এই আয়োগকে বলা হয় হাণ্টার কমিসন, কারণ ইনিই ছিলেন এই আয়োগের সভাপতি।

এই আয়োগের অন্যান্য সদস্য : ডি, এম, বারবুর ; ডব্লিউ, আর, ব্ল্যাকেট ; সি, এ, আর ব্রাউনিং ; কে, ডেইটন ; হাজি গোলাম হোসেন ; এচ, পি, জেকব ; ডব্লিউ লী-ওয়ার্ণার , ডব্লিউ মিলার ; পি, আর মুদালিয়ার ; কে, টি, টেলাঙ ; আনন্দ মোহন বসু ; এ, ডব্লিউ, ক্রপ্ট ; জে, টি, ফাউলার ; এ, পি, হাওয়েল ; এ, জিন্ ; সৈযদ মাহমুদ ; ভূদেব মুখার্জী ; জি পীয়ার্সন ; যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর ; জি, ই, ওয়ার্ড।

এই আয়োগের আওতা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বাইরে থাকল। প্রাথমিক শিক্ষার উপর মূলত জোর দেওয়ার কথা, কিন্তু কলেজিযেট এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পর্কেও এঁদের বক্তব্য থাকবে।

এঁদের বক্তব্য কয়েকটি শ্রেণীতে পড়ে : (১) প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, (২) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা, (৪) কলেজিয়েট শিক্ষা, (৫) শিক্ষাবিভাগের আভ্যন্তরীণ কার্য, (৬) বিভাগের বাহিরিক নীতি (৭) রাজা-মহারাজাদের ছেলের বিশেষ শিক্ষা (৮) মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক শিক্ষা, (৯) আদিম অধিবাসীদের শিক্ষা, (১০) নিম্নশ্রেণীর লোকের শিক্ষা, (১১) স্ত্রীশিক্ষা, (১২) নিয়ম-প্রণয়ন সম্পর্কে (Legislation)।

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে তাঁরা মনে করেন, যে-সব ইস্কুল ভারতীয়দের দ্বারা স্থাপিত, পরিচালিত, এবং যেখানে শিক্ষায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বিভাগ যেন এই ইস্কুলকে অনুমোদন করে, উৎসাহ দেয়। পরীক্ষার ফল দেখে

সাহায্য প্রদান করা হবে। শিক্ষকদের বিশেষ শিক্ষণ নিতে হবে। প্রদেশ অনুযায়ী পরীক্ষা ব্যবস্থা হবে। প্রয়োজনীয় বিষয় ধীরে ধীরে পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য এই ইস্কুল উন্মুক্ত থাকবে। অবশ্য বিশেষ ধরণের ইস্কুল হ'লে পৃথক কথা। দেখতে হবে, সেই সহরে এবং গ্রামে সমস্ত শ্রেণীই পড়া শুনার অধিকারী হয়েছে কিনা, তবেই পৃথক ইস্কুল অনুমোদন করা হবে। মিউনিসিপাল বা লোকাল বোর্ড যেখানে আছে তাদের হাতেই এই ইস্কুলের নিয়ন্ত্রণের ভার থাকবে। পরিদর্শক এই বোর্ডের পদাধিকারবলে সভ্য হবেন। ব্যয় নির্বাহ এই বোর্ড থেকেই হবে। শিক্ষাবিভাগ এই ইস্কুলের তালিকা রাখবেন।

প্রাথমিক ইস্কুল সেইগুলি যা মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বসাধারণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাপেক্ষ এই শিক্ষা হবে না, তাদের শুধু জীবন-যাত্রার মান উন্নত করতে পারে এমন শিক্ষাই দেওয়া হবে। উচ্চপ্রাথমিক বা নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। পরীক্ষার ফল দেখে এখানেও সাহায্যের হার নির্ণয় করা হবে। তবে অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ইস্কুলে ব্যতিক্রম চলতে পারে। ইস্কুলবাড়ী এবং আসবাব সাধারণ ধরণের এবং স্বল্পব্যয়ে নির্মিত হবে। পাঠ্যতালিকার মধ্যে ব্যবহারিক শিক্ষা যথা অঙ্ক, হিসাব, ভূমিমাপ. প্রাকৃতিক এবং পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান এবং কৃষিকাজে স্বাস্থ্যরক্ষায়, কারিগরীশিল্পে তাদের প্রয়োগ জানাতে হবে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে উন্নয়নের পরীক্ষার বিশেষ কোন সার্বিক মান থাকবেনা। খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। নর্মাল ইস্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক রাখতে হবে। এইজন্য শিক্ষক শিক্ষণ ইস্কুল যথেষ্ট স্থাপিত হবে। বেতন একেবারেই মকুব করতে হবে প্রাথমিক ইস্কুলের ছাত্রদের এমন কোন কথা নেই, তা হলই বা তারা মিউ-নিসিপ্যালিটি বা লোকালবোর্ডের করদাতা। বিনাবেতনের কথা দরিদ্র ছেলেদের বেলাই খাটবে। সরকারি নিম্নতন কাজে হার্ডিঞ্জের বিধানই অনুসৃত হবে। নৈশ ইস্কুলকে উৎসাহ দিতে হবে। এই ইস্কুলের শ্রেণীতে কোন বিশেষ বা সাম্প্রদায়িক ইস্কুল স্থাপন করা চলবেনা। লোকালবোর্ড আর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের খরচাতে এবং প্রাদেশিক রাজস্ববিভাগের খরচাতে চলবে।

মিউনিসিপ্যাল আর লোকাল বোর্ডের শিক্ষা-ভাণ্ডারের কার্যবিধি সম্পর্কে এই আয়োগ ফিরিস্তি দিলেন।

মাতৃভাষাতেই এই ইস্কুল শিক্ষা দেবে। ভারতীয় ভাষার কোন্‌টি মাতৃভাষা, কোন অঞ্চলের লোকের মাতৃভাষা সে সব নির্দেশ দেবেন বোর্ড। কোন পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষাবিভাগের অনুমোদন নিতে হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে দুটো ভাগ করা হল—(ক) যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবে, (খ) যারা ব্যবহারিক শিক্ষা যথা ব্যবসাবাণিজ্যিক এবং সাহিত্য নিরপেক্ষ (non-literary) শিক্ষা নেবে।

যখন মাধ্যমিকবিদ্যালয় এই রকম দ্বিধা বিভক্ত হবে, তখন ছেলেরা শেষ পরীক্ষা দিয়েছে কি নীচের অমুক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ এই রকম মর্মে তাদের পত্র বা সার্টিফিকেট দিবে। সরকারী চাকরীতে এই সার্টিফিকেট মান্য করা হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে উচ্চ এবং মধ্য উভয় বিদ্যালয়ই গণ্য হবে।

ইস্কুলে গ্রন্থাগারের জন্য সাহায্য দেওয়া হবে।

শিক্ষকদের স্থায়ী করা হবে শিক্ষাপদ্ধতির নীতি এবং ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পর। যারা স্নাতক তারা নর্মাল ইস্কুলে স্বল্পকালীন শিক্ষা নিতে পারবে।

সরকারী ইস্কুলের মতো অত উচ্চ ছাত্র বেতন সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুল প্রবর্তন করতে পারবেন না। বৃত্তিধারী ছাত্রদেরও বেতন থেকে রেহাই দেওয়া আবশ্যিক নয়। ৩ ঘণ্টার বেশি এক নাগাড়ে শ্রেণী পাঠনা চলবেনা, অবসর দিতে হবে ছাত্রদের। ইস্কুলের কর্তৃপক্ষের উপরই নির্ভর করবে শ্রেণীগত উন্নয়ন বিধি (class-promotion)।

কলেজিয়েট শিক্ষা সম্পর্কেও তাঁরা নির্দেশ দিলেন, কোন্ কোন ক্ষেত্রে সাহায্য করতে হবে ইত্যাদি। বিশেষ লক্ষ্য করার কথা—ভারতীয় স্নাতক (Indian graduates) যদি ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও স্নাতক হ'ন তবে তাঁদেরই আগে সরকারী কলেজে চাকরী দেওয়া হবে।

ছাত্রদের বেতন সরকারী কলেজে যত উচ্চহারের হবে, অত উচ্চহারের সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ আদায় করবেন না।

আভ্যন্তরীণ বিভাগীয় ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ছাত্র এক ইস্কুল থেকে অন্য ইস্কুলে গেলে পূর্বেকার ইস্কুলের সার্টিফিকেট নিয়ে ভর্তি হবে—সে সেই ইস্কুলের বেতন দিয়েছে কিনা, শ্রেণীপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে কিনা লিখিত থাকবে, উত্তীর্ণ না হলে নতুন ইস্কুলে উচ্চশ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে না।

ইস্কুলের শ্রেণীবিভাগ করা হ'ল—

(১) সরকার পরিচালিত, (২) সাহায্য প্রাপ্ত, (৩) প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

যেসব সরকারী বিভাগের কমিটির ইস্কুল বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগীয় পরীক্ষা দেয় তাদের নাম 'পাবলিক ইস্কুল'। পাবলিক ইস্কুলের তিনটি নাম শ্রেণী হিসাবে হবে ; বিভাগীয়, সাহায্যপ্রাপ্ত, সাহায্য নিরপেক্ষ।

যে সব ইস্কুল বিভাগে হিসাব নিকাশ জানায় মাত্র তারা বেসরকারী ইস্কুল।

কোনক্রমেই কলেজের অধ্যাপককে ইস্কুলের ইনসপেক্টর বা পরিদর্শকের পদে বা বিপরীতক্রমে বদলী করা যাবে না।

নর্মাল ইস্কুল (সরকারী বা বেসরকারী) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত বিভাগ থাকবে। ভারতীয় ভাষার বইয়ের ছাপার দিকে যত্ন নিতে হবে।

বাহিরিক সম্পর্কে বলছেন, সাহায্যপ্রাপ্ত ইস্কুলের শিক্ষককে নর্মাল ইস্কুলের পাঠ নেওয়ায় বাধ্য না করে অন্য পরীক্ষা দিতে দেওয়া যাবে। বিশেষ বিষয় পাঠনার উপর নির্ভর করেও সাহায্য দেওয়া যাবে, অবশ্য ফল দেখে সাহায্য করার কথা তো থাকবেই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপরই নির্ভর করবে ইস্কুলের পড়ানোর মাধ্যম কোন ভাষা হবে। কলেজের টাকা বরাদ্দ পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করবে না। সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে আরও অনেক নিয়মের প্রস্তাব করা হ'ল।

সামন্তদের ছেলের পড়াশুনার কথা বলতে গিয়ে আয়োগ বললেন, স্থানীয় সরকার এই বিশেষ ধরণের ইস্কুল কলেজ প্রবর্তনের কথা ভাববেন।

মুসলমানদের শাস্ত্রীয় ইস্কুল প্রবর্তনে উৎসাহ দেওয়া হবে। মুসলমান শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য আবশ্যক বোধে নর্মাল ইস্কুল বা শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুসলমানদের প্রাথমিক ইস্কুল পরিদর্শনের জন্য মুসলমান পরিদর্শক যথেষ্ট পরিমাণে নিযুক্ত হবে।

আদিম অধিবাসীদের ইস্কুলে বেতন মকুব করার কথা সাধারণ নিয়ম হ'ল। যদি তাদের কোন ভাষা লেখা বা পড়ার স্তরে না থাকে তবে পার্শ্ববর্তী প্রদেশের মাতৃভাষাই তাদের শিক্ষার মাধ্যম হোক। যেখানে তাদের ভাষা খানে পার্শ্ববর্তী এলেকার ভাষাও বিশেষ ভাষা হিসাবে পড়তে হবে।

অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক ইস্কুল খুলতে হবে।

এছাড়া মেয়েদেব শিক্ষার জন্যও বিশেষ নিয়ম করা হ'ল।

বিধিবদ্ধ করার কথা প্রসঙ্গেও তাঁদের বিশেষ নির্দেশ থাকল ॥

এই আয়োগ সবকাবকে শিক্ষাব্যাপারে প্রত্যক্ষ সহায়তা থেকে নিজদের সঙ্কুচিত করবার কথা বললেন। সে সময়ে সবকাবী তহবিলে নাকি যথেষ্ট অর্থ ছিল না, এইজন্যই এইরূপ নিদেশ। এই আয়োগ মোটামুটিভাবে উডেব নিদেশের বিপবীত কায কবল। আয়োগের সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। বিশেষ কবে কে. টি. তেলাঙ, ডি. এম. বাববুর, আর্থাব হাওয়েল বিভিন্ন ধারায় আপত্তি কবে পৃথক পৃথক পত্র দিলেন। তেলাঙেব প্রধান আপত্তি ছিল শিক্ষাঅধিকর্তাব নির্দিষ্ট বেতন প্রথা নিয়ে, মিসনারীদেব বিশেষ সাহাষ্য কবায। কলেজিয়েট শিক্ষাব যে বিধিতে আছে যে অধ্যক্ষ বা অধ্যাপকদেব মানবজাতি এবং নাগবিকেব কর্তব্য হিসাবে বক্তৃতা দিতে হবে, নীতি পুস্তক পড়াতে হবে সেই ধাবা সম্পর্কে তিনি প্রবল আপত্তি তুললেন। এই বিষয়ে তাব বক্তব্য হ'ল, ইংবেজ চায যে ভাবতীয়েবা সবকাবেব সর্বব্যাপাবে মুখ বুঁজে বশ্যতা স্বীকাব কববে। (If the Professors lectur's tend to teach the pupils the duty of submisson to the views of Government without a murmur of dissatisfaction, their is sure to come up a set of Liberal irreconcileables who will complain that Govt is endeavouring to enslave the intellect of the nation.)। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষাকে উপেক্ষা কবাব নীতি অনুমোদন কবলেন না। কেবল প্রাথমিক শিক্ষাব জনসাধাবণেব মনকে উন্নত কবা যায় না, বিশেষ ক'বে যেখানে চাকবী বাকবী নির্ভর কবে মাধ্যমিক শিক্ষাব উপব। অনুন্নতশ্রেণী, অনগ্রসব শ্রেণী, সাম্প্রদায়িক ইস্কুল সম্পর্কেও আপত্তি উঠল। মাধ্যমিক বিদ্যালযেব উচ্চ শ্রেণীতে যে দুটি ভাগ করা হ'ল তাব মান সার্টিফিকেট অনুযায়ী হবে, এবং সেই অনুসারে সরকারীবিভাগ মযাদা দেবে একথা বারবুর সাহেব মানলেন না। তিনি বলেন, এরও সাধারণ পরীক্ষা হওয়া উচিত। তিনি দেখেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের প্রবেশিকা পরীক্ষার মানই এত খারাপ যে তারা কেবল ছোটখাটো কেরাণীর চাকরীবই উপযুক্ত, আর কিছু নয় (My experience as the head of a large office in Bengal has led me to the conclusion that the adoption of the University

Entrance examination as a general Standard of education, has had disastrous effects in the case of youths not fitted to rise to a higher position than that of the subordinate clerks.) ।

শীতেলাও আজকালকার 'সমাজ বিদ্যা' সম্পর্কে কি বলতেন জানিনা। কিন্তু প্রবেশিকা পরীক্ষার মান অত্যন্ত উঁচু ব'লে এই সেদিন (১৮৫৭ সালে) তাকে নামানো হ'ল, আর ১৮৭০ থেকেই মান এত নেমে গেল কেন? বর্তমান কালে আমরা আবার বলি পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান কি উন্নতই না ছিল। সবই বোধ হয় আপেক্ষিক আর মাত্র কর্তৃপক্ষের বিশেষণ নিয়েই চলে।

লর্ড কার্জনের সঙ্কল্প-১৯০৪

(কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় আয়োগ ১৯০২ আমাদের এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলে পরিবর্জন করে তাঁর ইস্কুল সম্পর্কে সঙ্কল্প যা তারই মর্ম দেওয়া হ'ল)

কাজনের সঙ্কল্প দ্বিবিধ—নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার। এতাবৎকাল বেসরকারী ইস্কুলের নিয়ন্ত্রণ করা হ'তনা। কিন্তু তিনি স্থির করলেন সমস্ত রকম ইস্কুলকেই দু ধরণেব অনুমোদন নিতে হবে সরকারী এব৲ বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দ্বাবা তাদের ছাত্রদের প্রবেশিকাপরীক্ষা দেওয়াতে পারবে। আর সবকারী অনুমোদনে তাদের অধিকার হবে—

(১) সরকারী সাহায্য পাওয়ার,

(২) সরকারী পরীক্ষায় ছেলে পাঠানো, অথবা কারিগরী বিদ্যালয়ে সবকারী প্রবেশিকা পরীক্ষ ‍ যোগদান,

(৩) সরকাবী বৃত্তি লাভের সুযোগ।

কাজেই সবকারী সাহায্য বরাদ্দ বড়ে গেল। অননুমোদিত ইস্কুল থেকে অনুমোদিত ইস্কুলে ভর্তি হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। পরিদর্শক সংখ্যা বাড়ল। এখনকার অনুমোদনেব চরিত্র শুধু সুযোগ-সুবিধার ব্যাপার নয়, টিকে থাকতে হলেও দরকার।

সংস্কাব পরিক্রমায়, স্থির হল, সাকাবী ইস্কুলকে আদর্শ ইস্কুল হতে হবে, দালান সংস্কাব, ছাত্রাবাস নির্মাণ, শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতিতে অর্থ ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হল ; বেসরকারী ইস্কুলের সাহায্য বাড়ল যাতে তারা সরকারী বিদ্যালয়ের সমকক্ষ হ'তে পারে ; মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থার দিকে নজর পড়ল। মধ্য-শ্রেণীতে মাতৃভাষার মাধ্যম আবশ্যিক এবং ছাত্রদের ইংরেজিতেও এমন দখল থাকতে হবে যাতে উচ্চবিদ্যালয়ের পড়া বুঝতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষার খাতে বেশীপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হ'ল। এই অর্থ বরাদ্দের অভাবেই যে প্রাথমিক ইস্কুলের দুদর্শা হয়েছিল তা সঙ্গে সঙ্গেই প্রমাণিত হ'ল তা নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে—

	১৮৮১-২	১৯০১-২	১৯১১-১২
১। অনুমোদিত প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪২,৯১৬	৯৩,৬০৪	১,১৮,২৬২
২। ছাত্র সংখ্যা	২০,৬১,৫৭	৩০,৭৬,৬৭১	৪৮,০৬,৭৩৬

(উপরোক্ত সংখ্যা বর্মা প্রদেশ বাদ দিয়ে এব দেশীয় রাজ্য ধ'রে)।

পরীক্ষার ফল দেখে সাহায্যদান প্রথা তিনি বর্জিত করলেন। ১৮৩২ সালের আয়োগে ছিল সমস্ত খরচার ⅓ অংশ সরকার বহন করবে, কার্জন সরকারী সাহায্য অর্ধেক (½ অংশ) করলেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যবস্থাও করলেন। আর করলেন, সহর এব গ্রাম্য অঞ্চলের পাঠক্রমে স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ পরিবেশগত পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা।

শিল্প, কারিগরী এবং কৃষিশিক্ষার দিকেও তিনি মন দিলেন। টেকনোলজিকাল বা শিল্পকারিগরী শিক্ষায় তিনি বৈদিশিক শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করেন। কার্জনই কৃষি-বিদ্যা বিভাগ (Agricultural Department) স্থাপন করেন। পুসাতে কেন্দ্রীয় গবেষণ মন্দির স্থাপন করেন এখানে কৃষিবিদ্যার সর্বোচ্চ শিক্ষা দেওয়া হত। তিনি সঙ্কল্প করেন, প্রত্যেক প্রধান প্রদেশে একটি ক'রে কৃষিবিদ্যার কলেজ থাকবে। জনসাধারণের মধ্যে কৃষি বিদ্যা প্রচারের জন্য তিনি মধ্য এব উচ্চবিদ্যালয়ে শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করেন।

বিদেশে শিল্প কারিগরী শিক্ষার জন্য বৃত্তি ব্যবস্থা কার্জনের আমলেই প্রবর্তিত হয়।

১৯১৩ সালের সরকারী সঙ্কল্প :

সরকার (Governor General in Council) শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করলেন চরিত্রশিক্ষা। ধর্ম ও নীতির সম্পর্ক নির্ণয় করে বললেন মহাভারত, রামায়ণ, হাফিজ, সাদী, রুমী এবং অন্যান্য সংস্কৃত, আরবী, পারসী এবং পালি গ্রন্থে উত্তম উত্তম নীতিকথা আছে। (মেকলের প্রেতাত্মা একথা শুনে হয়ত পাশ ফিরে আর-একবার মরল)। ধর্ম সম্পর্কে তাঁরা নিরপেক্ষতা

অবলম্বন করলেও, নীতি পড়ানোর দৃঢ় নীতি প্রকাশ করলেন! (উপায়ও ছিলনা, কারণ তখন জাতীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে, সহিংস আন্দোলনও আছে)।

জানালেন দশ বছরে ছাত্রাবাসের সংখ্যা বেড়েছে, আবাসিক ছাত্রও বেড়েছে। ছাত্রাবাস আরও বাড়াতে সরকার সঙ্কল্প করেন। ঐতিহ্য রক্ষার বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠান অনুমোদন করলেন যথা, প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রের সমাবেশ, বিতর্ক-সভা, সাহিত্যসভা প্রভৃতি বিভিন্ন আলোচনা চক্র। ছাত্রাবাসের মাধ্যমে এগুলো ভালো চলবে। ইস্কুলের ইমারত স্বাস্থ্যকর ক'রে গড়ে তোলা হবে। খেলাধুলা, কায়িকশিক্ষা, বাগান করা বহির্ভ্রমণ প্রভৃতিও নীতি হিসাবে দাড়াল।

(কারণ, ছাত্রাবাস আলোচনা চক্র খেলাধূলা প্রভৃতি দ্বারা ছেলেদের যতটা মোহমুগ্ধ ক'রে রাখা যায় ততই বিপ্লববাদ অপসৃত হবে ব'লে সরকারের তখন ধারণা। শিক্ষা অধিকর্তা ঐ সময়ে একবার বলেছিলেন অন্ধকারময় শ্রেণীকক্ষ আর বিদ্যায়তনই বিপ্লবের আশ্রয়, এইজন্য বিদ্যালয় গৃহ সুদৃশ্য এবং স্বাস্থ্যকর করার প্রয়োজন পড়ল)।

অর্থের অনটনের দরুণ প্রাথমিক শিক্ষাকে তারা আবশ্যিক করলেন না, তবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যেসব ইস্কুল হবে তার অনুমোদন তারা করবেন।

এঁরা কার্জনের সেই পরিবেশভেদে পাঠ্যক্রমের স্বাতন্ত্র্য অনুসরণ করতে পারলেন না ব'লে জানালেন। তবে স্বীকার করলেন, "গ্রামের ইস্কুলে ভালো ক'রে ভূগোল পড়াও, ছেলেদের বেড়িয়ে নিয়ে ফের, প্রকৃতিপাঠ দাও," , মক্তব এবং পাঠশালা অনুমোদন করলেন, উৎসাহ দেওয়ার শপথ নিলেন। শিক্ষক কারা হবেন? না ছেলেরা যে-সম্প্রদায় আর শ্রেণী থেকে আসছে তাদেরই দলের লোক হবেন শিক্ষক। তারা মধ্য-বাংলা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, এক বছরের শিক্ষণ নেবে। তবে উচ্চপ্রাথমিক জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকের পক্ষে দু বছরের শিক্ষণ দরকার আবার মাঝে মাঝে ঝালাই কাজের জন্যও শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ শিক্ষকেরা ভুলে গেলে বন্ধের মধ্যে নতুন ক'রে শিক্ষণ দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

শিক্ষণ প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ১০৲ টাকার কম হবে না; তাঁদের চাকরীর ক্রম স্বীকার করা হবে, তারা হয় অবসরবৃত্তি পাবেন, না হয় প্রভিডেন্ট ফণ্ড থাকবে। ৫০ জনের বেশি ছাত্র থাকবেনা, ৩০ থেকে ৪০ হ'লেই ভালো হয়।

অব্যাহত বিদ্যালয় বলতে মধ্য অথবা মাধ্যমিক বাংলা ইস্কুল। বিদেশী ভাষা না শিখেও এখানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করা যায়। এই ইস্কুলের ছাত্রই ভালো প্রাথমিক শিক্ষক হবেন। অতএব এই ইস্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। কারিগরী শিল্পাগারেও এই বিদ্যা খুব কাজের। অনেক যায়গায় এর অবলুপ্তি ঘটেছে বটে কিন্তু মোটের উপর ভারতে তখন এই ইস্কুল বাড়তির মুখে—। তখন ইস্কুল বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৬৬৬ টিতে, ছাত্র ২৫৭,০০০ জন।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেদের মেধাশক্তি অন্যের তুলনায় অনেক উন্নত (There is much experience to the effect that scholars who have been through a complete Vernacular course are exceptionally efficient mentally)। (মাতৃভাষার স্তবচনী পুজো এইই প্রথম দেখা গেল)।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা সমগ্র ভারতে গত নয় বছরে বেড়েছে ৫,৫০০ থেকে ৬,৫০০ এবং ছাত্র সংখ্যা ৬২২,০০০ থেকে ৯০০,০০০। পরিবর্তন কি কি হবে?

১। সরকারী ইস্কুল কয়টির উন্নতি ঘটানো হবে—

(ক) কেবল গ্রাজুয়েট অথবা শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক কে নিয়োগ ক'রে,

(খ) ইংরেজি শিক্ষককে চাকরীক্রমে (graded service) আনতে হবে, বেতন ন্যূন পক্ষে ৪০৲ উচ্চ পক্ষে ৪০০৲ মাসে।

(গ) উপযুক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণ করে

(ঘ) আধুনিক যুগ সম্মত শিক্ষা দিয়ে এবং মাধ্যমিক শিক্ষাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ক'রে

(ঙ) কায়িক শিক্ষা আর বিজ্ঞান শিক্ষার সংস্কার ক'রে।

২। সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় বাড়িয়ে

৩। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় বাড়িয়ে

৪। আঞ্চলিক সুযোগ সুবিধা বুঝে সরকারী বিদ্যালয় স্থাপন ক'রে।

আধুনিক যুগসম্মত শিক্ষা বলতে ব্যবহারিক বিজ্ঞানের কথা (practical character, freed from the domination of the matriculation Examination) বা প্রবেশিকা পরীক্ষা নিরপেক্ষ ব'লে ১৮৮২ সালের আয়োগ উচ্চশ্রেণীতে হবে বলেছিলেন। কতগুলো প্রদেশে তখন এই শিক্ষা চালু হয়েছিল, বাংলাদেশে হয়নি। হয়েছিল মাদ্রাস এবং কুর্গে, বোম্বাইতে,

যুক্ত প্রদেশে এবং মধ্য প্রদেশে। ইংরেজ এলেকায় এই বিষয়ের জন্য 'স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা' যা 'স্কুল-ছাড়পত্র' (School Leaving Certificate) দেওয়া হ'ত। ১৯১০-১১ সালের হিসাবে বৃটীশ এলেকায় দেখা যাচ্ছে এই বিভাগের ছাত্র ১০,১৬১ জন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৬,৯৫২ জন।

এই পরীক্ষার তাৎপর্য নাকি মুখস্থবিদ্যা পরিহার করা এবং বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোত সম্পর্ক স্থাপন করা; যেসব অঞ্চলে এই ব্যবস্থা নেই সেখানে তা চালু করবার নীতি সরকার গ্রহণ করলেন। এর অন্য বৈশিষ্ট্য হবে,

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে

(২) সরকারী চাকরীতে যেতে হলে প্রবেশিকা পরীক্ষার মান নিয়েই শুধু চলবেনা

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হলে এই পরীক্ষার মানকে গ্রহণ করতে হবে। এই সময়ে অন্য নীতি হল আভ্যন্তরীণ এবং বাহিরিক উভয় প্রকার পরীক্ষার ঐক্য স্থাপন করা। যারা ইস্কুলের ছাড়পত্র নিয়ে বেরোতে চায় তাদের চরিত্র বা স্বভাবের এবং পড়াশুনার একটি নথি রাখতে হবে ইস্কুলে (আজকাল যেমন Cumulative Record Card বা অধ্যয়নকালীন ব্যাপক তালিকা রাখা হয়), এবং এতে পরিদর্শক মন্তব্য লিখবেন।

সাধারণ ইস্কুল সম্পর্কে এই হ'ল ১৯১৩ সালের সরকারী শিক্ষানীতি। এ ছাড়া, শিল্প কারিগরী, বয়নবিদ্যালয়, বাণিজ্যিক বিদ্যালয়, অঙ্কন বিদ্যালয়, কৃষিবিদ্যালয়, পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়, বনবিদ্যালয়, চিকিৎসা বিজ্ঞান বিদ্যালয়, আইন বিদ্যালয় প্রভৃতি সম্পর্কিত কিছু কিছু নতুন নীতি নির্ধারণ করা হল।

সামন্তদের কলেজ মেয়ো কলেজ খুব উন্নত হয়েছে ব'লে মনে করা হয়। সাধারণত ইয়োরোপীয় অধ্যাপক এখানে নিযুক্ত হ'ত।

শিক্ষিক-শিক্ষণ ইস্কুল সম্পর্কে বলা হ'ল, শিক্ষণ শিক্ষা না নিলে আর শিক্ষকতা করতে দেওয়া উচিত নয়। সমগ্র ভারতে তখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য ১৫টি কলেজ ছিল, ইংরেজিতে পড়ানো হয় এখানে, ছাত্রসংখ্যা ১৪০০; প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য আছে ৫৫০টি, ছাত্রসংখ্যা ১১০০০। এক বছর থেকে দু বছর পযন্ত নানা কালপর্যায়ের পাঠক্রম আছে। কিন্তু এতেও অভাব মিটছে না, কাজেই আরও শিক্ষণ-শিক্ষা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

টোল, মাদ্রাসা, পাঠশালা, মক্তবের জন্যও সাহায্য দেওয়া হবে ব'লে ঘোষণা করা হ'ল ॥

এই নীতিতে দেখা যাচ্ছে সরকার জাতীয়তাবাদ সম্প্রসারিত হওয়ায় অত্যন্ত ভীত হয়েছেন। কি ক'রে ছেলেদের শিক্ষকদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের সর্বক্ষণ প্রহরায় রাখা যাবে—তারই চিন্তা এই শিক্ষা-নীতিতে। শিক্ষার সংস্কারের নামে শুধু হাত-পা বাধার চেষ্টা। মহামতি গোখেল আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন তা নস্যাৎ ক'রে দেওয়া হ'ল। বিশ্ববিদ্যালযের হাত থেকে সরকারী হাতে শিক্ষাকে আনবার জন্য ছাত্রদের পরীক্ষাব কৃতিত্বকে দ্বিধা কবতে মনস্থ করা হ'ল। ছেলেদের প্রতি অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য ছাত্রাবাস প্রভৃতি এবং আভ্যন্তরীণ উন্নতিমান নথিভুক্ত করা হ'ল। দৈনন্দিন কাযকলাপের হিসাব এবং পরীক্ষার হিসাব দুটোব উপর ছাত্রেব ভবিষ্যৎ নির্ভব করবে।

সেদিন একজন আমেরিকার শিক্ষাব্রতী বলছিলেন, ছাত্রাবাস ব্যবস্থা এবং অনুষ্ঠানগত-পাঠক্রম ইংরেজদেরই প্রযোজনবোধে সৃষ্টির স্মৃতিমাত্র। কিন্তু আমেবিকা আবাব Cumulative Record Card দিচ্ছে, সে কথাও সত্য।

ফলত, ১৮৮২ আর ১৯১৩ সাল শিক্ষানীতিতে বর্তমানেও অনেকখানি জুড়ে তো আছেই, যা ছিল না তাও নানাভাবে ঘুরে আসছে। রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতাটির কথা মনে হয়,—

এনেছি শুধু বীণা
দেখ তো চেয়ে, আমারে তুমি চিনিতে পার কি না ॥

১৯১৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার অভিপ্রায়ে স্যাডলারের আয়োগ বসে। এই আয়োগ-নিদেশ প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থাব কথায় বললেন, ঢাকা এবং কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-বিভাগ (Department of Education) খোলা দরকার; আই-এ, এবং বি-এতে শিক্ষাবিষয় পাঠ্য হওয়া উচিত।

দ্বৈত শাসননীতিতে (১৯২১-৩৭) দুটো ভাগ হল—সংরক্ষিত আর হস্তান্তরিত। হস্তান্তরিত বিভাগগুলি 'ভারতীয়' মন্ত্রীদের হাতে যেতে পারবে। শিক্ষাবিভাগ ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে এল। কিন্তু অর্থবিভাগ

থাকল ইংরেজদের হাতে। তা ছাড়া কেন্দ্রীয় আর প্রাদেশিক অর্থনীতির সম্বন্ধ যা দাঁড়াল তাতে প্রদেশের হাতে খুব টাকা থাকে না। উপরন্তু, শিক্ষা বিভাগের উচ্চতম পদে আছে ভারতীয় শিক্ষা রাজপদের লোকেরা (Indian Educational Service), তারা প্রদেশের অধীন নয়।

তবু দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয় সমেত সমস্ত রকমের বিদ্যালয় সংখ্যা ১৯২১-২১ এ ছিল ১,৬৬,১৩০ আর ১৯৩৬-৩৭ সালে ২,১১,৩০৮টি ছাত্র ১৯২১-২২ এ ৭৩,৯৬,৫৬০ আর ১৯৩৬-৩৭ এ, ১,২৮,৮৮,০৪৪ জন। শুধু অনুমোদিত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়েরই এই সংখ্যা, এ ছাড়া অননুমোদিত তো ছিলই।

হার্টগ কমিটি (১৯২৯) (Auxiliary Committee of the Indian Statutory Commission) বললেন, শিক্ষার এই প্রসার সংখ্যাকে যেমন বাড়িয়েছে গুণের বা শিক্ষাদর্শের তেমনি অবনতি ঘটিয়েছে। এরকম চলতে দিলে শিক্ষা সার্থক হবে না। এদের মতে—

মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপারে অনেক উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়া এটি বড় মারাত্মক ব্যাধি এই শিক্ষার। শিল্পকারিগরী বিদ্যালয় বা বৃত্তিশিক্ষণ বিদ্যালয় একেবারে অকেজো হয়ে গেল। কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে পুনরায় হস্তক্ষেপ করা উচিত। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের এ বিষয়ে দায়িত্ব কায়েমে হোক বলে মত দেওয়া হচ্ছেন, কিন্তু তাদের দায়িত্ব কমে গেছে স্থানীয় শিক্ষাসমিতির (Local Bodies) স্বাধীনতায়। এ বিষয় পুনর্বিবেচনা করা উচিত॥

১৯১৭ থেকে ১৯২৭ এর মধ্যে অনেক প্রদেশেই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন রচিত হয়ে গেল। বাংলাদেশে ১৯৩০ সালে এই আইন হ'ল গ্রাম অঞ্চলে ছেলেদের জন্য। হার্টগ কমিটি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে প্রতিকারের জন্য নির্দেশ দিলেন,

(১) খুববেশী সম্প্রসারণের দিকে মন না দিয়ে, স্থায়িত্বের এবং দৃঢ়তার দিকে মন দিতে হবে,

(২) প্রাথমিক শিক্ষাকাল অন্যূন ৪ বছর হবে,

(৩) প্রাথমিক শিক্ষকদের, সাধারণ শিক্ষা মান উন্নত করতে হবে; শিক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) ইস্কুলের পাঠক্রম আরও বিস্তৃত এবং স্বাধীন শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে হবে (liberalised)

(৫) ঋতুকাল এবং স্থানীয় প্রয়োজন অনুসাবে ছুটি ছাটাব নিয়ম হবে,

(৬) নিচের ক্লাসে বিশেষ নজর দিতে হবে। দেখতে হবে ঐ শ্রেণী থেকেই পড়া ছেড়ে না দেয়

(৭) গ্রামেব উন্নতি হয এমন পাঠেব সমাবেশ করতে হবে ইস্কুলকে কেন্দ্র করে,

(৮) প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কবাব কাজ মন্থব ক'বে, যত্ন করে পড়ানোব বিধি-ব্যবস্থা কবা উচিত।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন হওয়াব পব (১৯৩৫) দ্বৈতশাসননীতিব অনেক সমস্যাব সমাধান হযে গেল। কিন্তু সমস্যা নতুন সৃষ্টি হলও কম নয। প্রাথমিক শিক্ষাব সমস্যা হল, (১) অবৈতনিক, সাবজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত কবা (২) ইস্কুলেব ছাত্রসংখ্যা 'অপচয়' অর্থাৎ পড়া শেষ হতে না হ'তেই ছেড়ে দেওয়াব সংখ্যা, (৩) পড়ানোব বিষয়।

মাধ্যমিক শিক্ষাব সমস্যা, (১) মাধ্যমিক শিক্ষা আব সহব বা উচ্চশ্রেণীব মধ্যে আবদ্ধ নেই, (২) ছাত্রীদেব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদেব স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রমেব ব্যবস্থা, (৩) ধর্মগত শিক্ষা সমস্যা (৪) বৃত্তি-শিক্ষায় ঔদাসীন্য (৫) শিক্ষাব মানেব অবনয়ন, (৬) শিক্ষিত বেকাব সমস্যা, (৭) শিক্ষকদেব বেতন এবং ইস্কুলেব সাহায্য (৮) সাম্প্রদাযিক ইস্কুলেব সংখ্যা বৃদ্ধি (৯) বিশ্ববিদ্যালয়েব এবং মাধ্যমিক ইস্কুলেব পাঠ্যক্রমেব স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়, (১০) শিক্ষাব মাধ্যম ইস্কুল এবং কলেজে

এ ছাড়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালযেব শিক্ষা এবং শাসনতান্ত্রিক ব্যাপাবে অনেক দুর্ঘটনা তো রইলেই।

অতএব এঁদেব পবিকল্পনা প্রধানত তিনটি খাতে বইল, (১) সন্ধানী কায (২) শাসন কায (৩) পবীক্ষা নিবীক্ষাব কাজ।

জাতীয়তার ভিত্তিতে তাদেব সন্ধান কাযেব মধ্যে এল বয়স্ক শিক্ষা, কায়িক শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ, বৃত্তিগতশিক্ষা, প্রভৃতি। সর্বভারতীয় শিক্ষা সন্ধানের জন্য শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পষদ (Central Advisory Board) ১৯৩৫ সনে পুনবায় গঠিত হ'ল। তাবা প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা প্রভৃতি

সন্ধানের জন্য বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ করলেন। এই সব কমিটির সভ্য প্রধানত এই দেশেরই শিক্ষাবিদ, বিদেশাগত বড বেশি নেই।

শাসনকার্যেও সরকার অনেক রকমের পরিকল্পনা করলেন, আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে নতুন ইস্কুল এল বুনিয়াদি ইস্কুল। বুনিয়াদি শিক্ষা হচ্ছে মহাত্মাগন্ধী উদ্ভাবিত ওয়ার্ধা পরিকল্পনা অনুসারী। প্রদেশের কংগ্রেস সরকার এই নিয়ে পরীক্ষা স্থরু করলেন। এই বুনিয়াদি শিক্ষার তুটি দিক প্রাদেশিক সরকারকে আকৃষ্ট করে, (১) এইরকম শিক্ষায় সরকারের কোন খরচ পডবেনা, (২) পরিবেশগত শিক্ষা পরিকল্পনা বিশেষ ক'রে গ্রামীণ সভ্যতা অনুসারী।

শিক্ষণতত্ত্বের দিক দিয়েও একটি আদর্শ ছিল, এ শিক্ষা কর্মভিত্তিক। স্থতো কেটে, চরকা কেটে, কাপড় বয়ন ক'রে শিক্ষা গ্রহণ করতে করতে ইস্কুলের আয়ও বাডবে ব'লে মনে করা হ'ল। বিরোধী মত যে না ছিল তা নয়; সেইজন্য ডক্টর জাকির হোসেনকে সভপতি ক'রে এর প্রয়োগ এবং প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করতে কমিটি গঠন করা হ'ল। কিন্তু কমিটির সন্ধানে স্বয়ংনিভরতার দিক পরিত্যক্ত হ'য়ে গেল। তা ছাড়া কোন শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে পাঠপরিচালনা করা হবে সে নিয়মও খুব একটা রইল না। জম্মু এবং কাশ্মীরে দেখা গেছে, শ্রীসাইদাইনের পরিকল্পনায় আয় নিভর হস্তশিল্প কেন্দ্রিক বুনিযাদি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ১৯৩৮ সালে, কিন্তু ১৯৫০ সালে শ্রীকাজমী তা নাকচ ক'রে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। পরিবেশগত শিক্ষা, মুখস্থবিদ্যা পরিহার, কায়িক শ্রমে আগ্রহ প্রভৃতি এই বুনিয়াদি শিক্ষার কীর্তি সে বিষয়ে অনেকেই একমত হলেন। মুসলমান সম্প্রদায় কিন্তু বুনিয়াদি শিক্ষা এবং বিদ্যা-মন্দির পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন না। হয়ত রাজনৈতিক কারণ কিছু ছিল। তাব তাঁরা নিখিল ভারত শিক্ষা অধিবেশনে কামাল ইয়ার জঙ্গ কমিটি গঠন ক'রে মুসলিম শিক্ষার পরিকল্পনা করতে চাইলেন। তু বছর কাজ ক'রে তাঁরা সঙ্কল্প উপস্থাপিত করলেন।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থরু হ'ল। কংগ্রেস শাসন পদ থেকে সরে এল। ১৯৪৩ থেকে যুদ্ধের অবস্থা মিত্রসঙ্ঘের পক্ষে একটু ভালো হওয়ায়, যুদ্ধোত্তর কালের নানা পরিকল্পনার মধ্যে ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদ তাঁদের পরিকল্পনা পেশ করলেন। এই পরিকল্পনাকেই বলা হয় সার্জেণ্ট স্কীম

এবং সার্জেণ্ট রিপোর্ট। সার্জেণ্ট সাহেব ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার বা আযোগ কর্তা।

পরিকল্পনার প্রধান নীতি হ'ল, তৎকালের ইংলণ্ডের সমকক্ষ ভারতকে ৪০ বছরের মধ্যে পরিণত করা (৪০ বছরে ইংলণ্ড আর বসে থাকবে না, কাজেই ভারত হয়ত পেছিয়েই থাকবে ৪০ বছরের কাল ব্যবধানে।)।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা :

(ক) প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা—৩ বছর থেকে ৬ বছরের ছেলেমেয়েদের জন্য। এর মধ্যে নার্সারী ইস্কুলও অন্তর্ভুক্ত। পড়াবেন শিক্ষিকারা, তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা নেবেন। এই শিক্ষা অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক যদিও নয় তবু অভিভাবকদের অনুরোধ করা হবে এই শিক্ষা নিতে। আনুষ্ঠানিক পাঠ বর্জন ক'রে বাস্তব এবং সামাজিক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করতে হবে এই সব বিদ্যালয়ে।

(খ) সার্বজনীন, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক প্রাথমিক বা বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। বয়স ৬ থেকে ১৪ বছর, নিম্নবুনিয়াদি ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়ে, উচ্চ বুনিয়াদি ১১ থেকে ১৪।

(গ) নির্বাচিত ছাত্রদের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠকাল ১১ থেকে ১৭ বৎসরের মধ্যে।

(ঘ) তিন বছরের বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রম। কিন্তু বর্তমান 'আই-এ' পরীক্ষার পর নির্বাচিত ছাত্রদের জন্য।

(ঙ) কারিগরী, বাণিজ্যিক এবং শিল্প শিক্ষা— আংশিক বা পূর্ণ সময়ের (part time and full time Students) ছাত্রদের জন্য।

(চ) নিরক্ষরতা দূরীভূত করার জন্য শিক্ষা এবং ২০ বছরের মধ্যে লোক-গ্রন্থাগার প্রবর্তন।

(ছ) শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য উপযুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(জ) বাধ্যতামূলক কায়িক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিদর্শন, চিকিৎসা করা, দুগ্ধ বিতরণ, দুপুরের খাওয়া প্রভৃতি প্রবর্তন।

(ঝ) চাকরীর সন্ধান পর্ষদ স্থাপন,

(ঞ) মানসিক এবং শারীরিক অসুবিধাগ্রস্ত ছেলেদের শিক্ষা

(ট) সামাজিক এবং অনুষ্ঠানগত কার্যক্রম প্রবর্তন।

বুনিয়াদি শিক্ষার কর্মভিত্তিক নীতি তাঁরা অনুমোদন করেন। আরও বলেন, কেবল আঁক কসিয়ে, পড়িয়ে এবং লিখিয়ে কখনও যোগ্য সমাজ-ব্যক্তি করা যায় না। ১৮৮১ সালে তেলাঙ্ এই মত নিয়েই প্রতিবাদ করেছিলেন। তখন তাঁর মত গ্রহণ করা হয়নি, কিন্তু এতদিনে স্বীকার করা হল। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায় বলতে হয়—দেশ বদলে গেলেই মত পালটাতে হয়)। নিম্নবুনিয়াদি স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে হবে, যারা বেশি পড়তে চায় তাদের জন্য উচ্চ বুনিয়াদি।

উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা তারাই পাবে যারা গড়-ছাত্র থেকে ভালো মেধাশক্তির পরিচয় দিয়েছে (হার্টগ কমিটির প্রতিধ্বনি করে শিক্ষা সঙ্কোচ নীতির কথা বলা হল) নির্বাচন করা হবে ১১। বয়সে (শিক্ষা-মনস্তাত্ত্বিকেরা এ বিষয়ে অন্যত্র প্রতিবাদ করেছেন—খাস বিলেতে)।

হিসাব করে দেখা গেছে শতকরা ২০জন নিম্ন বুনিয়াদি থেকে উচ্চ বিদ্যালয়ে যেতে পারবে (পূর্বেই শতকরা হার জানিয়ে দেওয়ার সুবিধা হচ্ছে, বলেই দেওয়া শতকরা ৮০ জনকে অনগ্রসর ছাত্র হিসাবে দাগিয়ে দাও)। উচ্চশ্রেণীতে এসে তারা ৩ বছর অন্তত পড়তে বাধ্য থাকবেই।

উচ্চবিদ্যালয়ের বেতনের হার বাড়ানো হবে (দরিদ্র দেশে এইটি হচ্ছে নির্বাচনের বড় বৈজ্ঞানিক মাপকাঠি। তবে বললেন শতকরা ৫০ জনকে ছাত্রবৃত্তি দিতে হবে, দরিদ্রদের শিক্ষা দারিদ্র্যের জন্যই বাধা পাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু ছাত্রবৃত্তি তো নির্বাচনের পর হবে, এবং সংশয়ের মধ্যে থেকে ভর্তি হবে। অল্প বয়সে দারিদ্র্যের জন্য, বাসস্থানের অভাবে তারা ভালো ফল তো না-ও দেখাতে পারে। বললেন, উচ্চ বিদ্যালয় কোনক্রমেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষায় পরিণত হবে না। এটি স্বয় নির্ভর। খুব মেধাবী যারা তারাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। গড় ছাত্রদের যদি কিছু শিক্ষা অভাব ঘটেই যায় তবে তারা আংশিক সময়ে বা পূর্ণ সময়ের জন্য বৃত্তি শিক্ষার ইস্কুলে ২ ৩ বছর পড়বে ('কোন ক্রমেই' বিশ্ববিদ্যালয় মুখাপেক্ষী হবে না কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা তো আর ভুঁই-ফোড় নয়। তাকে নির্ভর করতেই হয় ইস্কুলের শিক্ষার উপর; হয়ত এঁরা বলতে চান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইস্কুল ধার করবেনা, বিশ্ববিদ্যালয়ই ধার করবে ইস্কুলের কাছে। কিন্তু ইস্কুলের কার্যবিধির মধ্যে একটা ইংরেজি বা আমেরিকার নির্দেশ আছে, Propaedeutic—সে কথার অর্থ কি?)।

বললেন, উচ্চ বিদ্যালয় দুই শ্রেণীর ; (১) তত্ত্ব-বিদ্যা গত (Academic) বা তাত্ত্বিক এবং (২) কর্ম বিদ্যাগত(Technical) বা কার্মিক।

তাত্ত্বিক বিদ্যালয়ে সাহিত্য এবং বিজ্ঞানতথ্য পড়ানো হবে। আর কার্মিক ইস্কুলে ফলিত বিজ্ঞান, শিল্পকারিগরী এবং বাণিজ্যিক বিষয় পড়ানো হবে। এরই নিম্ন শ্রেণীতে বর্তমান মধ্য ইস্কুলের নিয়ম থাকবে তবে এখানে সর্বত্রই মননবিদ্যা (humanities) হবে মূল। পাঠ্যক্রমও বহু বিষয় নিয়ে হবে, ছেলে-মেয়েরা যাতে নিজদের অভিলাষ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী বিষয় নির্ধারণ করতে পারে। মেয়েদের জন্য, শিল্পাঙ্কন, সঙ্গীত, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান থাকবে। গ্রামে কৃষি-বিদ্যা ভিত্তিক পাঠ্যক্রম হবে। সমস্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষাই হবে পড়ার মাধ্যম। কিন্তু ইংরেজি হবে আবশ্যিক দ্বিতীয় ভাষা।

তাত্ত্বিক ইস্কুলে প্রাচীন ভাষা এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং কার্মিক ইস্কুলে বিজ্ঞান-বিষয় বিশেষ করে পড়তে হবে। কর্ম-গত বিষয়ের মধ্যে পড়ছে—কাঠ এবং ধাতুর কাজ, প্রাথমিক যন্ত্রবিজ্ঞান, মাপক-অঙ্কন (Measured drawing), বাণিজ্যিক বিষয়ে—হিসাব শিক্ষা (Book Keeping) সর্টহ্যাণ্ড বা সাঙ্কেতিক লিখন, টাইপরাইটিং বা লেখ্যযন্ত্র ব্যবহার, গণিতকবিদ্যা (Accountancy) প্রভৃতি। আর উভয় ইস্কুলের পাঠ্যক্রমে সমতা থাকবে যে সব বিষয়ে তা হচ্ছে—(১) মাতৃভাষা, (২) ইংরেজি (৩) আধুনিক ভারতীয় ভাষা, (৪) ইতিহাস (পৃথিবীর ও ভারতের) (৫) ভূগোল (পৃথিবীর ও ভারতের) (৬) অঙ্ক, (৭) বিজ্ঞান (৮) অর্থবিজ্ঞান (৯) কৃষি-বিজ্ঞান (১০) অঙ্কন-শিক্ষা (১১) সঙ্গীত, (১২) শারীরিক শিক্ষা। সবাইকেই যে সমস্ত বিষয় পড়তে হবে এমন কোন নিয়ম থাকল না।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বললেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এত অনুত্তীর্ণের সংখ্যা নেই ; কাজেই ভালো করে নির্বাচন ক'রে ভর্তি করা দরকার, (নির্বাচন ক'রে বাদ দেওয়া আর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে বাদ যাওয়ায় মোটের উপর হিসেবে কোথায় 'জাতীয়তার' ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে বোঝা গেল না। ছেলেদের অর্থ অপচয় হচ্ছে যদি ধরা যায় তবে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু শিক্ষা না পেলে যেখানে কাজকর্ম জোটে না—সেখানে এই মূলধন প্রয়োগ রূপ ব্যবসায়িক নীতি তো আসবেই)। তাঁরা ইণ্টারমিডিয়েট বা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের মধ্যশ্রেণী উঠিয়ে দিয়ে উচ্চবিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত করতে বললেন। কিন্তু প্রথম বর্ষ থাকবে উচ্চ বিদ্যালয়ে, দ্বিতীয় বর্ষ যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গে। তিন বছর হবে পাঠকাল ন্যূনপক্ষে। গবেষণার প্রচুর সুযোগ দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য মঞ্জুরী বিভাগ প্রবর্তিত হওয়া উচিত।

কর্মগত এবং বৃত্তিগত শিক্ষা সম্পর্কে ৭টি ভাগ করলেন। সর্বোচ্চ বিদ্যালয়ে গবেষক এবং প্রধান কর্মকর্তা তৈরী করা হবে। এরা আসবে কার্মিক বিদ্যালয় থেকে, তারপর যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ কর্ম-বিদ্যালয়ে। খুব কঠোর নির্বাচন পরীক্ষা থাকবে ভর্তির জন্য।

কার্মিক উচ্চ বিদ্যালয় নিম্নপদের কর্মচারীকে তৈরী করবে (Minor executives, foreman, charge hands etc) এঁদের জাতীয় ডিপ্লোমা, বা সার্টিফিকেট কোর্স পাস করতে হবে।

দক্ষ কারিগরও (Skilled Craftsman) কার্মিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবে। কিন্তু নিয়ম হবে, উচ্চ বুনিয়াদিতে কারিগরি কাজ নিয়ে পড়ার পর তারা নিম্ন কর্মগত বিদ্যালয় বা কারিগরী বিদ্যালয়ে (Industrial Schools) ২-৩ বছর পূর্ণকালীন অধ্যয়ন করবে।

তার নিচের চাকরীতে আসবে সোজাসুজি উচ্চ বুনিয়াদি বা মধ্য ইস্কুল থেকে। এখানে অবশ্য তাদের কারিগরি পাঠ নিতে হবে। এদের জন্য সাধারণ বিষয় পাঠ অব্যাহত রাখতে হবে, উন্নত ধরণের কারিগরী শিক্ষাও দিতে হবে।

সার্জেণ্ট রিপোর্টে আংশিক সময়ের পড়ার ব্যবস্থা বিশেষভাবে অনুমোদন করলেন।

এরপর বয়স্ক শিক্ষা। এখানকার পাঠগ্রহণেচ্ছুদের বয়স হবে ১০ এর উপর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। বিভিন্ন বয়সের জন্য পৃথক পৃথক শ্রেণী থাকবে। দুপুর বেলা ১০ থেকে ১৬ বছরের ছেলেদের জন্য বিদ্যালয় বসবে। মেয়েদের জন্যও পৃথক ব্যবস্থা করা উচিত।

চিত্তাকর্ষক করার জন্য নানা রকম দৃশ্য এবং শ্রব্য এই দুইরকমের যন্ত্র বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত। ছবিও থাকবে। তা ছাড়া থাকবে উপযুক্ত গ্রন্থাগার। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার এ বিষয়ে খুব কাজ দেয়। প্রত্যেক শ্রেণীতে ২৫ জনের বেশী শিক্ষার্থী থাকা উচিত নয়।

শিক্ষক সংখ্যা হিসাবে তাঁরা বললেন, প্রতি ৩০ জন প্রাকবুনিয়াদি এবং নিম্ন বুনিয়াদির জন্য একজন ক'রে শিক্ষক আর প্রতি ২৫ জন উচ্চ বুনিয়াদি বা উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য একজন ক'রে। প্রাকবুনিয়াদির বা নিম্ন বুনিয়াদির শিক্ষকদের উচ্চবিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন ক'রে দু বছরের শিক্ষণ নিতে হবে; এবং উচ্চ বুনিয়াদিতে যেতে হলে ৩ বছরের শিক্ষণ। উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক যারা স্নাতক উত্তীর্ণ নন তাঁদের দু বছরের শিক্ষা এবং স্নাতক হ'লে এক বছরের শিক্ষণ।

মাঝেমাঝে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য পুনরালোচনা মূলক পাঠ-ক্রমের ব্যবস্থা (Refresher courses) থাকবে। তাঁদের বেতনের হারও বৃদ্ধি করতে হবে।

এ ছাড়া অনুমোদন করলেন, ছেলেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা। মানসিক ও শারীরিক বৈকল্যের জন্য অনগ্রসর ছাত্রদের পৃথক বিদ্যালয় হওয়া উচিত। নিয়োগ পর্ষদ স্থাপন করা দরকার এবং অনুষ্ঠান ও সমাজ-গত কার্য পদ্ধতি উদযাপিত করা আবশ্যক। খেলাধূলা কোন্ বয়সের ছেলেদের কেমন হওয়া উচিত, মেয়েদের কেমন হওয়া দরকার সে সব সম্পর্কে এক ফিরিস্তিও দিলেন।

আর থাকল শিক্ষাবিভাগ এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে নানা আলোচনা ও অনুজ্ঞা।

তখন শিক্ষার দরুণ দেশে ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে সরকার ব্যয় করতেন ১৭½ কোটি টাকা। কিন্তু এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হ'লে ১৯৪০ সালের অর্থনীতিক মান অনুযায়ীও বছরে ৩১৩ কোটি টাকা পড়ে ব'লে অনুমান করা হয়। আর যদি লোকসংখ্যা বাড়ে এবং অর্থনীতিক মান বেড়ে যায় তবে ৯০০ কোটি টাকা হওয়াও বিচিত্র নয়। দরিদ্র দেশ এত টাকা ব্যয় করতে পারে না বলে এই পরিকল্পনার বিরোধীদল প্রবল হয়ে দাঁড়াল। তা ছাড়া মনোবৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে তো অনেক আপত্তির আছেই, বিশেষ ক'রে নির্বাচনের ভাঁওতায় শিক্ষার্থীকে বিপর্যস্ত করার কার্যে। আর এ করে কি হবে, না, ১৯৮০ সালের ভারতও ইলংণ্ড থেকে অর্ধশতাব্দী পিছিয়ে থাকবে।

এই জন্যই অনেকে মনে করলেন, আদর্শ কখনও জগতের পক্ষে পরম হতে পারে না, আদর্শ দেশের সমাজ রূপের মুখাপেক্ষী। ইংল্যণ্ডের যে

আদর্শ সে আদর্শ ভারতে চলতে পারে না। ভারতকে আদর্শ করতে হবে কোন এক কৃষি প্রধান দেশকে যেমন চীন, মিশর, তুর্কী, ডেনমার্ক বা সোভিয়েট রুশিয়া। তাই এই নিদেশ এবং সন্ধান ভারতবাসীর খুব মনঃপুত হ'ল না।

তবু আমরা এই সন্ধানী আয়োগের কথা বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত করলাম এই জন্য যে, স্বাধীনোত্তর কালের শিক্ষাপরিক্রমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে তার কোন্‌টি বাদ দিয়েছি, আর কোন্‌টি রেখেছি। একসময় যা আমরা নস্যাৎ করেছিলাম অসম্ভব ব'লে, আমবা নানাপথ ঘুরে সেই দিকেই যাচ্ছি কিনা বোঝা দবকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগের বিবরণী : (১৯৫২-৫৩)

(স্বাধীনতার পব এই কমিশন বসানো হয়। একে মুদালিয়র কামিশনও বলা হয়)। অনেকে বলেন, স্বাধীনতার পব থেকে কর্তৃপক্ষদের মনে ভারতবর্ষের দুটি ভাগই স্বীকৃত, দক্ষিণভারত এবং উত্তর ভারত; তাব মধ্যে আবার হিমালয় নিউ দিল্লী ববাবব একটি রেখা উত্তব-দক্ষিণে টানলে পশ্চিমখণ্ডটুকুই তাঁদের নজরে পড়ে বেশী, এইজন্য বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ যেন তাঁদেব কাছে পরিত্যক্ত। এব একটা বড প্রমাণ হিসাবে তাঁরা দেখান যে, এই আয়োগে বাঙলা দেশেব শিক্ষাবিদের কোন স্থান হলনা; শ্রীযুক্ত বসু নিউ দিল্লীর একটি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজেব অধ্যক্ষ হিসাবেই স্থান পেলেন। এর নাকি কি এক উদ্দেশ্য আছে।

আমরা এরূপ মনে করিনা। মনোবিজ্ঞানে বলে, মানুষের কায মাত্রই উদ্দেশ্য পবিচালিত; তবে তা যে উদ্দেশ্যদুষ্টই হবে তার কোন অর্থ নেই।

কিন্তু অক্সফোর্ড এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আটল্যাণ্টার শিক্ষাবিদদের এই আযোগে স্থান কেন দেওয়া হ'ল তা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

আয়োগের কবণীয় সম্পর্কে যে চারটি নির্দেশ ছিল, তার দুই এবং তিন নম্বরে আছে,

মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত যে সব সমস্যা তার সঙ্গে টেকনিক্যাল বা কারিগরী শিক্ষাকে মিলিযে কোন প্রাথমিক এবং বিশ্ববিদ্যালযের আয়োগ এতাবৎকাল আলোচনা করেননি এবং বর্তমানের মাধ্যমিকশিক্ষা একরোখা কেবল মননবিদ্যার্জনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে বহুবিষয় পডাবার মতো ব্যক্তিগত তারতম্য মেনে শিক্ষাসূচী নিরূপণের চেষ্টা অবান্তর হয়ে গেছে।

এই দুটি কারণই প্রধান। তবে তাঁরা এখানে স্বীকার করেছেন, বহুমুখী পাঠ্যতালিকা সম্বলিত মাধ্যমিক শিক্ষাকে পুনর্বিন্যাস করার প্রয়োজন এইজন্য যে, প্রাথমিক স্তরে ভারতসরকার এবং রাজ্য সরকার বুনিয়াদি শিক্ষাকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন ব'লেই।

বুনিয়াদি শিক্ষার মাথায় হাত রেখে এই যুক্তি জাল তৈবী তত সুবিধের বলে মনে হয় না।

একথা আমাদের স্পষ্ট ক'রে স্বীকার কবতেই হবে যে, যুগের স্বভাবে আমাদের দেশকে শিল্পোন্নত কবতেই হবে। নানা কারণে পশ্চিমের স্বতন্ত্রবাদীদের ব্যবসাযনীতি এবং শিল্পকাবখানা উন্নতির চিন্তা আমাদের আকৃষ্ট করেছে। সমাজ চাইছে আজ কারিগবী শিক্ষা। দেশকে জগতের অন্যান্য দেশের সমকক্ষ ক'বে তুলতে হলে তাদেব অস্ত্র হাতে নিতে হবে— এইই হচ্ছে সহজ পথ। জার্মাণ থেকে ইংল্যাণ্ডে, ইংল্যাণ্ড থেকে ফবাসীদেশে আমেরিকায়, আবাব রুশিয়ায় এবং জাপানে এই ধারা চলেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তারা দেখেছে দেশেব নিরাপত্তার জন্য বৃহৎ এবং প্রধান বস্তুর উৎপাদনের জন্য (heavy Industries) শিল্পকাবখানার প্রসার করা দরকার।

ভারতের পক্ষে সমস্যা হল কেবল সাধারণ শিল্প কারখানা নয় ভারী শিল্প-কারখানার স্তরেই তাকে উঠে আসতে হবে। এই উল্লম্ফন বেঙেব মতো কি ব্যাঘ্রের মতো তা বলা মুস্কিল; কিন্তু এমনি নির্মোক ঘটাতেই হবে একথা মানতে হয়।

তা যদি হয়, তবে ভারতবর্ষ এখন দুটো চরিত্রেব—(১) গণতান্ত্রিক, এবং (২) শিল্পকারখানায় উন্নত হওয়ার অভিলাষী। এই দুইটিকে সফল করতে হলে ভারতবাসীকে প্রধানত দুটি ধারায় শিক্ষা নিতে হবে; গণতান্ত্রিকতা এবং কারিগরী বিদ্যা। অর্থাৎ মননবিদ্যা এবং বিজ্ঞান।

তাই এই আয়োগ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন থেকে যেমন সরে যেতে চায়, তেমনি চায় মহাত্মা গান্ধীর গ্রামকেন্দ্রিক বুনিয়াদি শিক্ষা থেকে। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের উপাসক, যেখানেই সৌন্দর্যের ব্যাঘাত সেখানেই আপত্তি করেছেন; তাই প্রাচীন ভারতের ঔপনিষদিক আদর্শে শিক্ষাকে সাজাতে চেয়েছিলেন, আর গান্ধীজি বাস্তবপন্থী এবং সমাজকর্মী বলে প্রাচীনভারতের পরিবারতন্ত্রের অনুসারী হয়ে বর্তমান সমাজকে গডতে চেয়েছিলেন (এ বিষয়ে আমরা

বিস্তারিত আলোচনা করব ৩য় খণ্ডে)। ঠিক এই কারণেই তাঁরা মাতৃভাষাকেই শিক্ষার একমাত্র বাহন করতে চান।

কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক জগত এখন পৃথিবীর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে বলে সমস্যা দেখা দিল, কি ক'রে একজাতি এক প্রাণ-ই কেবল নয় একভাষা ভাষী করা যায় আর শিল্পে উন্নত করা যায় নিরাপত্তার জন্য। এই জন্যই হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হওয়া দরকার যার সাহায্যে গণতন্ত্রের সেই 'একমনা' ভাবটি রূপায়িত হ'তে পারে আর বিজ্ঞান ও কারিগরীর জন্য জনসমাজকে তৈরী করতে হবে। এই দুটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে গিয়ে অন্যান্য গণতান্ত্রিক আর শিল্পোন্নত দেশ প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা স্বয়ং সম্পূর্ণ করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সঙ্কোচ করতে বাধ্য হয়েছে। এ দেশকেও সেই পথে যেতে হবে। তারজন্য অভিজ্ঞতা দরকার, তাই অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা অক্সফোড এবং আমেরিকা থেকে আনতে বাধ্য হতে হয়।

এই শিক্ষায় দুটি উপন্যাস আছে। একটি হল ভাষাজ্ঞান ব্যতিরেকেও কারিগরী নৈপুণ্য অর্জন করা যায়। আর অপরটি, শিক্ষা ও শিক্ষার্থী নিত্য পরিবর্তনশীল। ত র ফলে পরীক্ষায় আসবে নৈর্বক্তিক পরীক্ষা আর পদ্ধতিতে আসবে চলতি-ধর্ম পদ্ধতি বা ডাইনামিক মেথড্। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কেন মানুষও স্থির নয়; কাজেই তার শিক্ষা স্থির অর্থাৎ বদ্ধ থাকতে পারেনা।

এই অবারণ চলার এক অভিশাপ আছে। সেকথা আচায বিনোবা ভাবে তাঁর 'শিক্ষা বিচার' গ্রন্থে ধরতে চেষ্টা করছেন। সেকথা ইংল্যণ্ড এবং আমেরিকা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে এইভাবে যে সেখানে শিল্পোন্নতি যতইহোক গণতান্ত্রিকতার সুরটি হারিয়ে গেল। তারজন্য সেখানকার শিক্ষাবিদ আবার মন দিয়েছেন কি করে শ্রেণীকক্ষে গোষ্ঠী সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, কি ক'রে সহানুভূতি করুণা প্রভৃতি সৃষ্টি করা যায়। তার পরিণতিতে দেখতে পাই ধর্ম শিক্ষাকে তাঁরা আজ অনুমোদন করছেন। সে প্রসঙ্গ আমরা অন্যত্র আলোচনা করব।

উপরের মানসিক নীতিটি যদি আ। বুঝতে পেরে থাকি তবে এই আয়োগের নির্দেশগুলি না পড়েও আমরা অনুমান করতে পারব—মাধ্যমিক শিক্ষার কিভাবে পুনর্গঠন করতে চান। অবশ্য আমরা অনুমানের পথে না গিয়ে এখন তাঁদের কথাই আলোচনা করব।

এই বিবরণীতে ১৫টি অধ্যায় আছে। ভূমিকা; বর্তমান ব্যবস্থার পরীক্ষা; নতুন শিক্ষা উদ্দেশ্য নির্ধারণ; মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন; ভাষা শিক্ষা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী পড়ানোয় গতিশীল পদ্ধতি ; চরিত্রশিক্ষা ; ইস্কুলেব উপদেশ ও পরিচালনা মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা ; ছাত্রদের স্বাস্থ্যশিক্ষা ; পরীক্ষা পদ্ধতির নতুন মান ; শিক্ষকদের উন্নতি ; প্রশাসনিক সমস্যা ; আর্থিক সংস্থা ; মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে সভ্যদের স্বপ্ন-সার্থকতা।

শিক্ষা সম্পর্কে তো রাজ্যসরকার ভাবে, তবে কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছেন কেন ? সে সম্পর্কে বিবরণীর ৫ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—সমগ্রভাবে ভারতের কৃষ্টি ও কাবিগরী শিক্ষাব যাতে উন্নতি হয় সে সম্পর্কে এই সরকার উদাসীন থাকতে পারেন না ; উত্তম সমাজ-ব্যক্তি যাতে তরুণেরা হয়ে উঠতে পারে সমাজ পুনর্গঠন এবং অর্থনৈতিক উন্নতিতে যাতে তারা সাহায্য কবতে পারে, এব' একথা স্পষ্ট যে মাধ্যমিক বিদ্যালয উত্তীর্ণ ছাত্রেবা যাতে বিভিন্ন কার্যসংস্থাব উপযুক্ত হয তাব সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সবকারকে ভাবতে হবেই। গণতন্ত্র রাষ্ট্র অক্ষুণ্ণ বাখতে হলে শিক্ষিত তরুণদেব দাযিত্ব সম্পন্ন এব' সহযোগী হয়ে সমাজের কার্য পরিকল্পনা কবতে হবে। প্রাদেশিকতা প্রভৃতি দোষ থেকে মক্ত করতে হলে হিন্দী এবং ইংবেজি ভাষা সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা কবতে হবে (পৃষ্ঠা ৬)

প্রচলিত শিক্ষাব দোষ কি ? সে সম্পর্কে ২১ পৃষ্ঠায বিস্তারিত লেখা আছে। প্রথম—ইস্কুল সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, দ্বিতীয—এত সঙ্কীর্ণ যে ছাত্রের সমগ্র ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতা গঠিত হয না, তৃতীয—ইংরেজি ভাষায় দুবল হলে সে জীবনেব মধ্যে অকেজো; চতুর্থ -শিক্ষাপদ্ধতিতে তাদেব স্বাধীন চিন্তাব বিকাশ হয় না, পঞ্চমত—বহু সংখ্যক ছাত্র শ্রেণীতে থাকায় শিক্ষকের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে ছাত্রেরা আসতে পায না ; শেষ—পরীক্ষা নিভর শিক্ষাব যা কিছু দোষ।

এত আযোগ স্থাপন কবা সত্ত্বেও এ দোষ ঘটে গেল কেন ? ১৮৮২ সালের হাণ্টার কমিশন বা আযোগ শিক্ষা সম্পর্কে এত যে বিপ্লবাত্মক নিদেশ দিলেন—দেশ তখন তা স্বীকার করল না কেন ? ১৮৮২ সালের পর ১৮৮৫ অর্থাৎ কংগ্রেসের জন্ম হল। কংগ্রেস এই আন্দোলন কবেনি কেন যে হাণ্টার আয়োগের নিদেশ মান্য কবা হোক! বরং বিপবীত চিন্তা থেকে জাতীয় বিদ্যালযের সূচনা হল। এ সব প্রশ্ন আসতে পারে, তাই বর্তমান আয়োগ বলছেন,

এমন চিন্তা ক'রে কোন প্রয়োজনই সাধন হবে না যে, ১৮৮২ সালের হাণ্টার (কমিশনের) আয়োগের সন্ধানকে যদি বিশেষ উৎসাহ এবং সাহসের

সঙ্গে প্রয়োগ করা যেত তা হলে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্র বিশেষভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, এবং এতটা বিলম্বে এখন বহুমুখী পাঠ্যসূচী, কারিগরী শিক্ষা, কৃষিবিজ্ঞান, বাণিজ্যিক বিষয় প্রভৃতি নতুন ক'রে বলবার প্রয়োজন পড়ত না, ইত্যাদি (পৃষ্ঠা ১৬)। ৪২ পৃষ্ঠায় আবার বলছেন, ১৯৫৩ সনের ভারতের অবস্থা ১৮৮২ সাল থেকে পৃথক নয়। অর্থাৎ হাণ্টার কমিশ্যনর নির্দেশ পালন না করা এখন খুব বুদ্ধির কাজ হয়নি ব'লে এঁরা অনুমান করছেন।

১৮৮২ সালে ফিরে গিয়ে ইংরেজদেব উদ্দেশ্য যদি বুঝতে চেষ্টা করি তবে রাজনৈতিক দিক দিয়ে তারা যে খুব খাঁটি খৃষ্টান ছিল মনে করতে পারিনে। বর্তমানে অনেকে রাষ্ট্রশক্তিকে যদি সেই দোষেই দোষী করতে চায় তবে অসুবিধার কথা।

কিন্তু মানুষের অসুবিধা তো হল। ভাষা দিয়েই দেখা যাক। হিন্দী ভাষা অহিন্দীভাষীদের আবশ্যিক পাঠ্য হল কেন? না, কেন্দ্রীয় সরকার এ ভাষাকে ভারতের সরকারি ভাষা ব'লে গ্রহণ করেছেন। কেন গ্রহণ করেছেন? রাষ্ট্রের ঐক্য সাধনের জন্য। ভাষা দিয়েই ঐক্য গঠন করা যায়? এতে বিরোধ সৃষ্টি হয় না! বিরোধীভাব এসেছিল ইংরেজি ভাষা নিয়ে। মাতৃভাষা না হলে তো যে কোন ভাষাই বিদেশী। তা সে জাহাজেই আসুক আর রেলে চড়েই আসুক।

সাধারণ অথচ মর্যাদা অভিপ্রায়ী লোক আরও অসুবিধে বোধ করে এই বিবরণীর আশু যুক্তি নিয়ে। ৪৭ পৃষ্ঠায় আছে, কারিগরী শিক্ষা যদি ঠিক পথে দেওয়া যায় তবে কারখানার, রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের অনেক খরচ বাঁচবে। কি রকম? দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মোটর গাড়ীর কথা নিয়ে। একটি রাষ্ট্রে মোটর গাড়ীর জন্য বরাদ্দ থাকে ১০০ কোটি টাকা। এই গাড়ী যদি সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয় এবং মেরামত করা হয় তবে দশ বৎসর এর পরমায়ু। তারপর আরও কথা আছে। শেষ কথা হ'ল, ভালো কারিগর থাকলে ২½ কোটি টাকা বাঁচবে। এই টাকার যদি সামান্য অংশও এই কারিগরী শিক্ষায় ব্যয় করা যায় তবে কারখানার এবং রাষ্ট্রের প্রভূত উপকার হয়।

সাধারণ লোকে বলবে গাড়ী কার তা জানিনে, কিন্তু মোটর চালক আর মিস্ত্রী হওয়ার জন্যই কি কারিগরী শিক্ষা! যে কারণে বুনিয়াদি শিক্ষা

অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে অপাংক্তেয় হয়ে রইল, সেই কারণেই এই কারিগরী শিক্ষা মধ্যবিত্তের কাছে গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের এই অনিচ্ছা অকল্যাণকর। শিক্ষা ইতিহাসের ছাত্র জিজ্ঞাসা করবেন, কারিগরী শিক্ষা ঠিকপথে চলেছে অথচ রাষ্ট্রের আয় বাড়েনি কিন্তু বিক্ষোভ জমেছে এমন প্রথমশ্রেণীর দেশ কি দেখা যায় নি!

পাবলিক ইস্কুল সম্পর্কে এই আয়োগ যে যুক্তি দিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৫০-৫১) তাও তেমনি গোঁজামিল গোছের বলে সাধারণ লোক মনে করে।

গণতন্ত্র নির্ভর করে সাধারণের আস্থার উপর। সেই আস্থা ভেঙে গেলে গণতন্ত্রের আত্মা নষ্ট হয়। এই দুর্ঘটনাই ঘটেছে শিল্পকারখানার বিশেষ উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে। আমরা কি সেই পথেই যাব? তাঁরা অনেক ডুব-সাঁতার দিয়ে আজ শ্রেণীকক্ষে সমাজ-সম্পর্কে প্রতিষ্ঠা করতে চান, সফল হননি, আমরা কি সেই ব্যর্থতা ডেকে আনব?

কোন পরিকল্পনাই পঁচিশবছরের বেশি মেযাদ নিয়ে উপস্থাপিত করা যায় না। প্রকৃতির নির্বাচন (Natural Selection) এর কাছে মানুষের বুদ্ধির নির্বাচন (Telic Selection) এইভাবে হার মানে। সে ক্ষেত্রে জনসাধারণ স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার উত্তর কালে সুখের প্রত্যাশা করবেই। এই প্রত্যাশা না মিটাতে পারলে অন্তর্দ্বন্দ্ব আসবেই। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বেই মানুষ নেমে যাবেনা তো!

১৮৮২ থেকে ১৯৫২ কম সময় নয়, ৭০ বছর। ৭০ বছর আগে যা গ্রহণ করেননি মনীষীরা, ৭০ বছর পর তা জনসাধারণ গ্রহণ করতে চাইবেনা।

নতুন শিক্ষা-পরিকল্পনা নিয়ে এইখানেই স্বাধীন ভাবতে বিরোধ ঘটল। অনেক কিছু বৃহৎ ঘটল, কিন্তু দেশের মানুষের মন অনেক ছোট হয়ে গেল। অথচ উপায়ই বা কি? শিল্পকারখানার সঙ্গে গণতন্ত্রের যেমন গূঢ় সম্পর্ক, তেমনি বর্তমান জগতে অর্থসম্পদের সঙ্গে কারিগরী আর বিজ্ঞান শিক্ষার সম্পর্ক। অমিয় চক্রবর্তী যেমন তাঁর কবিতায় বলেছেন, 'ধান করো ধান হবে।' তেমনি বলা যায় 'টাকা করো, টাকা হবে।' টাকা করতে হবে পৃথিবীর চামড়াকে বিদীর্ণ ক'রে। কারখানা আসবে, সম্পদ হবে, সমাজ ভাঙবে, সৌন্দর্য যাবে। হা হুতাশ করলে হবে না।

এই মাধ্যমিক শিক্ষার আয়োগকেও তাই সেই নিয়তিকে স্বীকার করতে হল। এই আয়োগের বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনের পরামর্শ কিছু আমরা তুলে দিচ্ছি।

১। মাধ্যমিক শিক্ষার নতুন ধারায়—প্রাথমিক অথবা নিম্ন বুনিয়াদি শিক্ষার চার বা পাঁচ বছর কাল পর এই শিক্ষা সুরু হবে, এর মধ্যে থাকবে—(ক) মধ্য অথবা উচ্চবুনিয়াদি অথবা নিম্ন-মাধ্যমিকের ৩ বছর এবং (খ) ৪ বছরের উচ্চতর মাধ্যমিকের শিক্ষা।

২) অন্তবর্তী কালে প্রচলিত উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমি বিদ্যালয় নির্দিষ্ট প্রণালীতে কাজ করতে থাকবে।

৩) কলেজের মধ্যবর্তী কালের এক বছর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪) প্রথম স্নাতক পাঠকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ বছরের হবে। (৫।৬।৭ ধারা কলেজ সংক্রান্ত)।

৮। সামর্থ্য, প্রবণতা প্রভৃতি অনুসরণ করে বহুমুখী পাঠ্যতালিকা নিয়ে বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে যাতে তাদের আগ্রহ লক্ষ্য ক'রে তারা পড়তে পায়।

১০। সমগ্র রাজ্যই যেন কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রামের ইস্কুলে করে; এর মধ্যে পশুপালন, এবং উদ্যানবিদ্যা (horticultures) প্রভৃতিও থাকে। (১১ থেকে ২২ ধারা পর্যন্ত কারিগরী শিক্ষা ও পাবলিক ইস্কুল প্রভৃতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ২৩ থেকে ২৫ পর্যন্ত ধারার সহশিক্ষা সংক্রান্ত)। পাঠ্যসূচী প্রসঙ্গে জানালেন,

ক। মধ্য ইস্কুলের স্তরে পাঠ্যসূচী হবে, (১) ভাষাগোষ্ঠী, (২) সমাজ পাঠ বা বিদ্যা, ৩) সাধারণ বিজ্ঞান (৪) অঙ্ক, (৫) চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত, (৬) হস্তশিল্প, ৭) শরীর শিক্ষা

খ। উচ্চ এবং উচ্চতর স্তরে ভিন্নমুখী পাঠ তালিকা থাকবে।

গ। তবে সাধারণ বিষয় সবারই পড়তে হবে, এগুলির মধ্যে—(১) ভাষাবর্গ (২) সাধারণ বিজ্ঞান, (৩, সমাজ-পাঠ বা ৪) হস্তশিল্প।

ঘ। ভিন্নমুখী পাঠ্যসূচী ৭ বর্গ, (১) মননবিদ্যা, (২) বিজ্ঞান, (৩) কারিগরী বিষয়, (৪) বাণিজ্যিক বিষয়, (৫) কৃষিবিদ্যা, (৬) অঙ্কন বিদ্যা (৭) গাহস্থ্য বিজ্ঞান।

প্রয়োজন হলে নতুন বিষয়ও প্রবিষ্ট করানো যেতে পারে।

ঙ) উচ্চ বা উচ্চতর বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে এই ভিন্নমুখী পাঠ্য-তালিকা চলতে থাকবে।

নিয়মানুবর্তিতার জন্য চরিত্র গঠন শিক্ষা অধ্যায়ে তাঁরা যা বললেন তার সারাংশ হচ্ছে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে একটি নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠে এমন ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের মধ্যে স্বয়ংশাসন প্রথা প্রবর্তিত করা; ১৭ বছরের কম বয়সের ছেলেদের যাতে রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত না করা হয় সে সম্পর্কে বিধান রচনা করা, ঐচ্ছিক হিসাবে ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে দেওয়া; অনুষ্ঠানগত কার্যক্রম প্রসার করা।

(কিন্তু এই অনুষ্ঠান-গত কার্যক্রমে নাগরিক ব্যবস্থা এবং সামরিকতার স্তর কেন যেন বেশি)।

পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বললেন, বহির্বৃত্তিক পরীক্ষা কমিয়ে আভ্যন্তরীণ নানাবিধ পরীক্ষা প্রবর্তিত করতে হবে, রচনাগত পরীক্ষার বদলে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, প্রতি ছেলের যাতে সমস্ত দিক পরীক্ষা করা যায় তার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রাখতে হবে, কম্পার্টমেণ্টাল বা অকৃতকার্য ছেলেদের জন্য পৃথক পরীক্ষা নিতে হবে।

এমনিক'রে বিভিন্ন অধ্যায়ে সুচিন্তিত মত তারা দিয়েছেন। শিক্ষা-বিশেষজ্ঞের নিকট এগুলির অনেক কিছু নতুন ব'ল মনে না হতে পারে, কিন্তু শিক্ষার আয়োগ হিসাবে সমাজকর্তারা সমাজের যেরূপটি স্বীকার করেছেন সেই রূপটি সার্থক করবার জন্য তাদের জ্ঞাত বিষয়ই জানিয়েছেন।

ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে তারা বিভিন্ন রকমের শিক্ষাকর প্রবর্তন করতে বলেন, এবং রাজ্য ও কেন্দ্রিয় সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা উচিত ব'লে উল্লেখ করেন (একথাটি সংবিধানেও উল্লিখিত আছে)। পাবলিক ইস্কুলের ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে অনেক স্ববিরোধী উক্তি আছে কিন্তু গণতন্ত্রে কোন শ্রেণীর লোককেই অবজ্ঞা করেনা সেইদিক দিয়ে ধনীদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা না রাখা অদূরদর্শিতা হত।

সংশয়বাদীরা বলবেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার না হয় সহযোগিতা করবেন, কিন্তু টাকা থাকলে তবেই না সহযোগিতা করা যায়।

এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার সঙ্গে এই আয়োগের তুলনা চলেনা। কারণ, শিল্পকারখানার সমৃদ্ধিতে যদি দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটেই তবে দেশের অর্থের অনটন থাকে না। ইংরেজ আমলে তেমন সমৃদ্ধি প্রত্যাশা করা বাতুলতা ছিল। স্বাধীনদেশের পক্ষে সে সন্দেহ থাকতে পারেনা।

এই আয়োগের অনেক পূর্বে শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অনাথ নাথ বসু মহাশয় তাঁর গ্রন্থে এই কথাটিই বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন,

"এইদেশে কাজের অভাব ভয়ঙ্কর বেশি। শিল্পকারখানা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যিক সংস্থার সামগ্রিক উন্নতির উপরই নির্ভর করে লোকের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতি; সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার উপরই যুক্ত কাজের সংখ্যা। ভারতে যে বেকার সমস্যা আছে তার কারণ বাণিজ্য এবং কারিগরীশিল্প ঠিকমতো বিস্তৃত হয়নি, এবং এই অবস্থার কারণ যতটা অর্থনৈতিক নয় তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। কারিগরি এবং বাণিজ্যিক শিক্ষাদ্বারা কখনও কর্মসংস্থার উন্নতি হয় না. (Technical or commercial education by itself does not and cannot create new avenues of employment)। অন্যপক্ষে আমরা দেখেছি যে রাশিয়াতে বড় বড় আকারের কলকারখানা বেড়ে উঠেছে, কারিগরী শিক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবার পূর্বেই। কাজেই শেষ পর্যন্ত এই কথা দাঁড়ায়, বেকারসমস্যা নির্ঘাৎ রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যাপার। শিক্ষাগত সমস্যা নয়। এই সমস্যাকে সমাধান করতে হবে রাজনৈতিক-অর্থ-নৈতিক স্তর থেকেই।" (A. N. Basu—Education in Modern India, Orient Book company, Calcutta 1947, Page 108-109)। তিনি ঐ গ্রন্থেই সেইজন্য বলেছেন, যতযাই বলুন আমাদের শিক্ষা সমস্যা রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা; সে রকম করলে আমাদের আলোচনা অবাস্তব হয়ে পড়বে, (After all, our educational problems cannot be dissociated from politics; to do that would only make our discussions unreal. Page 109)।

বর্তমানকালে, স্বাধীনোত্তর কালে, আমরা শিক্ষার সঙ্গে রাজনীতি যোগ করবার প্রয়োজন দেখিনা। আমরা দেখব এখন সমাজনীতির সঙ্গে শিক্ষাকে বিচার করে। বর্তমান শিক্ষা আয়োগ সম্পর্কে আমাদের সেই সমাজনীতি বা সমাজতত্ত্ব নিয়েই বিরোধ আছে।

সমাজতাত্ত্বিক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ভারতের এই সমাজব্যবস্থার কথা নিয়ে একসময় বিচার করেছিলেন (বিশ্বভারত; শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান বুকক্লাব লিমিটেড, সন ১৩৩০ সাল)। "Decentralisation commission এর উপদেশ সত্বেও, বিভিন্ন প্রদেশে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন বিলপাশ হইলেও আমার মনে হয় দেশের পুরাতন ও স্বাভাবিক গ্রাম্য ও জাতি সমূহ

শাসনের কিছুই সদ্ব্যবহার হয় নাই। আর প্রজাতন্ত্রের এই দুর্দিনে, এই বিপরীত দলবিরোধের যুগে যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটা বিশিষ্টতা আছে, তাহা বুঝিলে শুধু যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান জাতীয়ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারিব তাহা নহে, পাশ্চাত্যের প্রজাতন্ত্রে যে শ্রেণীবিরোধ রুশিয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের সহিত প্রবলভাবে এখন জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারও একটা মীমাংসা দেখাইতে পারিব। আমাদের গ্রাম্য সভা সমুদায়ের সম্মিলন ও সমবায়ে এমন একটা (Peasant Democracy) গড়িয়া উঠিতে পারে যাহা আমাদিগকে মণ্টেগু প্রচারিত বিদেশী প্রজাতন্ত্রের কৃত্রিমতা হইতে শুধু রক্ষা করিবে নহে, ইহা রাষ্ট্রীয়জীবনে বিরোধের পরিবর্তে মিলন, হিংসার পরিবর্তে মৈত্রীর বাণী বহন করিয়া জগতেরও কল্যাণ আনিয়া দিবে (পৃষ্ঠা ২৭৪)।"

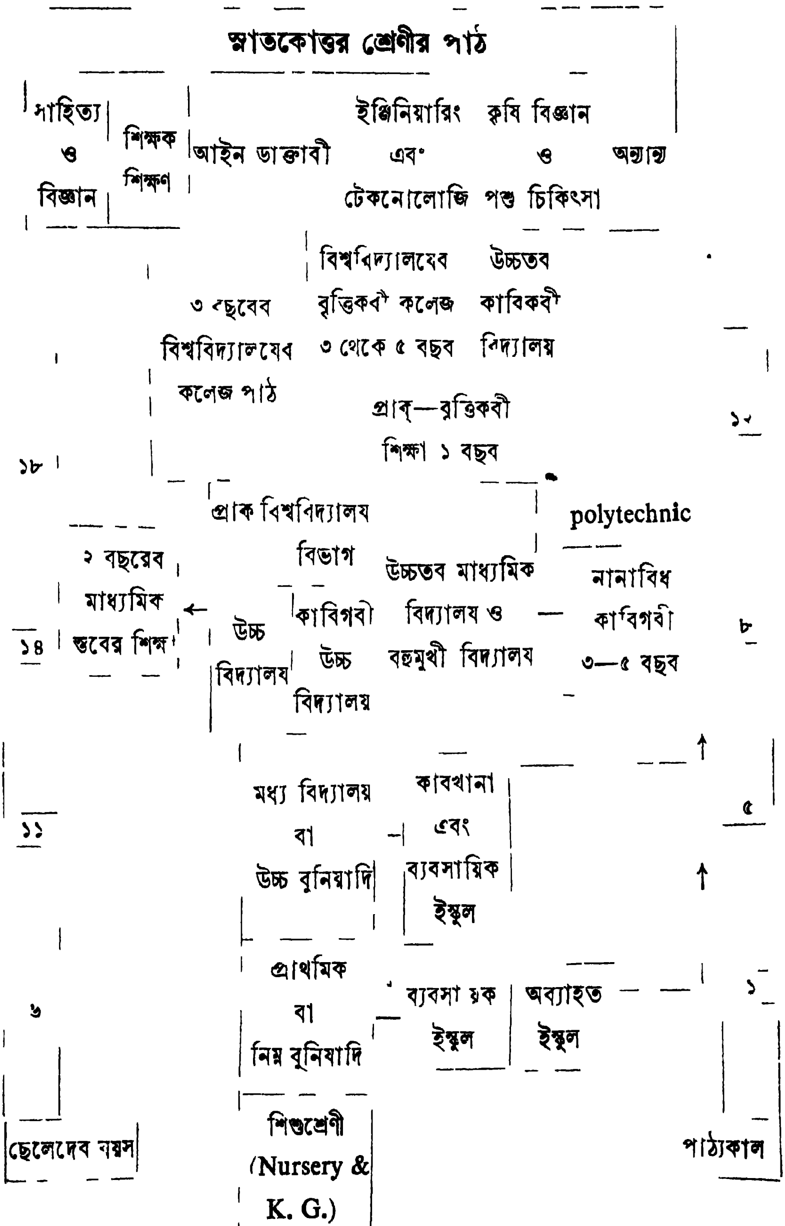
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষের প্রাচীন সমূহতন্ত্রের মধ্যে জগতের কল্যাণ রাষ্ট্রের রূপ দেখতে পেয়েছেন। এই সমূহতন্ত্রই রুশিয়ায় চীনে জাপানে আছে ব'লে তিনি প্রমাণ করেছেন। তিনি আলোচনা করেছেন—রুশিয়ার রাষ্ট্র গঠন এই কৃষকসমূহতন্ত্র নিয়েই পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে পৃথক হয়ে গেল। বঙ্গাব্দ ১৩৩০ অর্থ আনুমানিক ইংরেজি ১৯২৪, সেই সময়ে তিনি যা অনুভব করেছেন ১৯৬০ সালে জয়প্রকাশ নারায়ণও সেই কথাই বলতে চান, আচার্য বিনোবা ভাবেও সেই দর্শনে পৌঁছেছেন।

কাজেই কথাটা ভাবনার হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'গণতন্ত্র এবং শিল্পোন্নত' এই দুটো কথা একসঙ্গে সার্থক করা আলোচ্য আয়োগের সন্ধান দ্বারা হতে পারে না। ইংরেজের রাজনীতির পাশ থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি বলেই কলকারখানা বৃদ্ধি করলে দেশে সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীতি আসবে তা বোধ হয় ঠিক নয়। কল্যাণ রাষ্ট্র হতে গেলে মানুষের যাতে কল্যাণ হয় সেই ব্যবস্থাই করতে হয়। সম্পদ কর্ষণ করলেই মানবিক কল্যাণ সাধন হয় এমন কথা বলা যায় না। দারিদ্র বহু ক্ষতি করে, কিন্তু বিত্ত যে জগতের কেবল ভালোই করেছে এমন কথা ভাবা উচিত নয়।

১৯৫২ সালের আয়োগ রাষ্ট্রনায়কদের সমাজভিত্তির এই সন্ধান দিতে পারে নি; শুধু আত্মসমর্পণ করেছে। এই জন্য এই সন্ধান মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার মতো জাতীয় শিক্ষায় না হয়ে রাষ্ট্রীয় শিক্ষায় অবসিত হল।

তবু একথা ভুললে চলবে না যে এই আয়োগই প্রথম ভারতের এতাবৎ-

কালের আগোছালো ইস্কুলব্যবস্থাকে গুছিয়ে আনতে পেরেছে। এই সংগঠন রূপটি উপলব্ধি করবার জন্য আমরা তাঁদের ছবিটি তুলে দিচ্ছি :



বুনিয়াদি শিক্ষা :

জাতির প্রত্যেকটি ব্যক্তির সঙ্গে যিনি নিজকে অভেদ ক'রে ফেলেছিলেন তিনিই এই শিক্ষাব্যবস্থার কথা বিপ্লবের সুরে প্রথম বলেন। ইনি মহাত্মা গান্ধী।

হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজীর ছোট্ট একটা প্রবন্ধ (১৯৩৭ সালের জুলাইতে)। "সমগ্র জাতি হিসাবে শিক্ষার দিক দিয়ে আমরা এত পিছিয়ে যে, শুধু টাকার উপরই যদি শিক্ষা নির্ভর করে তা'হলে এই পুরুষে শিক্ষার দিক দিয়ে জাতির কোন ঋণ আমরা পরিশোধ ক'রে উঠতে পারব না। এই গঠন কাযে আমাকে অমিত সাহস সঞ্চয় ক'রে এমন কি নিজের মর্যাদাও যদি বলি দিতে হয় তা করেও আমি এগিয়ে এসে বলতে বাধ্য হব যে, শিক্ষা হবে স্বয়ং নির্ভর।

শিক্ষা বলতে আমি বুঝি শিশু তথা মানুষের শরীর, মন এবং আত্মার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। অক্ষর জ্ঞান শিক্ষায় সুরুও নয়, শেষও নয়; এ হচ্ছে একটা মাত্র পথ যাতে নরনারী শিক্ষিত হতে পাবে। নতুবা, অক্ষর জ্ঞান ব্যাপারটিই শিক্ষা নয়। আমি শিশুর শিক্ষা সুরু করব প্রয়োজনীয় হস্তশিল্প মাধ্যমে, এবং শিক্ষার গোড়াতেই যাতে সে একাজ করতে পারে তার চেষ্টা করব।...কিন্তু হস্তশিল্প বুদ্ধিবিবর্জিত ক'রে শিক্ষা দেওয়া হবে না, বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করে শিক্ষা দিতে হবে, শিশু জানবে এই পদ্ধতির সমস্ত কার্য-কারণ যোগ।"

তাঁর পরিকল্পনা হল, সুতো কাটা এবং কাপড় বোনানো প্রভৃতি হস্তশিল্পের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে পারলে সুদূর প্রসারী নীরব বিপ্লব ঘটবে। সহর এবং গ্রামের সম্পর্ক নৈতিক শক্তির উপর দাঁড়াবে; এতে সামাজিক নিরপত্তার বিপক্ষে যত রকম পাপ আছে এবং শ্রেণীবৈষম্যের যে বিষ বাষ্প জমে আছে তা দূরীভূত হ'বে। গ্রামের অবক্ষয় কমে যাবে এবং উচিত সমাজব্যবস্থার মধ্যদিয়ে অস্বাভাবিক বিভাগ, সেই সঙ্গতিসম্পন্ন আর অভাবক্লিষ্ট আর থাকবে না, প্রত্যেকেই বাঁচবার মতো জীবিকা অর্জন করতে পারবে, স্বাধীনতার স্বীকৃতি পাবে। কোন রকম রক্তক্ষয় ব্যতিরেকে কিংবা ভারতের মতো মহাদেশকে যন্ত্রশিল্পে উন্নত করতে বিরাট মূলধনের ব্যবস্থা বাদ দিয়েই দেশের এই উপকার সাধিত হতে পারবে।...সর্বশেষে বিশেষ প্রতিভা ব্যতীত জনসাধারণের ভাগ্য পরিবর্তন জনসাধারণই করতে পারবে।"

তাঁর এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় বুনিয়াদি শিক্ষা তিনি কাদের জন্য করতে চান। যে কোন কারণেই হোক ভারতবর্ষে প্রধানত দু ধরণের লোক তৈরী হয়ে পড়েছে; শিক্ষিত ও অশিক্ষিত। যাদের আর্থিক সংস্থা আছে তারাই শিক্ষা দীক্ষা পাচ্ছে এইটিই সাধারণ নিয়ম। শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে তারা যে কেবল অর্থের দিক দিয়েই বেঁচে থাকছে তা নয়, প্রভুত্বের যে সুযোগ তা তাদের এসে যাচ্ছে।

প্রাচীনভারতেব ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা যে প্রভুত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ইংরেজ তাদের সরিয়ে নতুন আর একদলকে সেই সুযোগ দিল। যেন একটি চাকার গায়ে একটি মাত্র দড়ি ঘুরিয়ে দেওয়া হল। একদিক যেমন নামবে আর এক দিক উঠবে।

সামাজিক মর্যাদার দিক বিচাব করলে ভারতের অধিবাসীর (অর্থাৎ সেই একটি দড়িব) মাত্র দুটো গতি কিন্তু যুগপৎ একের ভাগ্যেই ঘটবে না। এই অবস্থাকেই তিনি বদলে দিতে চাইলেন। দূরদর্শী এই সমাজকর্মী জানতেন এই কাজ কত বিপজ্জনক, তাই একে বিপ্লব আখ্যা দিয়েছিলেন। যে চিন্তান্তর থেকে এই শিক্ষা সংস্কারের সৃষ্টি সেই চিন্তান্তরে দেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ সহরবাসীব কথা ছিল না। সে চিন্তার পিছনে ছিল তাঁর ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে সুচিন্তিত সংস্কার যে, ভারত গ্রামীণ সভ্যতায় দৃঢ় এবং জীবন্ত; আর ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাবতবাসীর অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানরাজ্যে তুলে আনবার অদম্য ইচ্ছা জাতীয়তা আর মানবিকতা এই দুটি সূত্র তাঁর মধ্যে এক হয়ে গেল।

কিন্তু ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত নতুন মানুষ এই বিপ্লবকে সহরবাসীর মধ্যে এনে তাকে অপদস্থ করল, তারা পিছনের মনোবিজ্ঞান নিয়ে, থর্ণডাইক আর স্পিয়ারম্যানের সূত্র নিয়ে নাজেহাল করে দিল। যেটুকু বাকি থাকল তা আড়ম্বর দিয়ে পোষাকী করতে গিয়ে অবহেলার ক'রে দিল। ভারতে গ্রামীণ সভ্যতার প্রতিষ্ঠা হল না, বিদেশের আমদানী থাকল, যন্ত্রশিল্পে উন্নত করবার জন্য বহু মূলধন নিয়োগই করা হল।

যাই হোক, নানা প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীদের নিয়ে (কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের) একটি বৈঠক বসল ১৯৩৭ সালের আক্টোবরে ওয়ার্ধায়।

সেখানে এই নঈতালিমের প্রধান সূত্রগুলি স্বীকৃত হল। একটি পরীক্ষা-

মূলকভাবে পাঠ্যসূচী বা কার্যক্রম তৈরী হ'ল; সেইটি ১৯৩৮ সালের ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয়।

১৯৩৯ এর এপ্রিল ওয়ার্ধায় এই বুনিয়াদি বিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর অন্যান্য প্রদেশে। অক্টোবরের মধ্যে ভারতে ২৪৭টি বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং ১৪টি শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

পুণা সহরে অক্টোবর মাসে আর একটি বৈঠক বসে। কিন্তু তখন অন্যায়ভাবে যুদ্ধে জড়িত করার দরুণ জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন সুরু ক'রে দিয়েছে। তবু ১৯৪১ সালে জামিয়া নগরে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে একটি অধিবেশন বসে।

অধিবেশন থাকুক। আমরা একটু ভিতরের কথায় আসি। এই সময়ে বুনিয়াদি বিদ্যালয় বিভিন্ন প্রদেশে 'কালগ্রাসে পতিত হইতে থাকিল।' সরকারী বিজ্ঞপ্তির বলে উড়িষ্যা এবং মাদ্রাজে এই শিক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। বোম্বাই সরকার ইতস্ততের মধ্যে। অন্ধ্রপ্রদেশের জাতীয় কলাশালা (মসলীপত্তমে) টাকার অভাবে এবং লোকের সমর্থনের অভাবে বন্ধ হযে গেল। বিহার সরকার ২৭টি বিদ্যালয় নিযে টালবাহানা করতে করতে বলল—'বোধ হয় ভালোই হবে।' প্রশ্ন এই, এই দুদশা ঘটল কেন? এই শিক্ষা সরকারী সাহায্যের পবোয়া করেনা, ব্যয়বাহুল্য নেই, স্বয়ংনির্ভর, গ্রাম-কেন্দ্রিক। তবে? লোকের পৃষ্ঠপোষণার অভাবে অন্ধ্রের বিদ্যালয়টি বন্ধ হয় কেন? এরা কোন্ লোক?

সমাজের সেই দ্বিধা। খানটুক গ্রামীণ ভারত খানটুক ইংল্যণ্ডীয় ভারত পাশাপাশি থাকতে পারে না। গ্রামের লোক হস্তশিল্প চায়, তারা হস্তশিল্প শিখতে শিক্ষা চায় না; তারা শিক্ষা চায় যাতে নতুন মর্যাদা প্রাপ্ত হতে পারে সেই ভরসায়। সেই শিক্ষার সঙ্গে যখন সহরের শিক্ষার পার্থক্য দেখে তখন আসে তাদের ঔদাসীন্য। ইংলণ্ডীয় ভারত বুনিয়াদি শিক্ষা চাইতে পারেনা, গ্রাম চাইতে পারে না। এই যে দ্বিধা একে অপসারণ করতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রীয় শক্তি। জগতে অন্যান্য দেশে নতুন হোক পুরানো হোক সেই ভাবেই সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে।

ইংরেজের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি অবিলম্বে ভারতবাসীর হাতে আসা উচিত এই বুনিয়াদি বিপ্লবকে সার্থক করতে হলে।

১৯৪৫ সালের বক্তৃতায় (সেবাগ্রামে) মহাত্মাজী নতুন প্রেরণা আনতে চেষ্টা

করলেন; ধর্মের মতো একটি নতুন বিশ্বাস তিনি সৃষ্টি করতে চান।

দার্শনিকেরা বলেন, এই বিশ্বাসের উপরই সত্য-মিথ্যা দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু এই বিশ্বাস গ্রহণের পরিণামে নঈতালিম শিক্ষাসূচীর যে বিস্ময় আমরা দেখতে পাচ্ছি—যাতে বলা হল 'সমগ্রজীবনে জীবনের জন্যই শিক্ষাকে ব্যাপক করতে হবে' কিংবা—বয়স্কশিক্ষা, প্রাক্ বুনিয়াদি শিক্ষণ, বুনিয়াদি এবং উত্তর বুনিয়াদি শিক্ষার বিপুল কলেবর দেখলাম সেই বিস্ময় থেকেই প্রমাণ করে ঐ বিশ্বাস মিথ্যা। ইংরেজি শিক্ষায় আর চাকুরীর সুযোগে, বাবুগিরিতে আর আধিপত্য বিস্তারে, আইনের গণতন্ত্রে আর নাগরিকতায় আমরা স্নায়ু ও পেশীতে যে বিশ্বাসের লক্ষণ এবং মাপ এ তাবৎকাল নিয়েছি তাতে আমরা চলার পথে হোঁচট খেলাম, বুনিয়াদি শিক্ষা ব্যর্থ করে দিলাম।

পরবর্তীকালে ১৯৩৮এর কার্যসূচীকে সম্প্রসারিত ক'রে যে সব উদ্দেশ্য ও কার্যপন্থা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলি বুদ্ধিমান পাঠক একবার পরীক্ষা করলেই বুঝবেন ইংরেজ-নগরের শিক্ষার সঙ্গে তাকে এক করবার আপ্রাণ চেষ্টা আছে। সাফাই বোনাই কাতাই বাদ দিলে সাধারণ ইস্কুলের পাঠ্যতালিকাব সঙ্গে তার বিশেষ তফাৎ থাকে না। গান্ধীজি ১৯৪৮ সালেব ১৪ই ডিসেম্বরে নঈ তালিম সম্পর্কে যা বললেন তাতে 'হস্তশিল্পের' লক্ষণটিও আর প্রাধান্য পায় না (শেষদিন পর্যন্ত তবু তিনি গ্রাম সম্পর্কেই ভেবেছেন)। ১৯৫২ সালেব শিক্ষা-আয়োগ শিক্ষার যে সিঁড়ি দিয়েছেন, তাতে মনে হয় বুনিয়াদি নামে এক-প্রকারের বিদ্যালয় যখন চলে আসছে তখন, তাকে আর উঠিয়ে দরকার নেই তাকেও রাখা যাক। গ্রাম বা সমাজ সম্পর্কে আর ভাবনার কথা ওঠেনা। এইজন্যই বিনোবাভাবে তাঁব শিক্ষাবিচার গ্রন্থে (অনুবাদ রণেন্দ্রকুমাব দাস ১৯৫৮) বলেছেন, "বহুবৎসর ধরে লক্ষ্য করছি যে, নঈ-তালিমেব প্রয়োজনীয়তা অংশত স্বীকার করতে ইষ্টের চেয়ে অনিষ্টই বেশী হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার নঈ-তালিমের ব্যাপক প্রয়োগ করছে। ফলে সবত্র নঈ-তালিমের ব্যর্থ অনুকরণ হচ্ছে। কারণ, নঈ-তালিমের পশ্চাতে যে জীবন-দর্শন রয়েছে, তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করে নঈ-তালিমের কোন কোন অঙ্গ প্রয়োগ করাতে এর বিকৃত অনুকরণ মাত্র হচ্ছে।…যে সকল প্রাদেশিক সরকার নঈ-তালিমের প্রয়োগ করছে তাদের মধ্যে বিহার প্রদেশের কাজই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই বিহারেই আমি নঈ-তালিমের যে দশা দেখেছি, তাতে সন্দেহ হয় নঈ-তালিমকে ধ্বংস করার চেষ্টাই হচ্ছে (পৃষ্ঠা ১৬৯)।"

স্বাধীনতার পরে

১৯৪৭ সালের পর আজ প্রায় ১৫ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলল। এর মধ্যে ভারত শিক্ষাবিষয়ে নানা পরিকল্পনা নিয়েছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা পড়ছি।

এখন পযন্ত শিক্ষা ব্যাপারে সম্প্রসারণের যুগ চলছে। অসম্ভব দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটেছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সমস্ত ব্যাপারে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। এখন পর্যন্ত বিভাগের পর বিভাগ বিস্তৃতি লাভ করছে। কিন্তু শিক্ষার গুণগত বিচারে আমরা যে কোথায় দাঁড়াব তা এখনও ঠিক ক'রে বলবার সময় আসে নি। গণতান্ত্রিক দেশ আমাদের। শুধু গণতান্ত্রিক দেশ নয় শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ হতেও চলেছে। সমাজের চরিত্র এই দুটি দিক জগতের অন্য যে-দেশের সঙ্গে মেলে তারই অনুরূপ কাযক্রম অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছে ভারতবর্ষ। অন্ধ অনুকরণ যাতে না হয় তার জন্যই গবেষণা এবং সন্ধানী কায।

এই শিক্ষা ব্যাপারে অনেকাংশ আমেরিকার সঙ্গে মেলে, কিছু ইংলণ্ডেরও। 'চাকার মধ্যে চাকা' যদি না থেকে থাকে তবে মনে হয় সন্ধানী কায দিয়ে আমরা আমাদের দেশের নিজস্ব চরিত্র খুঁজে পেতে পারব।

তবে কোন রকম উপসংহার না টেনে আমরা গত চৌদ্দ বছরের শিক্ষার একটি মোটামুটি হিসাব দিতে চেষ্টা করি।

প্রাথমিক শিক্ষা :

প্রাথমিক শিক্ষা কথাটির দুটি অর্থ আছে। ব্যবহারত প্রথম শ্রেণী হ'তে পঞ্চম শ্রেণীর বিদ্যালয়কে প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যালয় বলা হয়। তবে সমস্ত রাজ্যেই এক রকম নিয়ম নয়। পশ্চিমবঙ্গে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অর্থাৎ বয়স ৬ থেকে ১০ বা ১১ বৎসর শিশুর শিক্ষালয়কে প্রাথমিক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে; উড়িষ্যায় ছ'টি ছিল, এখন ৫টি; পশ্চিম মহারাষ্ট্রে প্রথম চারটি শ্রেণীকে বলা হয়।

অন্য আর একটি অর্থও আছে যা সংগঠন বিধির ৪৫ ধারাতে মেনে নেওয়া হয়েছে।

একে ইংরেজিতে বলে 'এলিমেণ্টারী এডুকেসন'।

তাহলে আমরা প্রথম অর্থে বলতে পারি ছেলেমেয়েদের প্রথম বয়সের শিক্ষা আর দ্বিতীয় অর্থে বলব, সমাজ-ব্যক্তির প্রথম স্তরের শিক্ষা।

প্রথম স্তরের শিক্ষার মধ্যে পড়ল (১) ৬ থেকে ১০ বৎসর বয়স অর্থাৎ প্রথম বয়সের শিক্ষা, আর (২) ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের শিক্ষা বা নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা।'

এই দুই ধরণের বিদ্যালয়ের নানা নাম আছে যেমন নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক বা মধ্য বিদ্যালয় বা নিম্ন মাধ্যমিক।

জাতীয় পরিকল্পনায় কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বলতে জাতির প্রথম স্তরের শিক্ষাকেই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ ৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের শিক্ষাকেই অবৈতনিক এবং আবশ্যিক করার কথা।

প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করবার আন্দোলন আজকের নয়। বলতে গেলে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম এ্যাডামের কথাতেই এর আভাস পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক গ্রামকে বাধ্য করতে হবে বিদ্যালয় পরিচালনা করবার জন্য।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের রেভিন্যু সার্ভে কমিশনার ক্যাপ্টেন উইঙ্গেট কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য, আবশ্যিক শিক্ষার জন্য, শতকরা ৫৲ টাকা শিক্ষাকর বসাবার প্রস্তাব করেছিলেন। ঐ সময়েই গুজরাতের শিক্ষা পরিদর্শক হোপ সাহেব (T. C. Hope) প্রস্তাব করলেন, এমন একটি আইন করা হোক যাতে অধিবাসীরা নিজেদের উপর কর ধার্য করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ১৮৮৭ সালে ভরুচের সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক শ্রীশাস্ত্রী প্রাথমিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন।

জাতীয় জীবনে বিভিন্ন মনীষী বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীতে পত্রাবলীতে অসহিষ্ণু এবং উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষা সম্পর্কে। তবে তিনি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তেমন না বললেও তিনিই প্রথম গণশিক্ষার কথা তোলেন। গণশিক্ষাই হোক আর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাই হোক, আসল কথা তো দেশ থেকে অশিক্ষাকে দূর করা।

বোম্বাই প্রদেশ এ বিষয়ে অগ্রণী বলা যায়। স্যার রহিমতুল্লা আর স্যার

শীতলবাদের প্রচেষ্টায় সেই প্রদেশের সরকার ১৯০৬ সালে বোম্বাই সহরে এই শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য কমিটি নিযুক্ত করলেন। কমিটির মন্তব্য বিরুদ্ধে গেল।

এদিকে বরোদার গাইকোযাড তাঁর আম্রেলি তালুকে ১৮৯৩ সালে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করলেন। ১৯০৬ সালে তাঁর সমগ্র রাজ্যেই এই ব্যবস্থা চালু হল। তখন বোধ হয় বরোদার গাইকোয়াড মহরাজ সযাজিরাও।

১৯১০ সালে গোখেল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেচারে (১৯২১ এর আগে ভারত সরকারের লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এই নামে অভিহিত ছিল) এই বিষয়ে প্রস্তাব আনলেন।

গোখেলের প্রস্তাব খুব একটা অসম্ভব কল্পনার নয়। কারণ তিনি ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের শিক্ষাকে এই ব্যবস্থায় আনতে বলেছিলেন। তাও সবাইকে নয়। নির্দিষ্ট সংখ্যক শতকরা হারের ছেলেমেয়েরা যেখানে লেখাপড়া শিখছে—সেই রকম কিছু অঞ্চল বেছে নিয়ে প্রবর্তন করা হোক। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব ৩৮-১৩ ভোটে নাকচ হয়ে গেল। এই প্রস্তাব সমর্থন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দুজনের নাম উল্লেখ করতেই হয় একজন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং দ্বিতীয় জন মহম্মদ আলি জিন্নাহ্।

গোখেল হেরে গেলেও (My lord, I know that my bill will be thrawn out before the day closes. I make no complaint, I shall not feel even depressed. I have always felt and have often said that we of the present generation in India can only hope to serve our country by our failures.) তাঁর আন্দোলনে কাজ হয়েছিল। গোখেলের 'বিল' এর সারাংশ একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

বোম্বাই প্রদেশের ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ১৯১০ সনের ১৯শে মার্চ প্রথম তিনি এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। তার মর্ম:

(১) যেমন ইংল্যণ্ডের ১৮৭০ সনের বিধিতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (Local bodies) উপর ভার দেওয়া হয়েছে, তেমনি এখানেও তাদের উপর ভার দেওয়া হোক ঐ সব অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য,

(২) বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছেলেদের জন্যই থাকবে, মেয়েদের জন্য নয়,

(৩) ৬ থেকে ১০ বছরের ছেলেদের শিক্ষাই এই ব্যবস্থায় আসবে,

(৪) শতকরা ৩৩ জন ছাত্র (পড়বার উপযোগী এই বয়সের ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে) যেখানে পড়ছে সেখানেই এই ব্যবস্থা চালু হবে,

(৫) এই শিক্ষা অবৈতনিক হবে,

(৬) সরকারকে ২ ভাগ এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ১ ভাগ এই হারে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করতে হবে,

(৭) এই বিষয়ে বিশেষ সরকারী বিভাগ থাকবে

(৮) ভারত সরকার নিজে দায়িত্ব নেবেন, প্রদেশের উপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

এই বিল কার্যকরী করা হবে বলে সরকার পক্ষ থেকে প্রত্যাশা দেওয়ায় গোখেল 'বিল'টি তুলে নেন।

কিন্তু তেমন কোন নীতি চালু না করায় গোখেল পুনরায় ১৯১১ সনের ১৬ই মার্চ এই বিল উত্থাপন করেন। এইবার তিনি আরও সতর্কতার সঙ্গে 'বিল' উত্থাপন করেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর কতগুলি নির্দেশও ছিল। এইবার মেয়েদের শিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করার ইঙ্গিত ছিল।

'বিল'টি এইবার বেসরকারী আকারের। সরকার মতামত স্থির করতে সময় নিলেন। গোখেল ১৯১২ সনের ১৮ই মার্চ আবার এই বিতর্ক তুললেন। দুদিন ধরে বিতর্ক চলল, ভূস্বামীরা কিন্তু গোখেলের বিরুদ্ধে এবং সরকারী সদস্যদের সঙ্গে এক জোট হলেন। আর তারই ফলে তিনি হেরে গেলেন ভোটে। একদিকে যেমন গাইকোয়াড ছিলেন এই নীতির স্বপক্ষে কিন্তু অন্যদিকে বেশি সংখ্যার ভূস্বামীরা বিশেষ করে রাজপিপলার মহারাণা এর বিরুদ্ধে।

গোখেল হেরে গেলেন কিন্তু সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারত পরিদর্শনে এসে ১৯১২ সালের ৬ই জানুয়ারীতে শিক্ষা ব্যাপারে বিশেষ জোর দিতে নির্দেশ করলেন। আর তারই ফলে সরকারী বিভাগ এই বিষয়ে এগিয়ে এল। দিল্লী দরবারে শিক্ষা বরাদ্দ হিসাবে ৩৩০,০০০ পাউণ্ড ধরা হয়েছিল, তার বেশির ভাগ প্রাথমিক শিক্ষাতে ব্যয় করা হবে বলেই হাউস অব কমন্‌স্‌-এ ঘোষিত হল। তার ফলে ১৯০৪ এর শিক্ষা আইন পরিবর্তন করে ১৯১৩-এর ২১শে ফেব্রুয়ারীতে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যেমন,

(১) নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় বাড়ানো হবে। এখানে লেখা, পড়া.

অঙ্ক কসা, অঙ্কন শেখা, গ্রামেব ভৌগোলিক জ্ঞান প্রভৃতি পডানো এবং শেখানো হবে,

(২) এর সঙ্গে যুগপৎ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে। প্রযোজন বোধে নিম্নপ্রাথমিককে উচ্চ প্রাথমিকে পবিবর্তিত করা যাবে,

(৩) অবশ্য এখন পযন্ত গ্রাম এবং সহবেব ইস্কুলেব চরিত্রগত এবং পাঠ-গত স্বাতন্ত্র্য আনা সম্ভব নয়।

(৪) ছাত্রদেব সামাজিক শ্রেণী থেকেই শিক্ষক নেওয়া হবে, তাদেব মধ্য বাংলা (Middle Vernacular) পাশ কবতে হবে এবং এক বছবেব শিক্ষণ নিতে হবে। তবে মধ্য বাংলা পাশ না হলে উচ্চ প্রাথমিব উত্তীর্ণদের জন্য দু বছবেব শিক্ষণ।

(৫) ১২ টাকার কম এঁদেব বেতন হবে না, তাদেব অবসববৃত্তি (pension) অথবা প্রভিডেণ্ট ফণ্ডেব ব্যবস্থা থাকবে।

(৬) ৫০ জনেব বেশি একটি শিক্ষকেব অধীনে ছাত্র থাকবে না।

১৯১৭ এব পব থেকে এই ধবণেব আদর্শ বিদ্যালয অনাত্র হয়ে গেল। কেবল মাদ্রাজ, বাংলা, বিহাব আব উড়িষ্যাতে হল না। বাংলা দেশে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাব ইস্কুল করা হল। অর্থাৎ ১৭ বগ মাইলেব মধ্যে একটি 'ইউনিযন' তাব তাব অধীনে একটি আদর্শ প্রাথমিক ইস্কুল, সবকাবি খবচায়। তিনটি শ্রেণী এতে। অর্থাৎ নিম্ন প্রাথমিক। সবকাবী টাকা হলেও কর্তৃত্ব দেওয়া হল জেলা বোডকে। এ ব্যবস্থা নানাকাবণে সফল হয় নি।

এবপব বাংলা দেশে ১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হল। মিউনিসিপ্যালিটিব উপব এই শিক্ষাব ভাব থাকল। এই শিক্ষা অবৈতনিক নয় বটে, তবে অভিভাবক অক্ষম হলে বেতন মকুব কবাব ক্ষমতা থাকল।

তারপব অব্যাহত গতিতে আবও সব প্রস্তাব অনুপ্রস্তাব চলল। ১৯৩৫ সনে প্রস্তাব হল প্রাথমিক শিক্ষা চাব শ্রেণী পযন্ত হবে, গবীবদেব বেতন নেওয়া হবে না; বঙ্গদেশ ১৬,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় অঞ্চলে ভাগ কবা হবে, ৬৪,০০০ শিক্ষক থাকবেন, তাঁবা কত ঘণ্টা পডাবেন তারও নিদেশ থাকল, কোন শ্রেণীতে কতজন ছেলে থাকবে প্রভৃতি নানা বিষয়ে ভাবনা এল। মাইনে প্রধান শিক্ষকের হবে ২০৲ মাসে, অন্য শিক্ষকেব ১৫৲ টাকা। তবে এসব প্রস্তাব অনেকটাই পরীক্ষামূলক কার্যের জন্য। ঠিক বিধান এখনও হল না।

বোধ হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯১৮ সালে বোম্বাই প্রদেশে বিঠলভাই প্যাটেল যে আন্দোলনকে সফল করে নিয়েছিলেন তার উল্লেখ করতেই হয়। সংক্ষেপে এই-ই হচ্ছে ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অভিযান।

স্বাধীনতার পর সংগঠন বিধির ধারাকে অনুসরণ করে স্বাধীন ভারত কেন্দ্রীয় শাসন সংস্থা এবং রাজ্য উভয়ের মিলিত সহযোগে এই কার্য রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন।

দুটি ব্যাপারকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে: (১) ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক এবং আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং (২) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত অবস্থার উন্নতিসাধন করা এবং এই শিক্ষাকে বুনিয়াদি শিক্ষায় পরিবর্তিত করা।

কাজটি বৃহৎ বলে, ভারতসরকার স্থির করেছেন—তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১১ থেকে ১৪ বছর বয়সের বালক বালিকার এইরূপ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হবে।

১৯৫৭ সালের শিক্ষা ব্যবস্থার নিরীক্ষা করে (Educational Survey) দুটি নীতি নির্ধারণ করা হল,

(১) প্রতি ৩০০ বা অধিক অধিবাসীর জন্য একটি করে স্বয়ং নির্ভর (Idependent School) প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকবে।

(২) কিন্তু যে সব যায়গায় অধিবাসীর সংখ্যা ৩০০ জনের কম, সেখানে কয়েকটি অঞ্চলের অধিবাসী একত্র করে উপরোক্ত নির্দিষ্ট সংখ্যা অনুযায়ী বিদ্যালয় নির্মাণ করা হবে। এই বিদ্যালয়ের নাম গোষ্ঠী বিদ্যালয় (Group School); এই গোষ্ঠী বিদ্যালয় গ্রাম থেকে এক মাইলের মধ্যে নির্মিত হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে, সমগ্র ভারতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়াবে, ৩,২৩,৪৬৩টি। তার মধ্যে ১,৫০,২১৫টি স্বয়ং নির্ভর এবং ১,৭৩,২৪৮টি গোষ্ঠীগত।

এই বিদ্যালয় ২৭·৭৫ কোটি লোকের শিক্ষার সুযোগ দিতে পারবে অর্থাৎ সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৯৮·৬৯ জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা যাবে। অবশ্য এই নিরীক্ষায় সহর অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রশাসিত চারটি অঞ্চলকে বাদ দিয়ে ধরা হয়েছে।

১৯৫৭ সালের মার্চমাসের দিকে নির্ধারিত অঞ্চলে ২,২৭,১৩৫টি বিদ্যালয় ছিল; বাড়তি বিদ্যালয় সংখ্যা প্রয়োজন ৯৬,৩২৮টি। তৃতীয় বার্ষিক

পরিকল্পনায় পূর্বে কিছু বিদ্যালয় এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছে কাজেই তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনায় আরও ৭০,০০০ বিদ্যালয় প্রয়োজন।

গত চৌদ্দবৎসরে প্রাথমিক বিদ্যালয় পূর্বের তুলনায় দুইগুণ বেড়েছে এবং মধ্য বিদ্যালয় (Middle School) বেড়েছে তিন গুণের উপর। তবে মধ্য বিদ্যালয়কে প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হবে বা কোন কোন অঞ্চলে হচ্ছে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ২৭৭৯০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে; আর ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষের মতো; শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ৭৮ হাজারের মতো। অর্থবরাদ্দ ৬·৩৭ কোটি টাকা ১৯৫৯ সালে—(Review of Education in India, Ministry of Education, New Delhi, page 659)।

মাধ্যমিক শিক্ষা :

কিশোরকালের শিক্ষাব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে মাধ্যমিক শিক্ষা। কিন্তু স্বাধীনতার পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে চতুর্থশ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াব বয়স কখনও স্থিরীকৃত ছিল, কখনও বয়সের সীমা তুলেও দেওয়া হয়েছিল। আবাব প্রাথমিক বিদ্যালয় আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে পৃথক এক ধরণের বিদ্যালয় ছিল যাকে বলা যায় মধ্য বিদ্যালয় (Middle School)।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার কালকে ৮ বছরের ধবে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ ছয় বৎসর বয়স থেকে ১৪ বৎসব বয়স পর্যন্ত। তাই ১৪ থেকে ১৭ বৎসর বয়সের শিক্ষা কালকে ধরা হয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষার কাল। ১৯৫২ সালে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় কমিশন বসেছিল তাঁবাই এইরূপ নিদেশ দিলেন।

পুথিপুস্তকে এই নামকরণ মেনে নেওয়া হলেও, বাস্তবিকপক্ষে দেখা যায় এখনও ৬ বয়স থেকে ১১ বৎসর বয়সের শিক্ষালয়কে বলা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১২ থেকে ১৬ বৎসরের শিক্ষালয়কে উচ্চ বিদ্যালয় এবং ১২ থেকে ১৭ বৎসরের শিক্ষালয়কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে পূর্বেকার দশম শ্রেণীর উচ্চবিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীতে তুলে আনায় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় নামকরণ করা হল। এ'দিকে একাদশ শ্রেণী হওয়ায় কলেজের ৪ বৎসরের স্নাতক পড়ার

কাল কমে গিয়ে ৩ বৎসরের হল। আবার যেহেতু সমস্ত দশমশ্রেণীর বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়নি সেইহেতু দশম শ্রেণীর উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হলে একবৎসরের পর একটি প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর পরীক্ষা দিয়ে থাকে। এদের প্রায় একবছরের মধ্যে দুবার অনুমোদিত পরীক্ষা দিতে হয়।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আবার আর এক ধরণের বিদ্যালয় আছে তাকে বলা হয় বহুমুখী বিদ্যালয়। বিভিন্ন প্রকারের পাঠ্যতালিকা আছে। ছাত্রদের মানসিকতা পরীক্ষা করে কে কোন্ ধরণের বিষয় পড়লে ভবিষ্যতে সুবিধা করতে পারবে সেই সেই বিচার করে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচন করতে দেওয়া হয়। পূর্বে উচ্চবিদ্যালয়ে সবাইকেই একই বিষয় পড়তে হত। এখন তা অনুমোদন করা হয় না। কিন্তু এই নির্বাচন প্রথা তেমন কার্যকরী হয় নি।

বহুমুখী বিদ্যালয়ে ৭ রকমের পাঠ্যতালিকা থাকে: (১) মনন বিদ্যা (২) বিজ্ঞান, (৩) শিল্পবিজ্ঞান, (৪) ব্যবসায় বিজ্ঞান (৫) কৃষিবিজ্ঞান (৬) অঙ্কন বিদ্যা (৭) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। তবে কোনও বিদ্যালয়েই এই ৭টি পাঠ্যতালিকা থাকে না; ৩টি পাঠ্যতালিকার বিদ্যালয়ই বেশি, কোনটিতে চারটিও আছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর সমগ্র দেশে ৩,১২১টি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২,১১৫টি বহুমুখী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থির করা হয়েছে বহুমুখী বিদ্যালয়ের সংখ্যা আর না বাড়িয়ে ঐগুলিই সংগঠিত করা হবে। দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ধরে দেশে সর্বসমেত ১৫,৬০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এখানে ছাত্র সংখ্যা ২৯.১ লক্ষ। ১৪ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই সব বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায় শতকরা ১১.৫ জন। ইংরেজ আমল থেকে বর্তমানে প্রায় আড়াই গুণের অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পড়বার সুযোগ পেয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৫,৬০০টি হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল; এর মধ্যে ছেলেদের বিদ্যালয় ১৩,১০০টি এবং মেয়েদের ২,৫০০টি। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ১৪,৩৩৪টি।

১৪-থেকে ১৭ বৎসরের সংখ্যার অনুপাতে বিদ্যালয়ে পড়ছে ছেলেরা শতকরা ১৮.৪ জন এবং মেয়েরা শতকরা ৪.২ জন; একুনে ১১.৫ জন

পশ্চিমবঙ্গের সরকার নিয়ম করেছেন, (১) প্রাথমিক এবং নিম্নবুনিয়াদি হবে ৫ বৎসরের পাঠকাল নিয়ে, (২) নিম্নমাধ্যমিক বা উচ্চবুনিয়াদি হবে ৩ বৎসরের (৩) এবং পরবর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতে পারে (ক) প্রথম থেকে একাদশ শ্রেণীর, (খ) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর, (গ) নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণীর বহুমুখী অথবা (ঘ) নিম্নমাধ্যমিক বা উচ্চবুনিয়াদি প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর।

১৯৫৯-৬০ সালে এই বিদ্যালয় সংখ্যা ছিল ৭০৭৯টি (এর মধ্যে ৫৮৫টি উচ্চতর মাধ্যমিক এবং ১৭২টি উচ্চবুনিয়াদি) এবং ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ৮,০৯,২০০; শিক্ষক সংখ্যা ৩৫,৬৭০ জন, রাজ্যের বরাদ্দ ব্যয় ২৭৯ লক্ষ টাকা (Review of Education in India, Ministry of Education Page 661-662)।

সমাজ শিক্ষা

নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্যই বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে ছিল। ১৯৫১ সনের আদমসুমারীতে দেখা গেছে শতকরা মাত্র ১৬.৬ জন শিক্ষিত, এঁদের মধ্যে পুরুষদের হার শতকরা ২৭.৯ জন এবং মেয়েদের শতকরা ৭.৯ জন। এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষদের শতকরা ৩৩.৯ এবং মেয়েদের শতকরা ১২.৮ জন। একুনে শতকরা ২৩.৭ জন। নিরক্ষর বয়স্কদের সংখ্যা আনুমানিক ২০ কোটি।

বর্তমানে গড়ে ৫০,০০০ বয়স্কদের শ্রেণী পরিচালনা করা হয়, এবং ১২ লক্ষ বয়স্ক ব্যক্তি এই শ্রেণীতে যোগদান করেন। বার্ষিক ব্যয় ৮০ লক্ষ টাকা।

এই বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার নূতন নামকরণ হয়েছে সমাজশিক্ষা। এখন বয়স্কদের শিক্ষায় নিরক্ষরতা দূরীভূত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সমাজে নতুন নতুন দিক এসে পড়ায় সেই সবের সঙ্গে বয়স্কদের পরিচিত করাও এই সমাজশিক্ষার অঙ্গ। অর্থাৎ সমাজশিক্ষার এখন উদ্দেশ্য হ'ল—নিরক্ষরতা দূরীভূত করা, সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তি হতে সাহায্য করা, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে

অবগত হওয়া, দৈনন্দিন কার্যে বিজ্ঞান ব্যবহার করতে জানা, দেশের এবং বৃত্তির (Vocation) নানারকম সংবাদ কার্যকৌশল শেখা, অবসর বিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায় বুঝতে পারা। ১৯৫২ সন থেকে সমাজ শিক্ষার এইরূপ নীতিই গ্রহণ করা হয়েছে। এই কার্যের সহায়ক হিসাবে সমাজ-গোষ্ঠী উন্নয়নের বিভাগ স্থাপন করা হয়েছে (Community Development Block)। প্রতি ১০০টি গ্রামে দুজন কর্মচারী থাকেন—এবং একজন সমাজ শিক্ষা সংগঠনকারী (Social education organiser) আর একজন মুখ্য .সবিকা। এঁদের কার্য পরিদর্শনের জন্য আছেন জেলা সমাজ শিক্ষা সংগঠনকারী। তাঁর উপরে রাজ্যসরকারে একজন অধিকর্তা থাকেন।

গ্রামের প্রতিনিধিদের শিক্ষণের জন্য রাজ্যসরকাব পরিচালিত জনতা কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

সমাজশিক্ষারই অঙ্গ হিসাবে নানা বিভাগে কাজ করা হয়—(১) পুস্তিকা প্রকাশন বিভাগ (২) অভিনব পুস্তকের জন্য পুরস্কারেরই ব্যবস্থা (৩) যাঁরা শেখাবেন তাঁদের জন্য সাহিত্য রচনা করার বিভাগ (৪) ইউনেস্কোর পরিচালিত নতুন বয়স্ক শিক্ষিতদের জন্য সাহিত্য (৫) উপযুক্ত কোষগ্রন্থ প্রকাশনা।

শিল্পকারখানার কর্মীদের মধ্যে শিক্ষা কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা জানাবার জন্য ১৯৬০ সনে ইন্দোরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, হয়েছে নাম কর্মীদের সমাজশিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Workers' Social Education Institute)। এই সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণ ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্য। দিল্লীতে একটি প্রতিষ্ঠান আছে এখানে গ্রন্থগারিকেরা শেখেন কি করে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার এবং গ্রামের গ্রন্থাগার পরিচালিত করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ৩১০১টি এই শিক্ষাকেন্দ্র হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২,০৮ ১৭০ জন আর তার মধ্যে ৮৬,৪৫৯ জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়েছে।

স্ত্রী-শিক্ষা :

স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ না হওয়ার জন্য ১৯৫৮ সনে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রীমতী দুর্গাবাঈ দেশমুখের নেতৃত্বে একটি কমিটি স্থাপন করেন। স্বাধীনোত্তর

কালে কিভাবে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করা যায় এবং ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সমতালে শিক্ষিতার সঙ্গে বাঁধা যায় তার ব্যবস্থা এই কমিটির কাছে চেয়েছিলেন। তাঁরা নির্দেশ দিলেন, (১) মেয়েদের শিক্ষা যে এক বিশেষ সমস্যা তা কিছুকাল মেনে নিতে হবে—এবং সেইভাবে অর্থবরাদ্দ করতে হবে (২) জাতীয় এবং রাজ্য পরিষদ (National and State Councils) স্ত্রী-শিক্ষাব জন্য স্থাপন করতে হবে (৩) কেন্দ্রে এবং রাজ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেব জন্য বিশেষ বিভাগও থাকবে।

এই নির্দেশ অনুযায়ীই এখন কেন্দ্রে এবং বাজ্যে কাজ করা হচ্ছে। অবশ্য স্বীকার কবতে হবে যে, ১৯৪৯-৫০ সন থেকে ১৯৫৮-৫৯ সনে স্ত্রী-শিক্ষা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৪৯-৫০ সনে বিশ্ববিদ্যালয়েব বিভিন্ন বিভাগে ৩৬,০৪০ জন মেয়ে পডছিলেন, ১৯৫৮-৫৯ সনে সেখানে ১,২৪,৬৭৯ জন।

বিশ্ববিদ্যালয়েব মান অনুযাযী বৃত্তিকরী এবং বিশেষ শিক্ষা নিচ্ছিলেন ১৯৪০-৫০ সনে—৪৮২৬ জন, ১৯৫৮-৫৯ সনে ২১,৮৩৬ জন।

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষায় ১৯৪৯-৫০ সনে, ৫৭,৫৫,০৫৩ জন ১৯৫৮-৫৯ সনে—১,১৩,৮৯,৯৭৪ জন।

বিদ্যালয মানেব বৃত্তিকবী এবং বিশেষ শিক্ষা ১৯৪৯ ৫০ এ ২১৫,৪০১ জন ১৯৫৮—৫৯ সনে ২৭৮,৭৫১ জন।

একুনে ১৯৫৮—৫৯ সনে, ১,১৮,১৪ ৯৫১ জন শিক্ষা নিয়েছেন। ছেলেদেব শতকবা অনুপাতে ১৯৪৯-৫০ সনে মেযেবা শিক্ষা নিচ্ছিলেন, ৩৩ জন, এবং ১৯৫৮-৫৯ সনে ৪০ জন।

এই হিসাব থেকে দেখা যায, মেয়েবা সবচেয়ে বেশি যোগ দিচ্ছেন প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, গবেষণা বিভাগে স্নাতকোত্তব শ্রেণীতে এবং বৃত্তিকরী শিক্ষায়।

উচ্চ এবং উচ্চতব মাধ্যমিক বিদ্যালয়েব মেযেদেব সংখ্যা ১৯৫৮-৫৯ সনে প্রায় অর্ধেকে দাঁডিয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রামাঞ্চলে ১৪ বৎসর বয়স পযন্ত বালিকাব শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই ব্যবস্থা কবা হয। শতকরা ৬০ জন ঐ বয়সী মেয়েরা এখন লেখাপডা করছে বলে মনে কবা হয়; খরচ হয়েছে ১৯ লক্ষ টাকা আর ছাত্রীসংখ্যা ৪৬০০০ হাজার জন।

শিক্ষক শিক্ষণ :

বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নতিকল্পে শিক্ষকদের শিক্ষণের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মানসিকতা অনুসরণ ক'রে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে না পারলে পড়ানোর কাজ সুসম্পন্ন হয় না। পূর্বকালে ভারতবর্ষে শিক্ষণের পৃথক কোন ব্যবস্থা রাখা হতনা। যারা ভবিষ্যতে শিক্ষক হবে সাধারণ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তারা সেইরূপ বিশ্লেষণমন নিয়েই পড়ত, তদনুরূপ চরিত্রগঠন ক'রে যেত। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা জটিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, এ বিষয়ে আরও ধরাবাঁধা নিয়মে অগ্রসর হওয়া উচিত।

ভারতে মিশনারীরাই প্রথমে এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা আনয়ন করে। মাদ্রাজে, বাংলাদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টায় এইরূপ বিদ্যালয় অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতকে স্থাপিত হয়। তবে তাঁদের উদ্দেশ্য তত ব্যাপক ছিলনা। ১৮৫৪ সালে উড সাহেবের নিদেশনামায় শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ করে বলা হয়।

শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয় দুই শ্রেণীর আছে : (১) প্রাথমিক শিক্ষকের এবং (২) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের।

প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে সম্পূর্ণ অর্থ সাহায্য করবেন বলে পরিকল্পনা নিয়েছেন। কিন্তু সর্ত এই যে, যে সব শিক্ষণ বিদ্যালয় আছে তাতে ছাত্র সংখ্যা বাড়ানো এবং প্রয়োজন বোধে নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ২৭৬টি এইরূপ নূতন শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপিত হচ্ছে, (Review of Education in India, page 18)।

১৯৪৯-৫০ সনের মধ্যে (মধ্য বিদ্যালয় সমেত) শতকরা ৫৮ জন শিক্ষক শিক্ষণ-প্রাপ্ত হয়েছেন ; দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে শতকরা ৬৫ জন শিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন বলে গোড়ার দিকে ধরে নেওয়া হয়েছিল। এই হারে বাড়তে থাকলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের শতকরা হার হবে ৭৫ জন।

মাধ্যমিক বিদ্যলয়ের শিক্ষক শিক্ষণের জন্যও বহু কলেজ স্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সনে যেখানে ৪৮টি কলেজ ছিল ১৯৫৮-৫৯ সনে সেখানে এই কলেজ সংখ্যা হয়েছে ২৩৩টি। শিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে ২৪,৪২৮ জনের। ১৯৪৯-৫০ সনে শতকরা ৫৩·৬ জন শিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন,

দাঁড়িয়েছে শতকরা ৬৫ জন। আশা করা যায়, শতকরা ৭৫ জন শিক্ষণ শিক্ষক বিদ্যালয়ে থাকবেন। এছাড়া পরবর্তী বিশেষ শিক্ষণের জন্য ৫৪টি শিক্ষণ শিক্ষক মহাবিদ্যালয়ে বিশেষ বিভাগ আছে (Extension Services for Secondary Education)।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য ৭০টি প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে ৭৮৪০ জন শিক্ষকের পড়বার ব্যবস্থা। ১৯৫৮-৫৯ সনে শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ছিল ৫টি বুনিয়াদি এবং ১২টি সাধারণ। সাধারণ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে ঐ বছরে ছাত্রসংখ্যা ১৪৯২ তার মধ্যে শিক্ষিকা ৬৩৪ জন।

মোটামুটিভাবে শিক্ষণ শিক্ষা সম্পর্কে এইটুকুই বলা যেতে পারত। কিন্তু আর একটু বিস্তৃত না করলে এই শিক্ষা যে কেমন জটিল আকার ধারণ করছে তা বোঝা যাবে না। সমাজ ও সভ্যতা এমন ছড়িয়ে পড়েছে যে, নানাভাবে নানাদিক দিয়ে শিক্ষা সুরু হয়েছে। শিক্ষার প্রতি কেবল উৎসাহেই এসব বাড়ছে তা বলা যায় না, এর সঙ্গে ভবিষ্যত মানবের 'ধাক্কাধাক্কি'-ও রয়ে গেছে বলে মনে হয়। মর্যাদাস্তর অতিক্রম করবার উদ্বিগ্নতা প্রচুর। প্ল্যানিং-এর যুগে তাই কেউ দিশেহারা হতে চান না, দ্রুতপায়ে একটা সঙ্কল্প নিয়ে অগ্রসর হতে চান। অন্য গ্রহের অধিবাসী হঠাৎ এসে পড়লে মনে করবে, 'এরা যেন কি একটা চায়'। কলকাতার লোকে দেখতে পাবে বেলা দশটার সময়কার বহুবাজার ষ্ট্রীটের একখানা ছবি। সামনে ডালহৌসি স্কোয়ার। কিন্তু এরই মধ্যে অনেক দুর্ঘটনা আছে।

যাই হোক শিক্ষার এই বিচিত্র পথে শিক্ষক চাই। সেই শিক্ষকের জন্য ভারতে বর্তমানে যে শিক্ষণ বিদ্যালয় পাওয়া যায় তার চেহারা হচ্ছে,

(১) প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার শিক্ষক শিক্ষিকার,
(২) নর্মাল অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয় ,, ,,
(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্নাতক নন এমন ,, ,,
(৪) ,, ,, স্নাতক ,, ,,
(৫) বিশেষ শিক্ষকের শিক্ষণ বিদ্যালয়

প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকার শিক্ষণ বিদ্যালয়ঃ

প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ই আমাদের দেশে সরকারী তত্ত্বাবধানের একরকম বাইরে। ব্যক্তিগত ভাবে বেসরকারী 'বিদ্যালয় বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩ কোটি টাকা এই বাবদ ধরে রেখেছেন। ইতিমধ্যে নিউ দিল্লীতে 'বাল ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৫৬ সালে শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য দেশে মাত্র ২৪টি বিদ্যালয় ছিল। এইসব শিক্ষণ বিদ্যালয় এক বছরের একটি পাঠ্যক্রম চালু করেছেন। শিক্ষক শিক্ষিকারা সাধারণতঃ প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ অথবা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত।

এরই মধ্যে প্রাক্ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থাও আছে। তাঁদের শিক্ষণ পাঠ্যতালিকা সাধারণত কর্ম কেন্দ্রিক।

পাঠ্যতালিকার মধ্যে (১) সমাজ গোষ্ঠী (Community life) নিরূপণের শিক্ষা, (২) সমাজশিক্ষা, (৩) শিশুদের সম্পর্কে জানা (৪) শিশু শিক্ষার ইতিহাস (৫ এবং ৬) বুনিয়াদি সংক্রান্ত শিক্ষা, (৭) কর্ম পরিচালনার শিক্ষা, (৮) সাফাই এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, (৯) প্রকৃতিপাঠ, (১০) ভাষা-সাহিত্য এবং উচ্চারণ শেখানো, (১১) সঙ্গীত প্রভৃতি, (১২) অঙ্কন এবং হস্তশিল্প।

এই শিক্ষণের উচ্চতর দিকও আছে। যেমন বরোদার গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এরই উচ্চশিক্ষার জন্য এম এস-সি ডিগ্রী দেওয়া হয়, ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এমনি ব্যবস্থা আরও কয়েকটি স্থানেও আছে।

প্রাথমিক শিক্ষকের শিক্ষণ :

দু ধরণের—বনিয়াদী ও সাধারণ বুনিয়াদি শিক্ষণ বিদ্যালয়ের ছাত্র সাধারণত সাত বছরের প্রাথমিক শিক্ষা উত্তীর্ণ এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ। শিক্ষণ দুবছরের। প্রথম ধরণের শিক্ষক লাভ করেন জুনিয়র সার্টিফিকেট। আর দ্বিতীয় ধরণের শিক্ষক লাভ করেন সিনিয়র সার্টিফিকেট। এঁদের শিক্ষা বিষয়ে সাধারণত পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকে না।

সাধারণ শিক্ষা বিদ্যালয়ে রাজ্যে রাজ্যে ভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা কোনটার সঙ্গে কোনটার বিশেষ মিল নেই। এইসব পাঠ্যতালিকার পরীক্ষায় 'লিখিত' দিকই বেশি তার সঙ্গে ব্যবহারিক বা প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা থাকে। পাঞ্জাবে জুনিয়ার সার্টিফিকেটে অনেক রকম হস্তশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা আছে যেমন, ইট তৈরী, চুপড়ী তৈরী, মাদুর তৈরী প্রভৃতি। সিনিয়ার শিক্ষকদেরও অনেকটা এই রকম।

বুনিয়াদির জন্য হিন্দুস্থানী নঈ তালিম সঙ্ঘের পাঠ্য তালিকাই অনুসরণ করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা ঃ

নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সাধারণতঃ স্নাতক শিক্ষা প্রাপ্ত নন। এঁদের শিক্ষণ কাল ১ বছর বা ২ বছর। এঁরা বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বিভাগ থেকে ডিপ্লোমা পান। বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বরোদা, বোম্বাই, গুজরাত, কার্ণাটক, নাগপুর, পুণা, সাগর, জব্বলপুর—উপাধি দেন কেউ কেউ টি. ডি. কেউ বা ডিপ. টি।

টি. ডি দেওয়া হয় একবছর শিক্ষা অন্তে; ডিপ. টি দেওয়া হয় দুবছর পড়ার পর। রাজ্যসরকারের মধ্যে বিহার-দেয় সি. টি. বোম্বাই—এস. টি. সি; মধ্যপ্রদেশ—সি. টি; উত্তর প্রদেশ—সি. টি., পশ্চিমবঙ্গ টি. টি. সি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এল. টি ডিপ্লোমাও ছিল।

শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ঃ এও দুরকমের—বুনিয়াদি এবং সাধারণ। সাধারণ কলেজে বি. টি. বা বি. এড্, বা এল. টি. বা ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন দেওয়া হয়। এক বছরের শিক্ষণ। শিক্ষক সাধারণত স্নাতক উত্তীর্ণ। পাঠ্যক্রমে দুটোভাগ আছে—তত্ত্বগত (Theory) এবং ইস্কুল-পাঠনার ব্যবহারিক দিক।

বুনিয়াদিতেও একবছরের শিক্ষণ। শিক্ষকেরা স্নাতক শ্রেণী উত্তীর্ণ (Graduates)। বিভিন্ন রাজ্য নিজস্ব পাঠ্যতালিকা করে নিয়েছেন।

বিশেষ শিক্ষণ বিদ্যালয় ঃ

এই বিভাগে পড়ে শরীর চর্চার শিক্ষণ বিদ্যালয়, সংস্কৃতি চর্চার, গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের, হস্তশিল্পের, এবং হিন্দী প্রভৃতি বিশেষ বিষয়ের।

শরীর চর্চার শিক্ষণ বিদ্যালয়ের মধ্যে কৈবল্যধাম এস. এম. ওয়াই. এম. সমিতি (লোনাভালা) যোগশিক্ষার ডিপ্লোমা দেয়। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই শরীরচর্চা শিক্ষণের ব্যবস্থা রাখে নি। সরকারই এই ডিপ্লোমা দেয়। সমগ্র ভারতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ২০টি এইরূপ শিক্ষণ বিদ্যালয় ছিল।

সংস্কৃতি চর্চা শিক্ষণের জন্য নাম করতে হয়—বিশ্বভারতীর (নৃত্য, সঙ্গীত, অঙ্কনশিল্প), বরোদার বিশ্ববিদ্যালয় (কলা বিজ্ঞান); মাদ্রাজের কলাক্ষেত্র; মাদ্রাজের সঙ্গীত শিক্ষকের শিক্ষণ বিদ্যালয়; লক্ষ্ণৌ; দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া।

গার্হস্থ্যবিজ্ঞানের জন্য কলকাতার বিহারীলাল মিত্র ইনস্টিটিউসন, দিল্লীর লেডী আরউইন কলেজ, বোম্বাইয়ের এস. এন. ডি. টি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বরোদার ফ্যাকাল্টি অব হোম সায়েন্স, হায়দ্রাবাদ এবং এলাহাবাদ।

বুনিয়াদি-শিক্ষা

১৯৩৭ সনের মহাত্মা গান্ধী উদ্ভাবিত বুনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য ও রূপের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষার বদলে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রবর্তন করাই বুনিয়াদি শিক্ষার এখন প্রধান নীতি।

জম্মু এবং কাশ্মীরে ১৯৫০ এর দিকে দেখা গেছে হস্তশিল্প কেন্দ্রিক (craft centric) বুনিয়াদি শিক্ষার বদলে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা (activity centric education) প্রবর্তনের ঝোঁক; সেই নীতিই বর্তমানে ভারতের অন্যান্য বুনিয়াদি শিক্ষায় দেখা গেছে। জম্মু ও কাশ্মীরে তখন শিক্ষা-অধিকর্তা ছিলেন—এ. এ. কাজমী। তাঁর পূর্বে ১৯৩৮ এর দিকে কে. জি. সাঈদাইন। হয়ত বা তাঁদের প্রভাব এখানে ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রে থেকে থাকবে। বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম দিকে আর একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়ের যোগসাধন করে পড়াতে হবে, এবং তারা যাতে স্বাবলম্বী সমাজ-ব্যক্তি হতে পারে সে দিকেও নজর দেওয়া হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার বুনিয়াদি শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করতে এবং নিম্নবুনিয়াদিকে উচ্চবুনিয়াদিতে উন্নীত করতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করছিলেন।

কিন্তু আশানুরূপ ফললাভ হয় নি। তাঁরা বলেন এর কারণ, বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা ও উপকারিতা সম্পর্কে দেশে মতবিরোধ। কাজেই কর্তৃপক্ষ একটি নতুন পুস্তিকা প্রকাশ ক লেন—The Concept of Basic Education নামে (১৯৫৬ সালে)। তারপর আর একটি পুস্তিকায় পড়ানোর পদ্ধতি এবং কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হল। এই পুস্তিকার নাম Understanding Basic Education.

জি. রামচন্দ্রন্-এর নেতৃত্বে একটি নিরীক্ষা পরিষদ গঠিত করে বুনিয়াদি শিক্ষার ফলাফল বিচার করা হল। তাঁরা ১৯৫৬ সালে প্রবর্তিত 'কম্পাকট এরিয়া মেথড'-কে নাকচ করলেন। বললেন, এতে এখানে-সেখানে বুনিয়াদি আবহাওয়া হলেও সমগ্র দেশে এই শিক্ষা প্রসারের অন্তরায় এই পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বুনিয়াদি শিক্ষা কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়েছে। তাঁরা আরও খেলাস্লেন যে, সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করতে সম্মতিক্রমে বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য ১৯৫৬ সালে মন্ত্রী পরিষদ National অন্য দেশেরই সমকক্ষ।" ৬cation নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ছবি

অর্থবরাদ্দ

প্রথম স্তরের শিক্ষায়	—৮৯	কোটি	টাকা
মাধ্যমিক স্তরে	—৫১	"	"
বিশ্ববিদ্যালয়	—৫৭	"	"
কারিগরী ও বৃত্তিমূলক	৪৮	"	"
সমাজ শিক্ষা	—৫	"	"
শিক্ষাসম্পৃক্ত প্রশাসনিক বিভাগে	—৫৭	"	"

মোট ৩০৭ কোটি টাকা।

এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের দেয় ৯৫ কোটি টাকা আর ।ষয়ের, সরকারের দেয় ২১২ কোটি টাকা। ।।হাবাদ।

চীন দেশে

পৃথিবীতে ভারতবর্ষই কেবল বিচিত্র দেশ নয়, মানব-সভ্যতাই বিচিত্র। এই বৈচিত্র্য যে-কেবল দেশ এবং কালের প্রভাবেই নির্মিত হয়, তাও ততটা সত্য নয়; বৈচিত্র্যের আবির্ভাব হয় মানব-সমাজ সম্পর্ক রচনায়। সমাজ-সম্পর্ক রচিতই হয়; সেই রচনাকে বিন্যাস করতে এক-একজন দার্শনিক, সমাজকর্মী সমাজ-স্বীকৃত-পন্থা অবলম্বন ক'রে কতগুলি সূত্র গঠন করেন। সেই সূত্র কোন এক যুগে সংজ্ঞার আকারে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু যেহেতু তা সমাজ-স্বীকৃত তাই তার প্রভাব বা প্রয়োগ কোন এক যুগেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

আশু উদ্দেশ্যের জন্য সামন্ত বা নৃপতিরা জোর ক'রে এর রদ-বদল করতে চান; কিন্তু এই উদ্দেশ্যদুষ্ট পরিবর্তন এমনিই একরোখা, হয়ত বা কেবলই মস্তিষ্ক নির্ভর, হয়ত বা শাসন-তন্ত্রের অমোঘ বিধানে তার আশ্রয়—কিন্তু হৃদয় বা আন্তরিকতাকে বর্জন ক'রে তা ক্রমশই গণ-অপ্রিয় হ'তে থাকে। তবু তাদেরও অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ব আছে বলেই সমাজ-ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির এক বিচিত্র 'নক্সা' রচিত হয়।

এমনি এক বিচিত্র দেশ চীন। কেবল বিচিত্র দেশ নয়—বিচিত্র সমাজ। চীনের ইতিহাস পড়লে তাকেও আমরা 'মহামানবের সাগরতীর' বলতে পারি।

মানুষের বুদ্ধির বড় একটি খেলা হচ্ছে 'বিশেষণ' পদটির দাবার ছক্। দাবার ছকের বিশেষ বিশেষ শক্তির মতোই বিশেষণেরও 'তর', 'তম' প্রভৃতি গুণ স্বাতন্ত্র্যের ধারণা। যেমন বুদ্ধির খেলা 'বিশেষণ' তেমনি হৃদয়ের খেলা দেশ-প্রীতিতে। দুটির শক্তি যখন এক হয়ে মিশে যায়—তখন তা অমোঘ কিন্তু সত্য নয়।

বুদ্ধির খেলায় আমরা বলতে চাই কোন্‌টি প্রাচীনতম দেশ, হৃদয়ের খেলায় আমরা প্রমাণ করতে চাই 'কোন্ দেশটি সবার সেরা।' কিন্তু এই খেলার ছক যদি কিছুকাল বাক্সে রেখে ইতিহাস নিয়ে বসি তা হ'লে সর্ব-সম্মতিক্রমে স্বীকার করব—চীনও একটি প্রাচীন দেশ, চীনের গৌরবও অন্য দেশেরই সমকক্ষ। তবে যেহেতু এটি আর-একটি দেশ সেই হেতু অন্য

দেশ থেকে এরও স্বাতন্ত্র্য আছে। এই কথাটি মনে রেখেই আমরা চীন দেশের শিক্ষা এবং ইস্কুল সম্পর্কে আলোচনা করব।

চীনের ইতিহাস কোন্ যুগ থেকে সুরু করব, সে-এক সমস্যা। চীনের সমাজের স্বর্ণযুগ ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে বলে অনেকে মনে করেন। তার সভ্যতার ইতিহাসকে আলোচনা করতে এই বয়স-কে কমিয়ে কেউ কেউ ১০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে সুরু করেন, (For a sober survey of China's early civilisation, it is not necessary to push farther back than the 10th century B. C.—H. A. Giles, The Civilization of China , Williams and Norgate, London 1911. page 20)। কেউ বা ১৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ (···history of China cannot be pushed back beyond about—1500 ; Joseph Needham, Science and Civilization in China Vol I —Page 98)।

চীন সভ্যতার পরিণতি খৃষ্ট পূর্বাব্দ দশম শতক থেকেই সুরু করা যায়। কিন্তু সেখানে সমাজ-মানুষ তো তারও আগে ছিল। মানুষ আবার বহু পূর্ব থেকে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে পিকিং-এর কাছে চীন-মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, আদিম চীন-মানুষ যে কেমন তার হিসাব নির্ধারিত হয়েছে। এই পিকিং মানুষ উত্তর চীনে বাস করত ৫০০,০০০ বছর আগে। বর্তমান কালের উত্তর চীনের মানুষের সঙ্গে এই মানুষের অনেক সাদৃশ্য, (The Peking Man is the first Chinese we know anything about. He lived in North China about 500,000 years ago .. . ..Owen and Eleanor Lattimore, The making of Modern China, George Allen & Unwin Ltd, London 1945—page 34)। ওয়েইডেন-রেইখ-এর মতে (Weidenreich) প্লেইস্টোসীন যুগের মধ্যকালে এই মানুষের অস্তিত্ব ছিল (অর্থাৎ খৃষ্টপূর্বাব্দ ৪০০,০০০ বছর আগে)। নিয়ানডার্থাল মানুষেরও আগে। কাজেই পুরাতন প্রস্তরযুগের চীন মানুষেরা কঠিন প্রস্তরের অস্ত্র নির্মাণ করতে জানত ব'লে অনুমান করা যায়। পর্বত গুহায় অনির্বাণ অগ্নি প্রজ্জ্বালিত রাখতেও জানত।

নূতন প্রস্তর যুগের চীনারা সমগ্র চীনস্থানে ছড়িয়ে ছিল। এদের মধ্যে কতক লোক শিকার করত, মাছ ধরত, ফল-মূল, এবং বুনো ঘাসের বীজও

সংগ্রহ করত খাদ্যের জন্য। উত্তর চীনের লোকে চাষ বাসও শিখেছিল। দক্ষিণ চীনে ঐ যুগেই ধান চাষ করতে তারা শিখেছিল। কুকুর, শূকর ছিল তাদের প্রথম গৃহপালিত পশু; তারপর এল মেষ, ঘোড়া প্রভৃতি (Lattimore —page 35)। ল্যাটিমোরেরা এমনও অনুমান করেন যে তারা ঝুড়ি বুনতে, কাপড় তৈরী করতে, মৃৎপাত্র নির্মাণ করতেও ঐ সময়ে শিখেছিল। অবশ্য পুরাতন প্রস্তর যুগ থেকে নূতন প্রস্তর যুগের চীন অধিবাসীর সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত চলেছিল কিনা সে বিষয়ে মতান্তর আছে। আণ্ডারসনের (Andersson) মতই যদি সত্য হয়, তবু চীন-বাসী যে একেবারে কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল তা মনে হয় না। অন্তত মাঞ্চুরিয়ার আবহাওয়া তো ছিল। সেখানকার জীবনযাত্রায় কোন ছেদ পড়েছিল বলে খুব শোনা যায় না। যাই হোক, চীন মানুষ যে-অভিজ্ঞতা পূর্বে শিখেছিল তারই পরিণতি দেখতে পাই ২৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে। ঐ 'দুঃখের নদীর' তীরে (হোয়াংহো বা ইয়েলো রীভার) মানুষের সে কি কর্মচাঞ্চল্য। সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে তারা, বড় বড় জনপদ, কৃষি ছাড়াও কাঠের কাজ, বয়ন কাজ, মাটির কাজ অনেক উন্নত এখন।

কান্সু-শেন্সি-শান্সি-হোনান-শানটুঙ অঞ্চল ব্যেপে একটি সভ্যতার কথা জানতে পারা যায় ২৩০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দের মধ্যে। এই সভ্যতাকে বলা হয় ইয়াংশাও সংস্কৃতি। ছোট্ট ছোট্ট বীজের একরকমের খাদ্য তারা ব্যবহার করত (millet), শেষের দিকে ধান বুনতেও শিখেছিল। কিন্তু এই ফসল দুটি তো চীনের দেশীয় ফল নয়, তবে কোত্থেকে তারা এর ব্যবহার শিখল? মনে হয়, দক্ষিণ-পূব এশিয়া অঞ্চল থেকে তারা এর ব্যবহার জানতে পারে (Joseph Needham, Science and Civilisation Vol I page 81, Cambridge University press, 1954), অর্থাৎ ঐ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। আরও স্পষ্ট ক'রে বলা যায়, শিক্ষার জন্য তারা কেবল তৎপরই নয়, তাদের নির্বাচনী শক্তিও এসেছে—বুঝেছে কোন্‌টি প্রয়োজনীয়, কোন্‌টি গ্রহণীয়। কিন্তু ইয়াংশাও সভ্যতার বড় কীর্তি হচ্ছে চিত্রিত মৃৎ-পাত্র। তবে কুম্ভকারের চাকা তখনও তারা ব্যবহার করছে না, তারা অন্য উপায়ে নির্মাণ করছে। নব্য প্রস্তর যুগের মাটির কাজের এই রীতিতে চীন অন্য সমস্ত দেশ ছাড়িয়ে গেছে।

উত্তর এশিয়া এবং উত্তর আমেরিকায় তখন যে এক সভ্যতা প্রবাহিত হচ্ছে, তারই এ এক শাখা। অর্ধবৃত্তাকার বা চতুষ্কোণের পাথরের ছুরি সাইবেরিয়ার থেকে সুরু ক'রে এস্কিমোদের মধ্যে পর্যন্ত দেখা যায়। এই সভ্যতাকে শামানবাদ বলা হয়। গর্ত-খুঁড়ে বাস করার প্রথা, বিশেষ ধরণের ধনুক নির্মাণ, আর তিন-পায়ার উপর কড়াই রান্নার-কাজে ব্যবহার তা ছাড়া রসায়ন বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক দিক—বাষ্পে রান্না করার জন্য পাত্রাদি তৈরী—এই সভ্যতা বিশেষ ক'রে নব্য প্রস্তর যুগের চীনসভ্যতায় দেখা যায়। এই প্রথা তো শাঙ্ বংশ পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

ইয়াংশাও-মানুষের পর নব্য প্রস্তর যুগে এখানে আর কয়েকটি সভ্যতার কথা জানা যায়। লুঙ-শান মানুষে ইয়াংশাও মানুষ থেকে অনেক অগ্রসর হয়েছে। এই সময়ে নগব নির্মাণ করতে শিখেছে, বিশেষ প্রকারের মাটির ঘরও তৈরী করছে, কুম্ভকাবের চাকা এসেছে। চাকাব গাড়ীও তৈরী হচ্ছে বলে অনেকে অনুমান করেন। তবে এখন পর্যন্ত ধাতুর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে না। শাঙ্ (Shang) বংশের সময়ে বা ১৬০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ব্রোঞ্জের ব্যবহার দেখা যায়।

কিন্তু শামান-বাদ কি? শামান-বাদের মধ্য থেকেই আমরা তৎকালের কেন বর্তমানকালের চীনের চরিত্র পর্যন্ত বুঝতে পারব। শামান-বাদ তাদের চরিত্রেব একটি কাঠামো তৈরী ক'রে দিয়েছিল—যার উপর আশ্রয় কবল, কনফুসিয়াস, তাও এবং বৌদ্ধমতবাদ। এই শামানবাদেব মধ্যেই আছে চীনের রাসায়নিক বিজ্ঞানেব মানসিকতা।

শামান-বাদ মোটামুটি বলতে গেলে উত্তর-এশিয়া অধিবাসীর মধ্যে প্রচলিত যাদু-বিদ্যা মতো অনেকটা। বেরিং প্রণালী থেকে স্কাণ্ডিনেভিয়া পর্যন্ত লাপ-এস্কিমোদের অন্তর্ভুক্ত ক'রে এর প্রসার অর্থাৎ উরাল আলতাইক অঞ্চলের প্রথা। এদের ভিষক বা বৈদ্যদেরই বলা হয় শামান। বহু ঈশ্বর মতবাদ, দৈত্য-দানোর কল্পনা, প্রকৃতি-পূজা প্রভৃতি এই প্রথার অন্তর্গত। 'এই ধর্মীয়দের পুরোহিতেরা ধনুক বর্শা এবং বাদ্যযন্ত্র যথা ঢাক বা দুন্দুভি প্রভৃতি ব্যবহার করে। কারও উপর ভূত-প্রেত ভর করলে এরা রোগীকে নিরাময় করে মন্ত্র-তন্ত্র দিয়ে, দেবতা ভর করলেও তাদের ডাক পড়ে। হিস্টিরিয়া বা মূর্ছা রোগগ্রস্তের মতো হয়ে দেবতার ভর এনে সাধারণ মানুষ এবং দেব-দানোর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে আধার হিসাবে। এই উৎসবে নৃত্য

হচ্ছে একটি বিশেষ অঙ্গ। নানারকম পশু-পাখী এবং ব্যক্তির স্বর প্রয়োগ করাও একটি মুষ্টিযোগ বিশেষ।

কিন্তু এর সঙ্গে চীনের মানসিকতার সম্পর্ক কোথায়?

আমরা পূর্বে দেখেছি, শামান বা শমণ বৌদ্ধযুগেরই নয়। আরও আগে ভারতে ছিল। কাজেই বৌদ্ধপ্রথার শ্রমণ কথা থেকে এটি এসেছে এমন মনে করা যায়না। চীন ভাষার শা-মান (Sha-men) শ্রমণ কথা থেকেই এসেছে; তবে বৌদ্ধযুগের আগেকার সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যুক্ত হয় পরবর্তী কালে সঙ্ঘ-শ্রমণদের নাম নিয়ে (Sang men)।

অনেকে অনুমান করেন, বহুপূর্বে ভারতের তারিম অববাহিকায় (ভারতে না বলে তিব্বতের উত্তরে বলা উচিত) এই কথাটি ছিল। সেখান থেকেই শব্দটি এসেছে। তারপর সমগ্র উত্তর এশিয়াতে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু বর্তমানে এই তথ্যের উপর নির্ভর করা হয়না, (Laufer, Needham প্রভৃতি ব্যক্তি)। লউফার (Origin of the word Shaman; American Anthropologist, 1917) বলেন, এটি হচ্ছে প্রাচীন তুঙ্গুসিক শব্দ (Tungusic)। এর সঙ্গে বৌদ্ধ শ্রমণ বা চীনাশব্দ শা-মেন গুলিয়ে ফেলা ঠিক নয়। এই তুঙ্গুসিক শব্দ শামান পারস্যে রূপ নিল 'সামান,' তুর্কীতে এসে 'কামান' হয়ে গেল। তবে চীনভাষায় এই শব্দটি রূপ নিয়েছিল 'হ্‌সিয়েন মান' রূপে। 'হ্‌সিয়েন মান' কথাটি পরিবারগত পদবী হিসাবেও ব্যবহৃত দেখা গেছে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। হয়ত এই পরিবার ধর্মের উপাসক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই কথাটি ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যাপক অর্থটি—যাদুকর অতি-মানবীয় শক্তি বিশিষ্ট। চিঙ্‌ বংশে এদের নাম হয় স্ু-চু (Ssu-chu) হিসাবে।

এছাড়া চীনে শামানদের বলা হত 'উ' (Wu) বলে। নৃত্যের সঙ্গে এই প্রথাটির যোগ আছে। এই উৎসবে শামানরা নৃত্য করত, পালক বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক বস্তু এই নৃত্যের সময় তারা হাতে ধ'রে রাখত। ওঝা হিসাবে তারা অনেক সময় ভালুকের চামড়াও পরত। সময় সময় তারে শূন্যে অনেকটা লাফিয়ে উঠত। ইংলণ্ডেও এই প্রথা দেখা গেছে। এর পিছনে একটি মত আছে যে, এরা যত শূন্যে লাফাতে পারবে তত নাকি ফসল ফলবে। দু রকমের উ ছিল, মেয়ে এবং পুরুষ। মেয়ে উ-র খুব সমাদর ছিল। পুরুষ উ-কে বলা হত হ্‌সি। তাও সমাজে স্ত্রী জাতির প্রাধান্যের জন্য বোধহয় উয়ের (মেয়ে) প্রাধান্য ঘটে। পরবর্তীকালে এই ওঝা বা যাদুকরদের প্রবঞ্চক হিসাবে

অভিহিত করা হয়। যাইহোক সুদূর অতীতকালে এই শামান ধর্মমতই রাষ্ট্রের ধর্ম ছিল। তখন তারা অতি প্রয়োজনীয় ঘোটকের ব্যাধি নিরাময়ও করত। সমাজে এদের যে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা হত তার অনেক প্রমাণ কন্‌ফুসিয়াসের লেখা থেকেও পাওয়া যায়। ভালো বৈদ্যের সঙ্গে তাদের আচরণের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। বড কথা হচ্ছে, তারা বৃষ্টি নামানোর জন্য এমন সব ক্রিয়াকলাপ করত যাতে সমাজে তাদের উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করে। উলঙ্গ হয়ে আগুনে বা রৌদ্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে তাদের নৃত্য বিস্ময়-কর। ঐ ঘর্মবিন্দুই বৃষ্টির প্রতীক।

ওষুধ পত্তরের মধ্যে এরা গাছ-গাছড়া ব্যবহার করত, উৎপন্ন করতে পারত অমৃত রসায়ন। নীড্‌হ্যাম বলেন, এদের মধ্যে দিয়েই চীনে রসায়ন বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয় (Vol II, 1956, page 136)।

কিন্তু এদের সঙ্গে রাজতন্ত্রের সব সময় মিল ঘটেনি। এই সময় তাও ধর্মমতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ঘটে। এর ফলে যাদুর সঙ্গে যুক্ত হয় রাষ্ট্র রাজনীতি এবং দার্শনিকতা। তাও-রা রাজার বিরোধী হয়ে পড়ে, ফলে এই উ-রা ও। এদের মধ্যে একটি প্রথা ছিল, পীত নদীকে কন্যা দান করা। এই প্রথা খৃষ্টপূর্বাব্দ ৪১৫ তে রহিত করা হয়। চতুর্থ শতকেও দেখা যায় মেয়েরা এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছে; তাদের সঙ্গে মিলে তাও-রা পরিবার-গত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে, পূর্ব-পুরুষের শব উৎসব তারাই প্রতিপালন করে (তর্পণ)। মৃতকে পৃথিবীতে নামানো প্রভৃতি নানা রকম ক্রিয়া তারা করত। স্বর নকল বোধ হয় এইভাবে যাদুর সঙ্গে ব্যবহৃত হতে থাকে। আর বড দিক হল, রাজবংশের বিরুদ্ধে গুপ্তসমিতিগঠন। এই গুপ্তসমিতিতে আছে তাও এবং উ। তাবিজ কবজ জ্যোতিষী সমস্ত কিছু তাও আর উ-দের ব্যবসায়।

উ বা শামান সম্পর্কে এতকথা আলোচনা করলাম কারণ, আমাদের দেশে অথর্ববেদী থেকে সুরু ক'রে তান্ত্রিক পর্যন্ত এই ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। চীনে দেখতে পাওয়া গেল—অনেকটা বিজ্ঞান চর্চার মতো কিছু শিক্ষা। অর্থাৎ রসায়ন বিজ্ঞানের অনেকটা আদিম অবস্থা চীনে আমরা শামানদের মধ্যে পাচ্ছি, আর পাচ্ছি লোক ধর্মমত। লোক-ধর্মের মধ্য দিয়েই জাতির সংপ্রত্যক্ষ গঠিত হয়ে যায়—সে কথাটি মনে রাখা দরকার।

খৃষ্ট পূর্বাব্দ ৩০০০ থেকেই দেখা গেছে পীত বা হোয়াংহো নদীর তীরে বেশ সংগঠিত জনপদ সৃষ্টি হয়ে গেল। সেচ কাজও এই সময় দেখা গেছে।

এই পীত নদীর জনপদ প্রাক্ চীন সভ্যতা নয়, বরং আদি-চীন সভ্যতা। এই সভ্যতা এবং জনপদ ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সমুদ্রতটের দিকে প্রসারিত হয়, আর দক্ষিণে ইয়ংসি নদীর তীরে। এখানকার নব্য প্রস্তর যুগের মানুষকে নিজেদের করে নিল এরা। এই জনপদ রাষ্ট্র-গঠনের মূল বা সম্ভাবনা স্বরূপ। সুরু হ'ল ইয়াংসি নদীর তীরের রাজ্যের সঙ্গে উত্তরের রাজ্যের বিবাদ। পার্শ্ববর্তী আদিম অধিবাসীকে এরা পরিবর্তিত করতে করতে মঙ্গোলিয়া থেকে তিব্বত এবং ইন্দোচীন পর্যন্ত চীন রাজ্য মহাচীনে রূপান্তরিত হ'ল। ল্যাটিমোর অবাক হয়েছেন এই ভেবে যে, চীন অধিবাসীদের মধ্যে এই একতার রূপ হঠাৎ কি ক'রে প্রকাশ পেল? পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে তো এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় নি, (The making of Modern China—Page 36) ? মনে হয় বর্বর আর সভ্যচীন তখন থেকেই স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। চীনের সভ্যতা সম্পর্কে গর্ব তখনই দেখা গেছে। এই গৌরবই চীন অধিবাসীকে অগ্রসর করেছে।

চীনের ইতিহাসে দেখা যায় আদিম অধিবাসীর সঙ্গে সভ্য চীনবাসীর অবিরাম বিরোধ। কেন এই বিরোধ? এই বিরোধ থেকে কি নতুন সভ্যতা হ'তে পারে—তা অনুমান করা প্রয়োজন। সাধারণভাবে উত্তর মধ্য এশিয়ার এই আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে একটু আলোচনা ক'রে নিই। অবশ্য এই আদিবাসীদের সম্পর্কে কিছু বলা বিপদ আছে। কারণ, এসব আলোচনা বর্তমান কালের অবশেষ-আদিবাসী সম্পর্কেই মূলত। তবে এশিয়ার আদিবাসী সম্পর্কে নৃতত্ত্ববিদেরা বিশেষ মাথা না ঘামালেও, এই আদিবাসীরা এখনও সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করে ব'লে, যেটুকু আলোচনা হয়েছে নির্ভরযোগ্যতার দিক দিয়ে তা একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না।

প্রথমেই ধরা যাক তুঙ্গুদের কথা (যাদের কাছ থেকে শামান কথাটা পেয়েছি)। উত্তর এশিয়ায় বলগা হরিণের প্রাধান্য বিশেষভাবে দেখা যায়। এই উত্তরের তুঙ্গুরা প্রধানত বলগা হরিণ চরিয়ে বেড়ায়। এক একটি পরিবারের প্রায় ডজন-ডজন থেকে সুরু ক'রে শতশত বলগা হরিণ আছে। যাদের কম, তারা বেশিরভাগ শিকারজীবী, কিন্তু বলগা হরিণের তদারক করে তাদের মেয়েরা। শিকারের সময় মেয়ে-হরিণ নিয়ে তারা বনে যায়। নানারকম শিকার পদ্ধতি তাদের আছে। পশমের জন্য এরা কাঠবেড়াল

বা ঐ রকম জন্তু ধরে। চামড়াগুলি বদল-বিক্রী করে রুশদের সঙ্গে। রুশদের কাছ থেকে তারা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র নেয় এর বিনিময়ে। তুঙ্গরা সাধারণত খাদ-লোহা গালায় না, পরিষ্কৃত লোহা দিয়েই অস্ত্রাদি নির্মাণ করে।

বলগা হরিণের দুধ এরা পান করে। মাংস খায় বটে তবে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে। গাড়ী চালাতেও তারা বলগা-হরিণ ব্যবহার করে। কিন্তু এই হরিণের বড় শত্রু মশা। কাজেই এই সময়ে তাদের যেতে হয় কোন উঁচু স্থানে; আগুনের ধোঁয়াও জ্বালাতে হয়। এই হরিণ লবণপ্রিয়। কাজেই লবণ যোগাতে হয়। শীতকালে বাঘের উৎপাত। অর্থাৎ বলগা হরিণ যেমন সম্পদ তেমনি তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও তাদের অনেক হাঙ্গামা। জীবন থেকে তাদের শিখতে হয়।

ঋতুচক্র অনুযায়ী তাদের জীবনযাত্রা প্রণালীবদ্ধ। শীতকালে অনটন বশত তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে খাদ্যান্বেষণে ছড়িয়ে পড়ে, আবার গ্রীষ্মের সময় গ্রামের মতো বাস করে।

তা হলে জীবনযাত্রায় দেখছি দুটি রূপ, একটি যাযাবর আর একটি সমাজবদ্ধ হওয়া, বিচ্ছিন্নতা এবং সংযুক্তি একই সম্প্রদায়ে। অনুমান করা খুব কষ্ট হয় না যে, এমন কোন সমাজ-নীতি আছে যাতে দুটি দিক বেশ নিয়মিত হতে পারে। এই শিক্ষা ভৌগোলিক যেমন, সামাজিকও তেমনি। বিচিত্র পরিবেশ তাদের অভিনব সমাজপদ্ধতি নির্ণয় করতে সক্ষম করেছে।

সমাজপদ্ধতির মধ্যে দেখছি তারা পিতৃতন্ত্রপ্রথার। নিজেদেরই ভাষা আছে। কিন্তু কুলগত নামই আছে, কওম-গত নাম নেই, ঐক্য নেই। কুল বা গোত্র নানা রকমের, ১২ থেকে শতাবধি গৃহস্থ নিয়ে। উত্তরাধিকার সূত্রে কোন মণ্ডল বা মাতব্বর থাকে না। যখন লড়াই সুরু হয়, তখন সর্দার নির্বাচন ক'রে নেয়। গ্রীষ্মের সময়ে একত্র হয়ে ঝগড়া সালিশ করে, মীমাংসা করে। যখন মহামারীতে বা রোগে বলগা হরিণ কমে যায় তখন সকলের হরিণ একত্র করে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। মালিকানা তা হলে পরম-ভোগের নয়। হরিণের দুধ নিয়েও এমনি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা আছে কিন্তু তা সমাজ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এখানেও দুটি দিক দেখছি—ব্যক্তিগত মালিকানা আর সর্বজনীন স্বত্ব। বলগাহরিণ বলি দেয় কারণ তারা মনে করে—মৃতপুরীতে এই জীবন্ত মানুষের যোগাযোগ সে এই ভাবে করে দেয়।

প্রথম স্ত্রীর যদি সন্তানাদি না হয় তবেই দ্বিতীয় বিবাহ করা চলে—নতুবা এক স্ত্রী গ্রহণ করা বিধান।

সামোয়েদের জীবনযাত্রা অনেকটা এইরকম, তবে তারা বলগাহরিণের উপর এমনভাবে নির্ভর করেনা।

তুঙ্গুদের উত্তরে আছে ইয়াকুটরা। এরা ঘোড়ার উপর নির্ভরশীল; এরা পশুদের মাছ মাংস খাওয়াতে বাধ্য করে। কেন করে সে কথা ভাববার বটে। বর্তমানে এরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সরে আসছে। ঘোড়ার অভাবে এরা বল্গাহরিণের উপর নিভরশীল হয়ে পড়েছে।

এমনি আরও আদিবাসী আছে যেমন, চাকচী, কোরিয়াক, ইয়ুকাগির। শেষোক্ত আদিবাসীরা এখনও খাঁটি শিকারজীবী বা খাদ্যসংগ্রহকারী অবস্থায়।

এরপর পাওয়া যায় কাজাক, কিরঘিজ, কালমাকদের। কাজাকরা পিতৃতন্ত্রপ্রথার। ছোট ছোট দলে বাস করে, কিন্তু লড়াইয়ের সময় তারা বৃহৎ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এদের মধ্যে রাজ্য গড়বার মতো শক্তি দেখা দেয়নি বটে কিন্তু বড় যুদ্ধ-বাজ। কাজাকদের কুলগত ঐক্যই প্রধান; এই একতার মধ্যে অন্তর্নিহিতই তাদের আর্থিক ব্যবস্থা এবং ভূমি ব্যবস্থা। প্রত্যেক কুলের (clan) একজন করে সর্দার থাকে। এই সর্দার-রাই হচ্ছে নিয়ম রক্ষক। প্রত্যেক কুলের শিরস্ত্রাণে তাদের বিশিষ্ট বিশেষ প্রতীক থাকে, যে পশু তারা চরায় সেই পশুরই একটি প্রতীক নেয়। তাদের পরিবার ও স্বামীদের নিজস্ব পশু-চারণ ভূমি থাকে, তবে দরিদ্ররা ধনীদের কাছ থেকে অভাবের সময় খাদ্য-সাহায্য পায়। শীতের সময় অভাব অনটন বেড়ে যায়। সে সময় তারা পরস্পরের উপর নিভর করতে শেখে। দাসপ্রথা এদের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ছিল। এই কাজাকরা সামাজিক হিসাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—শ্বেত এবং কৃষ্ণ (white bones and black bones); প্রথমোক্ত দল সম্ভ্রান্ত তারা জেঙ্গিস খাঁর বংশধর বলে দাবী করে; এই দুই দলে অন্তর্বিবাহ নিষিদ্ধ।

গ্রীষ্ম এবং শীত এই দুই কাল অনুযায়ী তাদের জীবনযাত্রা নিরূপিত হয়। অভাবের সময় তাদের আঞ্চলিক দাবী থাকেনা; সুবিধামতো তারা অঞ্চল অধিকার ক'রে নেয়। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে অভিযানে বের হয়। কোন্ সময় কোন কুল কোন্ অঞ্চলে যে আক্রমণ করবে তা অন্যে জানতে পায় না। অর্থাৎ ভাগ্যান্বেষী এবং সুযোগ সন্ধানী।

পশুচারণ ছাড়া এরা কৃষিকাজও করে। এই কৃষিকাজে তারা দাস নিযুক্ত করে। শিকার যাত্রা বিশেষ দেখা যায় না।

এশিয়ার এই আদিবাসী ছাড়া চীনের দক্ষিণে ভারতে আছে মঙ্গোলদের শাখা লেপ্‌চা (···the Lepchas, an agricultural people of Sikkim are actually of Mongolian race. Ralph Piddington, An Introduction to Social Anthropology. Vol I, Oliver and Boyd London 1950 ; page 65)।

এই আদিবাসীদের ঘেরের মধ্যে তুরানীয়ান বা উরো-আলতাইকে জাতি হিসাবে চীন সমাজ গঠিত হ'ল; উরো-আলতাইকে জাতির মধ্যে পড়ে মঙ্গোলীয়, চীনা, মাঞ্চু, জাপানী তুর্কী, তাতার, ফিন এবং হাঙ্গারীর আদিবাসী। মূলত এরা ছিল যাযাবর। এই যাযাবর সম্প্রদায় সভ্যতা গঠন করল, নগর নির্মাণ করল ; আর তারই প্রাচীন নিদর্শন চীনাস্থান (Historical survey of Pre-christian Education ; Laurie, Longmans Green & Co, London 1907, page 103) ;

চীন নামটা হ'ল কি করে? সে এক মজার কথা। পশ্চিম-দেশ অর্থাৎ ইয়োরোপ গ্রীক শব্দ পেল সের অর্থাৎ সেরিস (Seres) ; কারণ স্সু (ssu) কথা চীনের ; তার অর্থ সিল্ক বা রেশম। রেশমের বাণিজ্য থেকেই এই নাম চালু। কিন্তু অনেকে অনুমান করেন ঐ শব্দে চীনবাসীকে মনে করা হত না; মনে করা হ'ত সাইবেরিয়ার যে সব লোক রেশম নিয়ে বাণিজ্য করত।

ক্যাথে বলেও ইয়োরোপে চীনকে বোঝাত (Cathay)। এ দুটি নাম একই কি না সে নিয়ে মতভেদ থাকলেও একটা মত দাঁড়িয়েছে এই যে, জলপথে যারা আসত তাদের বলা হয় চীন আর স্থলপথে যারা কারবার করত তাদের বলা হত ক্যাথে (Needham, vol I ; Page 169)।

কিন্তু চীন নামটি ভারতেরই দান। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে চীন বংশের (Chhin) রাজত্বকালে এই রাজ্যের সংযুক্তি ঘটে। গৌরবের যুগ। এই বংশকে মনে রেখেই সংস্কৃতে এলো চীন-স্থান বা মহাচীনস্থান। ঐ চীনস্থান থেকেই লাতিনে এল সিনা। এইভাবে বদল হ'তে হ'তে চলল। আরবে হ'ল অল-সীন! আর্মেনিয়ানে হ'ল জেনাস্‌দান (Jenasdan)।

যাইহোক দেখা যাচ্ছে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের চীনবংশ পৃথিবীতে চীন-সভ্যতার একটা স্থায়ী প্রভাব রাখতে পেরেছে।

তবে খৃঃ পূ তৃতীয় শতক ছাড়াও চীনের ঐতিহাসিক কাল পাওয়া যায়, খৃঃ পূ ১৫২০ থেকে। অর্থাৎ যখন থেকে আমাদের দেশে বৈদিক যুগ সুরু হ'ল। মোটামুটি একটা হিসাব করা যাক :

খৃঃ পূঃ ২০০০ থেকে খৃঃ পূঃ ১৫২০ —হ্‌সিয়া রাজ্য (কাহিনী গত যুগ)।

" " ১৫২০ " " " ১০৩০ —শাঙ্‌ বা ইন রাজ্য।

" " ১০৩০ " " " ২২১ —চাউ বংশ (সামন্ত তান্ত্রিক যুগ)।

" " ২২১ " " " ২০৭ —চিন বংশ (সংযুক্তির যুগ)।

" " ২০২ " " " ২২০ —হান বংশ।

খৃষ্টাব্দ ২২১ " " " ২৮৫ —শূ, ওয়েই এবং উ বংশ (বিভক্তি যুগ)

" " ২৬৫ " " " ৪২০ —চীন বংশ (সংযুক্তি ২য়)

" " ৪২০ " " " ৪৭৯ —স্বঙ্‌ বংশ।

খৃষ্টাব্দ ৪৭৯ থেকে খৃষ্টাব্দ ৫০২ চী বংশ (২য় বিভক্তি যুগ)

... ৫০২ ... ৫৫৭ লিয়াং

... ৫৫৭ ... ৫৮৭ (?) চেন

(এরই মধ্যে আছে উত্তর, পূর্ব, পশ্চিমের ওয়েই বংশ, উত্তর চি বংশ, উত্তর চাউ বংশ)

... ৫৮১ ... ৯০৬ সুই এবং তাঙ বংশ (তৃতীয় সংযুক্তি)

... ৯০৭ .. ৯৬০ এবং ১১২৭ (?) (তৃতীয় বিভক্তি যুগ)

... ৯৬০ ... ১১২৬ উত্তরের স্বঙ্‌ বংশ } চতুর্থ

... ১১২৭ ... ১২৭৯ দক্ষিণ ... } সংযুক্তি

(এরমধ্যে ১১১৫ থেকে ১২৩৪ পর্যন্ত তাতার চীন, এবং ১২৬০ থেকে ১৩৬৮ হচ্ছে মঙ্গোল ইয়ুআন বংশ)।

... ১৩৬৮ ... ১৬৪৪ মিঙ্‌ বংশ

... ১৬৪৪ ... ১৯১১ মাঞ্চু চিঙ্‌ বংশ

... ১৯১২ থেকে... ... রিপাবলিক।

নীড্‌হামের সারণী থেকে আমরা মোটামুটি এই তালিকাটি নির্ণয় করলাম। এর মধ্যে শাঙ্‌ বংশের সময়ে (খৃঃ পূঃ ১৫২০ থেকে) চীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। পূর্বে বর্ণিত ঐন্দ্রজালিক ধর্মমত ছাড়া, ব্রোঞ্জের কাজ ছাড়াও গম উৎপন্ন করতে শিখিয়েছে। অনেকে অনুমান

করেন, পশুচারণ জীবনযাত্রা চীনে কখনও ঘটেনি (কারণ দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যের চিহ্ন দেখা যায় না খাদ্যতালিকায়) তারা একেবারে কৃষিজীবীতে এসে পড়েছে। কথাটা যদি সত্য হয় তবে ভাববার মতো। আমরা তুঙ্গুদের মধ্যে দেখেছি দুগ্ধের প্রচলন; মাংসাহারই বরং নিয়মিত। তবে কি চীনেব এই অধিবাসীদেব সঙ্গে অপরিচয ছিল? অপরিচয় যে ছিল না—তার বড প্রমাণ শামান ধর্মমত। তবে কি শক্রতা এসেছিল? শত্রুতা এসেছিল কি দুধরণেব জীবনযাত্রার জন্য? এবা কি সামোযেদ জীবনযাত্রার অনুরূপ পদ্ধতিতে চলত? মীমাংসা করা কঠিন। তবে চীনের একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবাব মতো—এরা এমন একটি জাতি যাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে হুণ মঙ্গোল, বা তাতাব কাজাক বা তুঙ্গুদের একটা সঙ্ঘর্ষ আবহমান কাল থেকে আছে।

শাঙ্ বংশ থেকেই দেখা যায় সামন্ত প্রথাব উদ্ভব। তবে শাঙ্রাষ্ট্র খুব বড ছিল না। রাজধানী থেকে একশ-দুশ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কিন্তু দাসপ্রথা, নববলি এবং মাতৃতন্ত্র প্রথার অবশেষ এই যুগে দেখা যায়। মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে তারা এই সময়েই আসছে।

দ্রব্যমূল্য হিসাবে এই যুগে কড়ি ব্যবহৃত হ'ত। কড়ি হয়ত ইয়াংসি সঙ্গম থেকে প্রশান্ত মহাসাগব এলেকা থেকে আমদানী হ'ত। কথাটা সত্য হলে দূরপথে ব্যবসাবাণিজ্য স্বীকাব করতে হয়। চীন ভাষায় মূল্য কথাটা হত 'পেই (pei) শব্দে। ঐ শব্দটির অর্থ কড়ি, (আমাদের দেশে পাই পয়সা অর্থে ব্যবহৃত হ'ত; তাব উদ্ভব কড়ি থেকে কিনা, কিংবা দু দেশের শব্দে কোন ঐক্য আছে কিনা আলোচনা সাপেক্ষ)।

এই যুগে বাঁশেব জিনিসেরও প্রচলন ছিল। পুস্তক ইত্যাদি লিখিত হত বাঁশ এবং কাঠে। বিদ্বানের গৃহ একটি গুদাম গোছেব হয়ে পডত। এই জন্যই বোধ হয়, সেকালে চীনে গ্রন্থের বহ্ন্যুৎসব খুব সহজ ছিল। রাজার আক্রোশ পডলে কোন গ্রন্থই বাচান যেত না। হয়েছিলও তাই, চাউ বংশ শাঙদের সমস্ত পুথিপত্র নষ্ট করবার এমন ব্রতই নিয়েছিল যে, তার কিছুমাত্র অবশেষ নেই। কিন্তু শাঙ্যুগ থেকেই যে লিপি সুরু হয়েছিল বা তার অস্তিত্ব ছিল তার অনেক প্রমাণ মেলে। প্রথমে বোধ হয় ছিল চিত্রলিপি (pictogram)। মিশরের লিপি থেকে এ লিপি নতুন, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, মিশরে প্রাচীন চিত্রলিপি বা ভাবলিপি আর নেই, কিন্তু চীনে এখনও এই লিপিই অনেকাংশে বর্তমান।

শাঙ্-যুগের চিহ্ন থেকে আরও অনেক খবর পাওয়া যায়। বিশেষ সমাজ গঠনের। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন চীনসভ্যতার মধ্যে কয়েকটি শ্রেণীভেদ করা যায়:

(১) উত্তর সমাজ—সাধারণত ইয়াংশাউ এবং লুঙ্শান সংস্কৃতির প্রভাবে; এদের মধ্যে আছে তুঙ্গু চরিত্রবৈশিষ্ট্য

(২) উত্তর-পশ্চিম গোষ্ঠী—তুর্কীচরিত্র বৈশিষ্ট্য, অনেকটা যাযাবর ;

(৩) পশ্চিম গোষ্ঠী—তিব্বতীয় প্রভাব ;

(৪) দক্ষিণ বা দক্ষিণ পূর্ব গোষ্ঠী—থাই প্রভাবে ; এদের বলা হত সমুদ্রতটবাসী বা ইয়ুয়ে।

শাঙ্-যুগের চীনরা হয়ত উত্তরের সমাজ এবং দক্ষিণ-পূর্ব সমাজের প্রভাবে গঠিত। অর্থাৎ শামান-বাদ আছে, সর্পপূজা আছে, ড্রাগন আছে, নৌকো যাত্রা আছে, পর্বতপূজা আছে, বন পুড়িয়ে জনপদ গঠনের শিক্ষা আছে, শরৎ এবং বসন্তকালের উৎসব আছে, ব্রোঞ্জ-বাদ্য আছে, কুকুর প্রতীক নিয়ে ইন্দ্রজাল আছে।

চাউদের রাজত্বকাল রাজনৈতিক দিক দিয়ে খুব যে একটা নতুন কিছু করেছে তা মনে করা যায় না। এরা শাঙ্দের থেকে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর। শেন্সি অঞ্চলের পশ্চিমে বাস করত। প্রায় ৯০০ বছর রাজত্ব করে। এরা বিদেশী নয়, শাঙ্দের অনেক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত ছিল, তাদেরই সূত্র গুলি প্রয়োগ করে চীনসভ্যতার স্থিতি সম্পাদন করে। ভাষা তার মধ্যে একটি, দ্বিতীয়টি সামন্ততন্ত্র। ব্রোঞ্জ যুগকেও তারা অনেক এগিয়ে নিয়ে এল। কিন্তু সাহিত্যদর্শন সংস্কৃতি দিক দিয়ে এই যুগকে স্বর্ণযুগ বলা যায়। কনফুসিয়াস, মেনসিয়াস, লাউৎসে এবং মোৎসে এই যুগেরই দার্শনিক।

সামন্ত-প্রথা চীনের ভূগোলে রয়েছে, কর্মক্রিয়ার চরিত্রে রয়েছে। জলসেচন প্রক্রিয়ায় যৌথক্রিয়া প্রয়োজন ; উপত্যকাগুলি যদি জনপদ হয়, তবে তাদের সংযোগ বিশেষ একটা থাকে না, এক একটি জনপদ অন্য থেকে নিরপেক্ষ হ'তে চায়। অনেকটা দেহের কোষের মতো এই জনপদ। কিংবা বলা যায় চাকের মত। প্রত্যেক চাকে একটি ক'রে প্রাচীর ঘেরা নগর ; এখানে ফসল ইত্যাদি গোলাজাত করা হয় ; অভ্যন্তরে কারিগরেরা কাজ করছে, কাপড় তৈরী করছে, অস্ত্র তৈরী করছে, তৈজস তৈরী করছে, বাণিজ্যিক সমস্ত বিষয়ই উৎপন্ন বা নির্মাণ করা হচ্ছে। ৩০ থেকে ৬০

মাইল ব্যাসার্ধ নিয়ে এইরূপ নগর। প্রাচীরে ঘেরা করবার কারণ নিরাপত্তা। কিন্তু এই জলসেচ আর প্রাচীর চীনবাসীর ইঞ্জিনীয়ারিং জ্ঞানের এবং শিক্ষার বিশেষ পরিচয় দেয়। তা হলে বিজ্ঞানের তুটি দিক—রসায়ন ও শিল্প-বিজ্ঞান চীনের চরিত্রে এবং জীবনযাত্রায় বেশ উদ্ভাসিত হচ্ছে।

রাজনীতির দিক দিয়ে তারা এখনও জাতীয়তা বোধ পাইনি, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠন করেছে। সামন্তদের মধ্যে ঐক্য এনেছে চাউ সম্রাট। চাউসম্রাট এক শাসন আনে নি, এনেছে সামন্তদের বশ্যতাবোধ। কিন্তু অভিজাততন্ত্রও এখান থেকেই সৃষ্টি হ'ল। এখান থেকেই সুরু হ'ল তুটি শ্রেণী—কৃষক আব অভিজাত; বণিক বা দোকানদার আর ভদ্র; শিক্ষিত আর অশিক্ষিত; রাজকর্মচারী আর দাস।

চাউদের রাজধানী শেন্‌সী প্রদেশের সিয়ান নগরে। ৩০০ বছর পর্যন্ত এই রাজধানী; তারপর খৃঃ পূঃ ৭৭১ চাউরা পশ্চিমের অনগ্রসর জাতির কাছে পরাজিত হ'য়ে পূর্বে সরে এসে উত্তর হোনানে, পূর্বকালের শাঙ রাজ্যে, রাজধানী তৈরী করল। অর্থাৎ পুরনো চীন সংস্কৃতি ক্ষেত্র আবার জেগে উঠল। এখানেও খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে তারা সামন্তদের কাছে হেরে রাজপদ থেকে অপসৃত হল।

চাউদের ধ্বংস করা হল বটে, কিন্তু এই রাজত্বকালের শেষের দিকে বিভিন্ন দার্শনিক সাহিত্য শিক্ষার যে ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হল, তা চীনের শিক্ষাকে নিয়মিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ করে দিল। এই যুগ গৌরবের, তার কারণ রাজনৈতিক দিক দিয়ে নয়, তার কারণ সংস্কৃতি বয়নের যে টানা এরা জুড়ে গেল পরবর্তী কালে তারই উপর পোড়েন গেঁথে চীনের সংস্কৃতি গঠিত হয়, (It was glorious, not for political achievements, but for the establishment of the culture which became the warp on which future ages wove their varying patterns—A History of China, W. E. Soothill ; Ernest Benn Ltd, London—Revised Edition 1950 Page 21)।

এই ইতিহাস থেকে আমরা চীনের মোটামুটি :গঠন প্রকৃতি জানতে পারছি; শিক্ষা যে কি চরিত্র নেবে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু আরও স্পষ্ট করবার জন্য রাজনৈতিক ইতিহাস বাদ দিয়ে আমরা চীনের ভাষা ও দার্শনিকতায় সম্পর্কে একটু সন্ধান করি।

চীনভাষা একাক্ষরা ; কোন রকম প্রত্যয়-বিভক্তি নিষ্পন্ন নয় ; ছাড়া ছাড়া কিন্তু শব্দগুলি মূল ভাব থেকে আহৃত হয়ে পড়ে। একই শব্দ বিশেষ্য, ক্রিয়া, অনুসর্গ বা ক্রিয়া বিশেষণ পদে ব্যবহৃত হয়। কেমন করে অর্থভেদ হয়? তাদের স্বরে ঝোঁকে অথবা শব্দের স্থান ভেদে। শিশুরা যেমন বাক্য বলে, একটার পর একটা শব্দ ব'লে—কোথায় যোগসূত্র নেই : চীনের ভাষার বাক্যও তেমনি এক দেহী নয়, (The speech of the Chinese is monsyllabic ; out of the radical they form compounds.......The speech of the Chinese has been aptly compared to that of a child, which utters words one after another without forming them organically into a sentence. Laurie—Historical survey of pre-christian Education, Longmans, Green & Co, London, 1907 page 105)।

বর্ণমালা চিত্র-প্রতীক (pictograph) অর্থাৎ কোন দৃশ্য বা ভাববস্তুর প্রধান ছাপটি (impressions or essentials) সমাজ-স্বীকৃতি বা স্বমিতি স্তরে এনে তাকে রূপ দেওয়া বা অঙ্কন করা। সাধারণত মূর্ত বিষয় বা নভোচর বস্তু, জীবজন্তু বা প্রাণী, উদ্ভিদ জগৎ, মানুষেব সৃষ্ট উপকরণাদিই এই বর্ণমালায় স্থান পেত। তার পরেব যুগে পরক্ষোভাবে প্রতীকও সৃষ্ট হ'ল (indirect symbols)। এই পরোক্ষ প্রতীকেরও একটা নিয়ম ছিল যে, সামগ্রিক থেকে আংশিক বা প্রধান চিত্রেব আভাস মাত্র গ্রহণ করা হ'ত ; মানুষের ভাব-ইঙ্গিত বর্ণমালায় স্থান পেল , দ্রব্যের কোন গুণ নিয়েই চিত্রাঙ্কন চলত ; (যেমন পাখীর কেবল উড়ন্ত ভাব, মানুষের দ্বন্দ্বের রূপ প্রভৃতি)।

যদি দেখাতে হয় মানুষ উপরে উঠছে তবে হয়ত ছবি আঁকা হ'ল, মানুষের পা উপরের দিকে তোলা ; পূর্ণতা বোঝাতে কলসী ব্যবহার প্রভৃতি।

এইগুলি হ'ল ভাব-প্রতীক কিন্তু কোন বিষয়কে মূল হিসাবে ধ'রে। কিন্তু দুটি বিষয়ের সংযোগে একটি ভাবকেও বোঝানো হত। যেমন হাত এবং ঝাঁটা দুটির সমবায়ে স্ত্রীজাতি, হাত এবং লাঠি মিলিয়ে স্বামী বা কর্তা, স্নেহ বা ভালোবাসা বোঝাতে একটি মেয়ে এবং তার কোলে একটি সন্তান।

আর একপ্রকারের ছবি হ'ত অন্যোন্য ব্যাখ্যামূলক প্রতীক (mutually interpretative symbols)। পরীক্ষা বোঝাতে বৃদ্ধের ছবি দেওয়া হত কারণ বৃদ্ধেরাই ছোটদের পরীক্ষা নিত।

কিন্তু সমোচ্চারিত শব্দ নিয়ে কিছু গোলমাল হয়েছিল। কবির কথায় এবং কালক্রমে এই শব্দগুলি মূলভাব থেকে পরবর্তীকালে অনেকখানি সরে এসেছে। এগুলি যেন বিশেষ ভাবটি থেকে ধার নিয়ে অন্য একটি ভাব বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকল। ভাষাতত্ত্বের পক্ষে এইসব শব্দ অনেক মূল্যবান; এরা অতীতের নানা ঘটনাকে যেন নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

একরকমের শব্দ আছে যার উচ্চারণ এবং বর্ণ একই, কিন্তু সেটি যে-শব্দের সঙ্গে বসে তার সমবায়ে নতুন অর্থ সূচনা করে। অর্থাৎ মূল শব্দের অর্থকে এরা নিয়ন্ত্রিত করে (determinative phonetic) যেমন,

চিন (ধাতু) + থুঙ্গ = তামা বা ব্রোঞ্জ,

চু (বাঁশ) + থুঙ্গ = বাঁশি

হ্‌সিন (হৃদয়) + থুঙ্গ = বিমষ।

এখানে থুঙ্গ শব্দটি মূল শব্দকে পরিবর্তিত করছে। তেমনি.

শুই (জল) + মো (শাখা) = ফেনা,

শুই (জল) + লাঙ (প্রান্ত) = ঢেউ

শুই (জল) + চা (চিমটা) = নদীর শাখা।

এই যে ছ রকমের বর্ণরূপ বলা হল তার সম্পর্কে চীন দেশে ত্রয়োদশ শতকে অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের একটা অভিধানে ৪৯০০০ শব্দের মধ্যে শতকরা ৯৫টিই শেষোক্ত ষষ্ঠশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই কথাটি ভাববার মতো। খৃঃ পূ ১৭৪০-এই দেখা গেছে চীনে লেখার অভ্যাস জন্মেছে; প্রমাণ প্রয়োগে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে খৃঃ পূ ৩০০০-এই লেখ্যরীতির অস্তিত্ব আছে (Lauric, page 106)। কিন্তু ভাষা বা শব্দরীতির বদল কেমন ক'রে ঘটছে, চীনবাসীর পর্যবেক্ষণ শক্তি কিভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ধারা বেয়ে চলেছে তা চিন্তা করতে গেলে চীনের শিক্ষা এবং বুদ্ধির চলতা ধর্মিতা যে বিলক্ষণ ছিল তা অনুমান করা যায়।

খৃঃ পূ পঞ্চদশ শতক থেকে খৃঃ পূ একাদশ শতকে শাঙের যুগে সাধারণত চিত্রধর্মিতা বর্ণ বিন্যাসে বেশি, তবে অন্যান্য কয়েকটি শ্রেণীর শব্দও এসেছে। চাউ-এর যুগে (খৃঃ পূ ১১শতক থেকে খৃঃ পূ ৩য় শতকে) ষষ্ঠ শ্রেণীর শব্দ বেশ বেড়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তী কালে চীনের শব্দধ্বনি যেরূপ তেমন লিখিত রূপে মিল থাকল না। অসুবিধা হলনা কেন? অনুমান করা হয়, লিখিত রূপ স্থায়ী রূপ, কাজেই চীনের ভাষা উচ্চারণে আঞ্চলিক তারতম্য থাকলেও পড়ে

তারা চিং বুঝত। ভাষার এ যেন এক আঙ্কিক নিয়ম। এই আঙ্কিক নিয়মে খৃষ্টাব্দ চতুর্দশ শতকে পারস্যবাসী অকৃষ্ট হয়। হরফ বা বর্ণমালা যে উচ্চারণ থেকে বিমুক্ত চীনের এই অভিনব দিক পারস্য বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য করেছিল। কেবল পারস্য বৈজ্ঞানিক কেন, ইয়োরোপের লেইবনীজও (Leibniz) এই আদর্শের উপর নির্ভর ক'রে তিনি অঙ্কের ন্যায় স্থাপন করেন (Needham, vol, I page 33)।

আমরা চীনের ভাষা বা শব্দ নিয়ে আর বেশি আলোচনা করবনা। কিন্তু চীনের অভিধান এবং শব্দ যে তার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অনেক খবর দেয় তার সম্পর্কে ইয়োরোপের অনেক শিক্ষাব্রতী একমত। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী লেখক বলছেন যে, তাদের শব্দ আলোচনা ক'রে একথা প্রমাণ হয়েছে—জ্যামিতির সমকোণী ত্রিভুজের অনেক চরিত্রই তারা খৃঃ পূ ২২০০ বছরে আবিষ্কার করেছিল, ওরই উপর নির্ভর ক'রে তারা নদীর গতিপথ জলধারা নিয়ন্ত্রিত করেছিল; জোয়ার ভাঁটা যে চন্দ্রের আকর্ষণ-বিকর্ষণে তা তাদের অভিধান থেকেই বোঝা যায়; উদ্ভিদবিজ্ঞান এই চীন থেকেই জগতে ছড়িয়ে পড়েছে ইত্যাদি।

এই প্রাপ্তির মূলসূত্র হচ্ছে চীনবাসীর পর্যবেক্ষণ শক্তির ব্যবহার। দুই চোখ দিয়ে তারা দেখছে, তাকে শব্দে গেঁথে ফেলছে। শব্দ রেখে দিচ্ছে তাদেব অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা পুনরায় নতুনের সন্ধানে পাঠককে এগিযে দেয়। জাতিগত শিক্ষার দিক দিয়ে এ এক অভিনব পদ্ধতি। যদি কেউ ভাষা পডতে পারে, শব্দগুলো বুঝতে পারে, তবেই তার অনেক বিষয় আয়ত্ত হয়। শব্দের মধ্যেই রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা এবং সমাজ-নীতি। আমাদের ভাষায় আমরা বিষয়বস্তুকে বর্ণনা করি, ভাষা যেন বাহ্য, ভাষা বিষয়ের অবলম্বন, কিন্তু বিষয়ই প্রধান। কিন্তু চীনাভাষা ভাষাই বিষয়, বিষয়ই ভাষা। চীনভাষা হয়ত কৃত্রিম কিন্তু সর্বজনীন। মানুষে হয়ত বলেনা, কিন্তু সকল মানুষ সমান পড়ে, বৈষম্য নেই। কোন প্রকারে একজন চীনবাসী যদি লেখাপড়া আয়ত্ত করে তবে হাজার বছর আগে মানুষ যেমন পড়েছিল সে তেমনই পড়তে পায়; তেমনি আনন্দ পায়, উপভোগ করে। আমাদের দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা আজ হয়ত উপভোগ করতে পারি না, রবীন্দ্রনাথের ভাষাও একদিন হয়ত পুরনো হয়ে যাবে, কিন্তু চীনের ভাষার এ পরিবর্তন নেই। এইজন্য চীন অবিরত প্রাচীনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়,

প্রাচীনতার সঙ্গে সঙ্গে চলে। ভাষার এই সংস্কৃতি-কার্মিকতা চীনের সম্পদ বিশেষ। শিক্ষায় যত বাধাই থাকুক, শিখলে বাধা থাকে না।

আর তারই ফলে চীনের প্রাচীন শিক্ষাধারা বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলেছে। অনেক বিপ্লব এসেছে, শিক্ষার্থীদেব কাছ থেকে অনেক অভিযোগ এসেছে কিন্তু তাতে ভাবের পরিবর্তন ঘটেছে, ভাষার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। চীনবাসীর ঐক্য সাধনের এ এক বড কাবণ।

শিক্ষাশাস্ত্রে ভাষা যেমনি একটি উপকরণ, তেমনি উপকরণ চীনের মনীষীদের লোক-ধর্মমত। এই ধর্মমত চাউযুগ থেকে মূলত উৎসারিত হয়। আমরা এই প্রসঙ্গে সেই সবের একটু আলোচনা করে নিই।

শাঙ্‌বংশকে অপসারিত করেন উ ওয়াঙ, বা রাজা উ; তিনি রাজ্যকে ভাগ ভাগ করে ভূস্বামীদের বিতবণ করেন। তাঁর অনুজ ছিলেন তাঁর মন্ত্রী। তাঁকে দেওয়া হ'ল লু প্রদেশটি। লু অঞ্চল শানটুঙে অবস্থিত। এখানেই কনফুসিয়াস জন্ম গ্রহণ করেন খৃঃ পূঃ ৫৫২ তে। লু-র এই অধিপতিকে বলা হত চাউয়ের রাজা (Duke of Chow)। তাঁর জ্ঞান পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্বকেই কনফুসিয়াস আদর্শ হিসাবে পরিগণিত কবেন, (His wisdom and magnanimity made him the ideal man of Confucius. Soothill page, 1)।

লু-র অধিপতি ধর্মকে ব্যক্তির বদলে সম্প্রদায়গত করে তোলেন। এই জন্যই নীতি প্রভৃতি ধর্মেরই অঙ্গ হয়ে গেল। এই দুই জনের সমবেত প্রচেষ্টায় চিন্তা, প্রেষণা, সামাজিক এবং ব্যক্তিক উদ্দেশ্য যেন নতুন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হ'ল। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মঙ্গলসাধনই দেশবাসী এবং রাজার কর্তব্যের মধ্যে দাঁডায়। সম্রাট বা রাজার জীবন-চরিত্র অনুষ্ঠানিক ক্রিযা কর্মের মধ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, পুরনো ঐতিহ্যকে অনুসরণ করা সম্প্রদায়ের মঙ্গলের মধ্যে পরিগণিত হয়।

এই যুগটি ব্রোঞ্জ-যুগ এবং আদি সামন্তযুগকে কেবল অতিক্রম করতে বসেছে। সামন্তদের মধ্যে প্রতিযোগিতা রয়েছে, কে কাকে পরাভূত করতে পারে; একটা যুদ্ধের আবহাওয়া।

এই আন্দোলন বিশেষ বিষয়ের ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও এসে ধাক্কা দিয়ে পড়ল। এদের মধ্যে লিপিকর, লিপি সম্পাদক, উৎসব-অনুষ্ঠান কারী, সঙ্গীত এবং সৈন্য শিক্ষণ শিক্ষক এবং ধাতু বা কাঠের কর্মীদের ধরা যায়।

পুরনো যুগ এদের অভিজ্ঞতায় আছে, শাঙবংশের লোকও আছে। শাঙবংশজ সামন্ত বা ভূস্বামী পদ থেকে অপসারিত হয়েছে, কাজেই সেসব অভিযোগও রইল। সমাজ থেকে তাদের প্রায় অপাংক্তেয় ক'রে রাখা হয়েছিল।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে চীন দেশে একটা বিশেষণ পদ পাওয়া গেল 'জু' নামে। 'জু' অর্থ দুর্বল। অপসৃত শাঙবংশজেরা লোকের এই অপবাদকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ ক'রে বসল। এই ভেসে বেড়ানো 'জু' বা হৃত মর্যাদা ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য বিদ্যা-বুদ্ধির সাধনা করতে থাকে। আদি তাও মতের অন্তর্ভুক্ত যারা হ'ল তারা ছাড়া এই পণ্ডিতবর্গ রাজসভায় পুনরায় চাকুরী বাকরী বা অন্য দায়িত্বসম্পন্ন পদ গ্রহণ করতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে। এই দল কনফুসিয়াসের আগেও যে তাঁর মতো সমাজ মত ঘোষণা করেননি এমন বলা যায় না। কিন্তু কনফুসিয়াসের মতো তাঁদের হয়ত মৌলিকতা ছিল না, তাই তাঁরা এতটা সফলকাম হন নি।

কনফুসিয়াস নামটি ইয়োরোপের বিকৃত উচ্চারণ থেকে এসেছে। যেমন গঙ্গাকে গ্যাঞ্জেস বলে। পরিবারগত নাম তাঁর খুঙ্, (বা খোঙ্)। নিজের নাম চিউ; এবং ডাক নাম চুঙ নি। খ্যাতির নাম খুঙ্-ফু-ৎস্ন্য। এই নামটি লাতিনে হ'ল কনফুসিয়াস।

এর পরিবার শাঙ্বংশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি থেকে উদ্ভূত। খুঙ একটি রাজকর্মচারীর পদ পেয়েছিলেন। সমাজনীতি সংক্রান্ত কতকগুলি ধারণা তাঁর হয়। সে গুলি প্রয়োগ করবার জন্য খৃঃ পূঃ ৪৯৫ তে কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে পরিভ্রমণ করেন, সেখানকার সামন্তরাজাদের মধ্যে প্রচার করেন। জীবনের শেষ তিনটি বছর লু-তে এসে পুথি-পত্তর লিখতে ব্যাপৃত হন। দেহান্তর ঘটে খৃঃ পূঃ ৪৭৯ তে।

তাঁর শিষ্যদের বলা 'জু চিয়া' অর্থাৎ পণ্ডিতকুল। খুঙের নিজের জীবনে তাঁর মতের প্রতিষ্ঠা তেমন দেখে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু শিষ্যেরা এমন সিদ্ধি ঘটিয়েছিলেন যে খুঙকে চীনের মুকুটবিহীন রাজাই বলা হয়।

তাঁর মতবাদ কি? তিনি সামন্ত প্রথা পরিবর্জনে সমাজ-উন্নতি বিশ্বাস করেন নি। বরং তাকেই সমর্থন করেছেন। চাউ-য়ের আদর্শ সামন্ততন্ত্রকে তিনি অনুমোদন করেন—অর্থাৎ জ্যেষ্ঠপুত্র সম্পত্তির অধিকারী হবে, অন্যপুত্র পৃথক জমি পাবে।

খুঙ দেখেছিলেন, রাজাদের দুর্নীতির জন্য, সভাসদদের অন্যায়ের জন্য দেশের লোকের দুর্দশা। দেশের লোকের দুর্দশার দরুণই রাজ্যের দুর্দশা, রাজাদের উত্থানপতন। এই জন্যই আদর্শ রাজার নীতির দিকে তিনি এত মনোযোগ দেন। সত্যকার শাসকের আদর্শ হবে সমগ্রজনের মঙ্গলসাধন করা। কঠোর আইন প্রণয়নে এই কল্যাণধর্ম উদযাপন করা যায় না, যায় প্রকৃতির নিয়মকে উপযুক্তভাবে গ্রহণ ক'রে তাকে অনুষ্ঠিত করবার সহায়তা করা। এই প্রশাসনিকের জন্য দরকার বুদ্ধি, সহানভূতি এবং বিদ্যা। জন্মসূত্রেই যে শাসন করবার ক্ষমতা জন্মে তা নয়, ক্ষমতা জন্মে চরিত্র এবং প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা। কাজেই শিক্ষা সার্বজনীন হওয়া উচিত।

খুঙ তাহলে দুটো দিক স্বীকার করছেন ; প্রত্যেক মানুষই শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত আর প্রত্যেক মানুষই শাসনকর্মের অধিকারী। শিক্ষা দিয়ে সেই শাসনকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। অনেকটা গণতন্ত্রের মতো।

কিন্তু শিক্ষাই তো পৃথিবীতে যত বিপর্যয় এনেছে। তাহলে প্রকৃত শিক্ষা কোনটি? তিনি বলছেন, "যখন তুমি কোনকিছু জান তখনই যেন বলতে পার যে, হ্যাঁ তুমি এ বিষয়টি জান ; আর যখন তা জাননা তখন যেন স্বীকার করতে পার যে, না তুমি জাননা ; এইটিই প্রকৃত শিক্ষা।"

প্রকৃতি-শিক্ষার সঙ্গে যে তাঁর কোন বিরোধ ছিল এমন নয়, তবে বোধ হয় পুথির মধ্যে সেগুলি আবদ্ধ রেখেছিলেন। পাখী, পশু, গাছ-পালার নাম জানতে হবে, তা তাঁর কথায় পাওয়া যায়।

মানুষের সমাজের আদর্শপথ হিসাবে তিনি বললেন, সমাজ-মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হবেনা, প্রাকৃত-মানুষও সমাজ-মানুষ থেকে পৃথক থাকবেনা তবেই সে সত্যকার মানুষ হতে পারবে।

তিনি সমাজদর্শন থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করেননি। ঐ দুটিই এক। তিনি জানতেন এবং বলেছেনও, রাজার শক্তি বৃদ্ধি হয় এবং আহৃত হয় জনসাধারণের মধ্য থেকেই। এই সূত্র থেকেই খুঙ-কে বিপ্লববাদের সমর্থকও বলা হয়েছে।

খুঙ-কে প্রধান শিক্ষাব্রতীর মধ্যে একজন বলে মনে করা হয়। কারণ, তিনি শিক্ষাকে সকলের জন্য প্রচার করলেন; তাঁর পূর্বে কেবল ধনুর্বিদ্যার ইস্কুলই ছিল। তিনিই প্রচার করলেন, শিক্ষার কোন শ্রেণীভেদ থাকবেনা। শাসন কর্মচারী যে কেউই হতে পারে যদি তার শিক্ষা-যোগ্যতা থাকে। অনেকে

অনুমান করেন, এই নীতির মধ্য দিয়েই তিনি নতুন অভিজাত শ্রেণী তৈরী করার পথ প্রস্তুত করেছিলেন। তবু স্বীকার করতে হবে, এই উপায়েই তিনি গণতন্ত্র বোধ আবাহন করতে পেরেছিলেন। খুঙের প্রকৃত শিক্ষা বলতে মোটামুটি ভাবে বোঝা যায় চরিত্রে বিনয়ের প্রতিষ্ঠা।

আর একটি বৈশিষ্ট্য খুঙ-বাদে পাওয়া যায়, যুক্তির উপর এই বাদ বেশি জোর দেয় 'কোনরকম কুসংস্কার বা মরমীবাদকে আমল দেওয়া হয়নি' অর্থাৎ মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত যা নয় তাকে বর্জন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ন্যায় বোধ এবং সদ্বিচার মানুষের মধ্যে যখন প্রয়োগ করতে পারা যায়, তখন তাই হচ্ছে প্রজ্ঞা। দেব দানোকে শ্রদ্ধা কর, কিন্তু তাদের থেকে নিজেকে সরিয়েও রাখো। দেব-দানোকে পুজো বা সেবা করতে চাও? মানুষকেই যে সেবা করতে শিখল না, সে দেব-দানোকে সেবা করতে চায় কোন্ সাহসে? মৃতকে জানতে চাও? জীবন্তকেই যে জানলনা সে মৃতকে জানবে কি করে?" "যে মানুষ মানবিকতাই শেখেনি সে অনুষ্ঠান উদ্যাপন ক'রে কি করবে? যে মানুষ মানবগুণ পায়নি সে সঙ্গীত নৃত্যে যোগ দিয়ে কি করবে:?"

খুঙের মতবাদে একদিকে সমাজ মতকে যেমন পাশ কাটানো আছে, অন্যদিকে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা করবার সবল প্রচেষ্টা আছে।

তাঁর আলোচনা তিনটি বিষয়ে থাকত, স্তবস্তুতি, ইতিহাস এবং অনুষ্ঠান উদ্যাপন। পড়ানোর মধ্যে থাকত লিপিশিক্ষা, চরিত্র গঠন, গুরুজনে আস্থা স্থাপন এবং প্রতিজ্ঞা পুরণ বা শপথরক্ষা।

কিন্তু তিনি অতি-প্রাকৃত বিষয় বর্জন করেছিলেন। ভূমিকম্প আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি বিষয় তাঁর শিক্ষায় স্থান পায়নি, অথচ এগুলো দেশে আছে, দেশের এ সমস্যা। এইজন্যই অনেকে বলেন, তাঁর শিক্ষা চীনকে কারিগরী বিজ্ঞান এবং প্রকৃত বিজ্ঞানের পথ থেকে সরিয়ে আনল। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম হননি, কারণ তাও মতবাদ খুঙের মতবাদকে এইভাবেই প্রথম থেকে খণ্ডন করে দিয়েছে। খুঙবাদ এইজন্যই দেশে একেবারে নীচের তলায় নেমে আসতে পারেনি।

খুঙ-বাদীদের মধ্যে মাঙ-খো হচ্ছেন অন্যতম (Mencius)। তাঁর সময় খৃষ্ট পূর্বাব্দ ৩৭৪ থেকে ২৮৯। লু-র দক্ষিণে জন্মগ্রহণ করেন। লিয়াং এবং চি-তে তিনি পড়াতেন, সেখানকার অধিপতিদের পরামর্শ দিতেন।

মাঙ-খো খুঙের গণতন্ত্রের দিকটির উপর জোর দেন। মানবমন সম্পর্কে

তাঁর বিশেষ মত ছিল। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষেরই এমন মন থাকে যা অন্যের দুঃখে বিগলিত হয়। কোন ছেলে যদি দৈবাৎ কুয়োতে পড়ে যায় তবে মানুষ যে হা হুতাশ করে তার কারণ এ নয় যে ছেলেটির পিতামাতাকে তারা বিশেষ স্নেহ করে, কিংবা প্রতিবেশীর প্রশংসা কুড়োতে চায়; তার কারণ মানব-মনের এ এক ধর্ম বা আবশ্যিক গুণ। অর্থাৎ তাঁর মতে, মানুষ স্বভাবতই সদ্ধর্মী।

যদি বল, 'ভালো' হচ্ছে শিক্ষা-সাপেক্ষ; অনেকটা বুনো গাছের মতো তাকে যেমন কেটে খুঁদে পাত্র তৈরী করতে হয়—তেমনি মানুষকে সদ্ধর্মী করতে হয় শিক্ষা দিয়ে; যদি বল জলকে যে-পথ কেটে দেবে সেই পথে যাবে, তা হলে বলব বুনো গাছকে কাটা মানে তাকে বিনষ্ট করা; বিনষ্ট ক'রে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে লাভ নেই; জলকে যেপথ কেটে দেবে সেই পথে যাবে বটে, কিন্তু পাহাড়ের উপরে নিম্নাভিমুখী জলকে উঠাতে হলে তোমাকে বলপ্রয়োগ করতে হবে—সেটি হবে জলের ধর্মবিরোধী, প্রকৃতি বিরোধী; তেমনি শিক্ষা দিয়ে সদ্ধর্মী করতে গেলে মানুষকে প্রকৃতি বিরোধী করে তোলা হয়।'

মাঙ-খো এখানে অনেকটা তাও মতাবলম্বী হয়ে পড়েছেন। মাঙ-খো তৎকালের একটি মতবাদকে খণ্ডন করতে চাচ্ছেন—তা হচ্ছে, মানুষ মূলত ভালোও নয় মন্দও নয়—তাকে শিক্ষা দিয়ে ভালো করতে হয়। মাঙ-খো বলতে চান মানুষ স্বভাবতই ভালো, সেই প্রকৃতিকেই সাহায্য করতে হয় শিক্ষা দিয়ে। মানুষের প্রতি প্রীতিই মাঙ খো-কে খুঙের মতাবলম্বী করেছে। কিন্তু মাঙ খোর মধ্যে এই দিকটি তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

স্পষ্ট করলেন হ্-সুন চিঙ (খৃঃ পুঃ ২৯৮ থেকে ২৩৮)। শান্সীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রশাসনিক বিভাগের রাজকর্মচারী ছিলেন, কিন্তু লেখক এবং শিক্ষক হিসাবেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি।

তাঁর মতে, মানুষের খারাপ হওয়ার প্রবণতা আছেই। তাকে ভালো করতে হয় শিক্ষা দিয়ে।

খৃঃ পূর্ব চতুর্থশতকে আরিস্ততল মানুষের মনের শ্রেণীভেদ (Psyche), করেছিলেন; কিন্তু খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে হ্-সুন চিঙ চীন দেশে মনোবিদ্যার আবাহন করলেন। হ্-সুন বলেন, জল এবং আগুনের ধর্ম আছে (চি), কিন্তু প্রাণ নেই (সাঙ্); গাছের প্রাণ আছে কিন্তু দৃষ্টি নেই (চিহ্); পাখী-

পশুর দৃষ্টি আছে, কিন্তু বিচার ক্ষমতা নেই (ই); মানুষের ধর্ম আছে, জীবন আছে, দৃষ্টি আছে এবং সর্বোপরি বিচারবোধ আছে।...মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হতে জানে সমাজগঠন করতে জানে (চু-ণ)। কেমন ক'রে মানুষে পারে আর অন্যে পারে না ? কারণ মানুষ যৌথভাবে স্ব স্ব কাজ করতে পারে, এবং নিজের নিজের ভাগ নিতে জানে। কেমন ক'রে সে পারে? কারণ তার বিচার-বোধ এবং অধিকার বোধ আছে।

চীনের মনোবিদ্যা এই সূক্ষ্ম পথেই বিকশিত হতে থাকে। তার পযবেক্ষণশক্তির শিক্ষাই এমন গভীর ভাবে সমস্যা তুলতে শিখিয়েছে। হ্‌-স্থন কুসংস্কার বিরোধী কিন্তু জাতির ঐতিহ্য উৎসব-অনুষ্ঠান তিনি মান্য করেন; তিনি বিজ্ঞান বিরোধী কিন্তু প্রচলিত কারিগরী বৃত্তিকে অনুমোদন করেন। অর্থাৎ প্রকৃতি অনুসারী যা কিছু তাকেই তিনি মান্য করেন, কিন্তু জোর ক'রে কোন পরিবর্তনকে স্বীকার করেন নি। বোধ হয় তাও-বাদের মুখাপেক্ষী তিনি হয়ে পড়ছেন।

তবে মধ্যযুগে খুঙ-বাদীরা অঙ্ক, সেচকার্যের বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং কৃষিবিদ্যা অর্জন করছে দেখা যায়, কিন্তু আলকেমী বা রসায়ন শাস্ত্র অবহেলিত। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্য এই কামারের কাজ, কারখানার কাজ কিংবা অন্যান্য কারুকর্মকে তাঁরা নিতান্তই অবজ্ঞার চোখে দেখছেন।

হান সম্রাটের পৃষ্টপোষণায় খুঙ-ধর্ম রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পেতে থাকে। তখন থেকেই মন্দির গড়া হয়। আর এই ধর্ম যখন পণ্ডিতদের ধর্ম তখন অনুমান করা অসত্য হবে না যে এই মন্দিরগুলি লেখাপড়া শেখারই যায়গা বা ইস্কুল। কিন্তু মনন শাস্ত্রই এই ইস্কুলের পাঠ্যতালিকা হয়ে পড়ল।

মরমীবাদের মধ্যে তাও-বাদই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র যা বিজ্ঞান-বিরোধী নয়। তাও-বাদ চীনের বিজ্ঞানচর্চার স্বপক্ষে। হয়ত এই বিজ্ঞানচর্চাকে যাদু বা ইন্দ্রজাল হিসাবে অভিহিত করা হয়; কিন্তু বিজ্ঞান আর ইন্দ্রজালের মধ্যে পার্থক্য সেদিন পর্যন্ত, ষোড়শ-সপ্তদশ শতক পর্যন্তও, করা কঠিন ছিল। নিউটনকেও শেষ ঐন্দ্র জালিক বলা হয় (Lord Keynes—Newton the Man, July 1946)। কাজেই ইন্দ্রজাল কথাটি নিয়েই আমাদের উন্নাসিক হওয়া ঠিক হবে না।

তাও-বাদের দুটি উৎস আছে। চাউ যুগের শেষ দিকে মানব-সমাজ

বিরোধী হয়ে তাও-রা প্রকৃতি উপাসক হয়ে উঠল। রাজসভা ছেড়ে দিয়ে তারা নির্জনে, অরণ্যে এবং পাহাড়-পর্বতে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতিকে অনুসরণ করতে সুরু করল। মনুষ্য সমাজকে শৃঙ্খলায় আনা যাবেনা বলে তারা বিশ্বাস করে; এই দিক দিয়ে তারা খুঙের যে কেবল বিরোধীই তা নয়, প্রবল শত্রু। খুঙ-বাদের এই জ্ঞানচর্চাকে তারা অবজ্ঞা করতে সুরু ক'রে।

তাও-বাদের আর একটি শাখা পল্লবিত হতে থাকল 'শামান' ধর্মমতকে আশ্রয় ক'রে। এইটিই ছিল লোকধর্মমত, রাষ্ট্রীয় নয়। কাজেই খুঙ-বাদীদের বিরুদ্ধে এই ধর্মমতও প্রকৃতি-বাদীদের সঙ্গে এক হয়ে অভিযান সুরু করে। এই শামানবাদ থেকেই এল আলকেমি এবং ইন্দ্রজাল, উৎসব অনুষ্ঠান, নৃত্য-গীত প্রভৃতি।

তাও-বাদ থেকেই চীনের কবিরা প্রেরণা নিয়েছেন, এদের কাছ থেকেই কারিগরেরা উৎসাহ পেয়েছে, তাও-বাদের পৃষ্ঠপোষণাতেই চীন অভিজাত-তন্ত্র বিরোধী হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ তাও-বাদ চীনের আষ্টে-পৃষ্ঠে।

তাও-বাদের প্রথম প্রবক্তা লাউ-ৎসু মনে হয় হোনানের এক সম্ভ্রান্তবংশ জাত। কিন্তু তিনি পরিবারের নীতির সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

তাও হচ্ছে পথ। কিন্তু এ পথ মানব-সমাজের নয়, প্রকৃতি পরিক্রমার। তাও এই ব্রহ্মাণ্ডকে জন্ম দিয়েছে, প্রতিপালন করেছে, ভূষিত করছে, পূর্ণতার পথে নিয়ে যাচ্ছে। কাজেই সেই তাও মতাবলম্বী যে কোন কিছু পালন করবে কিন্তু দাবী করবে না, নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু নির্ভর করবে না, প্রধান হবে কিন্তু প্রভুত্ব করবে না। এই-ই হচ্ছে তাও-বাদের অদৃশ্য 'গুণ'

তাও অদৃশ্য; বা কাজ করে যায়, কিন্তু প্রভুত্ব করেনা; প্রকৃতিকে মান্য করে, প্রকৃতির উপর বলপ্রয়োগ করে না; 'দেখ এবং বোঝ, কিন্তু শাসন করনা' এই-ই হচ্ছে প্রকৃতি সম্পর্কে তাও-এর নীতি।

তাও সর্বদা, সবাইকে সঞ্জীবিত করে, কর্মসম্পাদন করে কিন্তু কর্মভোগ করে না; সকলকে ভূষিত করে কিন্তু কারও উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে না। শূন্য অর্থাৎ 'কিছু নাই' থেকে এর জন্ম, কাজেই সবার নীচে এর স্থান, কিন্তু যে হেতু তার বলপ্রয়োগ ব্যতীত সবাই এর আদেশ পালন করে সে হেতু তাও সকলের উপরে, নিজের মহত্ত্ব জাহির করে না তাই সে মহৎ।

মরমীবাদীদের এইই হচ্ছে মূলমন্ত্র। অনেটা সান্ধ্যভাষার মতো। উপনিষদের কথার মতো শোনায় "তদেজতি, তন্ন এজতি. তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।"

বর্তমান যুগে ইংরেজি সাহিত্যের কবিদের মধ্যেও এই সান্ধ্যভাষার ব্যবহার দেখা যায়, পরম সত্যকে বোঝাবার জন্য। যেমন এলিয়েট বলছেন,

Neither from nor towards ; at the still point, there
the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not
call it fixity.
Where past and future are gathered......

এই জন্যই ইংরেজি সাহিত্যের কবি-ঔপন্যাসিক সমালোচক ডুরেল বলেন, at many points you will see that **Four Quartets** (T. S. Eliot) re-state the formula of Lao Tzo and othr mystics of the past (Key to Modern Poetry ; Lawrence Durrell ; Rupa & Co, Cal ; Page 143)।

কিন্তু মরমীবাদীদের মধ্যে তাও-বাদ প্রকৃতির সত্য দর্শন থেকে ক্ষান্ত হয় নি। প্রকৃতির প্রক্রিয়াকে সে পর্যবেক্ষণ করবার জন্য ব্যগ্র :

"এই অসীমশূন্য অবিরাম ঘুরছে কি করে ?...সূর্য চন্দ্র নিজের নিজের স্থান নিয়ে কি সন্তুষ্ট ? কোন অদৃশ্য শক্তি কি এদের চালনা করছে ? কে এই সব গ্রহমণ্ডলকে নিয়মে বেঁধেছে ? কোন বিপ্লব ঘটছে না কেন ? ...এরা কি কখনও থামবে না ? কি করে মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়, আর বৃষ্টি থেকে মেঘ ?

এই সব প্রশ্ন তাও-বাদীরা আলোচনা করে। এই প্রশ্ন কেবল আত্মসমর্পণ করে না, সন্ধান করে।

"যে প্রাণীর নবদ্বার তারাই গর্ভ থেকে জাত হয় ; যাদের অষ্টদ্বার তারা ডিম্ব থেকে জন্মে। জীবনের অস্তিত্ব অদৃশ্য উৎস থেকে, গমন অসীমে।" জ্ঞান দিয়ে এসব বোঝা যায় না, যুক্তি দিয়ে ধরা যায় না।...এই সৃষ্টিতে তুমি কিছু যোগ করতে পার না, কিছু নিলে সৃষ্টির কোন কিছুরই হ্রাস হয় না।"

পরিবেশ অনুযায়ী মানুষের চরিত্র গঠিত হয়—একথাও তাও স্বীকার করেছে। পরিবেশের মধ্যে জলের ধর্ম আর গতি নিয়ে তাও-বাদীরা আলোচনা করেছে। শরীর-বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাদের ধারণা সেকালের পক্ষে নিখুঁত। প্রকৃতিকেই যে সে দেখে তা নয়, সে জীবজন্তু গাছপালা

মানুষ তার জীবনযাত্রা অবয়ব সংগঠন, মানসিকতা প্রভৃতি সমস্ত দিক গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখে।

কিন্তু পযবেক্ষণ করার সঙ্গে সব কিছু বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেও তাও-বাদী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে নি। সব কিছুর মধ্যে 'এক'কে খুঁজে ফেরে। জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে যেন এক মহা-এক আছে যার দ্বারা সবকিছু পরিবর্তিত হয়, স্থিতিলাভ করে। এই একের চেতনা থেকেই চীনের ধর্মনীতি, প্রকৃতিবিজ্ঞান এবং রাজনীতি নির্ধারিত হয়েছে। রাজনীতির দিক দিয়ে তাই এরা সামন্ততন্ত্রের মতো একটি মানব সমাজের বিচ্ছিন্ন অংশ মানতে চায় নি।

ছান্দোগ্য উপনিষদ যেমন ব্রহ্মকে কল্পনা করছে সমগ্র বস্তু-বিশ্বের মধ্যে, অনেকটা তেমনি তাও-এর অস্তিত্ব; পিপীলিকায় এই তাও আছে, আছে মাটির পাত্রে, আছে সর্বত্র। তাই তাও বা কোন কিছুই ঘৃণা করে না, খৃষ্ট বাদীর মতো কামার-কুমোরের তৈরী বস্তুকে উপেক্ষা করে না, বিজ্ঞানচর্চায় সব কিছুকেই তারা গ্রহণ করেছে। তা সে যত অবজ্ঞাত, যত কুৎসিত বস্তুই হোক না কেন।

চরিত্র গঠনের দিক দিয়ে তারা বলে, "যে রাজা পক্ষপাতীত্ব ক'রে কাউকে পুরস্কৃত করে না, তার মত নিয়ম বাদী এবং কঠোর হও, ভূমি এবং শস্যের মতো বিবেকী কিন্তু ধীর হও, যেমন ক'রে তারা সমস্ত উপচার গ্রহণ করে এবং আশির্বাদ বর্ষণ করিতে প্রিয়জন মানে না; উদার হৃদয় হও যেমনভাবে 'আকাশ' বাধাহীন হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে" ইত্যাদি।

তাও প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নেয় প্রকৃতির কোন অবস্থাকেই তারা উপেক্ষা করে না যেমন, "স্যাৎসেঁতে জায়গায় থাকলে মানুষের বাত হয়, মরেও যেতে পারে; কিন্তু সে তো আর্দ্রতার দোষ নয়, কারণ তা হলে পোকা সেখানে জীবন লাভ করে কি করে? গাছের উপরে বাস করা মানুর পক্ষে মঙ্গল না হতে পারে, কিন্তু সে তো মানুষের পক্ষে; শাখামৃগের বেলায়?" অর্থাৎ পরম হিতকর ব'লে প্রকৃতির কোনটিকে জগৎ মানবে? পরম অহিতকরই বা কোন্‌টি?

এই ভালো মন্দ যে এক সে কথা ফ্রয়েডের তথ্য থেকে পাচ্ছি। আর ফ্রয়েডকে অনুসরণ ক'রে আরও গভীরে যিনি প্রবেশ করেছেন সেই চিকিৎসক ডক্টর গ্রডেক (Groddeck ; 1866-1934)-এর উক্তি; (I do maintain that man creates his own illness for a definite purpose,

using the outer world merely as an instrument, finding there an inexhaustible supply of material which he can use for this purpose, to-day a piece of orange-peel, to-morrow the spirochete of syphilis, the day after a draught of cold air or anything else that will help him to pile up his woes),

আমি বলবই যে, মানুষ তার ব্যাধি সৃষ্টি করে নিজেরই কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে; বহির্জগৎ-কে সে এর উপকরণ তৈরী করে মাত্র। বহির্জগতে সে খুঁজে পায় অফুরন্ত উপাদান যা তার উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে পারে; আজকে সে দায়ী করবে কলার খোসাকে কালকে যৌন ব্যাধিকে, পরশু শীতল হাওয়াকে অথবা যে-কোন জিনিস যা তার দুঃখকে বাড়াতে সাহায্য করে। (উদ্ধৃতি ড্যুরেলের বই থেকে পৃষ্ঠা ৭২)।

তাও-এর এই নীতির সার্থকতা কি? সার্থকতা হচ্ছে এই যে, মানুষের নিজের কল্যাণের জন্য প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চায়, এইটি সত্য-সন্ধানের পক্ষে উপযুক্ত মানসিক অবস্থা নয়। প্রকৃতি শুধু মানুষের জন্য নয়। প্রকৃতির সব কিছুর পিছনে একটি হেতু আছে। যদি মানুষ তার সন্ধান না নেয়, তবে ঘটনা সংগ্রহে তারা যতই নিয়মনিষ্ঠ হোক তারা ভুলই করে। নিজের বিচারে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে এই যে ভেদজ্ঞান করেছে, এই জ্ঞানেই সে মানুষের মধ্যেও ভেদ করেছে; এমনি ক'রে পণ্ডিত শাসক সাধারণ মানুষ থেকে নিজেদের পৃথক করল, সরিয়ে রাখল। পর্বত থেকে জল উৎসারিত হয়ে নদীর দিকে যায়, তার কারণ তো এ নয় যে, জল পর্বতকে ঘৃণা করে আর সমুদ্রকে ভালবাসে! গোধূম সমতলভূমিতে উৎপন্ন হয় আর গোলাবাড়ীতে স্তূপীকৃত হয় তার কারণ এ নয় যে, গোধূম এই অবস্থা পছন্দ করে—এ ঘটেছে মানুষের ইচ্ছার দরুণ। প্রকৃত সাধু যে ভালো-মন্দ বাছে না, স্থায়ীত্ব আর ধ্বংস নিয়ে চিন্তা করে না, সে অনুসন্ধান করে তার কারণ।

মানুষের কি কোন কিছুই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে না? তাও প্রকৃতিবাদী সে বিষয়েও খুব স্পষ্ট ক'রে বলেছেন; "যুক্তিই কার্য পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করবে। বস্তু বিশ্বের অন্তর্নিহিত ধর্ম মেনেই এই নিয়ন্ত্রণ চলবে। যেমন, আগুন হয়ত কুয়োকে শুকিয়ে ফেলতে পারে, অথবা হুয়াই নদীর জলকে সেচকার্যের জন্য পাহাড়ের মাথায় তোলা যেতে পারে। কিন্তু এই কাজ হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়, এই প্রচেষ্টার সঙ্গে প্রকৃতির বিরোধ।

এই কাজকে বলা যায় অহিতকর বা অনাবশ্যক চেষ্টাপ্রসূত কর্ম (ইয়ু উয়ে)। কিন্তু নদীতে নৌকা চালাও, বালুতে গাড়ী চালাও, শীতের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য কিছু ব্যক্তিগত ব্যবস্থা নাও, বর্ষার বন্যার জন্য খাল খনন কর—এইগুলি হবে প্রকৃতি অনুসারী কাজ। বস্তুর প্রকৃতিকে মান্য করে যে কাজ সেই কাজই তাও বাদী করবে।"

খুঙের নীতি পরিবর্তন ক'রে তারা বলে, জ্ঞানী তাকেই বলে যে জানে যে সে কিছু জানেনা। ভুল তারাই করে যারা মনে করে যে তারা জানে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জানে না। আর জানা কেমন ক'রে সম্ভব? বই থেকে নয়, গুরুর মুখ থেকেও নয়। যারা ধনুক চালনা ভালো জানে তারা ধনুর্ধরের কাছ থেকে শেখে না, শেখে ধনুকের কাছ থেকেই, নৌকো চালনা মাঝির কাছ থেকে শেখা যায় না, নৌকো চালনা ক'রেই শিখতে হয়।

তাও-দের এই মতবাদ কি ইস্কুলকে নস্যাৎ করছে, বর্জন করছে শিক্ষককে? কিন্তু ফলত তা নয়। মানুষের আভজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে প্রকৃতির কাছ থেকে আর সেই অভিজ্ঞতার সূত্র অবলম্বন ক'রে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্যেই শিক্ষার একমাত্র অঙ্গ হওয়া ঠিক নয়, সূত্রটিকে প্রকৃতির মধ্য থেকে প্রমাণিত ক'রে নিতে হবে, সেই পর্যবেক্ষণেই নতুন অভিজ্ঞতা তৈরী হবে; এই কথাই তাও বলতে চায়।

তবে এত সত্ত্বেও, সমাজ নীতির দিক দিয়ে তাও হচ্ছে পশ্চাৎমুখী। প্রাচীন পদ্ধতি যৌথ কর্ম এই মতবাদ অনুমোদন করে, সঞ্চয় পছন্দ করেনা। সামন্ত-তন্ত্রকে নিন্দা করে, কিন্তু যখন সেই ব্যবস্থা এসে গেল তখন তা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ সে বলে দেয়নি, বলে দিল শুধু প্রাচীন সমাজব্যবস্থাকে অনুসরণ করতে। ধর্মের দিক দিয়ে তাও সমষ্টিগত ধর্মবোধকে বর্জন করল। এই সমষ্টিগত ধর্মবোধ সামন্ততন্ত্র প্রথার। কিন্তু রাষ্ট্র যত প্রসারিত হয় তত সমস্ত উৎসবে ব্যক্তির যোগ অসম্ভব হয়ে পড়ে, কাজেই ধর্মের দিক দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাও-বাদ ব্যক্তির মুক্তির উপায় হিসাবে পরিণত হল। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষণা পেলেও তাও-বাদ সমাজের সমস্ত স্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারল না। এই মতবাদের সঙ্গে এসে মিলল জরথুষ্ট্র বাদ, মিলল ভারতীয় দর্শন। তবে সুঙ্গ বংশের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত তাও-বাদ রাষ্ট্রের প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছে।

সবচেয়ে বড় দান তাও-এর হচ্ছে চীনে বিজ্ঞান-মন তৈরী করা (devel-

oped many of the most important features of the scientific attitude, and is therefore of cardinal importance for the history of Science in China. Needham, vol II ; Page 161)।

চীনের সমাজ জীবনে খুঙ বাদ এবং তাও বাদের পরিণতিক্রমে স্বভাবতই বুদ্ধিবাদ দেখা দিতে বাধ্য। খুঙ আর তাও এই দুটি বাদ যখন সমাজতটিনীর দুই তীরে আন্দোলিত হতে থাকল তখন মধ্যপন্থা আসবে। এই মধ্য পথ পাওয়া যায় (সাময়িক) মো চিয়া এবং মিঙ্ চিয়া বাদের মধ্যে।

মো-চিয়ার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন মো-তি। তাঁর কাল নিয়ে মতবিরোধ আছে, তবে মনে হয় পঞ্চম চতুর্থ খৃষ্ট পূর্ব শতকের মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন। অর্থাৎ মাঙ-খো (Mencius) এর জন্মের খুব বেশি আগে দেহত্যাগ করেননি। লু প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন, কিছুকাল বোধ হয় সুঙ্ বংশের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে সর্ব্বজনীন প্রেম এবং আক্রমণাত্মক যুদ্ধবিরোধীভাব।

এই মো-বাদ সুরু থেকেই খুব সঙ্ঘবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত আকারে প্রকাশ পেল। সামন্ততন্ত্রের বিরোধী যে এঁরা তা নন; তাঁদের শান্তিপ্রিয়তার একটা সীমা ছিল। যদি কোন দুর্বল রাষ্ট্র আক্রান্ত হ'ত সবল কর্তৃক তবে এই মো-বাদীরা দুর্বলকে সাহায্য করবার জন্য ছুটতেন। এই জন্য তাঁরা রণবিদ্যা শিখতে বাধ্য হতেন। এই রণ বিদ্যার অঙ্গই তাদের শিক্ষায় আনল দুর্গ নির্মাণ এবং অন্যান্য নিরাপত্তার জন্য বাস্তব বিজ্ঞান চর্চা। তাও বাদ যদি জীববিদ্যা এনে থাকে তবে মো-বাদীরা এনেছে পদার্থ ও যন্ত্র বিদ্যা।

তবে মো-বাদীদের মধ্যে কালক্রমে যে সব বিষয় প্রবেশ করল তার মধ্যে গোড়াতে—সমাজ বিধান, সমাজ-জীবন, ধর্ম এবং শেষে বৈজ্ঞানিক তর্কবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং রণবিদ্যা।

মো-বাদীরা তাও-এর আদিম মানবের প্রাথমিক জীবনযাত্রাকে পছন্দ করেননি। সমাজতত্ত্ব নিয়েই তাওদের সঙ্গে মো-বাদীর বিরোধ। মো-তির মতে :—

মানব সমাজের আদিকালে কোনরকম বিধান ছিলনা, কোন শাসন ছিল না; সবাই নিজের নিজের মত অনুযায়ী চলত। যত মানুষ তত মত। আবার প্রত্যেকেই নিজের মত সমর্থন করত, অন্যের মতে কান দিত না। ফলে পিতা-পুত্র, ছোট-বড় প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু হয়ে পড়ল, কেউ কোন মীমাংসায় আসতে পারত না। প্রত্যেকে অন্যের অসুবিধার জন্য জল, আগুন,

আর বিষ নিয়ে কাজ করত। বাড়তি উৎসাহ পারস্পরিক কাজ কর্মে ব্যয়িত হত না; বাড়তি খাদ্যের কোন অংশীদার না থাকায় পচে যেত। ...এই উচ্ছৃঙ্খলতার রূপ এখনও পশু-পাখীদের মধ্যে দেখা যায়। এই উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ শাসক-বিহীন মানব-সম্প্রদায়। কাজেই সৎ মানুষকে নির্বাচন করে রাজা করা হল।"

উপরোক্ত সমাজতত্ত্ব অবশ্য নির্ভুল নয়। কিন্তু এর মধ্যে রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা হচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়। তবে খুঙ্‌বাদীদের মতো অতটা গোঁড়া পন্থী নয়। মো-বাদীরা বেশী-মানুষের কল্যাণকেই শাসকের কর্তব্য হিসাবে ধরেছে। সর্বশক্তিমান বড় রাষ্ট্রকে ঘৃণা করে তখনই যখন ছোটরাজ্যকে সে আক্রমণ করে, বড় গৃহস্থ ঘৃণ্য যখন ছোট গৃহস্থকে ধ্বংস করে; সবল ঘৃণ্য যখন দুর্বলের উপর অত্যাচার করে; চতুর ঘৃণ্য যখন নির্বোধকে প্রবঞ্চনা করে; মানী ঘৃণ্য যখন সে দুঃস্থকে উপেক্ষা করে।"

এই দিক দিয়ে মো-বাদীরা যখন খুঙ্‌বাদের কাছাকাছি, তেমনি আবার তাও-বাদেরও কাছাকাছি যখন বলে, "মহান্ তাও যখন ছিলেন অর্থাৎ সেই অবস্থা বিরাজ করত, তখন জগৎ সংসার একটি সম্প্রদায় মাত্র। জনসাধারণকে পথ দেখানোর জন্য প্রতিভাশালী আর কল্যাণধর্মা নিযুক্ত হ'ত; তাদের কথা নিষ্ঠাযুক্ত, তারা সুষমাকে অনুশীলন করত। মানুষে অন্যের পিতামাতাকে নিজের পিতামাতার মতো শ্রদ্ধা করত, অন্যের সন্তানকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করত। মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত বৃদ্ধদের সংস্থান করা হ'ত, সমস্ত লোকেই কাজকর্ম পেত, আর ছোটদেরজন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।......এইই হচ্ছে 'তা থুঙ্গের' যুগ অর্থাৎ মহামিলনের যুগ।"

উপরোক্ত অংশ থেকে বেশ অনুমান করা যায়, চীনের সমাজে তখন কি অবস্থা ছিল অর্থাৎ এর বিপরীতটিই তখনকার রীতি।

মো-বাদীরা তাহলে জগতের কি ভাবে উন্নতি বিধান করতে চায়? বিশ্বজনীন প্রেম দ্বারা (চিয়েঙ্-আই)। শিক্ষার আদর্শে, চরিত্র সৃষ্টিতে যে এই বিশ্বপ্রেম আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্বপ্রেম যার আছে সে সামন্ততন্ত্র ধ্বংস করতে চায় না। সে বর্তমানকে নতুন আলোকে উৎসাহী করতে চায়।

ধর্মজগতে এই মো-বাদীদের পরলোক মানতে হবেই। এই পরলোক হচ্ছে প্রেত লোক। এই প্রেতাত্মা সর্বক্ষণ মানুষের এবং তার উত্তরাধিকারীর

কার্যাবলী লক্ষ্য করে, নীতি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করে। যদি কোন মানুষ ভূত বিশ্বাস না করে তবে মো-তির যুক্তি হচ্ছে, বিশ্বাস মানুষে দুভাবে করে ; দেখে এবং শুনে। গ্রামে যাও দেখবে তারা বলছে ভূত আছে।' তবে বিশ্বাস করবে না কেন ?'

বর্তমান যুগে এ হাস্যকর যুক্তি। কিন্তু এ যুক্তি সে সময়ও খুব সমর্থন করা হয়নি। উত্তর-মো-বাদীরা সেই জন্য বলছেন "সত্য কেবল দেখে আর শুনেই নির্ধারিত হয় না। বুদ্ধি দ্বারাও বুঝতে হয়। বুদ্ধির ব্যবহার করে বুঝতে হয় (হ্‌সিন ই)।" অবশ্য অদৃষ্টবাদ এরা মানতে পারেনি।

উত্তর-মো-বাদীরা বুদ্ধির উপর, যুক্তিবিজ্ঞানের উপর, অনেক কথা বলেছেন। এই ন্যায়- তর্কের সূত্র ধ'রে উত্তর-মো-বাদীরা সংবেদন, প্রত্যয় প্রভৃতি নানা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, চেষ্টা করেছেন ভাষার সংজ্ঞা দিতে।

"আগুন গরম কি ক'রে বুঝি? স্বাঙ্গীকরণের সাহায্যে। কেউ যদি বলে আগুন গরম, তবে তার অর্থ এ নয় যে অগ্নির উত্তাপকেই সে লক্ষ্য করেছে ; এই উক্তি বা অনুভূতি ঘটল কারণ, দর্শন-সংবেদনের আলোর সঙ্গে সে নিজকে স্বাঙ্গীকরণের প্রক্রিয়ায় মিশিয়ে ফেলেছে। প্রত্যক্ষের (Perception) জন্য দরকার ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন বস্তু ; পঞ্চইন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে এই প্রক্রিয়া ঘটে ; তারপর ঐ সংবাদ চিন্তার আশ্রয় নেয় (লু), তারপর সেই প্রত্যয় বা ব্যাখ্যাপূর্ণ জ্ঞান (চিহ্‌) মন বা ব্যক্তি আয়ত্ত করে।"

ভাষা কি? "মানুষের মুখ সমর্থ হয় এমন নাম উচ্চারণ করে। তাই ভাষা। ভাষা হচ্ছে অঙ্কিত ব্যাঘ্রের মতো, সত্যিকার বাঘ নয়। যখন কোন বস্তুকে নাম দিই, তখন বস্তুকে সে নির্দেশও করে, বস্তুর পক্ষে উপযুক্তও হওয়া চাই।"

বস্তুর ধর্ম কি? অর্থাৎ বিশেষণ কি? "বস্তুর নামে বিশেষণ দিই। যেমন বলি 'সুন্দর' ফুল। ঐ সুন্দর কথাটা বাদ দিলে বা যোগ দিলে বস্তুর যখন কোন হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটেনা, তখনই সে বস্তু বিশেষণ।"

জানা আর না-জানা কাকে বলে? "কারও সামনে তার জানা জিনিস আর না-জানা জিনিস মিশিয়ে দাও। সে যদি জানা জিনিস বেছে নিতে পারে, সে যদি না-জানা জিনিস প্রত্যাখ্যান করতে পারে—তা হলে সে উভয়কেই জানল।"

শেষোক্ত সংজ্ঞাটি আমাদের শিক্ষা-প্রসঙ্গে একটি অভিনব সংজ্ঞা। যাই হোক, পূর্ব-মো-বাদী আর উত্তর-মোবাদীরা উভয়ে জ্ঞানরাজ্যের, ন্যায়বিদ্যার অনেক আলোচনা করেছেন; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি বিষয়ের সূক্ষ্ম সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির অনুশীলনে চীনে মো-বাদীদের স্থান অতি উচ্চে।

শিক্ষার এই অবস্থাতেই চীন পেয়েছে কুঙ্গসুন-লুঙ্গের মতো দার্শনিক এবং হুই-শিয়ের মতো নৈয়ায়িক। সোক্রাতিসের মতো কুঙ্গসুন-লুঙ্গও প্রশ্নোত্তরের সাহায্য শিক্ষা দিতেন (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে)। কুঙ্গসুন প্রবর্তন করেন 'সার্বিকতা' বোধ (Universals) বা চিহ্। 'সাদা ঘোড়া বলে কিছু নেই; ঘোড়া হচ্ছে আকৃতি আর সাদা হচ্ছে রঙ। দুটি পৃথক জিনিস, পৃথক ভাবে জেনে থাকি।' এই 'শ্বেত-অশ্ব' তাঁর বিখ্যাত দার্শনিকতা। হুই-শিহ্ (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতকে) বিখ্যাত ছিলেন কূট-সমস্যা প্রসঙ্গে। হুই-শিহ্ অনেকটা তাও মতাবলম্বী ছিলেন। এঁরা দার্শনিকতায় আপেক্ষিকতাবাদের পর্যন্ত আভাস দিয়ে গেছেন (স্থান এবং কাল উভয় ক্ষেত্রেই); "সূর্য উঠছে বলা যায় কি করে? এখন এখানে উঠছে, অন্যত্র তখন অস্ত যাচ্ছে। কাজেই সূর্য সর্বক্ষণই অস্ত যাচ্ছে।" "অস্তিত্ব আর নাস্তিত্ব উভয়েই উভয়ের জন্ম দিচ্ছে।" ইত্যাদি কূট প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু জাতীয় চরিত্র বিধানতন্ত্রীরা (ফা-চিয়া) প্রবলভাবে পরিবর্তিত ক'রে দিয়েছিল একই সময়ে। এই বিধান বাদীরা তাওদের নস্যাৎ করে দিতে চেষ্টা করে, অমোঘ নিয়ম কানুনের এরা পক্ষাপাতী, এরা মো-বাদীদের মান্য করে, কিন্তু আসলে এরা চরম খুঙ্ বাদী। অবশ্য এই অমোঘ বিধানের কাছে জাতি ধর্ম-সম্পদ নির্বিশেষে সমস্ত ব্যক্তিই সমান, এমন ঘোষণা থাকল। তা হয়ত সফল হয়নি, কিন্তু জাতীয় চরিত্রে এই বিধান-নিষ্ঠা যেন আলখিত পুথির মতো কিংবা পাভলভের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সৃষ্টি ক'রে বসল।

মতবাদের আলোচনা আমরা পৃথক-পৃথক ভাবে করলেও একথা মনে করা ভুল হবে যে, চীনের চরিত্রে বুঝি একটার পর একটা মতবাদ এসে তাকে বারবার পরিবর্তিত করছে। জাতীয় চরিত্রে এই সব ধারা একত্রিত হয়ে মিশ্রিত অবস্থায় চলছে প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগে। সপ্তম-ষষ্ঠ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চীনের যে অবস্থা তাইই আমরা বর্ণনা করলাম। খৃষ্টীয় প্রথম শতক থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করতে সুরু করল।

এচ. এ. গাইলস বলেন, চীনবাসী ঠিক খাঁটি অর্থে ধার্মিক নয়, যদিও তারা খুব সংস্কার পরায়ণ। বৌদ্ধধর্ম চীনের সক্রিয় ধর্ম। কিন্তু ভক্তি নেই মানুষের মনে; বৌদ্ধমন্দিরে গিয়ে জনসাধারণ হাসবে, কথা বলবে, কেনা-বেচা করবে; পবিত্র মূর্তি তাদের সংযত করতে পারেনা (H. A. Giles; The Civilisation of China, Page 55)। লবীও এই কথাই বলেছেন (Historical Survey of Pre-christian Education, Page 112-115)।

চীনের জীবন যাত্রায় এরূপ ঘটল কেন? চীনে কি ভারতের বৌদ্ধধর্মই গ্রহণ করেছে? চীনের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে আমরা সেকথাই জানতে পারব। জানতে পারব, জনসাধারণ নিজের মনের রচনা কিভাবে ধর্মে আরোপ করে।

চীনের বৌদ্ধমত সাধারণত মহাযানী, কিন্তু হীনযানী মতবাদও যথেষ্ট আছে। বস্তুত, চীনে বৌদ্ধমতের আমরা পাঁচটি শাখা পাই, (১) বুদ্ধ অবতংশক সূত্র বা যোগাচার (২) আগম বা হীনযানী, (৩,৪,৫) মহাযানী (লঙ্কাবতার, সুবর্ণ প্রভাসসূত্র, প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র)।

এ সকলের মধ্যে কয়েকটি নূতন বৈশিষ্ট্যও আবির্ভূত হয়েছে; ধ্যান (চান) অনেকটা মরমীবাদের অনুকল্প খৃষ্টীয় ৫ম শতকে দেখা গেল; দ্বিতীয়টি সুখাবতী বা স্বর্গরাজ্য কল্পনা। এই সুখাবতী সুদূর পশ্চিমে কোথায়ও আছে বলে কল্পনা করা হয়, প্রথমত নির্বাণ লাভ করলে এই সুখাবতীতে স্থান লাভ ঘটে বলে প্রচারিত হত, পরে নির্বাণ অবস্থার সর্ত আর থাকলনা। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি, ফলে তান্ত্রিকতা, এসে আশ্রয় নিল এই মতবাদে। এ ছাড়া বৌদ্ধমতের সঙ্গে প্রচলিত মত ত নক এসে প্রবেশ করল।

খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকে দেখা যায় একজন বৌদ্ধভিক্ষু চীনে প্রবেশ করছেন। দ্বিতীয় শতকের শেষে চীনের বৌদ্ধগ্রন্থ লি-হুয়ো লিখলেন মাউ। মাউ কিছুদিন ইন্দোচীনে ছিলেন। গ্রন্থটি অনেকটা মিলিন্দ পঞ্্হোর অনুরূপ। ইনি খুঙবাদ এবং তাও-বাদও মান্য করতেন; কাজেই সেই সকল শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত ক'রেই বৌদ্ধমতকে সমর্থন করতেন। পরবর্তীকালে খুঙ-তাও আর বৌদ্ধমত তিনটি মিলিয়ে একটি নতুন মত প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা চলল। বাধা যে না ছিল তা নয়, যেমন কু-হুয়ান (৪৩০ থেকে ৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) বললেন, "বৌদ্ধধর্ম আর তাও ধর্ম প্রায় এক; তবে বৌদ্ধধর্ম ভারতের পক্ষেই উপযুক্ত, চীনের পক্ষে নয়।" অন্যান্য লেখক বলেন, "খুঙ আর তাও এই জগতের বস্তু-বিশ্বকেই নিয়ন্ত্রিত

করতে চান, আর বৌদ্ধমতে পলাতকবাদ ; এই বস্তু-বিশ্ব থেকে পালিয়ে যেতে চায়।”

এইভাবে বৌদ্ধ মতের বিরুদ্ধে চীনে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি জাগ্রৎ হয়। প্রথমে আক্রমণ করা হয় এই বলে, যদিও বৌদ্ধধর্মে আত্মার সঙ্গে বিরোধ আছে তবু তারা কিছু একটার অস্তিত্ব স্বীকার করে যার জন্য পুণ্য কর্ম আর পাপকর্ম জীবে বর্তায়। দ্বিতীয় আক্রমণ আসে মায়াবাদের উপর। ‘ঐ যে পতাকাটি নড়ছে ঐটি কি? না, মায়া; পতাকাও নড়ছে না, বাতাসও নড়ছে না, নড়ছে ব্যক্তির মনের অনুভূতি।’ এই যদি মায়াবাদ তবে তার বিরুদ্ধতা আসবে এইভাবে “প্রতিদিন দেখছি সূর্য চন্দ্র আকাশে পরিভ্রমণ করছে; পাহাড়-পর্বত নদী পৃথিবীকে আশ্রয় করছে; পশুপাখী মানুষ জগৎ পরিভ্রমণ করছে। যদি হাজার হাজার ভিক্ষু সমবেত হয়ে এই মায়াবাদ প্রচার করে তবু পৃথিবীকে তারা ধ্বংস করতে পারবে না, সৃষ্টির গতি রুদ্ধ করতে পারবে না, এ সবকে শূন্য করে দিতে পারবে না।…একটির যদি হ্রাস ঘটে অন্যটির জন্ম হবে। আমার দেহ চলে যাবে, কিন্তু মানবজাতি থাকবে। কাজেই সব কিছুই শূন্য নয়।” রবীন্দ্রনাথও অনুরূপ কথা বলেছেন।

লাভ আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা-নামা একই খেলা একই তার গতি।

অথবা

যে-কাল হরিয়া লয় ধন,
সেই-কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা।

ফলত, চীনের খুঙ এবং তাও-এর গতিবাদের সঙ্গে বৌদ্ধের শূন্যতাবাদ মেলেনি, এইজন্যই এত প্রতিক্রিয়া। মিলল না মো-বাদীদের সার্বিকতার সঙ্গে; মানুষ এবং ভগবান তো দুই নয়, এক। জগৎ-শৃঙ্খলার একটিই নীতি (লি) দুটি নয়। কেউই কর্তা নয়, কেউই কর্ম নয়। গাছের শিকড় আর ফল একই ‘লি’ কর্তৃক পরিচালিত। মানুষের স্বভাব পূর্ণ হলে, স্বর্গের স্ব-ভাবেরও পূর্ণতা ঘটে। ফলের সঙ্গে ‘লি’-র স্বাতন্ত্র্য নেই। বৌদ্ধধর্ম মানুষ আর ঈশ্বরকে

পৃথক ক'রে ভাবে, যেন একটিকে নিয়ে অন্যটিকে ছাড়া যায়; ফলটি নিয়ে শিকড়কে যেন কেটে ফেলতে পারি।

এই বৌদ্ধ-বিরোধী অভিযান ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক অবধি অব্যাহত ধারায় চলছিল। তবে বৌদ্ধধর্ম চীনের জীবনযাত্রায় এমন জড়িয়ে পড়ল কেন? এ সম্পর্কে দ্বাদশ শতকে একজন সমাজতাত্ত্বিক বলছেন (চেন্ শূন্):

'বৌদ্ধধর্মের আবেদন সুদূর পর্বত-উপত্যকায় যুবতী, মেয়ে এবং বৃদ্ধাদের কাছে পর্যন্ত আছে। তারা যোগাচার করে, এমন কি দেহকে নষ্ট ক'রে দেয়। এই অবস্থা থেকে তাদের আর ফিরিয়ে আনা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের দুটি অনিষ্টকর দিক; একটি, জীবন-মৃত্যু এবং সংস্কার-সুখ মত দিয়ে মূর্খদের প্রবঞ্চনা করে; দ্বিতীয়টি দার্শনিকতার গালভরা কথায় পণ্ডিতদের প্রবঞ্চনা করে। জীবন-মৃত্যু এবং সংস্কার-সুখ মতবাদে সাধারণ লোক কেন প্রবঞ্চিত হয়? তারা মৃত্যুর পর নরকে যেতে ভয় পায়; আবার ঈশ্বরের কাছে পুনর্জন্মের জন্য প্রার্থনা করে। এই জন্যই নানা আচার আচরণ ক'রে মৃত্যুর পর শাস্তি থেকে ত্রাণ পেতে চায়; পুনর্জন্মে তারা সুখী হতে পারবে, সমাজের মর্যাদা পাবে, ধনী হবে—পুনরায় ভিখারী হতে হবে না। পণ্ডিতেরা প্রবঞ্চিত হয় কেন? পণ্ডিতেরা কেবল বই পড়ে কেবল ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু আহরণ করে রচনা শিখবার জন্য। তারা সত্য-সন্ধানের ধার ধারে না। কাজেই তাদের মন স্থিতিলাভ করে নি, চঞ্চল। বৌদ্ধ মতবাদ তাই তাদের সহজেই আকৃষ্ট হতে পারে।'

চেন-শূনের বক্তব্যে সমাজের সত্য অবস্থা উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা আছে, কিন্তু কেন এই অবস্থা থাকে? চীনের ইতিহাসে সমাজ-সংগঠক, দার্শনিক এবং রাজাদের তো অভাব ছিল না! তবে চীনের মানুষের মনে এই দ্বিধা এল কেন? কোথায় ত্রুটি? শিক্ষায় না সমাজ-ব্যবস্থায়? এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না যে, ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম সেখানে প্রবেশ করেছিল; একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, চীনের বৌদ্ধধর্ম চীনবাসীর মনের অনুসরণ ক'রে সৃষ্ট হয়েছিল। ঐন্দ্রজালিক ধর্মে তাদের আস্থা বলে স্বীকার করাও খুব সত্য উক্তি হবে না। যাদু ধর্ম তো তাও-এর মধ্যে ছিল। মনে হয়, খুঙ আর তাও বাদের ত্রুটিই চীন সমাজকে স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষ কোন ধর্মেই শান্তি পায়নি। দারিদ্র্য, রাজার হাত থেকে অত্যাচার, অভিজাতদের উৎপীড়ন, শিক্ষা-প্রবঞ্চনা সব কিছু তাদের বিদীর্ণ

ক'রে দিয়েছে। এক একটি যুদ্ধে মানুষের প্রাণ কচু-গাছের বেশি সমাদর পায় নি। রাজার পরাজয়ে লাখে-লাখে মানুষ পথে-ঘাটে অস্ত্রমুখে প্রাণ দিয়েছে। এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে পলায়ন করা স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতা প্রকাশ পেয়েছে সুপ্রাচীন শামান ধর্মে, প্রকাশ পেয়েছে অতি-লৌকিক কল্পনায়, প্রকাশ পেয়েছে যৌন-সংস্কারে (For centuries the country in one part or another had been wasted, men were dragged from their fields and homes to fight wars in which they had no interest and gaunt famine often stalked the land....There were, of course, periods of peace, and also barons who sought the welfare of the masses, but the ever-renewed strife had its effect on the character of the people, and especially of the educated class. It was a period productive of pessimism, a period when many left office and became recluses, hopeless of a remedy. W. E. Soothill, Page 19)।

এই অবস্থায় ধর্ম আর যাদু এক হয়ে যায়। কারণ এই প্রক্রিয়ার ধর্ম হচ্ছে বিফলতার ক্ষেত্রে মানসিক শক্তি সঞ্চার করা, বুদ্ধির অগম্য বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করা, সমবেত শুভবাদকে প্রকাশ করা, বিফলতা এবং দুর্যোগের কারণ আবিষ্কার করা, পরিশেষে সামাজিক সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। হয়ত জ্ঞাতসারে এ সব ঘটে না, কিন্তু ঘটে (Piddington Vol 1 page 366)। র‍্যাডক্লিফ-ব্রাউন-ই প্রথম এই ম্যাজিকের প্রকরণে ধর্মকে সমাজের এবং ব্যক্তির মানসিকতা তৈরীর হিতকল্পে বলেই জোর দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তা ছাড়া সমগ্র আদিম জাতিদের মধ্যেই দেখা যায় মৃত্যুর পরও যে আত্মা বেঁচে থাকে—সেই মতে বিশ্বাসী। বিপর্যস্ত সমাজে এই অনুষ্ঠান-উৎসব এবং পুনর্জন্মবাদের বোধ জাগ্রৎ করতেই হবে—এইই হচ্ছে মানব-সমাজতত্ত্ববিদদের প্রত্যয়। কাজেই, চীন দেশ এত বড় বড় দার্শনিকদের জন্ম দিলেও আদিম মানব-সমাজের মানসিকতার এবং সমাজ-প্রয়োজনীয়তার উর্ধে উঠতে পারেনি। চিন্তাজগতে দু-একজন ব্যক্তি উর্ধে উঠেছেন, কিন্তু সমাজ উঠতে পারেনি বলেই বারবার তাঁদের সার্থক তত্ত্বচিন্তাকে সাধারণ মানুষ নিজের মতো ক'রে ভেঙে গড়ে নিচ্ছে। বশ্যতার এ এক বক্র বিদ্রোহ। এরা রাজনীতির প্রাণ দিয়েছে, যূপকাষ্ঠে

কিন্তু তাদের প্রত্যেকটি রক্ত বিন্দু মৃত্তিকায় সঞ্চিত হয়ে বিদ্রোহের এমন এক অন্তঃসলিলা সৃষ্টি করেছে যাতে চীনের সভ্যতার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও সে ভেঙে পড়ল। অতএব খুঙ্‌বাদকে আমরা দোষ দিতে পারি না, পারি না তাওবাদকে, পারিনা বৌদ্ধধর্মকে। আমরা এই সমালোচনার গোলকধাঁধাঁয় ঢুকবনা। কিন্তু একথা না বললে বোধ হয় অন্যায় হবে যে, বৌদ্ধধর্ম চীনদেশের বিজ্ঞানচর্চাকে রুদ্ধ করে দেয় নি। কেবল বিজ্ঞান কেন,—প্রমাণ, ন্যায়বিদ্যা প্রভৃতি ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের সহায়তাতেই চীন নিয়ে যেতে পেরেছিল। দার্শনিকতার এই অঞ্চলকে চীনের বৌদ্ধধর্ম সমৃদ্ধই ক'রে তুলেছে।

চীনের প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি আলোচনা ক'রে চীনের সমাজ কাঠামোর প্রাণের দিকটির সন্ধান পেলাম। এবার দেখতে হবে শিক্ষার মাধ্যমে এই তত্ত্ব বা চিন্তার আলোক জনসাধারণের কাছে কি ভাবে পৌঁছোচ্ছে। চীনের শিক্ষা-চরিত্রের দুটো ভাগই মোটামুটি করা যায়; একটি সুপ্রাচীন কালের শিক্ষা ব্যবস্থা, আর অন্যটি প্রজাতন্ত্রের পরের অবস্থা। কম্যুনিজম বা সাম্যবাদের পরের কথা আলোচনা না করলেও চলে; কারণ রাশিয়ায় এই শিক্ষার চরিত্র আমরা দেখেছি।

চীনের প্রাচীন শিক্ষাধারা প্রসঙ্গে লরী বিশেষ আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগের চিত্রই যে তিনি দিতে পেরেছেন তা নয়। তিনি প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগ কেন খৃষ্টীয় অষ্টম শতক পর্যন্ত আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। বোধহয় তেমন নির্ভরযোগ্য পুস্তকের অভাব বলেই।

আমরা প্রাক্ খৃষ্টীয় যুগ সম্পর্কে উপরি লিখিত ধর্মমত থেকেই শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে কিছু অনুমান ক'রে নিতে পারি। বলতে কি, প্রাক্‌খৃষ্টীয় যুগের শিক্ষা যেহেতু অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সেই হেতু তাদের জীবনযাত্রা পর্যালোচনা করলেই শিক্ষার অবস্থা বুঝতে পারা যায়। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, সমাজের প্রভাতকালের শিক্ষা প্রায় একই রকম; পশ্চিম খণ্ডে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তা ছাড়া শাঙ্‌ যুগে কিরূপ শিক্ষা থাকা সম্ভব তাও আমরা প্রথমে কিছু কিছু দেখাতে চেষ্টা করেছি। কাজেই, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে তার পরের হাজার বছর পর্যন্ত যদি আলোচনা করি তবে চীনের শিক্ষার প্রথমাংশ আলোচিত হবে।

ওয়েলস উইলিয়ামস প্রাচীন পুথি থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন, ৪০০০ বছর আগে অর্থাৎ ২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চীনের গ্রামে ইস্কুল ছিল, জেলায়

উচ্চ-শিক্ষালয় ছিল, রাজার নিজ বিভাগীয় কলেজ ছিল এবং বড় বড় নগরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। পূর্বে উল্লিখিত মো-বাদীদের সমাজ-বিশ্লেষণেও দেখতে পেয়েছি, তা-থুঙ্গ কালে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য পিতামাতা বিশেষ নজর দিতেন। এই উক্তিকে কেবল রোমান্টিক উক্তি মনে করবার হেতু নেই; কারণ দেশের শ্রুতির উপর নির্ভর করেও অনেক সময় তথ্যানুসন্ধান করা হয়। তা ছাড়া তা-থুঙ্গ যুগ এমন একটা কাল্পনিক অবস্থা যে সেটি খুব কাছাকাছি সময়ের নয়। এইজন্যই উইলিয়ামসের সন্ধান খুব অযথার্থ নয়।

চাউ যুগের গোড়ার দিকে, দ্বাদশ-একাদশ শতকের গ্রন্থ থেকে, দেখা যায় যে চাউদের নিন্দা করা হচ্ছে এই বলে যে, তারা কেবল রাজ-কর্মচারী নির্বাচন করবার জন্যই পরীক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রতিবাদ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে, তৎপূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সন্তোষ জনক চরিত্র ছিল। প্লাথ এবং বিয়ো (Plath and Biot) প্রভৃতি গবেষকদের গ্রন্থ থেকে লরী দেখতে পেয়েছেন খুঙের সময়েই সমগ্র সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ রূপই কেবল পায়নি, সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। খৃষ্ট পূর্বাব্দ ২০০০ বছর আগেও যে সুসংবদ্ধ শিক্ষাকার্যক্রম নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল তাতে তাঁরা কোন সন্দেহই করতে চান না। কথাটি স্বাভাবিকও। শাঙ যুগের কাঠ বাঁশ প্রভৃতিতে লেখা এবং অস্থি-লেখমালার অস্তিত্বে একথা অবিশ্বাস করা যায় না; এই লেখা আয়াস সাধ্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সাপেক্ষ।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-সাপেক্ষ এইজন্যই বলতে হয়—শাঙ্ যুগের শেষে এবং চাউ যুগের প্রথম থেকেই শিক্ষাকে রাষ্ট্র করায়ত্ত করতে চেয়েছেন, করায়ত্ত করতে চায়—শুধু সুবিধা ভোগীর সমাজ তৈরী করতে। জনসাধারণের মধ্যেকার অতি প্রচলিত শিক্ষাকে নাস্তানবুদ ক'রে দেওয়ার জন্য নিজদের অনুমোদিত শিক্ষা প্রবর্তন করতে চায়। খুঙ্ এই শিক্ষাকে ভগীরথের মতো টেনে এনে পুনরায় সর্বসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শিক্ষা-চরিত্রে গণতন্ত্র এলেও, মূলত আসেনি। ফলে সাধারণ লোকে রাষ্ট্র পরিচালিত ইস্কুল কলেজগুলি পরিত্যাগ ক'রে ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষকের পদতলে বসে শিক্ষা-গ্রহণ করবার মতো এক মনোবৃত্তি গঠন ক'রে বসে। এইজন্যই ঐতিহাসিকেরা বলেন, চীনের তরুণেরা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গিয়ে পড়ার চেয়ে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকের সান্নিধ্যে পড়বার জন্যই ইচ্ছুক এবং আগ্রহী। যে গুরু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তার কাছেই সবাই এসে ভিড় করছে;

এই রকম বেসরকারী 'মহাবিদ্যালয়' চীনে প্রচুর, (The Chinese young man prefers coaching establishments to educational institutions; and where a master has gained a reputation for skill in teaching, many pupils gather round him to prepare for examination. Such private colleges are numerous.—Laurie; Historical Survey of prechristian education. Longmans Green & Co, 1907 page 125)। এই অবস্থার কারণ দুটি হতে পারে, (১) চিরাচরিত রীতি এবং (২) তাৎকালিক সরকার পোষিত ইস্কুলের দুর্নাম। শেষোক্ত কারণও দুভাবে জন্মাতে পারে (১) ছাত্রসংখ্যার প্রাচুর্যে লেখাপড়ার প্রতিবন্ধকতা, অথবা (২) সরকারী ইস্কুলের শিক্ষা অকেজো।

কিন্তু যে-ব্যবস্থায় সরকার সাহায্য করছেন, যে-শিক্ষার উপর নির্ভর করছে সরকারী চাকরী এবং পরীক্ষা, সে-ব্যবস্থায় যতই ত্রুটি থাকুক সরকার সেইটিই সমর্থন করে থাকে, ফলে চাকরী পাওয়া সহজ হয়ে যায়। এই রকম কারণ নিয়ে অনুমান করতে গিয়ে আমরা চীনের চরিত্রের সেই পুরাতন অভ্যাস বা চিরাচরিত রীতি-মূলক কারণটিকেই সমর্থন করতে উৎসুক হবই। ঘটনা হয়ত তাই-ই।

রাষ্ট্র ইস্কুল নিয়ন্ত্রণ করত কি রকম করে? আমরা দেখেছি, প্রকৃতপক্ষে এক রাষ্ট্র-অবস্থা তখনও ছিল না, প্রধানত সামন্তদের উপরই আঞ্চলিক শাসন নির্ভর করত। কাজেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র যে অঞ্চলের উপর বিশেষ হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হ'ত তা মনে হয় না। অথচ সম্রাটের তেমন বাসনা অন্তত শিক্ষার দিক দিয়ে ছিল।

কাজটি খুব সহজে হয়ে গেল। চীনের জনসংখ্যা কম নয়। কাজেই রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ইস্কুল কল্পনা অস্বাভাবিক, বিশেষ করে অর্থের দিক দিয়ে। অতএব ব্যবস্থা করা হল, সরকারী চাকরীগুলি নিয়ন্ত্রিত করা হোক। যারা শিক্ষিত তারাই সমাজে বিশেষ মর্যাদা পাবে, চাকরী পাবে। শিক্ষানুযায়ী চাকরীর তারতম্য বিচার করা হবে। শাসন-কার্য পরিচালিত হবে। শাসন-কার্য পরিচালিত হবে উত্তরাধিকার সূত্রে ব্যক্তিদ্বারা নয়, পরিচালিত হবে শিক্ষালব্ধ মর্যাদার অধিকারী যারা তাদের দ্বারা।

পিকিঙের হান-লিন বা শিক্ষাব্রতীদের পরিচালিত একটি পরীক্ষকগোষ্ঠী স্থাপিত হ'ল, তাঁরাই পরীক্ষা ক'রে দেখবেন—কে প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত

আর কে নয়। নিয়মিত সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হত, পরীক্ষার্থী উপস্থিত থাকত। কেবল কয়েকটি শ্রেণীর লোকে এই পরীক্ষায় প্রবেশাধিকার পেতনা—তার মধ্যে ক্ষৌরকার এবং নট-শ্রেণী অন্যতম। খুঙের সময়ে বোধ হয় এই শিক্ষা বা প'ীক্ষা এতটা প্রতিযোগিতা-মূলক ছিল না, বিশেষ একটা মানে পৌছাতে পারলেই চাকরী পাওয়া যেত অর্থাৎ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া যেত। কিন্তু খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক থেকে এই পরীক্ষা বিশেষ প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়ে।

এই পরীক্ষার বিচিত্র ইতিহাসেব একটা সাধারণ ইতিহাস এই, খৃষ্ট-পূর্বাব্দ একাদশ শতকে সুকুমার কলা (সঙ্গীত, ধনুর্বিদ্যা, অশ্বারোহণ, লেখা, এবং অঙ্ক কসা) এবং দেশীয় উৎসব-অনুষ্ঠান অর্থাৎ সমাজ-নীতি সম্পর্কে পবীক্ষার্থীকে পরিচিত হ'তে হত। কারণ তখন জনসাধারণ বেশিব ভাগই ছিল কৃষিজীবী। কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের শিক্ষায় কারুকর্ম বা সুকুমার-কলা আবশ্যিক হতেই হবে। কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠান সমাজ নীতি বিষয়টি সত্যিই চীন-সভ্যতাকে নতুন ক'রে ভাবতে শেখায়। সমাজের সংগঠনশক্তির এ এক প্রকাশ। এই কারণেই বলা হয়, চীনের শিক্ষা অতি প্রাচীন কাল থেকেই সঙ্ঘবদ্ধ এবং সংগঠিত। এই বিষয়টিই বর্তমান যুগে—বিশেষ পাঠ্যতালিকা (Extra-curricular activities) এবং কিছুদিন হল অনুষ্ঠানগত (co-carricular) পাঠ্য হিসাবে পবিগণিত হয়েছে। তবে বর্তমানের এই বিষয়টির যেমন বক্তৃতা শোনা যায়, তাতে মনে হয় এ বিষয়টি একটি সমাজ-রীতিব অভিনয় করা ছাডা আর কিছু নয়, এটি যে উদ্দেশ্য-দুষ্ট তা আমরা বৃটিশ ভারতে দেখেছি। এই উভয় কারণের জন্যই সমাজের সেই দৃঢ়তা, এই অভিনীত-ঐতিহ্য অনুশীলন থেকে গড়ে উঠতে পারছেনা।

যাইহোক, তার হাজার বছর পর (হান যুগে) দেখা গেল, পরীক্ষার বিষয় আরও বেড়েছে, অর্থাৎ খুঙ-দর্শন এসে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ওরই মধ্যেও পারিবারিক-স্নেহযুক্ত মনোভাব এবং সমাজ-একীকরণের বিষয়টিতে বিশেষ জোর পড়ল। অধিক বিষয়ের মধ্যে এল—দেশের আইন, সৈন্য পরিচালনা, কৃষিবিজ্ঞান, রাজস্ব-পরিচালনা, সাম্রাজ্যের ভূগোল এবং সেচ পরিকল্পনা। .

আরও এক হাজার বছর পর (তাঙ এবং সুঙদের সময়ে) সাহিত্য-শিক্ষার মর্যাদা আরও বেড়ে গেল, উপাধির মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী তৈরী করা হল।

মোটামুটি এই সব দিকই মিঙ্গ এবং ৎ-সিঙ্গদের সময়ে দেখা গেছে।

শিক্ষকের যে বাঁধাধরা কোনরকম উপাধি দরকার হত তা বোধ হয় নয়। পাশ্চাত্য দেশের মতো শিক্ষকতা করতে কোনরকম কর্তৃপক্ষের অনুমতিরও দরকার হত না। কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষকতা কার্যে খ্যাতির প্রয়োজন ছিল। তাঁর খ্যাতিতেই অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের তাঁর কাছে পাঠাতো। মনে হয় যাঁরা প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় ব্যর্থ হতেন তাঁরাই শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত হতেন; তাই সাহিত্যবিষয়ে সাধারণত তাঁদের উপাধি থাকত। উপরের ইস্কুলে গবেষণা-করেছেন-এমন ব্যক্তিই পড়াতেন, অর্থাৎ আমরা এখন যাঁদের 'ডক্টর' বলি তাঁরাই। প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারী ছাড়া সমাজে শিক্ষকের মতো এত সম্মান আর কেউ পেতেন না।

প্যাগোডা বা মন্দিরে এই ইস্কুল বসত, সহরে বা গ্রামে। আর বসত কোন বণিকের আশ্রিত হয়ে, বা বাজারে। কোনরকম চালাঘর হলেই ইস্কুল বসতে পারত। ঘর ভাড়া করতেন শিক্ষক নিজে। এই সাধারণ ইস্কুল ছাড়া সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলেমেয়েদের জন্য ধনীর পৃষ্ঠপোষণায় ইস্কুল খোলা হ'ত। এই ইস্কুলের ঘরের অবস্থা ভালো, কারণ ধনী ব্যক্তিটি পূর্বপুরুষের নামে এই ইস্কুলবাড়ী উৎসর্গ করতেন।

গ্রামের ইস্কুলে ছাত্রসংখ্যা ২০ থেকে ৭০ এক একজন শিক্ষকের তাঁবে। সকালবেলা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত একবার ইস্কুল বসবে; তারপর আহারাদির সময়ে ছুটি দিয়ে পুনরায় ১ টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কাজ চলত।

শিক্ষকের নিজের জন্য বসবার আসন কাছে। ছাত্রেরা বই, কাগজ, কালি প্রভৃতি লিখবার সরঞ্জাম এবং বসবার আসন নিয়ে আসত।

৭ বছর বয়সে পড়া সুরু হত। আমাদের দেশের হাতে-খড়ি মতো চীনেও একটি অনুষ্ঠান ছিল 'কোই-হোক'। খুঙের মূর্তির কাছে তারা ধূপ ধুনো দিয়ে পূজো করবে, তারপর গুরুমহাশয়কে প্রণাম করবে। প্রতিদিন এমনি এসে গুরুবন্দনা করবে।

এই খবর আমরা পাচ্ছি ডুলিট্‌ল-এর লেখা থেকে, (Doolittle, Social life of the Chinese, 1866)। সেই কথাই লবী সাহেবও বলছেন। মনে হয় ডুলিটল উনবিংশ শতকের চিত্রই দিয়েছেন। তা যদি হয়, তবে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতের এই প্রথা চীনে গিয়েছিল বলে অনুমান করতে পারি।

প্রায় প্রত্যেক ইস্কুলেই তিনটি ক'রে শিক্ষান্তর ছিল। প্রাথমিক, মধ্য এবং উচ্চ। প্রাথমিক স্তরে লেখা অভ্যাস এবং মুখস্থ করা; মধ্যস্তরে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ; উচ্চস্তরে টীকা ব্যাখ্যা প্রভৃতি স্বাধীন রচনা।

পাঠের মধ্যে ছিল—প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি অর্থাৎ 'তিন রকমের প্রাচীন পুথি'। প্রথম সুরু হত এই পাঠে—শিক্ষার সার্থকতা দিয়ে। তারপর পরিবারে ব্যবহার রীতি বা ব্যক্তিগত আচরণ; তারপর জ্ঞানমূলক শিক্ষা যেমন—তিনটি শক্তি সম্বন্ধে যথা,—আকাশ, পৃথিবী এবং মানুষ; চারটি ঋতু কাল এবং আকাশের দিক; পাঁচটি উপকরণ বিষয়ে যথা, ধাতু, কাষ্ঠ, অগ্নি, পৃথিবী, জল; পাঁচটি সদগুণ যথা, প্রেম, ন্যায়, প্রজ্ঞা, সত্য, সৌজন্য। এছাড়া ৬টি শস্য বিষয়ে, ৬টি গৃহপালিত পশু বিষয়ে, ৭টি মনোবৃত্তি বিষয়ে, আটটি সঙ্গীত উপকরণ, ৯ রকমের সামাজিক সম্পর্ক, রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র প্রভৃতি বিষয়ও জানতে হত। তারপর আছে চীনের ইতিহাস।

পাঠ্যতালিকাই কেবল কঠিন নয়, হরফ শেখাও গভীর প্রচেষ্টাসাপেক্ষ বটেই। এমন অনেক শব্দ শিখতে হ'ত যার অর্থ হয়ত শিক্ষকও বুঝতে পারতেন না।

কেমনভাবে পড়ানো হতনা, তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে শ্রেণীভাগ ছিলনা ইস্কুলে এ কথা জানা যায়। সবই ব্যক্তিগত পাঠনার মতো। পড়া শিখত যে উপায়ে তা হচ্ছে—বই খোলার পর শিক্ষক পড়তেন। তাঁর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ছেলে যার যাব বই খুলে আবৃত্তি করত বা শিক্ষকের অনুকরণে পড়ত। চোখ আছে বইয়ে, যেটি পড়ছে তাতে বুলোচ্ছে অঙ্গুলী, এমনি করে, যখন স্বাধীনভাবে ছাত্রেরা পড়তে পারবে—তখনই পড়া হ'ল ব'লে ধ'রে নেওয়া যাবে। তারপর, এই রকম 'পড়া নিয়ে' যার যার যায়গায় ফিরে এসে ঐগুলি মুখস্থ করত। সরবে বা বলতে গেলে উচ্চৈঃস্বরে পড়াই ছিল বিধি। পড়া হল? এবার এস পড়া ধরা হবে। ছাত্র এল, শিক্ষকের কাছে বই রেখে, পেছন ফিরে মুখস্থ বলতে থাকল।

বইয়ের ভাষার তিনটি ক'রে প্রতীক নিয়ে এক একটি বাক্য, এই জন্যই এই ভাষাকে বলা হয় ত্রয়ী-প্রাচীন অক্ষরের ভাষা (যা পূর্বে উল্লেখ করেছি), পদ্ধতি দেখছি অনেকটা আমাদের দেশেরই মতো ছিল। এই জন্যই মনে হয়, ভারতের বৌদ্ধ শিক্ষারীতি ওদেশে গিয়েছিল। আগে কি ছিল, সে কথা জানা এখনও সম্ভব নয়।

উচ্চবিদ্যালয়ে অবশ্য বক্তৃতা-ধর্মী বা আলোচনা ধর্মী পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল।

যাই হোক এইসব পড়ার আশু উদ্দেশ্যই ছিল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য। কাজেই সেই পরীক্ষার কথার হিসাব একটু নিই।

চীনের জেলা বড ছোট নয়, ইয়োরোপের এক-একটি দেশের মতো; এই জেলার ভার থাকে একজন নগর-কর্তার উপর (Mandarin), তাঁর নীচে অনেক অবর কর্তা থাকেন, তাঁদের মধ্যে দুজন শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ।

অনেকগুলো জেলা নিযে একটি বিভাগ; বিভাগের কর্তা একজন বিচারক। কয়েকটি বিভাগ নিয়ে একটি চক্র; চক্রের কর্তা তাওউ-তেই; এর মাধ্যমেই সৈন্য বিভাগের সঙ্গে শাসন বিভাগের যোগসূত্র রক্ষিত হ'ল।

প্রদেশের শাসন করেন একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, তাঁকে নিযুক্ত করেন স্বয়ং সম্রাট।

ঠিক এমনি ব্যবস্থা শিক্ষাবিভাগের; হুবহু অনুরূপ। সর্বপ্রধান হচ্ছে পিকিং-এর হান-লিন। ২৩২ জন সভ্য এখানে। প্রত্যেকের জন্য একটি করে বাড়ী আর বাগান সরকার দেয়, কিছু বৃত্তিও আছে। এত সত্ত্বেও সরকার থেকে এই পর্ষৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন। সরকার সাহায্যের বরাদ্দ কখনও বন্ধ করতে পারেনা। কেবল শিক্ষা নিযন্ত্রণই এই পর্ষদ করেনা, সম্রাটকে অনেক বিষয়ে পরামর্শও দেয়।

জেলায় শিক্ষাবিশেষজ্ঞদেব পরিচালনায় প্রাথমিক পরীক্ষা (preliminary examination) অর্থাৎ উপাধির প্রাথমিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই পরীক্ষা দুটো।

এই পরীক্ষা দুটির পর বিভাগীয় শহরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। এই পরীক্ষা প্রতি তিনবছরে দু বার হয়। পরীক্ষার্থী এখানেও দুবার পরীক্ষা দেয়। যারা উত্তীর্ণ হবে বলে মনে হয়, তাদের স্মৃতি থেকে একটি নির্দিষ্ট পুস্তক (Sacred Edict) উদ্ধৃত করতে হয়। এই মুখস্থ লেখায় উত্তীর্ণ না হলে অন্য বিষয়ে সে যত ভালোই করুক, সে উত্তীর্ণ হল না। যারা উত্তীর্ণ হল তারা উপাধি পেল (সিউৎসাই)। উত্তীর্ণ ব্যক্তির কতগুলি সামাজিক সুবিধে এল: তার টুপিতে বোতাম পরতে পারবে; ফৌজদারী অপরাধেও সে কিছু সুবিধা ভোগ করে, সে হল অভিজাত। কিন্তু উপাধি পায় খুব কম যুবকই। এই স্নাতক-পত্র দেওয়া নিয়ন্ত্রণ করে সরকার। কাজেই অন্যান্য

বিষয়ে যত বিদ্যাই থাক, অনুত্তীর্ণ ব্যক্তি হতাশ হয়ে, সমাজে মর্যাদা না পেয়ে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

তাই পরীক্ষায় দুর্নীতি ঢোকে, ঘুষ প্রথা ছিল, উপাধি কেনা চলত। ৭।৮ হাজাব প্রার্থীর মধ্যে হয়ত ৬০।৭০ জনই উত্তীর্ণ হ'ত।

এই উপাধির পর হচ্ছে চু-জিন স্তর তাবপর চিন-ৎসে উপাধি (Doctor) এই পবীক্ষা নেয় হান-লিন পিকিঙে।

তা হলে তিনটি স্তর, উপাধি, চু-জিন এবং চিন-ৎসে। উপাধি পেয়েও চু জিন না উত্তীর্ণ হতে পারে। তাতে ক্ষতি আছে, উপাধি পেলেই চাকরি পাবে না, চু-জিন হলে পাওয়ার আশা থাকে। চিন ৎসে হলে জেলা শাসক হওয়া যায়।

চাকরীব এত কড়াকড়ি থাকলে উমেদারীও থাকবে। উমেদারী থাকলে ঘুষ থাকবে। চীনের সমাজে শেষেব দিকে এই অবস্থাই হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কোন প্রাচীনদেশ সম্পর্কেই এমন সাদা-মাঠা কথায় কিছু বলা যায়না। শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থকারেরা (সাধারণত পাশ্চাত্য দেশীয়) চীনের পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে উপহাসই ক'রে থাকেন। এক সময় ছিল যখন চীনের শিক্ষা-সম্পর্কে সেখানকার মিশনারীদের আলোচনাই নির্ভর করতে হ'ত। কিন্তু তারপর ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে অধিকতর সন্ধান নিয়েছেন। তাঁদের বিশ্লেষণে ঘটনাগুলি অন্যবকম দাঁড়িয়েছে।

চীনের ঐ পাঠ্যক্রমই, তা সে অন্যদেশ মুখস্থবিদ্যা ইত্যাদি বিশ্লেষণে যতই নিন্দা করুন, প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেব তৈরী কবেছে, এঁদের সামনে পশ্চিমের অনেক মনীষী রাজনীতি বিশেষজ্ঞই দাঁড়াতে পারেননি। তার বোধ হয় প্রধান কারণ, চীন সুদূর অতীত থেকে সমাজ মানুষের কার্মিকতা এবং সম্পর্ক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছে। খৃষ্টেব জন্মের বহু আগে সেখানকার সমাজ দার্শনিকেরা বলেছিলেন, "ন্যায়ের জন্য ভালো যুদ্ধ ব'লে কিছু নেই এইমাত্র আছে কতগুলি যুদ্ধের চরিত্র থেকে কতগুলি ভালো," এইসব দার্শনিকতার মধ্যে মানবসমাজের অভিজ্ঞতা যে কিরূপ চিন্তা-গর্ভ হয়ে আছে এবং কেনই বা আছে তার সন্ধান করে ঐতিহাসিকেরা মুগ্ধ হয়েছেন।

গাইলস তাই বলেন, (H. A. Giles, The Civilisation of China, Page 112-113) চীনের পরীক্ষা নিয়ে অনেক উপহাস করা হচ্ছে, তবে একবার সত্য ঘটনা শুনুন। এই পরীক্ষা চীনের প্রশাসনিক বিভাগের মধ্যে

একটি গৌরবপূর্ণ কাজ। লুকোচুরি করে ভর্তির জন্য নাম ঢোকানোর ব্যবস্থা মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে; এবং এমন কথা বলা যায়না যে, এই গুপ্ত প্রক্রিয়া একেবারেই সফল হয়নি। কিন্তু বিপদও ছিল, ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড হ'ত। এতো পরীক্ষা নয়, অগ্নিপরীক্ষা বিশেষ; কিন্তু এই পরীক্ষা যাঁরা নিতেন বা পরীক্ষার কেন্দ্র যেখানে হ'ত সে সম্পর্কে ইতিহাস যতই পড়া যায় ততই মনে হয় এমন সুশৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা সেকালে হ'ল কি করে। যেমন সময়-নিষ্ঠা, তেমনি ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দায়িত্ব এবং গোপনীয়তা রক্ষা করবার কত রকম কৌশল। প্রশাসনিক বিভাগের এই একটি বিভাগ দেখলেই মনে হয়, চীনের মানুষ কত অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, কত সঙ্ঘবদ্ধ।

গাইলস-এর সম্পূর্ণ বক্তব্য উদ্ধৃত করতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু স্থান অসঙ্কুলান হেতু সম্ভব নয়। তবে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে—যে সব প্রার্থী পরীক্ষার উত্তর খাতায় দিল, সেই খাতা কিন্তু পরীক্ষকদের হাতে দেওয়া হ'তনা; সেই সব খাতা লাল কালি দিয়ে নকল করে সেই নকল খাতা পাঠানো হত। নকল খাতাতেই পরীক্ষকেরা নম্বর দিতেন। কাজেই পরীক্ষকদের ধরে-বেঁধে নম্বর বাড়িয়ে নেওয়া নিতান্তই অসম্ভব ছিল।

চীনের অধিবাসী সরকারী দুর্নীতি সম্পর্কে তিলকে তালে পরিণত ক'রে আন্দোলন করেছে, রেখে ঢেকে কিছু বলেনি; কিন্তু এই একটি বিষয়ে তারা একমত যে, পরীক্ষা উৎপীড়নমূলক বটে কিন্তু এখানে কোন দুর্নীতি ছিলনা; (The Chinese who make no attempt to conceal or excuse, in fact rather exaggerate any corruption in their pnblic Service generally, do not hesitate to declare with striking unanimity that the conduct of their examination system is above suspicion, and there appears to be no valid reason why we should not accept this conclusion. Giles--Page 116)।

বলা হয়ে থাকে, চীনারা সাধারণত কবিতা আর দর্শনে অগ্রসর। কিন্তু সভ্যতা এবং অন্যান্য আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতিতেও যে-তারা কত উন্নত ছিল তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে :

মুদ্রণ-পদ্ধতি সম্পর্কে চীনের দান অবিস্মরণীয়। সেচ কার্যে চাকার ব্যবহার তাদেরই আবিষ্কার; চীনের প্রাচীরের কথা বাদ দিয়েও তাদের বিস্ময়কর কীর্তি রয়েছে সেতু নির্মাণে; আজকাল আমরা গাড়ীতে মাইল

অনুযায়ী মূল্য হার নিরূপণের মিটার যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি, দেখা গেছে চীন তাদের সাধারণ গাড়ীতে এমনি যন্ত্র ব্যবহার করে জানতে পারত গাড়ী কতটা দূরে পরিক্রমণ করল ; এ ঘটনা খৃষ্টাব্দ চতুর্থ শতকে ঘটেছিল ; আঙুলের ছাপ দেখে ব্যক্তিকে সন্ধান করা চীনেই দেখা গেছে (খৃষ্টাব্দ ৭ম শতকে)।

যন্ত্রবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতিতে প্রাচীন চীন কত যে অগ্রসর হয়েছিল, তার মূল্যায়ন কিছু কিছু বর্তমানে চলছে। কাজেই চীনের শিক্ষাব্যবস্থার এমন কোন গুণ নিশ্চয়ই ছিল—যার ফলে শিক্ষা রুদ্ধ-বৃদ্ধি হয়ে থাকে নি। শিক্ষায় এই শক্তি কোথায়? নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কিন্তু দুঃসাধ্য ব'লেই তাকে অযথা নিন্দা করা যায় না। দুঃসাধ্য কারণ, মানব-সভ্যতার মধ্যে দুটো দেশ পাওয়া যায় যার মধ্যে কোনরকম যোগসাধন নেই। একটি হচ্ছে সামাজিক এশিয়া অন্যটি নিতান্তই বণিকী-খৃষ্ট-ইয়োরোপ ; বণিকী-খৃষ্ট-ইয়োরোপ শিল্প বিপ্লবের পর এমন অপরাজেয় হয়ে জগতে ছড়িয়ে পড়ল যে তার বন্যায় সামাজিক এশিয়াকে কোণঠাসা হয়েই থাকতে হ'ল তা নয়, ইউরোপের বক্তৃতায় এবং সম্পদের চাকচক্যে তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আত্মবিস্মৃত হ'ল, আত্মহত্যা করল।

যাই হোক আধুনিক কালের স্বকপোল-কল্পিত ইতিহাস ছেড়ে আমরা ইস্কুলের অগ্রগামিতা দেখতে চেষ্টা করি।

খুঙ্ বা লাও-এর যুগে অনেকে কল্পনা করেন গ্রামের ইস্কুলের পাশাপাশি চরক-ইস্কুলও ছিল (Peripatetic)।

কিন্তু খৃঃ পূর্বাব্দ ৩১৮ তে চীনের চ্-হি রাজধানীতে একটি একাডেমীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তার নাম চি-হ্সিয়া বা চি-এর দরজা। অন্যান্য প্রদেশ থেকে পণ্ডিত এবং শিক্ষার্থী এখানে সমবেত হত : তারা বাসস্থান পেত, আহার্যও পেত। স্থাপন করেছিলেন রাজা হ্সুয়ান। এখানে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিতেন বলে জানা যায়। এঁদের মধ্যে প্রকৃতিবাদী দার্শনিক ৎ-সাউ-ইয়েন ছিলেন ; ইনিই ইন-ইয়াং মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা : তাও-বাদীদের থিয়েন-ফিয়েন, শেন-তাও চুয়াঙ্-ৎস্থও ছিলেন বলে অনুমিত হয়। এই একাদেমীর বয়স প্রায় প্লেতোর একাদেমীর (খৃঃ পূর্বাব্দ ৩৪৮ আনুমানিক)।

এরপর চীনের সাম্রাজ্য গঠিত হল চীন বংশ কর্তৃক (২২৫-২০৬ খৃঃ পূর্বাব্দ)।

এই যুগ সামন্ততন্ত্র বিরোধী! পূর্বের যুগের সমস্ত সাহিত্য নষ্ট করা হ'ল, কারণ খুঙবাদ সামন্ততন্ত্রের গুণগান করেছে বলে মনে করা হ'ত। চীন সম্রাটের মন্ত্রী ছিলেন লি; একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। তিনিই চীনের লিপির সরলীকরণ করলেন। বর্তমানকালেও সেই সরলীকৃত লিপি চীনের অবলম্বন। তিনি সম্রাটকে পরামর্শ দিলেন, 'সামন্তযুগের সমস্ত গ্রন্থ ধ্বংস করে দিন'। নতুন সমাজের উপযোগী গ্রন্থ লেখা সুরু হোক। মার্কসবাদের মতো অনেকটা; সমাজকে বিশেষ ভাবে ভাবিত করলেই তা ঐতিহ্য হয়ে দাঁড়ায়। কেবল জ্যোতির্বিজ্ঞান, পূজাউপাসনা, ভেষজ বিজ্ঞান, এবং কৃষিকাজ সংক্রান্ত পুথি রাখা হবে। আর সবই পুড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কাজটি খুব সহজও ছিল। কারণ তখন পুথি কাষ্ঠখণ্ডে বা বংশখণ্ডে একরকমের তেল রঙ দিয়ে চিত্রিত করা হ'ত। সম্রাট নিজে এই রকম ১২০ পাউণ্ড ওজনের গ্রন্থ এবং রাজ অনুশাসন দৈনিক পাঠ কবতেন। এই দুর্বহ ভার নিয়ে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব। তবে একেবারে যে কিছু বাঁচানো যায় নি তা নয়; তবু ধ্বংস প্রচণ্ড রকমেরই ছিল।

এই সময়ে চীনের প্রাচীরের প্রকৃত নির্মাতা মেঙ্-তিয়েন লিখবার একটি উপকবণ আবিষ্কার করলেন; উটের লোমের তুলি বা পেন্সিল। তার আগে বাঁশের একরকম কলম ব্যবহৃত হ'ত। তাঁর আবিষ্কার আর একটি দিক দিয়ে যুগান্তকারী এই জন্য যে, তখন থেকেই কাঠ বা বাঁশের ফলকের পরিবর্তে সিল্কের কাপড়ে লেখা চলতে লাগল। চীন বংশ একদিকে যেমন গ্রন্থ ধ্বংস করেছে তেমনি গ্রন্থ-সংরক্ষণেব প্রচেষ্টা জাগিয়ে স্থায়ী গ্রন্থ নির্মাণের উপকরণ অজ্ঞাতসারে যুগিয়ে দি '।

এর পরেই সামন্তদেব বিদ্রোহ সুরু হয়। সামন্তবাদ স্থাপনের সঙ্কল্প নিয়ে হান বংশ রাজ্য অধিকার করল। অবশ্য যতটা সঙ্কল্প ততটা সিদ্ধি হল না। কারণ সমাজে চীন বংশ নতুন চিন্তাধারা দিয়ে গেছে তাকে নষ্ট করা সহজ নয়; নষ্ট করা বাজনীতির দিক দিয়েও সুবুদ্ধির হল না। যাই হোক হান বংশকে বলা যায় শাসন-তান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। অতএব একদল লোক পাওয়া যাবে যারা শাসনতন্ত্র রক্ষা করে। এঁরা খুঙ-এর গ্রন্থাদি অর্থাৎ চাউ বং:শের যত গ্রন্থ পাওয়া গেল তার পুনঃপ্রচার করতে সুরু করলেন। এই সময়ের একটি লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে। (খৃঃ পূঃ ২০১):

"সম্রাট চীন-যুগের জটিল এবং কঠিন উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ ক'রে দিলেন; ফলে এই হল, পানোন্মত্ত অবস্থায় কর্মচারীরা তর্কবিতর্ক সুরু করল, তরবারি নিয়ে হলঘরের দেওয়ালে ঠুকতে লাগল। সম্রাট তো মহাখাপ্পা। স্ সুস্থন থুঙ্গ সম্রাটকে তখন বললেন, পণ্ডিতেরা কখনও সাম্রাজ্য জয় করতে পারবেনা। কিন্তু তারা সাম্রাজ্য রক্ষার সাহায্য করতে পারে। আমি পরামর্শ দিচ্ছি লু্ প্রদেশের সমস্ত পণ্ডিতদেব আপনি আহ্বান করুন, এবং আদেশ করুন তারা যেন রাজ্যের একটি বিধিগত উৎসব অনুষ্ঠানেব ব্যবস্থা করে।"

এইভাবে বিধান তৈরী করতেই পণ্ডিতেবা প্রথম আলোচনা-চক্র প্রতিষ্ঠা করল। এইভাবেই চীনেব 'পরীক্ষা ব্যবস্থা' সেই থেকে সুরু হল। হ্সিয়াও হোর নির্দেশে কাওৎ-সু যখন প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের কাছে রাজকর্মচারী পদের যোগ্য ব্যক্তির অনুমোদন চেয়ে পাঠালেন, সেই থেকে পরীক্ষা ব্যবস্থা সুরু হল।

সম্রাট উ (খৃঃ পূ ১৪১) সিংহাসনে বসলেন। চুঙ-শূ-এর প্রস্তাবক্রমে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য উ বিশেষ চেষ্টা কবলেন। চুঙ-শূ নিজে একজন পণ্ডিত, তিনিই শাসনতান্ত্রিকতার বিধি বন্ধ করেন। তাঁর একটি গ্রন্থ আছে চ্-হুন চ্-হিউ ফানলু। এই সময় থেকেই চীনেব ইতিহাস লেখা সুরু হয়।

ঐ যে পণ্ডিতদের চক্র বা বুধ-মণ্ডলী ওঁরাই প্রাচীন লেখা পড়ে নানারকম নিয়ম এবং বিধির নিদেশ দিতেন। এই থেকে সুরু হল পুথিপত্রের ব্যাখ্যা এবং আলোচনা করার ধারা শিক্ষা জগতে।

এই যে ব্যুরোক্রাসী প্রতিষ্ঠার হিড়িক এল, তারজন্য তো ইস্কুল কলেজ চাই। খৃঃ পূর্বাব্দ ১২৪, পো শিহ কুয়ান বা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল প্রাচীন পুথি পড়ার জন্য। কিন্তু প্রাদেশিক বিদ্যালয় ওয়ান্-ওঙ্গ তাঁর স্জেচুয়ান প্রদেশে খৃঃ পূর্বাব্দ ১৪৫ এই স্থাপন করেন।

ওয়ান্ ওঙ্গের বিদ্যালয়ের ইতিহাস আছে। ওয়ান্ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে দেখলেন জেলার লোকে অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর সদৃশ, শিক্ষা দিয়ে এদের সংস্কার করতে হবে। চেঙতু-তে তিনি এইজন্য শিক্ষা বিভাগ (হ্সুয়েহ্কুয়ান) স্থাপন করলেন। এই শিক্ষাবিভাগের পরিচালকদের তিনি নিজের হাতে শিক্ষা দেন, এবং তাদের রাজধানীতে পাঠিয়ে শিক্ষাও দিয়ে আনলেন।

তারপর জেলার সমস্ত ছেলেদের আহ্বান করলেন এখানে এসে পড়তে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষণ ব্যবস্থা করা হ'ল তারপর ছাত্র আহ্বান করা হল। যে ছেলেটি সবার সেরা হবে তাকে কর্মচারীর পদ দেওয়া হবে, আর যারা তেমন নয় তাদের উপাধি দেওয়া হবে—হ্‌সিয়াও তি লি থিয়েন অর্থাৎ 'উপযুক্ত ভাবে শিক্ষিত কৃষক পুত্র'। ওয়ান ওঙ্গ যখন পরিদর্শনে আসতেন তখন এই ছাত্রদের নিজের সঙ্গে নিয়ে জেলায় ঘুরে বেড়াতেন, তাদের অনেকরকমের সুবিধা দিতেন, যথা তাঁর কার্য পরিষদে ঢুকবার জন্য তাদের বিশেষ ফটকের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার একটি সুফল দেখা দিল। লোকে ছাত্রদের সম্ভ্রম করতে সুরু করল, সবাই চাইল তাদের ছেলেরাও এমনি শিক্ষালাভ করুক, এইরকম সুযোগ পাক।

সম্রাট উ নিজেও পরবর্তীকালে ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু নতুন শিক্ষার অগ্রগামী ওয়ান ওঙ্গকেই বলা হয়।

ওয়াঙ মাঙ্গের সময়ে (খৃষ্টাব্দ প্রথম শতকের প্রথম দশকে) বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এক অধিবেশন আহ্বান করলেন। কারা বিশেষজ্ঞ? যাঁরা প্রাচীন পুথির বিবরণ দিতে পারেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করেছেন, অঙ্ক জানেন, সঙ্গীত শাস্ত্র জানেন, যাঁরা ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ভেষজ্জ বিজ্ঞান এবং উদ্ভিদ বিজ্ঞান জানেন; যাঁরা প্রাচীন পুথির পঞ্চস্কন্ধ অবগত আছেন। প্রায় সহস্রাধিক এইরকম বিশেষজ্ঞ সমবেত হয়েছিলেন ব'লে জানা যায়।

এই বিদ্যোৎসাহিতা বিজ্ঞান-চর্চার কথা জানায়। জানায় চীনে এইসব শিক্ষা প্রচলিত ছিল। যাইহোক এই সময়ে দেখাগেল ৎ-শাইলুন ১১৪ খৃষ্টাব্দে কাগজ আবিষ্কার করেছেন (সুট হিলের মতে ১০৫ খৃষ্টাব্দে Soothill, Page 31)। তা ছাড়া এই সময়ে বহু বিষয়ে গ্রন্থাদি লিখিত হয় এবং আবিষ্কৃত হয়। প্রথম অভিধান লিখিত হয় এই সময়ে, চীনের বিশ্বকোষও প্রণয়ন করা হয়।

হান যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য পুস্তক মুদ্রণ ব্যবস্থা। কি ভাবে এই ব্যবস্থা এল? কবে থেকে এল?

প্রথমে চীনদেশে প্রচলিত ছিল মোহর খোদাই করা কাঠে, বাঁশে, পাথরে। তারপর কাঠের ব্লক থেকে কাগজে ছাপানোর প্রথা দেখা গেল; ৯৩২ খৃষ্টাব্দে খুঙের গ্রন্থ মুদ্রিত হ'তে দেখা যায়। এমনি ক'রে ধাপে ধাপে মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত হ'ল।

কাগজ আবিষ্কৃত হওয়ার পর চীনলিপিরও কিছু পরিবর্তন ঘটল, আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে। প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটল কারণ, এর পূর্বে গ্রন্থ নকল করায় ব্যক্তিগত তারতম্য অনুযায়ী লিপির এবং ফলে বক্তব্যের কিছু স্বাতন্ত্র্য ঘটত; এখন গ্রন্থ-পাঠ অনেকটা নিয়মবদ্ধ হয়ে গেল। ধর্মের দিক দিয়ে হানযুগের শেষ দিকেই বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করল। খৃষ্টাব্দ ৩৪ এর দিকে ইহুদী বণিকেরা এখানে আসতে থাকে; এই সময়েই আরবেরা সমুদ্র-পথে দক্ষিণ-চীনে আসতে থাকে; এবং ১৯৬ খৃষ্টাব্দে রোম-সম্রাটের প্রতিনিধি মার্কাস অরেলিয়'স চীনে প্রেরিত হন।

খৃষ্টাব্দ ২২০ থেকে ২৬৫ এর মধ্যে চীন ত্রিখণ্ডিত হয়ে যায়। উত্তরাঞ্চলের অধিকার এল ওয়ে (we) এর, পশ্চিমাঞ্চলে শু এবং দক্ষিণে উ।

বৌদ্ধধর্ম অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় খুঙ বাদের ক্ষয় ঘটে। তার ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থা সাময়িক বাতিল হয়ে যায়। অন্তত কর্মচারী নিয়োগের জন্য আর পরীক্ষা গ্রহণ প্রথা থাকলনা।

তাতারদের আক্রমণে চীন বিপর্যস্ত হলেও শিক্ষা-বিষয়ে একটি নতুন দিক নিয়ে এল। ৩৯৭ খৃষ্টাব্দে তোবা রাজ্য উত্তর চীনে স্থাপিত হয়। এই তোবা বংশ অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ছিল। প্রথমত এরা বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম চীনে স্থায়ী আসন লাভ করে। লিয়াঙ (Liang) বংশের প্রতিষ্ঠাতা (৫০২ থেকে ৫৫৭) তোবাদের অনুকরণে দক্ষিণেও বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটায়। উল্লেখযোগ্য এই যে, তাঁর সময়ে ১৩০০০ বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারতেব ভিক্ষুদের এনে ধর্ম প্রচার করা হয়। আমরা জানি বৌদ্ধমঠের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ বিদ্যালয়ও যাবে, কাজেই এই মঠ যে এক একটি ইস্কুলকেও আশ্রয় দিত তা অনুমান করা কঠিন নয়। আবার এই সময় থেকেই দেখা গেল সংস্কৃত গ্রন্থ চীন-ভাষায় অনূদিত হতে; এই অনুবাদকদের মধ্যে কুমারজীব ছিলেন অন্যতম। চান বা ধ্যানী সম্প্রদায় অর্থাৎ ধ্যানের দ্বারা অন্তর সমৃদ্ধ করা যায় এই ভাবটি চীন, কোরিয়া এবং জাপানে বৌদ্ধধর্মের নতুন আলোক সম্পাত করল এই সময় থেকেই।

সুই রাজাদের পর থাঙ রাজারা আসে। এদের সময়েই ইসলাম ধর্ম চীনে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে।

৮৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে আবার খুঙবাদ প্রতিষ্ঠা পাওয়ায়, এবং বৌদ্ধমঠের

অত্যধিক প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় বৌদ্ধদেব বিরুদ্ধে রাজাদের কোপদৃষ্টি পড়ে। প্রায় অর্ধলক্ষাধিক মন্দির-মঠ ধ্বংস করে ফেলা হয়। কিন্তু থাঙ বৌদ্ধবাদ চীনের শিক্ষায় নতুন সংযোজনা করল মুদ্রণ বিষয়ে। চীনরা বহুদিন থেকে কালি এবং কাগজ ব্যবহার করছে; তারা জানে ধাতু, পাথর এবং মাটি থেকে সীল তৈরী করতে। এখন এল ব্লক দিয়ে ছাপানোর প্রথা।

আর একটি প্রয়োজনও ছিল। স্থইদের সময় থেকেই স্থশৃঙ্খল লিখিত পরীক্ষা-প্রথা ছিল বটে; তার আগে হানদের আমল থেকে ছিল মৌখিক পরীক্ষা। পরীক্ষা-পদ্ধতি যত বিন্যস্ত হল, ততই পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ও ঢেলে সাজাতে হল। ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে দেখা গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০০ মতো ছাত্র পড়ছে। রাষ্ট্রীয় আকাদেমী ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হল (হান-লিন ইয়ুয়ান), এবং চিঙ্-এর শেষ দিক পর্যন্ত চালু ছিল। এই একাদেমীতে গবেষণার কাজই বেশি চলত।

আর এক কারণে সাহিত্য-চর্চার প্রেরণা এল। তা হচ্ছে বিধান নিরূপণ করা। যাই হোক থুঙ্গ যুগকে বলা যায় চীনের সাহিত্যের যুগ. এই যুগে জগদ্বিখ্যাত অনেক কবির জন্ম হয়; তাঁবা কার্ব্য চর্চা ক'রে চীনের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। কাব্য ছাড়া উৎকর্ষ দেখা দিল গদ্য সাহিত্যের।

থাঙ্ (Thang) যুগের সঙ্গে স্থঙ্গ যুগের তফাৎ হচ্ছে—প্রথম যুগ মননবিদ্যার, দ্বিতীয় যুগ বিজ্ঞান-চচার।

বিজ্ঞান-চর্চায় স্থই যুগেই দেখা গেছে ব্রাহ্মণ্যবাদের আবির্ভাব; জ্যোতির্বিজ্ঞানে, পঞ্জিকায়, অঙ্কে, ভেষজে।

ষষ্ঠ শতকে আর একটি সংস্কৃতির ধারা এল পারস্য থেকে; অর্থাৎ জরথুস্ত্রবাদ। সরকাব এই মতের পৃষ্ঠপোষণা করেছে। এল নেস্টোরিয়ান খৃষ্টধর্ম, সিরিয়া থেকে। মনে রাখতে হবে, কেবল ধর্মই আসে না, আসে সংস্কৃতি, আসে বিদ্যা। এই বিদ্যার্জনের জন্য প্রয়োজন ইস্কুল। আমরা পূর্বে দেখেছি, ঐসব দেশে বিদ্যালয় তখন সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গ হিসাবে পরিণত হয়েছে। বিদেশে এসে এই প্রয়োজনীয়তা বাড়ে ছাড়া কমে না। গোষ্ঠী গঠনের এইই হচ্ছে প্রাথমিক স্থত্র। আরও একটা নতুন সম্ভাবনা এসেছে সওদাগরদের মারফৎ। বস্তু-সভ্যতার ধাবক হচ্ছে সওদাগর। অথচ, প্রাচীন ইস্কুল দর্শন বিজ্ঞানের তথ্য নিয়ে, রাজা নিয়ে মত্ত; সেখানে সওদাগরেরা কারিগরী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে কারিগরী ইস্কুল প্রতিষ্ঠার কথা

ভাববেই। ভারতে এরকম হয়েছে, ইংল্যাণ্ডে হয়েছে। চীনের অবস্থাও তখন ইংল্যাণ্ডের মতো; কারণ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, রাজার চেয়ে সওদাগরের হাতে টাকা জমছে বেশি। পূর্বে মঠের হাতে সম্পত্তি চলে যাচ্ছে বলে—মঠ ধ্বংস করা হয়েছিল, কিন্তু সওদাগরকে ধ্বংস করা অত সহজ নয়। অতএব ভিতরের চাপে থাঙ্গ সাম্রাজ্যের পতন ঘটল।

সুঙ্গদের রাজত্বকালে থাঙ্গদের গীতিকবিতা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্যেব স্থান ক'রে দিল। কারণ সৈন্যবাহিনী এবং সেনাপতিদের মুক্ত ক'বে দিয়ে (রাজনৈতিক কারণে) গ্রামে বা মফঃস্বলে পাঠিযে দেওয়া হযেছিল। অবসর আনে শিক্ষা বা বিদ্যাচর্চা। কিন্তু ঐ সময়েব মধ্যে অর্থাৎ ১০৩২ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের এক গোষ্ঠী হ্‌সি-হ্‌সিয়া কান্‌সু এবং নিঙ্গসিয়াতে রাজত্ব করতে বসল। হ্‌সি-হ্‌সিয়া ভাষা অনেকটা চীনের মতো। এই বংশ একটি আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করেছিল হ্‌সি-হ্‌সিয়া নামে। মনে হয় ঐ ভাষা চর্চার জন্যই এই ইস্কুল।

সুঙ্গ-যুগ বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার দিক দিযে তুঙ্গসীমায় উঠেছিল। বিজ্ঞান ভাষাতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির এমন কোন বিভাগ নেই যে এই যুগে কোন প্রতিভাশালীর সাহায্য পায় নি।

এই ঘটনা সম্ভব হল কি করে? ঐতিহাসিকেরা বলেন, যত ইস্কুল কলেজ ছিল, সরকারী অথবা বেসরকারী (শূ ইয়ুআন), সবগুলোর বর্গীকরণ করা হয়। অর্থসাহায্যও প্রচুর করা হ'ল। সব বিদ্যালয়ই যেন রাষ্ট্রেব প্রভূত সাহায্য নিয়ে নতুন ক'রে শিক্ষা ব্যবস্থাকে গডতে থাকে।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম থেকে (১২০৪) চেঙ্গিসখাঁ চীনে আক্রমণ চালালেন। মঙ্গোল বা ইয়ুআন বংশ প্রায় শতবর্ষ রাজত্ব করেছিল। মঙ্গোলযুগেব একটি বড সৃষ্টি চীনকে বাইরের জগতেব সামনে এনে দাঁড কবানো। এতকাল চীন ছিল অবরুদ্ধ দেশ মতো; এখন সমস্ত পথ মুক্ত হয়ে গেল। মুক্তিলাভের বড লাভ, আন্তর্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার। এই জন্যই এখন থেকে ভৌগোলিক জ্ঞান চর্চার তাগিদ পডে যায়। এই সময়ে বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম তাওদেব উপর প্রতিশোধ নিতে পারল। কারণ দেখা যায়, মঙ্গোল শাসকদের সহায়তায় তাও-দের অনেক গ্রন্থ পুডিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এই থেকেই তাও-বাদ দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে গিয়ে গুপ্ত সমিতি গঠন করতে পারল। মঙ্গোল যুগের অবসান ঘটানোয় তাও

বিপ্লবীদের হাত অনেকখানি ছিল। সে যাক, এখানে চীনের পরীক্ষা-প্রথার কথা নিয়ে আবার আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে। চীনের পণ্ডিত-অভ্রেরা আবার শাসন-কার্যে প্রবিষ্ট হতে চায়। অথচ পণ্ডিতদের মধ্যে বেকার সমস্যাও বেশি দেখা দিল। এই সমস্যাই ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে অবলুপ্ত পরীক্ষা প্রথা পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। ১৩১৫ তে আবার পরীক্ষা প্রবর্তন করা হ'ল। এই সমস্যা আর একটি দিকে ধাবিত হল; পণ্ডিতেরা এবার নাটক এবং উপন্যাস সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হলেন। খুঙ-বাদের পুনরায় আক্রমণ ঘটে; এই শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৩৮২ তে মঙ্গোল যুগের অবসান ঘটে।

মিঙ্গ এবং চিঙ্গ (বা মাঞ্চু) যুগ নান্‌কিংকে কেন্দ্র ক'রে অধিষ্ঠিত হ'ল। মিঙ্গযুগে দেশীয় ধর্ম এবং আচার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা চলে। কিন্তু তার চেয়ে বড কথা হচ্ছে, সমগ্র ইয়োরোপ চীনে ঢুকে পড়েছে। পর্তুগীজ এলো ১৫১৪ তে, ডাচ ১৬২২ এ, ইংরেজ ১৬৩৭ এ। রাশিয়া ১৫৬৭ এবং ১৬১৯-এই দুবার আসতে চেষ্টা করেছে। ফিলিপাইন দখল করল স্পেনীয়রা ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে।

এদিকে শাসন তান্ত্রিক সম্প্রদায় দিনে দিনে বেড়ে চলছে। তার ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থা কঠোর হ'তে সুরু করে।

নতুন যুগে আসবার আগে প্রাচীন চীনের ইস্কুল সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সূত্র আলোচনা করলাম তাব সার সঙ্ক্ষেপ আমরা একটু করে নিই:

(ক) সাধারণ উদ্দেশ্য:

১। চিত্র বা ভাবলিপির প্রচুর চর্চা দেখে একথা মনে করা নিতান্তই যুক্তি-সম্মত হবে যে, প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ব্যবস্থা শাঙ্‌-যুগ থেকেই ছিল। না থাকলে এই লিপি শিক্ষা চলতে পারে না। ধীরে ধীরে এই সংস্কৃতিই জাতির মানসিকতায় দৃঢ় হয়ে ভিত্তি প্রস্তুত করছিল। গল্ট সাহেব তো আরও জোর দিয়ে বলেন যে, সুশৃঙ্খল শিক্ষা পদ্ধতি এবং অনুশীলন এই প্রতিষ্ঠানে ছিলই, ২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকেই কোন না কোন প্রকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল; (Thus it does not seem unreasonable to assume that as early as 2000 B. C. there were some types of educational institutions. H. S. Galt—Chinese educational Institutions, Vol. 1 Page 58 ; A. Probsthain, London 1951)।

২। চাউ যুগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন ধারার কথা জানতে পারা যায় নি।

সাধারণত প্রাচীন চীনে শাসকশ্রেণীর প্রয়োজন সাধনের জন্যই শিক্ষা কতগুলি বিষয়ে নিবদ্ধ থাকত; ছয়টি বিষয়—উপাসনা-উৎসব বিধি, সঙ্গীত, ধনুর্বিদ্যা, রথচালনা, লেখা এবং হিসাব কসা। এর মধ্যে উপাসনা-উৎসব বিধি-শিক্ষার মধ্যে সামাজিকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, অন্যান্যের মধ্যে রণনীতি কিন্তু লেখা আর হিসাব-কসার মধ্য দিয়েই আসছে খাঁটি বিদ্যাভ্যাস। সাধারণভাবে লৌকিক জীবনযাত্রা থেকেই আসছে পাঠ্যসূচী; সে সময়ে শিক্ষা পুথিগত হয়ে পড়েনি, পণ্ডিতীও নয়; সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে সমাজ-সম্পর্ক স্থাপনার উপায়ই হচ্ছে এই শিক্ষা বিষয়।

৩। চীনের সমাজে জাতিভেদ প্রথা তৎকালে দেখা যায় নি; এমন কি স্থায়ী সমাজশ্রেণীও নয়। তবে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে পদমর্যাদার স্তরভেদ ছিল। সম্ভ্রান্ত শ্রেণী থাকলেও, স্পষ্টত কৃষকশ্রেণী ব'লে কিছু ছিল না। চীন ভাষায় 'কৃষক' বোঝায় এমন শব্দ-ও দেখা যায় না। যা পাওয়া যায় তার অর্থ হচ্ছে, জনসাধারণ, লোক এবং ছোট লোক।

সমাজশ্রেণীর মধ্যে এই কথাগুলি পাওয়া যায় যথা, পণ্ডিত (শি), গৃহস্থ (নুঙ্) শ্রমজীবী (কুঙ্) ব্যবসাদার (শাঙ্)। অর্থাৎ বৃত্তি-গত পরিচয়।

আশ্চর্যের কথা এই যে, রাজাদের শিক্ষাবিষয় সুরু হত কৃষিকাজ শেখার মধ্য দিয়ে। সম্রাটই ছিলেন শিক্ষার অধিকর্তা। কাজেই কৃষিকাজ পাঠ্যসূচীতে সমাদৃত হওয়া স্বাভাবিক।

সম্ভ্রান্তবর্গের শিক্ষা বিষয়ে বেশ বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়: প্রধান শিক্ষক এবং তাঁর সহকারী এঁদের ছেলেদের শিক্ষার ভার নিলেন। প্রধান শিক্ষক সম্মুখে হেঁটে চললেন, আর সহকারীরা ছাত্রদেব পশ্চাতে। তাঁরা যখন হলঘর থেকে বেরোবেন বা সেখানে প্রবেশ করবেন—তাঁদের পথে থাকবেন ছাত্র-তত্ত্বাবধায়ক এবং অন্যান্য শিক্ষক। তাদের লেখাপড়া শেখানো হ'ত আর ধার্মিক ক'রে গড়া হত। নীতি শিক্ষা দিতে শিক্ষকেরা বাস্তব সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা করতেন। ছাত্র-তত্ত্বাবধায়ক ছাত্রদের নীতিশিক্ষায় পরিচালনা করতেন, নজরও রাখতেন।

সম্রাটের কর্মচারীদের (সম্ভ্রান্তকর্মচারী) পুত্রদের জন্য এক জন বিশেষ

লোক নিযুক্ত হ'ত। তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে সমস্ত রাজপুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা থাকত। তিনিই তাদের করণীয় সম্পর্কে ব্যবস্থা দিতেন।

শিক্ষক ছাত্রদের তিনটি বিষয়ে চরিত্র-শিক্ষা দিতেন: সত্যবাদিতা, সতর্কতা, এবং অন্যায় বা সামাজিক পাপ নিবারণ করবার অভ্যাস অর্জন করা।

খ) **আঞ্চলিক ইস্কুল ব্যবস্থা:**

১। শাসনকার্যের জন্য চাউ যুগে দেশকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছিল:

৫টি পরিবার নিয়ে	১টি গোষ্ঠী;
৫টি গোষ্ঠী ...	১টি পল্লী (পাড়া)
৫টি পল্লী ...	১টি সমাজ-বংশ; (clan)
৫টি সমাজ-বংশ	১টি গ্রাম-সম্প্রদায়;
৫টি গ্রাম-সম্প্রদায়	১টি পল্লী-অঞ্চল; (County)
৫টি পল্লী-অঞ্চল	১টি শাসনবিভাগ; (department)

এই বিভাগটি আভ্যন্তরীণ শাসনকার্যের। বহির্বৃত্তিক শাসন বিভাগ হচ্ছে;

৫টি পরিবারে	১টি পাড়া	(লিউ)
৫টি পাড়ায়	১টি গ্রাম	(লি)
৪টি গ্রামে	১টি পরগণা	(ৎ-স্যুয়ান)
৫টি পরগণায়	১টি সহর	(পি)
৫টি সহরে	১টি জেলা	(হ্‌সিয়েন)
৫টি জেলায়	১টি রাজ্য।	(স্যুই)

এই সময়ে ইস্কুল গৃহস্থের বাড়ীতে যা ছিল তা 'শূ' বা ব্যক্তিগত ইস্কুল; গ্রাম-সম্প্রদায়ের ইস্কুলটিকে বলা হ'ত হ্‌সিয়াঙ্‌; পল্লীঅঞ্চলের ইস্কুল হচ্ছে হ্‌স্যূ; রাজধানীর ইস্কুল হ্‌স্যুয়েহ্‌। অর্থাৎ চাউ যুগে শাসনকার্যের জন্য যেমন নিয়ম মাফিক অঞ্চলে দেশকে ভাগ করা হয়েছে তেমনি অঞ্চল হিসাবে ইস্কুলও দেখা যায়। এই ব্যবস্থা নিশ্চিত রূপে প্রমাণ ক'রে যে, সে সময়েই চীনদেশে সংগঠিত নিয়মবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল।

২। রাজধানীতে নয় রকমের ইস্কুল ছিল বলে জানা যায়: তার মধ্যে ছয়টি,

শান হ্‌সিয়াঙ — উচ্চতর ইস্কুল।

তুঙ্‌ হ্‌স্যূ — পূর্বদিকের কলেজ।

তুঙ্ চিয়াও — পূর্বদিকের ইস্কুল।
কু ৎসুঙ — রাজকীয় ইস্কুল প্রাসাদ (hall of the honoured Blind)।
পি ইয়ু — „ ইস্কুলের দ্বিতীয় প্রাসাদ („ „ bright harmony)
চেঙ্ চুন্ — চরিত্র সৃষ্টি এবং সাম্যশিক্ষার কলেজ।

৩। স্থান, শ্রেণী-ইস্কুলের কাযতালিকা অনুযায়ী ইস্কুলের নামও পাওয়া যায়:

*ইস্কুলের নাম	*স্থান	*কার্যতালিকা	*শ্রেণী
শূ—(ব্যক্তিগত ইস্কুল)	বাড়ীতে	...	...
হ্সিয়াঙ—(বিদ্যালয়)	সম্প্রদায় গোষ্ঠীতে		
শাঙ্ হ্সিয়াঙ—(উচ্চবিদ্যালয়)	—	বইপড়া	—
হ্সু—(বিদ্যালয়)	পল্লীঅঞ্চলে		
তুঙ্ হ্সু—(পূর্বদিকের কলেজ)	প্রাসাদের পূর্বদিক।	যুদ্ধ এবং সহরবাসীর নৃত্য এবং বলিপ্রথা।	
কু ৎসুঙ্—(রাজকীয় ইস্কুল প্রাসাদ, প্রথম স্তর)		কবিতা, গান এবং উৎসব	
চেঙ্ চুন্— (চরিত্রশিক্ষা এবং সাম্য শিক্ষা)		গান, প্রথম শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠন,	
হ্সিয়াঙ হ্সুয়েহ্—(প্রাথমিক ইস্কুল)	প্রাসাদের দক্ষিণে	—	প্রাথমিক;
তা হ্সুয়েহ্—(বিশ্ববিদ্যালয়)	বড় বড় জেলা সহরে	উচ্চতর শিক্ষার	
পি ইয়ু—(রাজকীয় ইস্কুলপ্রাসাদের দ্বিতীয় স্তর)	সম্রাটের রাজধানীতে		
পান্ কুঙ্—(প্রাদেশিক কলেজ)	রাজ্যের রাজধানীতে		
তাঙ্ চিয়াও—(পূর্বদিকের ইস্কুল)	—	বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা করতে শেখা।	
ইয়ু হ্সিয়াঙ (শান্যুগের ইস্কুল)	প্রাসাদের পশ্চিমে।		

এই ১৩ প্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে চীনের প্রাচীন গ্রন্থে জানতে পারা যায়। এই ইতিহাস থেকে জানা যায়, ইস্কুলের শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ্যতালিকার প্রভেদ।

হান যুগে (২০২ বা ২০৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩য় খৃষ্টাব্দ) পাঁচ রকমের ইস্কুলের কথা জানা যায়:

তা-ই হ্সুয়েহ (বিশ্ববিদ্যালয়)—রাজধানীতে উচ্চতর শিক্ষা।

চুন কুয়োর অন্তর্গত

হ্সুয়েহ	—	প্রদেশে	মাধ্যমিক
হ্সিয়াও	—	পল্লীঅঞ্চলে	„
হ্সিয়াঙ্	—	সহরে	„
চু-র অন্তর্গত হ্সু	—	গ্রামে	

দক্ষিণ রাজবংশের যুগে (২২০ খৃষ্টাব্দ থেকে ৫৮১ খৃষ্টাব্দ) পাওয়া যায়,

কুয়ো ৎ-জু হ্সুয়েহ্—চিন্ বংশ কর্তৃক ২৭৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত; অভিজাতদের পুত্রেরা মাত্র পড়তে পেত।

জু হ্সুয়েহ্ কুয়ান্—সুঙ্গ বংশ কর্তৃক ৪৩৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত; কনফুসিয়াসের শাস্ত্র পড়তে হত।

এ ছাড়া সুঙ্গের আমলে আরও তিন প্রকারের ইস্কুল ছিল ; (১) ধর্মশিক্ষার (২) ইতিহাস শিক্ষার এবং (৩) সাহিত্য শিক্ষার। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী ইস্কুলও ছিল।

৪৭১ খৃষ্টাব্দে সুঙ্গদের পৃষ্ঠপোষণায় 'ৎ-সুঙ্ মিঙ্গ কুয়ান' নামে সাধারণ শিক্ষা-আলোকের জন্য একটি ইস্কুল স্থাপিত হয়। বোধ হয় ধর্মশিক্ষা এখানে প্রধান পাঠ ছিল। কিন্তু এর সঙ্গে ৪টি বিভাগ ছিল সেখানে অন্যান্য ইস্কুলের পাঠ্যতালিকা পড়া যেত। অনেকটা বহুমুখী (ধর্মীয়) বিদ্যালয়ের মতো।

৪৮৩ খৃষ্টাব্দে চেইবংশের রাজাদের সময়ে একটি সামরিক শিক্ষার ইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। তবে বোধ হয় প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত হয় নি।

ৎ-সুঙ্ মিঙ্গ কুয়ানের মতো চেই-রাজারা পণ্ডিতদের জন্য একটি ইস্কুল খোলেন তার নাম হ্সুয়েহ্ শি কুয়ান্।

লিয়াঙ রাজারা আইন শিক্ষার একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ৫০৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁরা 'চি ইয়া কুয়ান্' নামে দূরের ছাত্রদের জন্য একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ৫০৬ এ। আর একটি উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইস্কুল খোলা হয় ৫৪২ খৃষ্টাব্দে 'শি লিন কুয়ান' নামে।

উত্তর রাজ্যের ওয়েই রাজারা ৪০৮ খৃষ্টাব্দে 'চুঙ্গ শূ হ্সুয়েহ্' প্রতিষ্ঠা করেন ; এটি পুথিপড়ার কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় হিসাবে পরিগণিত হত।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এঁরা চার দরজার ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ৫০০ খৃষ্টাব্দে ; এখানে অভিজাতদের পুত্রেরাই পড়ত।

সম্রাটের সঙ্গে বিদ্বন্মণ্ডলী সমবেত হয়ে শাস্ত্রালোচনা করতেন। এই

ধরণের ইস্কুলকে এঁরা 'লিন্ চিহ্' ইস্কুল বলেছেন। 'লু' দরজার কাছেকার ইস্কুলের নাম ছিল লু মেন্ হ্‌স্যুয়েহ্—প্রতিষ্ঠিত হয় ৫৬০ খৃষ্টাব্দে।

হানদের পরিকল্পনা মতো এঁরাও স্থাপন করলেন 'তাই হ্‌স্যুয়েহ্' এবং 'পি ইয়ুং'। 'পি-ইয়ুং' যে কি ধরণের ইস্কুল তা কেউ বলতে পারে না, তবে এই ইস্কুলটি রাজপ্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত সে কথা জানা যায়।

পাঠ্যতালিকার মধ্যে এই ইস্কুলে ছিল—প্রাচীন শাস্ত্র, তাও-বাদ এবং বৌদ্ধশাস্ত্র, সামরিক শিক্ষা এবং আইন।

হান্ যুগে 'গুরুজনের প্রতি ব্যবহার' বিষয় ইস্কুলের শিক্ষার অঙ্গ ছিল; এই যুগে তার উপর জোর পড়ে।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়, তার ফলে ব্যাপক সাহিত্যচর্চা সমাজে এল। তাঙ্‌ যুগে, ৬১৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট কাও ৎ-স্যু শিক্ষা সম্পর্কে এক আদেশ জারী করলেন। আদেশটি প্রণিধানযোগ্য। মর্মটি নিম্নরূপ:

'কুয়ো ৎ-জু হ্‌স্যুয়েহ্'—ইস্কুলে ৭২ জন ছাত্র পড়তে পারবে। ছাত্র নির্বাচন করতে হবে তৃতীয় স্তর বা তার উপরকার স্তরের রাজপুরুষদের মধ্য থেকে।

'তাই হ্‌স্যুয়েহ্'—ইস্কুলে ১৪০ জন ছাত্র পড়বে। পঞ্চম স্তর বা তদুচ্চ স্তরের রাজপুরুষদের ছেলেমেয়েরা এই ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার যোগ্য।

'চার দরজার'—ইস্কুলে ১৩০ জন ছাত্র পড়বে। সপ্তম বা তদুচ্চ স্তরের রাজপুরুষের ছেলেরা ছাত্র হওয়ার যোগ্য।

জেলা ইস্কুলের মধ্যে (চুন্)—প্রথম শ্রেণীর জেলার ইস্কুলে ৬০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৫০ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ইস্কুলে ৪০ জন ছাত্র পড়বে।

হ্‌সিয়েন বা পল্লীঅঞ্চলের প্রথম শ্রেণীর ইস্কুলে ৪০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩০ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ইস্কুলে ২০ জন ছাত্র সংখ্যা নির্দিষ্ট।

কাও ৎ-স্যু ৬১২ খৃষ্টাব্দে সাহিত্যের ইস্কুল স্থাপন করলেন, ৬২৬ খৃষ্টাব্দে এর নাম হল হুঙ্গ-ওয়েন-কুয়ান।

লিপি শিক্ষা বা হাতের লেখা শিক্ষা এবং আইন শিক্ষার জন্যও ইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। ধীরে ধীরে নানা বিষয়ের যথা প্রাচীনশাস্ত্র, ইতিহাস এবং অঙ্কের জন্য পৃথক পৃথক ইস্কুল স্থাপিত হল।

যাই হোক তাঙ্‌ যুগের শেষে চীনে যে বিভিন্ন ধরণের ইস্কুল ছিল তাদের বর্গীকৃত করলে দাঁড়ায়:

(১) অভিজাতদের ইস্কুল, (২) বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) বিশেষ বিষয় পড়বার ইস্কুল, (৪) তু-তু ইস্কুল বা সেনানিবাস অঞ্চলের ইস্কুল, (৫) চাউ ইস্কুল বা সহরে নাগরিকদের শিক্ষার জন্য ৩ রকমের ইস্কুল (৬) হ্‌সিয়েন ইস্কুল—৪ শ্রেণীর ইস্কুল।

ইস্কুল ছাড়া বৃহত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ;

(৭) হুঙ্গ-ওয়েন-কুয়ান ; গ্রন্থাগার এবং ইস্কুল একত্রে ; এখানে রাজা বা অভিজাতদের পোষ্য এবং আত্মীয়বর্গ পড়ত,

(৮) চুঙ্গ-ওয়েন-কুয়ান—প্রসিদ্ধ সাহিত্য-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ; এটিও গ্রন্থাগার ও ইস্কুল একত্রে ; স্থাপিত হয় ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে

(৯) কুয়াঙ্গ-ওয়েন-কুয়ান্‌—সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রাহভাজন শিক্ষার্থীরা পড়তে পেত ; বৃহত্তর সাহিত্য শিক্ষার প্রতিষ্ঠান একে বলা যায়। স্থাপিত হয় ৭৫০ খৃষ্টাব্দে।

চীনের ইস্কুল সম্পর্কে এত বিস্তৃত লিখলাম এই জন্য যে, ইস্কুলের ধারণা গ্রীসে এল, না মিশরে এল, না চীনে এল—সেই কথা পাঠকদের অনুধাবন করবার জন্য। এখানকার প্রাচীন ইস্কুল যে কতখানি নিয়মবদ্ধ ছিল তা বুঝবার জন্য তখনকার প্রশাসনিক বিভাগের কথা একটু বলি :

মন্ত্রণাসভায় প্রধান মন্ত্রীকে নিয়ে ৬ জন মন্ত্রী ছিলেন ; তার মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী একজন। ইনি আভ্যন্তরীণ শাসন তদারক করতেন। বিস্ময়ের কথা সুপ্রাচীন কালে চীন-ই একমাত্র দেশ যে বুঝতে পেরেছিল স্বরাষ্ট্র-সচিবের একমাত্র কর্মই হচ্ছে দেশের শিক্ষা বিস্তার ; শিক্ষার বিস্তার ঘটলেই দেশে শান্তি থাকে। জগতে এমনটি দ্বিতীয়বার ঘটল না কেন তা গবেষণা করবার মতো। এই শিক্ষামন্ত্রীর অধীনে আর যাঁরা ছিলেন,

(১) সহকারী মন্ত্রী, (২) বিভাগীয় তত্ত্বাধাযক (৩) তত্ত্বাধায়কের নীচে কয়েকজন বিভাগীয় উপদেষ্টা (Governor) (৪) তার নীচে পল্লী-অঞ্চলের শাসনকর্তা (৯) তার নীচে সম্প্রদায়ের (Communal) শাসনকর্তা। (৬) তার নীচে উপজাতিদেব অাংকর্তা (director) (৭) তাব নীচে ছোট গ্রামের অধিকর্তা।

শিক্ষা মন্ত্রীর প্রধান করণীয় ছিল জমি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান। এই জ্ঞান সমাজের লোককে প্রদান করার ব্যবস্থা করা, যাতে কৃষিকাজ সুসম্পন্ন হয়।

বৎসরের প্রথম দিনে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা-পরিদর্শকদের দেশের সমস্ত অঞ্চলে

প্রেরণ করতেন। তাঁরা শিক্ষা-অনুজ্ঞা নিয়ে লোকের মধ্যে প্রচার করেন। তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হত ;

(ক) ৬টি মানবিকগুণ—উপলব্ধি, পরোপচিকীর্ষা, শ্রদ্ধা, ন্যায়-বিচার, রাজভক্তি, এবং ঐক্য।

(খ) ৬ রকমের সামাজিক স্বভাব : পারিবারিক আনুগত্য, সৌহার্দ, ক্ষমা, পরিবার-সঞ্জাত স্নেহ-প্রীতি, দায়িত্ববোধ এবং করুণা।

(গ) ৬ রকমের সামাজিক কর্ম : শাস্ত্রীয় উৎসব-অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, ধনুর্বিদ্যা অশ্বারোহণ, লেখা, এবং হিসাব কসা।

সহকারী মন্ত্রীর কাজ : শিক্ষা সম্পর্কীয় আইনকানুন প্রচারিত করা, এবং জনসাধারণের মনোভাব এবং অবস্থার সন্ধান নেওয়া।

বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়ক—৪ জন : শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করা এবং আইন প্রণয়ন করা ; জাতীয় ত্রিবার্ষিক পরীক্ষা তত্ত্বাবধান করা।

বিভাগীয় উপদেষ্টা : বিভাগের শিক্ষা বিধি নিয়ন্ত্রণ করা। মাসের প্রথম দিনে শিক্ষা বিধি তাঁর হস্তগত হবে, মন্ত্রী তাঁকে দেবেন। তিনি তখন তাঁর বিভাগের কর্মচারীকে ঐগুলি প্রদান ক'রে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবার ব্যবস্থা করবেন।

পল্লী-অঞ্চলের শাসনকর্তা : মাসের প্রথম দিনে তাঁর অঞ্চলের অধিবাসীকে সমবেত ক'রে—তাদের সামনে শিক্ষা-বিধি পড়ে শোনাবেন—এবং তাদের শিক্ষা-গুণ নিরূপণ করবেন।

সম্প্রদায়ের শাসনকর্তা : বৎসরে ৪টি ঋতুকাল। প্রত্যেক ঋতুর প্রথম দিনে তাঁর সম্প্রদায়কে সমবেত করিয়ে শিক্ষা বিধি পড়িয়ে শোনাবেন। এমনি ক'রে উপজাতি এবং ছোট গ্রামের অধিকর্তারা নিজস্ব কাজ মাসের প্রথম দিনে উদ্‌যাপিত করবেন।

অনেকে ভাববেন, শিক্ষাসংক্রান্ত কাজ তো কিছুই দেখা যাচ্ছেনা! হয়ত এইটি শিক্ষার অঙ্গ। অথবা গণ্ট সাহেবের অনুমানই সত্য যে, এ বিষয়ে বিশেষ পুথি-পত্তর এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। কিংবা অসম্পূর্ণ।

যাই হোক, চীন যে তার সমাজকে গঠন করবার জন্যই এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাদের শিক্ষা ব্যাপারে 'সামাজিক শিক্ষার' (Social Education) কথাও জানা যায়। তবে আমরা সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করতে নিরস্ত হলাম,

কারণ মোটামুটি এই সঙ্কীর্ণ আলোচনা থেকেই আমরা চীনের বিস্তৃত শিক্ষাব্যবস্থার কথা অনুমান ক'রে নিতে পারি।

এই পর্যন্ত চীনেব প্রচলিত ইস্কুল ও শিক্ষাব্যবস্থাব আলোচনা চলে। এর পবই ইয়োবোপীয় প্রভাব এসে ইস্কুলকে জগতের অন্যান্য অঞ্চলেব মতো ভেঙ্গে সাজানোর চেষ্টা চলেছে। পরবর্তীকাল নিশ্চিতরূপে পাশ্চাত্য ইস্কুলকে অনুসরণ করবে। গণবাষ্ট্রেব যুগ পর্যন্ত আমরা তাবই সন্ধান পাব। অবশ্য কিছু কিছু দিকে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি, তবে সে আলোচনা কেবল চীনেব প্রচলিত শিক্ষাব সমালোচনা মাত্র, সে সমালোচনা আবাব ইয়োরোপীয়দের হাত থেকে।

অষ্টাদশ উনবিংশ শতকে মিশনারীবা খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্যই ইস্কুল খুলেছিল। এই ধর্মপ্রচারকদেব মধ্যে ক্যাথলিক প্রথম দিকে ইস্কুল প্রবর্তন কবল, তাবপর প্রোটেস্টাণ্ট। মিঙ্গদের বাজত্বকালে অর্থাৎ ষোড়শ সপ্তদশ শতকে জেস্যুইটরা বিজ্ঞান অনুশীলনের এক নতুন ধারা চীনে আনল। এঁদের মধ্যে মাতিও রিক্কি, ফনবেল, ফার্ডিনাণ্ড ভাববেইস্টেব নাম উল্লেখযোগ্য। শাংহাইযেব কাছে ১৮৭২ সালে 'যন্তব-মন্তব' (observatory) ক্যাথলিকেবা স্থাপন কবে। ১৮০৭ সালে ববার্ট মরিসন ক্যানটনে এলেন, সেই থেকে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইস্কুল খোলা হ'ল। ম্যাকাও এবং হংকঙে ১৮৩৫ এ স্থাপিত মরিসন শিক্ষা সমিতি (Morrison Education Society) নিজস্ব ইস্কুল খোলে। এই ইস্কুলের উদ্দেশ্য হল খৃষ্টান তৈরী করা। কাজেই দরিদ্রদের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর এখানে কেউ পড়তে এল না। অবশ্য এই ছাত্রদের সরকাবী চাকবীর জন্য পরীক্ষা প্রথার মধ্যে যাওয়ার কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না।

১৮৭৭ সালে শাংহাইতে মিশনারীদের এক অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনে স্থির হল, কেবল খৃষ্টান কববার উদ্দেশ্যেই ইস্কুল পরিচালনা করা হবে না, উদ্দেশ্য হবে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি এবং প্রগতি শিক্ষাব দিকে চীনাদের আকৃষ্ট কবা। এইসব ইস্কুলে ইংরেজিই ছিল শিক্ষাব মাধ্যমে। উনবিংশ শতকেব শেষ দশকে—এই উদ্দেশ্য নিয়ে ইস্কুল পুনর্গঠিত করা হল।

খৃষ্টীয় কলেজ প্রথম খোলে প্রেসবাইটেরিযান মিশনাবী, শাংটুঙ প্রদেশের তেঙ্‌চাউতে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ডক্টব ক্যালভিন ম্যাটিয়ার। এই কলেজই পরবর্তীকালে চীলু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা মাত্র দশ জন। ইয়েনচিঙ, হ্যাচাও প্রভৃতি স্থানে উনবিংশ শতকের শেষে এই ধরণের আরও কলেজ খোলা হয়।

প্রোটেস্টান্ট-রা আর একটি নতুন কাজ করল, তা হচ্ছে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। চীন সমাজে এইটি নতুন চিন্তা। মিস আলডারসী (Miss Aldersy) ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে চীন-বালিকাদের জন্য নিংপোতে একটি ইস্কুল খোলেন।

চীনসরকারের সাহায্যে এই ধরণের ইস্কুল কিভাবে স্থাপিত হয়? প্রথম দিকে ব্যবহারিক বিষয় শিক্ষার জন্য চীন সরকার এই ইস্কুল খোলেন। বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়ায় সে বিষয় শিক্ষা নেওয়ার জন্য কর্মচারীদের শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল পিকিঙে ১৮৬২ সালে। চার বছর পর নৌবিভাগের ইস্কুল ফুচাও-তে স্থাপিত হয়; ১৮৭৯ সালে টিয়েনটসিনে স্থাপিত হয় টেলিগ্রাফ কলেজ।

কেন সরকার এই ব্যবহারিক বিষয়ের উপর জোর দিলেন? সে বড বিচিত্র ইতিহাস। চীনকে তরমুজের সঙ্গে তুলনা করে বলা যেতে পারে, এই সময় তাকে 'ফালি ফালি' করবার জন্য আন্তর্জাতিক সওদাগরদের এবং সাম্রাজ্যবাদীদের ষডযন্ত্র চলছে।

ইংল্যণ্ডের শিল্প বিপ্লব শুধু ইংল্যণ্ডের নয় মানব-সভ্যতারই অভিশাপ স্বরূপ। এই শিল্পবিপ্লব থেকে জাত হয়েছিল সাম্রাজ্য-গৃধ্নু বৃটিশ সওদাগর। দুর্বল সম্রাটেরা সওদাগরদের সাহায্য না ক'রে পথ পায়নি। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করতে হবে। বাণিজ্য করতে করতে একটা সময় এল যখন ইংল্যণ্ড থেকে রৌপ্য চালান হ'ত চীনে তার দ্রব্যের বিনিময়ে। এল আফিং। আফিমের ব্যবসায় চীনের বাণিজ্যের পতন ঘটে অর্থাৎ ইংল্যণ্ডের রৌপ্য জাহাজ থেকে না নেমে জাহাজেই দেশের দিকে ফেরত আসছে। এত ঋণ চীনের। চীনের অপরাধ হল—এই আফিমের বিরুদ্ধতা করা, আর রৌপ্য দাবী করা। চীন আফিম কিনবেনা, কাপড কিনবেনা—এমন সঙ্কল্প নিল। তা কি হয়। বাধ্য করা হবে, (The older British monopoly interests, trying to maintain their established market, urged the British Government to force the Chinese Government to continue accepting the import of opium, whether they

liked it or not...the newer British interests, pushing impatiently to find or create new markets for their manufactured commodities, especially textiles, urged the British Government to force the Chinese Government to accept tne principle of free opportunity to trade for all merchants dealing in any commodities. Lattimore—Page 115)।

বাধল আফিমের যুদ্ধ। তার ফলেই নান্‌কিঙের সন্ধি (১৮৪২)। এই সন্ধি চীনের পক্ষে অবমানকর। আর্থিক দিয়ে ক্ষতিকর, রাজনৈতিক দিয়ে বিপ্লব-মূলক, সামাজিক দিয়ে অহিতকর আর শিক্ষার দিক দিয়ে ঐতিহ্য-বিরোধী। এই স্থরু সন্ধি-সর্তের। তারপর এল আমেরিকার সন্ধি (১৮৪৪); এল ফরাসীদের, এল তাই-পিঙ্‌ বিদ্রোহ (১৮৪৮-৬৫), এল বক্সার বিদ্রোহ। এমন অবস্থায় নতুনের আধিপত্য বেড়ে যাওয়ায়, চীনের পরীক্ষা-প্রথা নাকচ হ'তে বাধ্য। চাকরীর নতুন যায়গা সৃষ্টি হল, নতুন রকমের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এল। কাজেই চীন-সম্রাট বিষয় গত নতুন শিক্ষার ধারাকে আয়ত্ত করতে চাইলেন।

সম্রাট কুয়াঙ্‌ হ্‌-স্থ শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করবার জন্য নানা আদেশ জারী করলেন; নতুন ধরণের ইস্কুল প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিলেন, রচনা-প্রধান পরীক্ষা-প্রথা রহিত কবলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের জন্য বিদেশে ছেলেদের পাঠালেন। কিন্তু এই সংস্কার একশত দিনের বেশি টেকে নি। সম্রাজ্ঞী এসে এই সব পরিবর্তন বন্ধ ক'রে দিযে রক্ষণশীলতার দিকে দেশকে আকর্ষণ করেন।

১৯০০ সালে বক্সার বিদ্রোহ ঘটে এইখান থেকেই তিনি বুঝতে পারলেন, পশ্চিমকে উচ্ছেদ করতে হলে—ওদের শিক্ষাতেই শিক্ষিত হতে হবে। ১৯০২ সালে কুয়াঙ্‌ হ্‌-স্থর শিক্ষাসংস্কার চালু কবলেন। তারপর রুশ-জাপানের যুদ্ধ থেকে (১৯০৫) বোঝা গেল, পাশ্চাত্য শিক্ষাই হচ্ছে জাতিব বাঁচবার একমাত্র পথ। এইবার বচনা-প্রধান পরীক্ষা ব্যবস্থার একেবারেই অবসান ঘটল। ওয়েন-হান কিয়াঙ (একজন চীনা খৃষ্টান) বলেন, এই পরীক্ষা-প্রথার সমাপ্তি কেবল যে আধুনিক ইস্কুলের বৃদ্ধিরই সহায়তা করল তা নয়, এই ঘটনা পুরনো আবদ্ধ প্রাচীন শিক্ষার উপরের টান সরে গিয়ে অধিকতর গতিশীল পাশ্চাত্য -শিক্ষার অনুগামী করে তুলল দেশবাসীকে, (The abolition of the examination system not only

facilitated the growth of modern schools, but it also made it possible to shift the emphasis from the petrified classical training to the more dynamic Western learning. Wen Han Kiang, The Chinese student movement; King's Crown press, New York, 1948, Page 13)।

গ্রন্থকারের বক্তব্যের মধ্যে একটি লুকানো কথা আছে—'অধিকতর গতিশীল পাশ্চাত্য শিক্ষা'। পাশ্চাত্য শিক্ষা যদি 'অধিকতর গতিশীল' হয় তবে চীনের শিক্ষাও গতিশীল; অবরুদ্ধ নয়। এই বাক্যের দ্বন্দ্ব বাদ দিয়েও তাঁর ঐ গ্রন্থে অন্যত্র যে বিশ্লেষণ আছে (পৃষ্ঠা ১৩৪—১৪৬) তাতে এই মন্তব্য স্ববিরোধী ব'লে মনে হবে। আমাদের বোঝা দরকার 'অধিকতর গতিশীল' বলতে কি বুঝি? কোন কিছু পরিবর্তন করাই গতিশীলতার লক্ষণ নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা বস্তুবাদের উপর দাঁড়াতে বাধ্য। যে বস্তুতে তাদের সম্পদ-কর্ষণের সুবিধা হয়, সেই বস্তুই তারা আন্দোলন করে। কিন্তু সমাজের কল্যাণের জন্য তার কতটা সমাযোজন করা যায়, সে-কথা তাদের ভাবনার বাইরে। সমাজ বলতে তারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই বোঝে। রৈখিক আকারের সভ্যতা পরিবার-গত সভ্যতাকে ভেঙে চুরে দিতে পারে হুণদের মতোই দুর্দম হয়ে। কিন্তু সেখানেই তো মানব সভ্যতার শেষ কথা নয়। একটির বদলে আর একটিকে বরণ করলেই প্রগতি হয় না।

এই কথা চীনের শিক্ষাব্রতীরা সমাজ সংস্কারকেরা যত সহজে বুঝতে পেরেছিলেন, এশিয়ার অন্য দেশ সে কথা বোধ হয় বুঝতে পারে নি। চাঙ চিহ্-টুঙ বলছেন, "নতুন এবং পুরনো উভয় শিক্ষাই যুগপৎ চলবে; পুরনো বলতে চতুঃশাস্ত্র, (four books) পঞ্চ সূত্র (five canons), ইতিহাস রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং চীনের ভূগোল; নতুন বলতে—পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস। উভয়ই আবশ্যিক; এবং আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, পুরনো তৈরী করবে বনিয়াদ আর নতুন ব্যবহৃত হবে ব্যবহারিক জীবন শিক্ষায়" (চাঙ চিহ্ টুঙ্ হুপে এবং হুনান প্রদেশের ভাইসরয় ছিলেন, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের ঠিক পরেই তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশ করেন; স্যামুয়েল উডব্রিজ ১৯০০ তে এফ. এচ. রেভেল প্রকাশক দ্বারা অনুবাদ করেন, গ্রন্থটির ইংরেজি নাম China's Only Hope)। তিনি বলেন চীনের শিক্ষা নৈতিক. আর পশ্চিমের শিক্ষা ব্যবহারিক।

চিহ্-টুঙের এই বিশ্লেষণ দিকদর্শন বিশেষ। কারণ এমনি কথা আমরা পরবর্তী কালেও শুনতে পেয়েছি।

প্রথম মহাযুদ্ধের কিছুপর চীনে তিনটি মতবাদ গঠিত হয়ে পড়ে; উদার নৈতিক (হুশি যার নায়ক), জাতীয়তাবাদ (সুন-ইয়াৎ সেন যার নেতা) এবং সাম্যবাদ (মাওৎসে-তুঙ যার প্রবক্তা)। হু-শি চেয়েছিলেন চীনকে সম্পূর্ণ ভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা নিতে হবে; এবং তাহলেই পশ্চিমের গণতন্ত্রের সমাজ চীনের কল্যাণকর হ'বে। সুন ইয়াৎ সেন এতটা চান নি; তিনি বলেন—পুরনো চীন দর্শনকে নতুন চিন্তার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে যাতে চীন জাতি হিসাবে মুক্ত হয়, রাষ্ট্র হিসাবে গণতান্ত্রিক হয়, এবং আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়। মাওৎ-সেতুঙ মার্ক্স লেনিনবাদ এনে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদ সম্মত সমাজ গঠন করতে চান।

হু-শির মতবাদ দাঁড়াতে পারল না। পশ্চিমের সভ্যতা জগৎকে শান্তি দিতে পারে নি। সুন-ইয়াৎসেন আর মাও-ৎসেতুঙ গোড়া থেকেই বলছেন, সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমী শিক্ষা নিয়ে চীনের কল্যাণ হবে না। সুন ইয়াৎ সেন এই কথাই বলতেন, জাতীয় জীবনে গৌরব অর্জন করতে হলে —চীনকে তার পুরনো নীতিশিক্ষা প্রবর্তিত করতে হবে, পুরনো শিক্ষাকে সংস্কার ক'রে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, এবং পুরনো ক্ষমতাকে আবাহন করতে হবে; পশ্চিমের বিজ্ঞান বড সন্দেহ নেই, কিন্তু তাদেব সাম্রাজ্যবাদ নিন্দনীয়। "ইয়োরোপীয় জাতি চীন থেকে বড রাষ্ট্র ও সমাজ দর্শনের দিক দিয়ে নয়, বস্তুগত সভ্যতার দিক দিয়ে; ইয়োরোপের কাছ থেকে শিখতে হলে বিজ্ঞানই শিখব; সমাজ দর্শন নয়."

মাও-ৎসে-তুঙ-ও তাঁর দলেব সভ্যদের উপদেশ দিচ্ছেন, 'তাঁরা কেবল মার্ক্স, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্তালিনেব লেখাই পডবেন না, চীনের জাতীয় সংস্কৃতির বিষয়ও পডবেন।" তিনি অতীতের এই কৃষ্টি সম্পদকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেন; তাই বলেন, মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকেরা যদি অতীতেব এই ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করেন তবে ইতিহাসের বিদ্যুৎ প্রবাহে বিঘ্ন ঘটবে। আজকের চীন কালকের চীন থেকে জন্ম নিয়েছে; কাজেই কনফুসিয়াস থেকে সুন-ইয়াৎ-সেন পর্যন্ত তাদেব অনেক কিছু গ্রহণ করবার আছে। তিনি বলেন, "কম্যুনিস্টরা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মার্ক্সবাদী, কিন্তু এই মার্ক্সবাদ কেবল জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই আহরণ করা যেতে পারে। তিনি ঘোষণা করলেন,

বিনাসর্তে পাশ্চাত্য ভাব গ্রহণ করা ভ্রমাত্মক। চীন অন্ধভাবে বৈদেশিক বস্তু গ্রহণ করায় পূর্বে বহু দুর্বিপাকে পড়েছে। চীন কম্যুনিস্টরা মার্ক্সবাদ গ্রহণ করতেও যেন এ ভুল না করে। আমরা মার্ক্সবাদের প্রধান সত্যের সঙ্গে বাস্তব এবং ব্যবহারিক চীন বিপ্লববাদকে মিলিয়ে নিয়ে গ্রহণ করব, অর্থাৎ জাতীয় চরিত্রই প্রথমে গ্রহণ করব। তারপর কল্যাণপ্রদ মার্ক্সবাদ; আমরা যেন কখনও মনোগত অভিলাষের জন্য অথবা যান্ত্রিকভাবে এই জ্ঞান প্রয়োগ না করি (অর্থাৎ মার্ক্সবাদ)।'

(The idea of "Unconditional Westernisation" is a wrong one. China has suffered a lot by blindly absorbing foreign materials before. Chinese Communists should never break this rule even, in the application of Marxism. We must unify appropriately the general truth of Marxism and the concrete practice of the Chinese revolution, ie ; we must adopt the national form before we can find Marxism useful and should never subjectivley or mechanically apply it.—China's New Democracy, Page 61)।

প্রকৃতপক্ষে ইয়োরোপের ইস্কুল ধরণ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই চীনে তার বিরুদ্ধে মতবাদ গড়ে উঠতে দেখা গেল।

১৯৩২ সনের কিছু আগে লীগ অফ নেশন্স থেকে শিক্ষাবিশেষজ্ঞরা চীনের শিক্ষা সম্পর্কে মতামত জানিয়েছেন। সেই গ্রন্থ প্যারিস থেকে ছাপানোও হয় (The Reorganisation of Education in China, Published by League of Nations, Institute of Intellectual Co-operation; Paris)। এই বিশেষজ্ঞের মধ্যে ছিলেন জার্মান, পোল, ফরাসী এবং ইংরেজ (Becker ; Falski ; Langevin ; Tawney)। তাঁরাও ঐ গ্রন্থে চীনের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আমেরিকার শিক্ষা নীতি গ্রহণ করার বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে চীনের অতীতকে খুব বড় ক'রে দাঁড করিয়েছেন (Chapter II pages 23-29)। মনে হয় আমেরিকার প্রভাবে ইয়োরোপ তখনও শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। সে যাই হোক তাঁদের বক্তব্যের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রনায়কদের কথা হুবহু মিলে যায়। প্রয়োজনে যেমন মানুষ সত্যদ্রষ্টা হয়, ভয়েও বোধ হয় বিশ্বপ্রেমিক হয়ে পড়ে।

আমেরিকাকে সে সময় সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে, তার আরও প্রমাণ ল্যান্সলট ফর্স্টারের গ্রন্থ 'দি নিউ কালচার ইন চাইনা, (Lancelot Forster The New Culture in China; London, George Allen and Unwin Ltd, 1936) তাঁর গ্রন্থের পঞ্চম অনুচ্ছেদে (Chapter V—America and China). এ বিষয়ে স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাই। (The United States in a sense is a reaction against the European system. Page 84.

..there poured into the States, unchecked from the odd undisciplined corners of Europe, those who had been squeezed out by economic pressure, and a new principle began to assert itself—wealth for wealth's sake.—Page 85)

ফর্স্টার বলেন আমেরিকাবাসী—শিক্ষা সম্পর্কে এমন মতবাদ তৈরী করল যাতে ইয়োরোপ উঠল চমকে; এই মতবাদ সত্যিই পুরনো দেশকে কর্মপ্রেরণায় উৎসাহিত করল। ইয়োরোপের পুরনো রীতির মত ছিল, শিক্ষায় অর্থ জোটে না, আমেরিকার নীতি হল, শিক্ষা শিল্প-কারখানারই প্রসূত একটি বিষয়, কাজেই অর্থ প্রচুর জুটবেই। আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের এই বিশ্বাস এত দৃঢ় যে তারা টাকা খরচ করে পূর্বে ও পশ্চিমে এই নয়া ধর্মের প্রচারকদের পাঠিয়ে প্রচার করতে সুরু করল, জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা একান্ত রকমে প্রয়োজন (Page 88)।

লীগ-অফ্-নেশন্সের উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে চীনের বিভিন্ন ধরণের ইস্কুল সম্পর্কে যে-খবর পাই তার মর্ম কিছু উদ্ধৃত করছি। আলোচ্য যুগ হচ্ছে, ১৯১৫-৩০ সাল অবধি।

প্রাথমিক শিক্ষা :

১৯১৫ থেকে ১৯৩০ এ প্রাথমিক ইস্কুলের ছাত্রসংখ্যা দুগুণের উপর বাড়তে দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৩০-এ প্রায় ৮৯ লক্ষ ছাত্র পড়ছে। তৎসত্ত্বেও তুলনামূলক হিসাব করে দেখা যায়, চীনের জনসংখ্যার অনুপাতে ৬ থেকে ১৫ বছরের ছাত্র সংখ্যা যা তা অন্যান্য দেশের তুলনায় পাঁচ থেকে দশগুণ পিছিয়ে ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা সাধারণত ৪ বছরের, কোন কোন ক্ষেত্রে ছয় বৎসরেরও

আছে। এদিক দিয়ে তৎকালের সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে চীনের অনেক মিল। কিন্তু এই মিল বাইরের দিক দিয়েই, চরিত্র-গত অনেক বৈষম্য উভয় দেশের মধ্যে তখনও ছিল।

চীনের জনসংখ্যার তুলনায় ৬ থেকে ৯ বছরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা তৎকালে শতকরা ৯ জন; আর ৬ থেকে ১১ শতকরা ১৩ জন। এই ইস্কুল বয়সী ছাত্রসংখ্যা শান্‌সী প্রদেশের প্রাথমিক ইস্কুলে পড়ত—শতকরা ৭৬·৮ জন; মাঞ্চুরিয়াতে ৩৫·৫ জন শতকরা; শিকিঙে শতকরা ৩২·৬ জন—ইত্যাদি ভাবে নিম্ন হার ২০ থেকে ২৫। কাজেই প্রদেশে প্রদেশে প্রাথমিক ইস্কুলের সংখ্যার প্রভেদ ছিল। সর্বনিম্ন হার হচ্ছে ৫·১ জন (হু পে—)। কাজেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রাথমিক ইস্কুলের প্রসার নিয়ে গণরাষ্ট্রকে বিশেষ চিন্তিত দেখা গেছে।

প্রাথমিক ইস্কুলের বাবদে টাকা-পয়সা খরচ করারও খুব একটা নিয়মবদ্ধ নীতি ছিলনা। ইস্কুলের দুরবস্থা সেইজন্যই বেশি প্রতীয়মান হয়েছ, (Attention should be drawn to the fact that the money which China spends at present on primary education and on education generally is not spent wisely or as economically as it might be, more especially as China is a poor country which cannot afford to spend improvidently. The Reorganisation of Education in China, Page 80)।

ইস্কুলের বাড়ী এবং অর্থবরাদ্দ নিয়ে এমন অবস্থা দেখে গেছে যে, যেখানে বাড়ীর পিছনে বহু টাকা খরচ হচ্ছে সেখানে ছাত্রসংখ্যা নগণ্য, আবার যেখানে ছাত্রসংখ্যা অত্যধিক সেখানে বাড়ী নেই, বা স্থানের অসঙ্কুলান। এ সম্পর্কে তথ্যসন্ধানীরা যে চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন তা হচ্ছে, "অনেক যায়গায় পরিত্যক্ত মন্দিরে ইস্কুল বসছে। এই মন্দিরের সংখ্যা বহু, বিশেষ ক'রে সহরে। কিন্তু যেখানে সাধারণ গৃহে ইস্কুল বসে, কিংবা ইস্কুলের জন্য যেখানে বাড়ী তৈরী করা হয়েছে, সেখানে স্থানের অসদ্ব্যবহার লক্ষণীয়। কারণ সেখানে খুব অল্প ঘরে শ্রেণীকক্ষ বসে, ছেলেদের জন্য বড় সঙ্কীর্ণ স্থান, কিন্তু শিক্ষকের ঘর অফিস বা আসবাবপত্র রাখবার যায়গা বা শিক্ষা উপকরণ রাখবার যায়গার প্রাচুর্য বড় পীড়া দায়ক।"

বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা চীনে শোনা গেছে ১৯২০ থেকে। তখন

সঙ্কল্প করা হয়েছিল ৮ বছরের মধ্যে ৪ বৎসর কালীন প্রাথমিক ইস্কুলের পড়া বাধ্যতামূলক করা হবে। সে সম্পর্কে পরিকল্পনাও করা হ'ল নিম্নরূপে,

১৯২১	—প্রদেশের রাজধানীতে এবং বন্দরে,						
১৯২২	—বড় বড় সহরে, জেলাসহরে প্রভৃতিতে।						
১৯২৩	—যেসব সহরে ৫০০ পরিবারের বেশি লোক বাস করে।						
১৯২৪	— "	"	৩০০	"	"	"	" "
১৯২৫-২৬	— "	"	২০০	"	"	"	" "
১৯২৭	— "	"	১০০	"	"	"	" "
১৯২৮	— "	"	১০০	"	কম	"	" "

কিন্তু ১৯৩০ সালেও সঙ্কল্প সিদ্ধি হলনা। তাই সেই সময়ে নতুন পরিকল্পনা করা হ'ল যে, ২০ বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করা হ'বে। তবে প্রথম ৫ বছর যাবে শিক্ষক-শিক্ষণ ইস্কুল স্থাপন করতে। কিন্তু এ পরিকল্পনাতেও অনেকে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন। তারমধ্যে প্রথম সন্দেহ এল শিক্ষক শিক্ষণ ইস্কুল নিয়ে।

লীগ অব নেশনস এর শিক্ষা-বিশেষজ্ঞেরা ৪ বছরের পাঠকালকে বাড়িয়ে ৭ বছর করবার কথা জ্ঞাপন করেন।

এই ইস্কুলে সাধারণত বক্তৃতা পদ্ধতিতে পড়ানো হত। শিক্ষক ছাত্রদের প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতেন না। এই পদ্ধতিতে পরিপার্শ্ব সম্পর্কে চিন্তার সৃষ্টি করা যায় বটে, কিন্তু ছেলেদের কর্মনিপুণ ক'রে গড়ে তোলা যায় না। বিজ্ঞান বিষয়েও পাঠ দিতে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বা সরঞ্জাম ব্যবহার করা হ'তনা। বই থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হ'ত। বইয়ের সংখ্যা ছিল প্রচুর। সব বই যে সুন্দর ছাপানো বা চিত্রবহুল ছিল তা নয়। প্রকৃতি পাঠ বা ভূগোল পাঠেও সত্যিকারের প্রকৃতি বা মানচিত্র দেখিয়ে পড়ানো হ'তনা।

মাধ্যমিক ইস্কুল

এই ইস্কুল তখনও আমেরিকা ছাঁচে ঢালা। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, আমেরিকার এই মাধ্যমিক ইস্কুল ব্যবস্থা এমন ব্যয়বহুল যে চীনের মতো দরিদ্রদেশে তার আদর্শ নেওয়া ঠিক হয়নি (Page 99)।

১৯৩১ সালের হিসাবে দেখা যায় চীনে ২০৬৬টি এই ইস্কুল আছে আর ছাত্রসংখ্যা ৩০৭, ৯০৬ জন।

প্রাথমিক ইস্কুলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কিন্তু

মাধ্যমিক ইস্কুলে দুই-একটি বিদেশী ভাষাও শিখতে হত। এই ইস্কুলের শিক্ষা অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নির্ভর।

ছ বৎসরের পাঠকাল। ১২ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত। এই কালকে দুভাগে ভাগ করা হ'ল : ১২ থেকে ১৫, আর ১৫ থেকে ১৮। প্রথম কালকে বলা হয় নিম্ন-মাধ্যমিক। কিন্তু এই নিম্ন মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েই বহু ছেলে পড়াশুনা ছেড়ে দিত।

পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হ'তে হ'ত। পরীক্ষা দুরকমের লিখিত আর মৌখিক। ৮ মাসে ইস্কুলের বছর, ৪ মাস ক'রে এক একটি ভাগ। পরীক্ষার সংখ্যা বেশি ; মাসিক পরীক্ষা ত্রৈমাসিক পরীক্ষা প্রভৃতি অনেক রকমের পরীক্ষা ছিল।

শতকরা ৬০ পেলে (সমস্ত পরীক্ষায়) তবে তারা উচ্চ মাধ্যমিকে যেতে পারত। নিম্ন মাধ্যমিকের পাঠ বিষয় ছিল,

(১) কুওমিণ্টাঙের নীতি এবং নাগরিক শাস্ত্র (civics) (২) চীনভাষা (৩) বিদেশী ভাষা, (৪) ইতিহাস, (৫) ভূগোল (৬) অঙ্ক (৭) প্রকৃতি বিজ্ঞান (৮) শরীর চর্চা (৯) স্বাস্থ্য ও শারীর বিজ্ঞান (১০) অঙ্কন (১১) সঙ্গীত (১২) শারীরিক কাজ (১৩) বৃত্তি-শিক্ষা।

উচ্চ মাধ্যমিকে বাড়তি হিসাবে দেশ বিদেশের ইতিহাস-ভূগোল সমেত পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, সামরিক শিক্ষা এবং কয়েকটি ঐচ্ছিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকেই বৃত্তিশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'ত। পরবর্তীকালে এই বৃত্তিশিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কৃষি ও কারখানা ইস্কুল স্থাপনার প্রস্তাব করা হয় শিক্ষা-সচিবের দপ্তর থেকে।

এ ছাড়া ছিল নানারকম ইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়। কিণ্ডার-গার্টেনের জন্যও শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় ছিল। ঐ সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে গ্রামের ইস্কুলের শিক্ষকদের জন্য পৃথক শিক্ষণ ব্যবস্থা।

যাইহোক গণরাষ্ট্রের শেষের দিকে চীনকে আমেরিকার পথ থেকে সরে এসে রাশিয়ার শিক্ষানীতির দিকে ঝুঁকতে দেখা গেছে। সমাজ গঠনে দুই দেশের ঐক্যই হয়ত এই পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছে। কম্যুনিষ্ট চীনে রাশিয়ার শিক্ষার প্রভাব প্রভূত বর্তমান। আমরা সে প্রসঙ্গ রাশিয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি, কাজেই চীনে সেই নীতি আর বিশেষ ক'রে আলোচনা করলাম না।

জাপানে

প্রকৃত জাপানে পুরনো প্রস্তর যুগের কোন চিহ্ন দেখা যায়নি। কিন্তু তাদিয়েই একথা প্রমাণিত হয় না যে, পুরনো প্রস্তরযুগ জাপানে ছিল না। এ হতে পারে যে, সে বিষয় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি, (All we can safely say is that it has not been discovered yet.—Ancient Japan in the Light of Anthropology—Dr Ryuzo Torii, Published by Kokusai Bunka Shinkokai, Tokyo 1937 Page 5)।

নতুন প্রস্তরযুগই জাপানের সংস্কৃতির আদিকাল ব'লে অনুমিত হয়। এই সংস্কৃতি জাপানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। সেই সময়কার আদিবাসীদের সংস্কৃতিই এইটি।

জাপানের আদিবাসী বলতে পণ্ডিতেরা মনে করেন আইনু (Ainu) কে। তবে আদি সংস্কৃতি যে আইনুদেরই, একথা বোধ হয় হঠাৎ স্বীকার করা যায় না। হয়ত অনেকটা আইনুদের মতো তারা ছিল। অন্যান্য দেশের মতো নব্যপ্রস্তর যুগে তাদের সভ্যতা প্রস্তর-নির্ভরই ছিল। আবার অস্থিগঠিত অস্ত্র-শস্ত্রও পাওয়া যায়। ছিল মৃন্ময় পাত্র। মাটির প্রতিকৃতিতে দেখা যায় কেশসজ্জা, উলকি বা শরীর চিত্র করা, এমনকি সিন্দুর ব্যবহারও দেখতে পাওয়া গেছে ; সিন্দুরকে জাপানী ভাষায় শু বলে, (Page 6)।

অনেকে অনুমান করেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের জাপানের অধিবাসী ছিল নিগ্রো। কিন্তু সেকথা বোধ হয় সত্য নয়। তারা নিগ্রোও নয়, অসভ্যও নয়।

তাদের মৎস্যশিকার, তাদের গর্ত খুঁড়ে বাস করা পদ্ধতির সঙ্গে এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চুকচী, আলিউট, কোরিয়াক, এস্কিমো অর্থাৎ প্রস্তরযুগের সাইবেরীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায়। এশিয়ার পুরাতন অধিবাসীর আচার-নীতির সঙ্গেই তাদের বহুলাংশে মিল।

আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার আছে। মৃত্তিকা নির্মিত তাঁদের যে প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে, তা কিন্তু কোনটিই পুরুষের নয়, মেয়েদের। এই থেকে এই কথাই মনে করা স্বাভাবিক যে, এগুলি খেলনার বিষয়বস্তু নয়, বরং পূজার উদ্দেশ্যে এগুলি নির্মিত।

এই প্রাগৈতিহাসিক যুগের পূজা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে তারা দেবস্থানে প্রস্তর নির্মিত বৃত্ত তৈরী করত। এই বৃত্তের নাম ইওয়াসাকা (Iwasaka)। এরা বোধ হয় কৃষিকাজ শিখেছিল কোরিয়ার মাধ্যমে চীনের কাছ থেকে। এই আদি জাপানীদের নাম দেওয়া হয়েছে .যাদাই (Jodai)। এই যুগে কুল-বংশ রীতি বেশ দেখা গেল। সাধারণত সর্দার এই কুলকে প্রতিপালন করতেন, আর থাকত কুল-দেবতা। কুল দেবতা ছাড়া আরও অনেক দেবতা ছিল, যেমন—অরণ্য-দেবতা, নদী-দেবতা, সমুদ্র-দেবতা প্রভৃতি। কিন্তু প্রাকৃতিক কোন 'বস্তু'কে দেবতাব আসনে বসানো হ'ত না। পাহাড়ে-পর্বতে দেবতা থাকতে পারেন, কিন্তু পাহাড়-পর্বতই দেবতা নন। এই সবের সঙ্গে ছিল যাদুকর মিকো (Miko)। মিকো দেবতার উপচার সংগ্রহ করত। টোরি মনে কবেন, জাপানের প্রাচীন ধর্ম হচ্ছে শামান ধর্ম (Page 11)। জাপানে এই শামান সাধারণত নারী , পুরুষ শামানও অবশ্য আছে।

সঙ্ক্ষেপে এইই হচ্ছে জাপানের অনুমিত প্রাক্ ইতিহাস। কিন্তু শিক্ষা যেহেতু জাতি সম্প্রদায়ের এবং অধিবাসীব প্রাচীন ঐতিহ্যের উপব অনেকখানি দাঁড়িযে, যেহেতু জাতির চরিত্র প্রাচীন অভ্যাস-পথেই গঠিত হয বেশি, তাই এই সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাসকে আমাদের বিশেষ ক'বে আলোচনা ক'রে নিতে হবে। আমাদের জানতে হবে, কে আদিম জাপানী, কার সংস্পর্শে তারা এল, কি ছিল তাদের সমাজের কাজ কর্ম।

জাপানের সংস্কৃতির ইতিহাসকে তাই আমরা মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ ক'রে নেব। প্রথম ভাগ পুরনো প্রস্তরযুগ আর নব্যপ্রস্তর যুগের সন্ধি থেকে বৌদ্ধ-প্রভাবের পূর্ব পর্যন্ত, দ্বিতীয় ভাগ বৌদ্ধধর্মের পর থেকে।

এই আলোচনার মধ্যে অনেকবার আমরা 'যুগ' কথাটিতে আসব। এই যুগ আমরা মনে করছি সংস্কৃতির যুগ। শিক্ষা-শাস্ত্র সংস্কৃতি-যুগ নিয়েই কারবার করে। শিক্ষা মানুষের মনে কি ভাবে আশ্রয় করছে, সে রহস্য তার প্রাচীন সংস্কৃতি ধারা থেকেই জানতে পারা যায়।

যোমোন যুগ (মাটির পাত্রে তরঙ্গায়িত মাদুরের মতো নক্সা ছিল বলে—সেই যুগের মানুষকে যোমোন যুগ বলা হয়) হয়ত নতুনপ্রস্তরযুগের আগে। তবে বর্তমানে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, নব্যপ্রস্তরযুগেরই এটি হচ্ছে পশ্চাদ্বর্তন, (The Jomon period may be characterized throughout most of its evolution as a retarded Neolithic,

and even over-run in south Japan by the Bronze and Iron Ages before country-wide maturity had been attained. Page 32-33 ; Japan, before Buddhism. J. E. Kidder Jr ; London, Thames and Hudson, 1959.) ।

এই যুগের মানুষে কৃষিকাযের আদিরূপটিই জানত ; পশুকে পোষ মানানো প্রথা তেমন দেখা যায়নি। কিছু কিছু সমাজবদ্ধতার লক্ষণও দেখা গেছে। এই সঙ্ঘবদ্ধতার কারণ বোধ হয় পারস্পরিক নিরাপত্তা, শিকার-যাত্রা প্রভৃতির জন্যই ; কৃষিকার্যের জন্য সমাজ গঠন করবার প্রবণতা তখনও দেখা যায়নি বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

জাপানে নব্যপ্রস্তরযুগের যা চিহ্ন পাওয়া গেছে তার কালবিভাগ করলে দাঁড়ায়,

আদি —	ইনাবিদাই—তাদো, কায়ামা	আধুনিক	৭৫০০—৩৭০০ খৃঃ পূঃ
প্রাথমিক—	—	—	৩৭০০—৩০০০ „
মধ্য		—	৩০০০—২০০০ „
পরবর্তী		—	২০০০—১০০০ „
শেষ	আঙ্গিয়ো	—	১০০০—২৫০ „
			(দক্ষিণ জাপানে)।

যোমোন (Jomon) মানুষ সাধারণত সমুদ্র উপকূলে বাস করত। জীবনযাত্রা নির্বাহ করত শামুক-মাছ সংগ্রহ করে। প্রথম দিকে সমুদ্র-শঙ্খ বা শামুক প্রচুর ব্যবহৃত হত। পাহাড়ে যারা কাজ করত তারাও প্রথম দিকে এই শামুক-নির্ভর ছিল। কিন্তু তারা ছোট ছোট সম্প্রদায় হয়ে বাস করত, শিকার করত। ফল সংগ্রহ করত, আরও নানা বনজ খাদ্য গ্রহণ করত।

শেল মাছ কোথায় পাওয়া যায় তা আবিষ্কার করতে যোমোন মানুষের বেশি দেরী হয়নি। টোকিও উপসাগরের কাছে তাই তাদের বসতি সুরু হ'ল। কন্তো, হোক্কাইডো এবং চুবা পর্বতের সান্নিধ্যে শীত বেশি বলে তারা কিছুটা গর্ত খুঁড়ে তার উপর নানা আকারের ঘর তৈরী ক'রে বাস করত। ঘরগুলি পাতায় অথবা গাছের ছাল দিয়ে ছাওয়া ; কোন কোন ক্ষেত্রে মাটি দিয়েও ঢাকা হ'ত। ঘরের সামনের দরজা আগে একটি ছিদ্রমতো ছিল, পরবর্তীকালে দুটি খুঁটি বসানো হ'ল, চাল তখন

চালু হল। যার বাড়ীর সামনে যত সুন্দর তার বাড়ী তত আধুনিক ব'লে পরিগণিত হ'ত। মেঝে অনেক সময় পাথরে ঢাকা, কোন সময় মেঝের কেন্দ্র স্থলে আগুনের কুণ্ড রাখা হ'ত। মধ্য যোমোন যুগে অনেক গর্ত-ঘর পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় তারা গোষ্ঠী গড়ে বাস করতে জানত। আদি যোমোন যুগের নিদর্শন তেমন কিছু পাওয়া যায় না। যা পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় তখনও পাক-শালার (hearth) কোন বন্দোবস্ত নেই। তবে এ যুগের বাড়ীঘর সাধারণত চতুষ্কোণের। এই সময়ে যেসব অগ্নিকুণ্ড পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় সেগুলি ডিম্বাকৃতি ছিল; এগুলি পাথরের; ঘরের কেন্দ্র থেকে কিছু পশ্চিমে অবস্থিত।

মধ্য যোমোন যুগেই গোষ্ঠী বড় হ'তে থাকল। মনে হয় তারা দক্ষ পশু ও মৎস্য শিকারী; এমন কি আত্মরক্ষার কৌশলেও নিপুণ ছিল। সাধারণত তারা উপত্যকার বা মালভূমির নদী-উৎসের মুখে বাস করত। এই সময়কার ঘরের এবং পল্লীর নিদর্শন দেখে মনে হয়, তাদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা এবং পরিবারের সংখ্যা অনুযায়ী ঘর নির্মাণ পদ্ধতি এসেছে। তবে পণ্ডিতেরা শপথ ক'রে তেমন স্বীকৃতি দেন না, (There is little to suggest that social status, size of family or time differences would have been responsible for this, Kidder, Page 45)।

মধ্যকালের যোমোনেরা মাটির পাত্র প্রচুর তৈরী করত; আর পাকশালার উনুনের জন্য (hearths) কলসী প্রোথিত করত। আগুনের কুণ্ডের জন্য পাথরও বসানো হ'ত। এই কলসী-উনুন উবায়ামাতে প্রচুর পাওয়া গেছে। কিন্তু রান্নার তৈজস কিছু দেখা যায় না। তাই মনে হয় এই সব উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্যই ব্যবহৃত হত।

পাথরের মেঝে মধ্য থেকে শেষ যোমোন যুগও বেশি মেলে। সাধারণত নদীগর্ভের পাথর দিয়ে এই মেঝে বিছানো হ'ত। তা ছাড়া মাদুর দিয়েও শেষ যুগে মেঝে ঢাকতে দেখা গেছে।

মধ্যযুগের প্রধান যোমোন পল্লী তোগারুইশি, হিরাইড প্রভৃতি অঞ্চলে। এখানকার গৃহসংখ্যা প্রায় ৬০। তবে মনে হয় প্রায় ৩০০ শতের বেশি পাওয়া যাবে। এযুগ ধরা হয় ৩০০০ খৃঃ পূর্বাব্দ। এখানেই লাল রঙ বা সিঁদুর পাওয়া গেছে। মাটির পাত্র বা ঘর রঙানোর জন্য হয়ত এই লালরঙ ব্যবহৃত হ'ত। হিরাইডেও প্রথম গোষ্ঠী বা সমাজ বাসের ইতিহাস

(জাপান প্রসঙ্গে) মেলে ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকেই। এই যুগের কর্মচাঞ্চল্য এবং কারিগরী শিক্ষার প্রভাব খৃষ্টাব্দ দশম শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

কুকুরের ব্যবহার যোমোন যুগে পাওয়া যায়; বিড়াল তখনও বন্য। ঘোড়ার ব্যবহার বোধ হয় যায়োই লোকেরা শেখালো। যায়োই লোকের সঙ্গে মিশেই জাপানের আদিবাসী প্রথম পশু-পালন শিখল নব্যপ্রস্তর যুগে। মধ্য যোমোন যুগের পরই জাপানীকে কৃষিনির্ভর হ'তে দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে লিঙ্গ পূজার নিদর্শন। পাথরের টুপি যোমোন যুগে যা পাওয়া যায় তাতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সিদ্ধান্তই করছেন। কবরস্থ করার নিয়মকানুন এখনও স্থির হয়নি। নানাভাবে দেহ প্রোথিত করতে দেখা যায়।

সূর্য দেবতার ধারণা ২০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ থেকেই দেখা গেছে। ইয়ামাতো লোকের আগে এই পূজা দেখা যায়না। তাই অনুমিত হয়, প্রথমদিকে এ পূজা ছিল সম্প্রদায়গত। এর থেকেও প্রাচীন প্রস্তর পূজা।

এখন সমস্যা হচ্ছে, আদি জাপানী কে? আইনুরাই যে নব্যপ্রস্তর যুগের জাপানের মানুষ একথা অনেকে স্বীকার করেন। বর্তমানে আইনুদের সংখ্যা ১৪০০০। কিন্তু অতি দ্রুত মিশ্র বিবাহে তাদেব নিজের আকৃতি ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অবলুপ্ত হ'তে বসেছে।

আইনুরা হচ্ছে বড় মাথাওয়ালা ককেশীয়। কিছু মোঙ্গোল মিশ্রণ আছে। এটা ঘটেছিল জাপানে আসবার পথে। ৩০০০ বছর আগে তাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়না। কাজেই বর্তমানে মনে হচ্ছে, আদি যোমোনরা কখনই আইনু নয়। যোমোন মানুষই আদি জাপানী। আইনুরা উত্তর থেকে জাপানীদের দক্ষিণে হটিয়ে দিয়ে এদেশে বাস করল। এই অভিযানকে অনেকে যায়োই অভিযান ব'লে মনে করেন। যোমোনেরা আইনুদের পূর্বসূরী।

হোনসু, হোক্কাইডোর অনেক স্থানের নামে আইনুদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তোহোকুতে অবরোধ ক'রে আইনুরা অনেক শতাব্দী সেখানে বাস করেছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্বে বর্বর এমিশি ব'লে যাদের অভিহিত করা হয়েছিল, তারাও হয়ত আইনু। অষ্টম শতাব্দীতে দেখা গেছে আইনুরা উত্তর জাপানে দুর্গ নির্মাণ ক'রে বসবাস করছে।

এখানে জাপানীদের সঙ্গে আইনুদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। জাপানের উত্তরাংশে যে বড় বড় ঢিপি দেখা যায়, অনেকে বলেন ঐগুলি আইনু জাপানীর

যুদ্ধের অবশেষ। আইনুদের হত্যা ক'রে রাখা হয়েছিল ঐভাবে।
(Batchelor—Ainu life and Lore, Kyobunkwan, Tokyo, Page 23)
আইনুরা বীরের জাতি। ৭২০ খৃষ্টাব্দে তারা জাপানীদের উপর এমন আক্রমণ চালায় যে, জাপানীরা নয়টি প্রদেশ থেকে সৈন্য এনে তাদের দমন করে। আইনুদেরকে 'সেনডাই'-এর উত্তরে বিতাড়িত করা হয়। ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আইনুরা জাপানীকে আক্রমণ করে। ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এদের মধ্যে ভীষণ অন্তর্যুদ্ধ ঘটে। এরই ফলে এরা দুর্বল হয়ে পড়ল। ৮৭৮ খৃষ্টাব্দে জাপানীরা এদের একেবারে পর্যুদস্ত করে দেয়।

আইনুরা শ্বেতবর্ণের। যোমোনরাও অনেকটা তাই বটে, কিন্তু আইনুদের মতো অতটা শ্বেতবর্ণীয় নয়।

আইনুরা পর্যুদস্ত হল, কিন্তু তাদের ঐতিহ্য থেকে গেল। এই ঐতিহ্যের মধ্যে একটি হচ্ছে তাদের জীবন-বোধ ও ধর্ম ধারণা।

মানুষ সম্পর্কে আইনুদের ছিল দ্বৈত ধারণা। অর্থাৎ মানুষের আছে কেবল শরীর আর আত্মা। শরীর মন এবং আত্মা এই তিন ধারণা তাদের ছিলনা। দেহ হচ্ছে আত্মার খাঁচা মাত্র, অনেকটা পোষাকের মতো কিংবা বাসগৃহ। এই দেহে সে চলাফেরা করে, কথা বলে, কিন্তু দেহটি কেবল সাময়িক থাকবার স্থান মাত্র। এই দেহ একদিন থাকবেনা, ঘর ভেঙে যাবে; কিন্তু খাঁটি মানুষ সর্বদাই বেঁচে থাকে। অমরত্ব তার কথার কথা নয়, অমরত্বই তার স্বভাব। আইনু নিহত হয় বা মরে অর্থ তার দেহটাই মরে। যুদ্ধক্ষেত্রে সে মরলেও তার আত্মা পুনরায় যুদ্ধ করে। যতদিন তার সঙ্কল্প সিদ্ধ না হয় ততদিন তার আত্মা থামতে জানে না।

উদ্ভিদ এবং অচেতন পদার্থ সম্পর্কেও তাদের এইরূপ ধারণা। পাতা শাখায় উদ্ভিদ নেই, উদ্ভিদ আছে তার আত্মায়।

অর্থাৎ আইনুদের মতে, কোন জীবনই বা অবস্থারই মরেনা, সে অন্যরূপে অন্যত্র আবির্ভূত হবেই।

এই আত্মা দেবতার সমস্ত গুণেরই অধিকারী। এইজন্যই আইনুরা দেবতার সঙ্গে মানুষকে পৃথক ভাবেনা। দেবতার সমান আসনে তারা বসে। দেবতা যদি কথা না শোনেন তবে তারা তাকে গালিগালাজও দেয় (Batchelor-Page 2)। দেবতা যদি অনুতপ্ত না হন, তবে তার পূজোপচার বন্ধ ক'রে দেবে ব'লে ভয় দেখায়। এমনি ক'রে দেবতায় মানুষের সম্পর্ক

আরোপিত হ'ল। মানুষের সঙ্গে তাদের পার্থক্য কেবল এই যে, দেবতা আরও সূক্ষ্ম আত্মার অধিকারী, দৃশ্য বা অদৃশ্য দুই উপায়েই তারা চলাফেরা করতে পারে।

মৃতব্যক্তির আত্মা প্রিয়-জনের কাছে সমবেত হ'ন কোন কোন সময়ে। অদৃশ্য থেকেও তারা পরিবারকে নানাপ্রকার সাহায্য ক'রে থাকে। কখনও বা স্বপ্নে বা তারা আবির্ভূত হয়। কোন সময় দেবতা বা মৃতপুরুষ পাখী, ভালুক, মাছ বা অন্যপ্রাণীর রূপ ধ'রে এসে বাণী বিতরণ করে।

আইনুরা পরিবার প্রথায় সমাজ চালাত। তাদের মধ্যে কোন রাজা ছিল না। পরিবারের প্রধানেরাই একত্র হয়ে সমাজের কার্য চালাত।

শাস্তি প্রথার মধ্যে গরম জল, ঠাণ্ডা জল, উত্তপ্ত প্রস্তর প্রভৃতি ব্যবহৃত হ'ত। উৎসবের মধ্যে ভল্লুক-মেধ উৎসব। আর আছে বৃক্ষ-পূজা। শিকারীরা পাহাড়ে শিকার করতে গিয়ে প্রথম বৃক্ষ দেবতাকে পূজা ক'রে নেয়, যাতে কোন বিপদ-আপদ না ঘটে। এই পূজার মধ্যে প্রার্থনাই বড়। 'হে বৃক্ষ-দেবতা তুমি আমাদের অরণ্যের সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার ক'রো' এইরূপ প্রার্থনা।

আইনুদের কাহিনী থেকে নির্বাসন-প্রসঙ্গ জানা যায়। সমাজ-বিদ্রোহীকে নির্বাসন দেওয়া হ'ত এমন এক স্থানে যেখানে গাছ-পালা জন্মায় না, পাখি থাকে না। ব্যাটচেলর মনে করেন এই নির্বাসন-স্থল সাইবেরিয়ায়। অনুমানটি সত্য না-ও হতে পারে। তবে কি তারা সাইবেরিয়া থেকে এসেছে? তারা কি সাইবেরিয়া অঞ্চল থেকে বিতাড়িত সম্প্রদায়? জাপানের উত্তরাঞ্চলে তাদের বসবাস দেখে সাইবেরিয়ার সঙ্গে তাদের যে যোগ ছিল তা অনুমান করা চলতে পারে।

আমরা পূর্বে বলেছি জাপানীর সঙ্গে এশিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীর অর্থাৎ চুকচী, আলিউট, কোরিয়াক—এস্কিমোদের জীবনযাত্রার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কি তাদের জীবনযাত্রার রূপ? কোন্ রূপটি তাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করল? শামান ধর্মের সঙ্গে তাদের মিল পাওয়া যায় কেন?

চুকচী, আলিউট, কোরিয়াক, এস্কিমোদের জীবনযাত্রা বল্গা-হরিণকে কেন্দ্র ক'রে রচিত হ'তে দেখা যায়। এদের মধ্যে এস্কিমোদের ধরা হয় খাদ্য-সংগ্রাহক সম্প্রদায়ের এবং চুকচী-কোরিয়াককে ধরা হয় যাযাবর পশুচারক

সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ক'রে। বোধহয় তুন্দ্রা-অঞ্চলের যুকাগির এবং মধ্য এশিয়ার কাজাক-কিরঘিজ এবং তুঙ্গুদের সঙ্গে মিশে কোরিয়াক-চুকচীরা এক নবীন জীবন-দর্শন চলতা শক্তি পেল। বল্গাহরিণের দুধ, বল্গা হরিণের স্লেজের সঙ্গে সঙ্গে কোরিয়াক চুকচী উৎসব-অনুষ্ঠানে বল্গাহরিণ বধ করার প্রথা, উপাসনার প্রথাও প্রবর্তিত করল। এই মৃত বল্গাহরিণের আত্মা মানুষের উত্তরসূরীর সঙ্গে মৃত পূর্বসূরীর যোগসাধন ক'রে ব'লে এক ধারণাও সৃষ্টি হ'ল।

কিন্তু বল্গাহরিণেকে কেন্দ্র ক'রেই জীবনযাত্রা বা সমাজ-নীতি সীমাবদ্ধ রইলনা। এল মৎস্য শিকার। মৎস্য আর বল্গাহরিণ শিকার এবং ব্যবহার পরবর্তী সমাজস্তরে প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। আইনুদের মধ্যে বল্গাহরিণ নেই, কিন্তু ভল্লুক আছে। মৃতপুরুষের সঙ্গে সমাযোজনের ব্যবস্থা আছে।

এই দুই ধরণের জীবিকায় পর্যবেক্ষণ শক্তি প্রয়োজন। এস্কিমোদের সীলশিকার করার ব্যাপারে তাদের অধ্যবসায় এবং পর্যবেক্ষণশক্তি আমরা দেখে থাকি। দেখে থাকি তাদের গৃহনির্মাণে—বুদ্ধির দিক। এই দুই দিকের অভাব প্রাচীন জাপানীদের মধ্যেই বা দেখা যাবে কেন?

পিতৃতন্ত্র প্রথা পশুচারকদের মধ্যে বিশেষভাবে দেখা যায়। দেখা যায় পরিবারের কর্তা এবং গোত্রের সদারের একাধিপত্য। এই অবস্থা আমরা প্রাচীন জাপানেও দেখেছি।

আর একটি কথা বলবার আছে। পূর্বেকার নৃতত্ত্ববিদেরা বলতেন, মানুষ যুগে যুগে বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক স্তর অতিক্রম ক'রে ক'রে সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। যেমন, প্রথম স্তর হচ্ছে শিকার জীবন, দ্বিতীয় পশুচারণ, তৃতীয় কৃষিজীবীর স্তর। খাদ্যসংগ্রহের যে বিভিন্ন অবস্থা আছে—তা তাঁরা দেখতে পাননি। বর্তমানের নৃতত্ত্ববিদেরা কৃষিকাজের আগের স্তর যে পশুচারণা তা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, ওরকম ক্রমশ স্তর ভেদ মানুষের সমাজযাত্রায় দেখা যায় না। তাদের অর্থনৈতিক জীবন আছে, কিন্তু অর্থনৈতিক ক্রমস্তর নেই। অর্থনৈতিক একটিমাত্র স্তর কোন কালে মানুষের সমাজে দেখাও যায় না। স্তরের সঙ্গে স্তরের মিশ্রণ।

এই নতুন তথ্যানুসন্ধান ক'রে সি. ডি. ফোর্ড (C. Daryll Forde—Habitat, Economy and Society. London Methuen & Co Ltd. 1957) ভূগোল-নির্ভর মানবতত্ত্বের গ্রন্থখানিতে মানবসমাজের অর্থনৈতিক

জীবনকে (স্তর নয়) ভাগ করেছেন,—সংগ্রাহক, শিকার, মৎস্যশিকার, কৃষি এবং পশু-পালন—এই কয়টিতে (Page 461)। এর যে-কোনটির সঙ্গে অন্যগুলির মিশ্রণও ঘটে।

আর-একটি কথা তিনি বলেন,—এই অর্থনৈতিক দিক দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর ক'রেই যে বিকশিত হবে তার কোন স্থিরতা নেই। প্রাকৃতিক পরিবেশ আর মানুষের কার্যপ্রণালীর মধ্যে আর একটি অবস্থা আছে; তা হচ্ছে, নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়বস্তু এবং তার মূল্যমান সংগ্রহ; আর তারই সঙ্গে জ্ঞান এবং বিশ্বাসের সমবেত দিক অর্থাৎ সংস্কৃতি। আবার এই সংস্কৃতি তো স্থিতিশীল নয়, তা বদলায়। কিন্তু পরিবর্তন স্বীকার করলেই এ কথাও উড়িয়ে দেওয়া যায়না যে, পরিবর্তনের কারণ কেবল পরিবেশই নয় পরিবর্তন ঘটে নতুন আবিষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। নতুন পরিবেশ এলেই যে আবিষ্ক্রিয়া ঘটবে এমন কথাও আবার বলা যায়না।

সোজা কথায় এই দাঁড়ায় যে, মানুষ যখন প্রকৃতিজাত বস্তুর সম্মুখীন হয় তখন তার একটা চিন্তার সৃষ্টি হয়। এই চিন্তাই নিয়ন্ত্রণ করে তার আচরণকে। এই চিন্তাই সৃষ্টি করে তার সংস্কৃতিকে, সাহায্য করে তার পোষাক আর তার ঘরবাড়ী তৈরী করার উপায় উদ্ভাবন করতে। একটি বিশেষ মানুষের বেলায় চিন্তা মাত্রই কর্ম-প্রেরণা দিতে পারে; কিন্তু সমগ্র সমাজের মানুষের চিন্তার ঐক্য না ঘটলে সামাজিক কর্ম-প্রেরণা আসে না।

আমরা চুকচী কোরিয়াকদের সমাজ থেকে তাদের সমাজবদ্ধতা এবং যাযাবরী ভাব দুটোই পেতে পারি। ঋতুচক্রে তাদের পুরনো বাসভূমিতে সমবেত হওয়া, আবার খাদ্যসন্ধানে বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে পড়া এই উভয় জীবনাদর্শ বা সমাজ-নীতি দেখতে পাব। দেখতে পাব গোত্রের অধিকার। পরিবারের অধিকার আর ব্যক্তির অধিকারের সমন্বয়। কিন্তু তাতেই আর প্রাচীন জাপানী চরিত্র বোঝা যায় না।

প্রাচীন জাপানী সমাজে চিন্তার রূপাতিক্রমণ ঘটেছে। সেই রূপাতিক্রমণ তার সমাজ নিয়মে অনেক পরিবর্তন এনেছে। এতো দু-একদিনের ঘটনা নয়। এর মধ্যে কত আবিষ্কার ঘটেছে, কত স্থানবদল হয়েছে। তবু স্বীকার করতে হবে, তাদের সেই আদিকালের পরিবার-নীতি, মৎস্যশিকার উৎসব অনুষ্ঠান, গৃহ-নির্মাণ পদ্ধতি রয়ে গেল।

এই সমাজ-ব্যবস্থা, পরিবার-নীতি আর উত্তরাধিকার-প্রথা তাদের

রাষ্ট্রনীতিক জীবনে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দেও দেখা গেছে। মেইজি যুগের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের সংবিধানে এই রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে।

গণতান্ত্রিক দেশের পার্লিয়ামেণ্টারী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল; কিন্তু পাশ্চাত্যের এই নির্বাচনতন্ত্রের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য-সমাজের ব্যক্তি-প্রাধান্য এতে নেই। ব্যক্তিকে দেশ, সমাজ এবং সমাজের কর্তা মিকাডো বা সম্রাটের অনুমোদনে স্বাধিকার ভোগ করতে হবে। পরিষদের দুটি কক্ষ আছে, দুধরণের সদস্য আছে, মন্ত্রিসভা আছে। কিন্তু এই মন্ত্রি-সভা তাদের কার্য-প্রণালীর জন্য পরিষদের নিকট দায়ী নয়, জবাবদিহি তাদের করতে হবে সম্রাটের কাছে। পরিষদের সদস্যেরা মন্ত্রিদের কার্যে বাধা দিয়ে তাদের অকেজো হয়ত করতে পারে, কিন্তু মন্ত্রী নির্বাচন তাদের হাতে তো নেই। আরও বৈশিষ্ট্য হ'ল, নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ সঙ্কোচ বা প্রসার করা এই ডিয়েটেব হাতে নেই, সম্রাটেরই হাতে। স্থল ও নৌসেনা এবং প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারী নিয়োগ নিয়েও কোন কথা উঠতে পারেনা।

অনেকে এই প্রথাকে স্বৈরাচার মনে করতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন শোগুনের আত্মসমর্পণের পর মানুষ সম্রাটকেই চেয়েছিল হয়ত বা সম্রাটের এই কার্যপদ্ধতিই ছিল তাদের অভিপ্রেত। এইটি প্রমাণিত হয় রাজা ইতোর (ইনিই সংবিধান রচয়িতা) অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যা থেকে। তিনি বলছেন,

অপরপক্ষে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য আছে, অন্য সভ্য দেশে অনুরূপ ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যাবেনা। জাতিতে, ভাষায়, ধর্মে এবং মনের দিকদিয়ে এই জাতি এক; বিচ্ছিন্ন ছিল এতকাল বাইরের জগৎ থেকে; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, আর সামন্ত ব্যবস্থায় নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছে এই দেশবাসী; এরই মধ্য দিয়ে পরিবার এবং অর্ধপরিবার-গত বন্ধন প্রত্যেক সমাজ-সংগঠনে এবং প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে; উপরন্তু এই নৈতিক এবং ধর্মীয় ধারা অন্যোন্য সহযোগ এবং ভ্রাতৃত্বের উপর অনাবশ্যক জোর দিয়েছে। তারই ফলে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে করতে অজ্ঞাতসারে আমরা বিশাল গ্রামীণ সমাজ গড়ে ফেলেছি। এই সমাজে সমাজ-উদাসীন বুদ্ধির এবং জীবনযাত্রা'য় বৈষয়িকতা বা স্বার্থপরতা সংযত করা হয়েছে; এই প্রতিক্রিয়াশীল ঘটনাকে ঠেকিয়ে রেখেছে মানুষের সঙ্গে মানুষের গভীর এবং সহানুভূতি সূচক সম্পর্ক (Syed Ross Masood; Japan and

its educational system. Hyderabad Deccan, 1923, Page 158)। এই গ্রামীণ সমাজের অনুরূপ ছবি দেখেছি তুন্দ্রা অঞ্চলের ঐসব মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে, দেখেছি ১৮৮৯ এর সংবিধান ধারাগুলিতে।

কাল নিরবধি; সংস্কৃতির পিছনে যে মানুষের মন থাকে তার স্মৃতিও নিরবগ্রাহ। জাপানে জাতির এই ঐতিহ্যকে উদ্বোধন করতে হয়নি, সে যেন জাগ্রত। এইখানেই জাপান সমাজের বৈশিষ্ট্য।

জাপানের মানসিক গঠনের আদিস্তর থেকে আমরা জানতে পারছি, শিক্ষাব অবিরাম প্রবাহ যে মন্থর গতিতে চলছিল তা বোধহয় ঠিক নয়। মৃন্ময় পাত্র নির্মাণে বিভিন্ন ধরণের নকসা এবং মৎস্য শিকারে অধ্যবসায় সাই-বেরিয়া এবং বেরিং প্রণালীব আদিবাসী থেকে পাওয়া হলেও তাব রূপ বদল ঘটেছে। যেখানে বল্লাহরিণ নেই সেখানে অদৃশ্য বল্লাহবিণকে কেন্দ্র করেই তাদেব আব সংস্কৃতি বচিত হয়নি। সমাজের যৌথকর্মে সংগঠনশক্তিব পরিচয় পাওযা গেছে। কৃষিকাজে উন্নতি না ঘটলেও অন্যান্য কারিগরীতে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জনেব চেষ্টা আছে। ঘব-বাড়ী নির্মাণে উপায়-উন্মেষ দেখা দিচ্ছে।

এই সমাজে ইতিহাসেব গতি আসছে। মানুষের কর্ম-কৌশল জাতি সৃষ্টিব পথে প্রযুক্ত হচ্ছে। জাপানেব সমাজ ও বাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা কবলেই আমরা সেকথা জানতে পাবব। ইতিহাসেব আদি যুগের সেই ধাবা আমবা অনুসবণ কবতে চেষ্টা কবি।

প্রাগৈতিহাসিক জাপানী মানুষ প্রথম পাওয়া গেছে ইয়োকোসুকাতে। হয়ত এই মানুষ আদি যোমোন যুগেব। পরবর্তী কালেব যোমোন মানুষকে দেখে মনে হয় তার মধে মোঙ্গাল মিশ্রণ ঘটেছে। মনে হয় যায়োইযুগেব অভিযানেব কালে এই মিশ্রণ ঘটল। যাই হোক এই সময় থেকেই—জাপানীদেব আকৃতিতে একটা মান দাঁড়াল। তার আগে কেবল পবিবর্তন দেখা গেছে।

২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সমুদ্রপাব থেকে মানুষে এই দ্বীপে অভিযান চালাতে থাকে। চীনে তখন হান যুগ। এই চীন সভ্যতার প্রভাবেই ব্রোঞ্জ যুগ এল, এল কৃষিকাজেব সংগঠন।

চীনেব এই যুগের ইতিহাসে শতবাজ্যের দেশ ব'লে জাপানকে অভিহিত করা হযেছে। চীনের সঙ্গে জাপানেব যেখানে প্রায়ঃ সংযোগ ঘটেছে সেখানকার (উত্তর কিয়ুশু) অনেক স্থানের নাম জানা যায়। এইখানেই

যায়োই সভ্যতার উদ্ভব ঘটে। ধাতুর ব্যবহার, এবং ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কুম্ভ নির্মাণ প্রভৃতি এখানে সুরু হ'ল। ধান্যউৎপাদনের বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা এবং সঙ্গে সঙ্গে লোহার অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণও দেখা গেল।

যারা বাইরে থেকে এল—তারা সমাজে আধিপত্য খাটিয়ে উচ্চ শ্রেণীতে পরিগণিত হল। দক্ষিণ-জাপান পর্যন্ত মোঙ্গোল প্রভাব প্রসারিত হয়। যোমোন সভ্যতার সঙ্গে যায়োই সভ্যতার সংযোগ ঘটে গেল।

যায়োইয়ের মধ্যযুগ প্রথম শতক পর্যন্ত চলেছিল। এই সময়েই চীনের সঙ্গে জাপানের ওতপ্রোত সংযোগ ঘটল। চীন-কোরিয়া থেকে বিলাসদ্রব্য এসে জাপানের সমাজে প্রবেশ করে এই যুগে। এই স্রোতেই আয়না বা দর্পণ জাপানে এল। আয়না যেন অর্থ এবং মর্যাদার প্রতীক হ'য়ে দাঁড়াল। আর জাপানে এই আয়না সূর্যের প্রতীক হওয়ায় আয়নার সঙ্গে রহস্যবাদিতা জুড়ে গেল—এই ঘটনা আমরা শিন্টো ধর্মে দেখেছি।

ছোরা বা ছোট তরবারি হাবাকিরিতে ব্যবহৃত হয়, যা সামুরাইরা ব্যবহার করে তা এল কোরিয়া থেকে। এমনি ক'রে বিদেশী পণ্য জাপানকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়।

কৃষিকাজের জন্য নানা দ্রব্যনির্মাণ, কবরস্থ করবার নানা পদ্ধতি জাপানে চীন এবং কোরিয়া থেকে এসে যোমোন সভ্যতাকে যায়োই সভ্যতা গ্রাস করল এক কথায় জাপানে যায়োই সভ্যতা এক যুগান্তর ঘটিয়েছে।

যায়োই যুগে ব্রোঞ্জ আসবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের কিছু উপকরণ এসে জোটে। যদিও পাথর এবং মাটির পরিবর্তে এই ধাতুর ব্যবহার যোমোনরা প্রথমত খুব ভালো চোখে দেখেনি, তবু কালক্রমে এটিকে স্থায়ী সম্পদ ব'লে মনে করা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রে বাস্তববুদ্ধি এসে পড়ে। কৃষিকাজে এই ধাতুর ব্যবহার প্রয়োজনীয় হতে লাগল। কৃষির সঙ্গে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানও জুড়ে যায়। নৃত্য-উৎসব যেন কৃষিজীবনের এক আবশ্যকীয় অঙ্গ। এই ভাবেই —অস্ত্র এবং ঘণ্টা কবরস্থ করার প্রথা প্রবর্তিত হয়।

আদি ঐতিহাসিক যুগের আগে আমরা উত্তরে আইনুদের পাচ্ছি, দক্ষিণে যাযোই বা চীন-কোরিয়াকে পাচ্ছি, আর যোমোন এই দুই ধারার মধ্যে মিশে নতুন জাপান তৈরী করার পথে।

ইতিহাস পূর্ববর্তীযুগ জাপানী কথা-কাহিনী থেকে অনেকে ষষ্ঠশতক ব'লে মনে করেন। এই কথা-কাহিনীতে একটি খবর মেলে তা হচ্ছে

জাপানের বিভিন্ন রাজ্যকে একত্র করবার প্রচেষ্টা। 'জাপানের প্রথম সম্রাট জিম্মু তেন্নো। তাঁর যুগ ৬৬০ খৃঃ পূর্বাব্দ, ইয়ামাতো ভূমিতে তাঁর স্থান নির্ণয় করা হয়। তাঁরই বংশ জাপানের সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হ'য়ে আসছেন। তাঁরা জাপানের সর্বময় কর্তা।

এই সময় জাপানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্ঘর্ষেব কথা জানা যায়। আর একটি তথ্য হচ্ছে, যেখানে ব্রোঞ্জ সভ্যতা দেখা দিয়েছিল সেই কিয়ুশূতে জনসাধারণ দারিদ্রে নিপীড়িত (Kidder, Page 134)। পশ্চিম-জাপানে অনেক মহারাণীর কথা জানা যায়। এইজন্য চীনের ইতিহাসে কথিত আছে, জাপানে নারীরাই শাসন করে।

দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে কোরিয়ার সঙ্গে জাপানের সঙ্ঘর্ষের কথা জানা যায় (সিল্লাতে)। কিন্তু কোরিয়াকে জয় করতে গিয়ে জাপান বৌদ্ধ সংস্কৃতি নিজের দেশে নিয়ে এল। এখন থেকে চীনের সঙ্গে জাপানের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকল না, যোগাযোগ দৃঢ় হ'ল কোরিয়ার সঙ্গে। চতুর্থ-পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতক ধ'রে কোরিয়ার জনবাসী জাপানে স'রে এল। নিয়ে এল বৌদ্ধধর্ম। সপ্তম শতকে জাপানে আবার চীন-ঐতিহ্যের প্লাবন দেখা গেল।

এই সময় সমাজের ব্যক্তির মধ্যে পাচ্ছি, দাস, প্রভু (retainers), কর্মীসঙ্ঘ তোমো-সভ্য (corporation members), সম্ভ্রান্তপরিবার। তাঁরা সম্রাটের এব আলোক প্রাপ্ত লোকদের (elite) সাহায্যে আসতেন। অবশ্য দাসের সংখ্যা নগণ্য, তারা বোধ হয় ‥ ক পরাজিত বন্দী। যাদের কাজ-কর্মে স্বেচ্ছা প্রেরণা ছিলনা, বা স্বাধীনতা ছিলনা, তারা হচ্ছে কর্মীসঙ্ঘের লোক (guild)। তাদের বৃত্তি বংশগত ভাবে এবং তারা ‥পরের তলার মানুষের পণ্যসরবরাহ করত। কিন্তু এখানেই কাজ-কর্ম পাওয়া যেত বেশি। জাপানের অধিকাংশ লোক এই গিল্ডের সহায়তায় জীবিকানির্বাহ করত। এরা কুম্ভকার, কেরানী জেলে, তাঁতি, সৈনিক, গণক, নট, ধাত্রী প্রভৃতি। যতই সমাজ বৃদ্ধির পথে যেতে থাকল ততই এরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। তোমো অনেকটা গিল্ড বা বে' (be) এর মতো।

পিতৃতন্ত্র প্রথায় পরিবার। পরিবারে পরিবারে মাতব্বর থাকতেন। তাঁদের চাহিদামতোই কর্মীরা কাজের যোগান দিত। এই মাতব্বর বংশগত ধারায় চলে আসছে, তারা সম্রাটের অনুগত ব্যক্তি।

তাহলে সম্রাটের শাসন কার্য এই পরিবার নায়কের মাধ্যমেই নির্বাহ

হ'ত বলে মনে করা যায়। আর পরিবারিক পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বিভিন্ন প্রযত্ন ছিল।

পরিবার, সমাজ, দেশ, সাম্রাজ্য অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হল। এইবার নিয়ম এল ধর্মব্যাপারে।

শিণ্টো ধর্ম প্রথমদিকে অস্পষ্ট, এইটি রূপ পেল বৌদ্ধধর্মে আসবার সঙ্গে সঙ্গে। যায়োই যুগ থেকেই দেবতার কল্যাণের দিক অনুভব করা হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে স্নান করার প্রথা এল। স্নান ক'রে পাপক্ষালন করা হত। আমাতেরাসু বা সূর্য-দেবীর পূজা সম্রাটের পরিবারথেকে জাত হওয়ায় সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। রাষ্ট্রীয় ঐক্য গঠনের ব্যাপাবে এই আমাতেরাসু লাঞ্ছিত পতাকা কিছুদিন পূর্ব থেকেই প্রচলিত হ'লেও, বৌদ্ধধর্মের বন্যায় শঙ্কিত হ'যে এই সূর্য-দেবীব পূজা বিধিবদ্ধ হয়ে গেল, জনপ্রিয় হল। কারণ বৌদ্ধধর্ম ছিল লৌকিক দেবদেবতাব বিরোধী। এইজন্যই দেখা যায় বৌদ্ধধর্মে মূর্তি-নির্মাণ পদ্ধতি প্রচলিত হওয়াব শতশত বৎসব পরেও শিণ্টোধর্মে ঐ পদ্ধতি প্রয়োগ কবেনি। শিণ্টো বা 'ধর্মেব পথ' অনেকে তাও ধর্মের থেকে এসেছে ব'লে মনে করেন। আমাদেব তা মনে হযনা। তবে তাও যেহেতু বৌদ্ধধর্ম বিরোধী তখন তাও-য়েব মতবাদ নিযে শিণ্টো ধর্ম পুষ্ট হ'ল—একথা বলা যায়। বৌদ্ধ-ধর্মের পূর্বে যে জাপানে মন্দির মঠ ছিল না, তা সত্য নয়। ইতিহাস পূর্ববর্তী যুগ থেকেই দেখা গেছে প্রতীক হিসাবে মাগাতামা (তরবারি), দর্পণ।

জাতিগঠনের উপাদান কি-কি, সংস্কৃতির দান মনের উপর কেমনভাবে পড়ে, এ নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। ধর্মেব সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক কি, অর্থনৈতিক দিক কেমন ক'বে জাতি-গঠনের প্রেরণা দেয় সে সব আলোচনা বর্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু জাতীয়-শিক্ষা বলতে আমরা যদি কোন-কিছুব উপর নিতান্তই জোর দিই, তবে একটা কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, একটি সমাজের নিজস্ব স্থান সম্পর্কে একটি চেতনা থাকে। এই চেতনা যে হঠাৎ-পাওয়া তা নয়। মানুষের এমন অবস্থা পাওয়া যায় না যখন এই স্থান-বোধ অনুপস্থিত ছিল। ধর্মের ঐক্য থাকলেই মানুষ একটি জাতিতে পরিণত হয় না, তা আমরা হামেশাই দেখতে পাই। কিন্তু অধিবাসীর নিজের এলেকা সম্পর্কে যখন মমত্ব আসে তখনই জাতীয়তার সৃষ্টি হয়।

কোন্‌টি আগে? স্থান-বোধ, না সংস্কৃতির ঐক্য, না সম্পদকর্ষণে আচরণেব ঐক্য?

কোন্‌টি যে প্রাথমিক দিক—তা বলা হয়ত দুষ্কর। কিন্তু পরিণত জাতির সম্পর্কে কিছু জানতে হলে তার ধর্ম-ইতিহাস জানতে হয়। ধর্ম হচ্ছে তাব পরিবেশ-গত ধারণা; একটি বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায় যখন তখনই শোণিতে শোণিতে একটি ধ্বনি তোলে। এই ধ্বনির ঐক্য-ও জাতীয়তা গঠনে অনেকটা কাযকরী।

এইজন্য যে-কয়টি দিক জাপানেব জাতীয় চরিত্র গঠনে সাহায্য করেছিল তাব মধ্যে ধর্মমতের দিকগুলি প্রথমত আলোচনা করা যাক।

জাপানের প্রধান লোক-গোষ্ঠী অন্তত কোরিয়া থেকে এসেছে একথা নৃতত্ত্ববিদেরা স্বীকার করেন। তবে একবারেই তাবা ঝাঁপিয়ে পড়েনি, বহু শতাব্দী ধ'রে তাদের এই আগমন ঘটেছিল।

শিণ্টো ধর্মের সঙ্গে অবশ্য তাতাবদেব এই কারণে সাদৃশ্য খোঁজা ঠিক হবে না, যদিও উভয় ধর্মেই সূয-পূজা আছে। তাতারদের সঙ্গে সাদৃশ্য না থাকলেও কোরিয়াবাসীর সঙ্গে আছে। ঐযে জাপানের রাজপ্রাসাদে কাবা-নো-কামির পূজা হয়, ঐ দেবতা তো কোরিয়াব। কেবল কামি কেন কারা-কুনি-ইদেট-নো-কামি বা সুসা-নো-উযো এবং ফুৎসুনুশি প্রভৃতি দেব-মন্দির এবং দেবতার সঙ্গে কোরিয়ার সম্পর্ক রয়েছে।

এসব খবর পাওয়া যাচ্ছে কি করে? খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতকের আগে জাপানে কোন লিখিত পুঁথি এমন কি লেখার ব্যবহারই দেখা যায় না। কিন্তু 'লেখা'র প্রচলন না থাকলেও, ভাষা যে না ছিল তা তো নয়। একথা নিশ্চিত যে, নানারকম পুরাণ কথা এবং তৎসঙ্গে অনুষ্ঠানরীতির অস্তিত্ব ছিল। এই কথা-কাহিনী এবং অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া বংশ বংশ ধরে সঞ্চারিত হয়েছে নাকাতোমি আর ইম্‌বে এই দুই পুরোহিত গোষ্ঠীর মাধ্যমে। মিকাডোর রাজসভায় এই পুরোহিতেরাই উত্তরাধিকার সূত্রে অভিষিক্ত হয়ে পদ প্রাপ্ত হয়। এই পুরোহিত কোন একজন ব্যক্তি নন, পুরোহিত সঙ্ঘ।

এই পুরোহিত গোষ্ঠী ছাড়া আর একটি সঙ্ঘ ছিল কাতারিব নামে। কাতারিব সাধারণত মন্ত্র বা শ্লোক আবৃত্তি করত। শিণ্টোদের প্রধান স্থান হচ্ছে ইদজুমো প্রদেশে; এই সব প্রদেশে কাতারিব বিশেষ রূপে প্রতিষ্ঠিত। এদের কথা ৪৬৫ খৃষ্টাব্দে রচিত নিহোঙ্গি গ্রন্থ থেকে পঞ্চদশ

শতক পর্যন্ত জানা যায়। কিন্তু তারপর এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তারপরও তারা মিকাডোর অভিষেকের সময় তারা প্রাচীন ভাষায় মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে থাকে।

জাপানের সম্রাট কর্তৃক যেসব পুথি রচিত হয়, তার মধ্যে ৭১২ খৃষ্টাব্দে কোজিকি—অর্থাৎ প্রাচীন বিষয়ের ইতিহাস, নিহোঙ্গি (৭২০ তে) অর্থাৎ জাপানের কাহিনীমূলক ইতিহাস (চীন ভাষায় রচিত), কিউজিকি (৬২০ তে) কেবল পুরাণ কথার গ্রন্থ (এই গ্রন্থের তারিখ নিয়ে মতান্তর আছে) এবং ইয়োঙ্গিশিকি অর্থাৎ ইয়োঙ্গিযুগের রীতি নীতি (৯০১-৯২৩) অন্যতম। ইয়োঙ্গিশিকিতেই রাজ-সমর্থিত শিন্টো ধর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত ইতিহাস জানতে পারা যায়। শিন্টোরা কেমন ক'রে উৎসব অনুষ্ঠান করে সে সম্পর্কে খবর, এমন কি পূজা উপলক্ষ্যে ২৭টি প্রার্থনা সঙ্গীতও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

ধর্মের মধ্যে যদি মনের আবেগ জড়িত থাকে, অর্থাৎ প্রক্ষোভ থাকে, তবে শিন্টো ধর্ম হচ্ছে কৃতজ্ঞতা এবং প্রেম এই দুইটি আবেগ থেকে জাত। এই ধর্মে দুজন মহৎ দেবতা আছেন, সূর্য-দেবতা এবং অন্ন-দেবতা। তাঁদের জন্য যে উৎসব হয়, তা হচ্ছে আনন্দের।

জাপানী ভাষায় দেবতাকে সাধরণত বলা হয় কামি (Kami)। এর সাধারণ অর্থ হয়ত 'আচ্ছাদন' বা 'উপর'। রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানকেও 'কামি' বলা হয়, নীচু প্রদেশকে বলা হয় শিমো (Shimo)। কামি কেবল দেবতার বেলায় প্রযোজ্য নয়, মিকাডোর বেলাতেও, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বেলাতেও প্রয়োগ করা হয়। যেহেতু দেবতা স্বর্গে বাস করেন সেহেতু কামি, মিকাডো যেহেতু সমাজের শ্রেষ্ঠস্থানে সেহেতু কামি।

প্রকৃতি দেবতা এবং নর-দেবতা এই দুই ধরণের দেবতাকে জাপানে পাওয়া যায়। প্রকৃতির দেবতা যথা—

একক	হিসাবে	সূর্য
গণ	"	বৃক্ষ দেবতা
সম্পদ	"	বৃদ্ধির দেবতা

নর-দেবতা প্রথা—

একক	হিসাবে	তেম্মাঙ্গু
গণ	"	কোয়েন্
সম্পদ	"	তা-জিকারা-নো-ওয়ো।

এইসব দেবতা-বাদের নানা পরিবর্তিত রূপ দেখা যায় শিন্টো ধর্মে। সাহিত্য ও ভাষার আশ্রয়ে যখন দেবস্তুতি দেখা গেল তখন মানব-সমাজের অনুরূপ ব্যবহার এই দেবতায় আরোপ করা হল, (The humanization of the nature deities is reflected in the vocabulary of Shinto. Page 19, Shinto—W. G. Aston, Longmans Green & Co, London, 1905)। যেমন 'মিয়োয়া' একটি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে মহান্-পিতা তা অধিকাংশ দেবতার বেলাতেই প্রয়োগ করা হয়। যদিও 'পিতা' অর্থেই দেবতার মানবত্ব আরোপ করার প্রবণতা দেখা যায়, তবু একথা সত্য শিন্টো দেবতার কোন লিঙ্গ ভেদ নেই। কাহিনী প্রসঙ্গে দেবতা পুরুষ কি স্ত্রী বুঝে, নিতে হয়। হয়ত কোন সময়ে পুরুষ শব্দ 'ওয়ো' এবং স্ত্রী শব্দ 'মে' ব্যবহার করা হয়।

দেবতত্ত্ব থেকে আর একটি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে, 'সুমে'। এইসব শব্দ দেবতার ক্ষমতা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। 'সুমে' কথার অর্থ সকলকে সংগ্রহ ক'রে 'এক' করা, অর্থাৎ সাধারণভাবে সকলের উপর আধিপত্য করা, বা শাসন করা। কাজেই মিকাডোর বেলাতেও এই শব্দ ব্যবহৃত হ'ল, শব্দটি হ'ল সুমেরা বা সুমেরাগি-নো-মিকোটো, (Sumeragi no mikoto) মিকোটো হচ্ছে পবিত্র বস্তু; কাজেই মিকাডোর বেলাতে এইটি ব্যবহৃত হয়; তার পূর্বে পিতাকেও মিকোটো বলা হ'ত।

দেবতত্ত্ব ও ভাষার এই ব্যবহার থেকে আমরা বেশ বুঝতে পারি, জাপানের সমাজ পূর্বাপর পরিবার নিয়মে আবদ্ধ, স্বতন্ত্রবাদিতা সেখানে নেই। অবশ্য উত্তর-পূর্ব এশিয়ার রীতিই ছিল পরিবার নীতি।

এ্যাস্টন মনে করেন, জাপানে কল্পনার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন যেন 'সমাসোক্তি' অলঙ্কার প্রয়োগে কৃপণতা আছে। এই দিক দিয়ে তিনি কনফুসিয়াস-নীতির সঙ্গে শিন্টোর সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন (page 21)।

তা ছাড়া বহুত্ব-বাচক শব্দেরও তেমন বিধি জাপানী ব্যাকরণে নেই বলে, কোন দেবতার নামটি যে বহুত্ব বাচক আর কোনটি একত্ব বাচক তা বুঝে উঠা দায়। বোধ হয় চীনের প্রভাব আসবার আগে স্থাপত্য বা শিল্পের দিক দিয়ে জাপান খুব উন্নত ছিল না, তাই দেবতার মূর্তি সব অস্পষ্ট—কল্পনায় এবং প্রকাশে।

এ কথা দ্বারা এই বোঝা যাচ্ছে শিন্টোবাদে ধার্মিকদের মানসিকতাই বড়,

প্রকাশের দিকে তত নয়। কিন্তু প্রকাশের দিকে বড় না হলেও অপ্রকাশ্য নয়, বরং ব্যাপক। অর্থাৎ ভাবটি ব্যাপক; সে ভাবটি সমাজ নির্ভর; কিন্তু ব্যক্তির হয়ে ওঠেনি।

এই দেবত্ববাদে পরবর্তীকালে আত্মা বা আধ্যাত্মিকতা জুড়ে গেল। এই আত্মাকে জাপানীতে বলে 'মিতামা'। এই যুগেই দেখা যায় দেবতা সর্বত্র আছেন। কেমন ভাবে? না, যখনই প্রার্থনা করা হয় তখনই তিনি রূপ ধ'রে সেখানে অধিষ্ঠিত হন। তিনি আদৌ সেখানে থাকেন না, কিন্তু উৎসব-অনুষ্ঠানে আসেন। 'মি' হচ্ছে সম্ভ্রমার্থক শব্দ। তামা হচ্ছে 'দান' বা 'বর' বা কোন মূল্যবান বস্তু। অর্থাৎ তিনি এলে কিছু মূল্যবান বস্তুর প্রাপ্তি ঘটে; হয়ত সে উর্বরাশক্তি, হয়ত সে মানুষের বিশেষ সৌভাগ্য।

শিণ্টো পুথি থেকে আর দুটি কথা পাওয়া যায়, আরাহা-গোতো, অর্থাৎ প্রকাশ্য বস্তু এবং কাকুরে-গোতো অর্থাৎ অদৃশ্য বস্তু। শেষের শব্দটিই আধ্যাত্মিকক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অদৃশ্য দেবতার আশীর্বাদকেই বলা হয় কাকুরে-গোতো (**Kakure-Goto**)। দেবতা হচ্ছেন অদৃশ্য তিনি আসেন আত্মার-আলোকে বা অবতার হিসাবে। কাজেই এখান থেকেই রহস্যবাদের সম্ভাবনা দেখা দিল।

এই দেবতত্ত্বের অনুরূপ হচ্ছে মানবতত্ত্ব। মানব সমাজে একক ব্যক্তি হিসাবে শ্রদ্ধা পাচ্ছেন—মিকাডো। তবে এই মানব-দেবত্ব ধর্মের অঙ্গীভূত হয়নি, হয়েছে সমাজ-নিয়মের আবশ্যক অঙ্গ হিসাবে। গণ হিসাবে এসেছে পিতা এবং পিতৃপুরুষ; তা সে মৃতই হোক আর জীবিতই হোক।

এখন রাজার কাছ থেকে যখন মানব সমাজ নানা উপকার পাচ্ছে তখন তাকেও শ্রদ্ধার আসনে বসাবে—সে বিষয়ে বিতর্ক থাকে না, যদি জাতির চরিত্র ধর্মের নীতির সঙ্গে এমনি বাঁধা পড়ে যায়। মিকাডোকেও এমনি শ্রদ্ধার আসনে বসানো হ'ল। তাঁর সম্বন্ধে নানা কাব্য উপমা যুক্ত হ'ল যেমন সূর্য পুত্র, 'সূর্যের সার্থক পুত্র' ইত্যাদি। কিন্তু এই উপমা দেখে নাসিকা কুঞ্চন ক'রে একথা ভাবা ঠিক হবে না যে তারা কত অজ্ঞ—মানুষকে দেবতা বলে।

সূর্যের কাছ থেকে মানুষ যে উপকার পাচ্ছে, অমনি উপকার বা আশীর্বাদ রাজার কাছ থেকে পাচ্ছে বলেই সূর্যের সঙ্গে তাকে তুলনা করা হয়েছে। এই উপমার পিছনে যে ধারণাটি আছে সেইটি বুঝলেই সমাজ সম্পর্কে ঠিক উপলব্ধি আমাদের হবে।

জীবিত মিকাডোকে যে দেবতা মনে করা হয় তা কিন্তু বাস্তব বা যথার্থ দেবতা অর্থে নয়। পদগৌরবের জন্য। জাপানের এক মন্ত্রী ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার দূতকে বলছেন, জাপানের সম্রাট পৃথিবী শাসন করেন দেবতারই প্রতিনিধি হিসাবে। আবার তিনিই বলছেন, তোমাদের রাজারাও দেব-পুত্র। কাজেই মনে হয় প্রকৃত দেবতা মিকাডোকে ভাবা হয় না।

মৃত মিকাডোকে দেবতা ভাবা স্থরু বা নিয়মিত হয়েছে দশম শতক থেকে। প্রকৃতির দেবতাকে যেমন ভাবে উপচার দেওয়া হয়, মৃত মিকাডোকেও তেমনি দেওয়া হয়।

পূর্বপুরুষকে পূজা করবার পদ্ধতি চীনে যেমন দেখা গেছে, সে অর্থে শিণ্টোদের মধ্যে এ পূজা আদৌ ছিল না। ষষ্ঠ শতকের আগে এই রীতি দেখা যায় নি। পরবর্তীকালে যে কথা উঠেছে যে শিণ্টোরা পূর্বপুরুষ পূজারী মর্মে মর্মে, সে কথাটির প্রবক্তারা বোধ হয় জাপানে চীনের প্রভাব সম্পর্কে খতিয়ে দেখেন নি। জাপানীদের পক্ষেও চীনের প্রভাব অগ্রাহ্য ক'রে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা দুঃসাধ্য কারণ ঐতিহ্য তাদের স্বাঙ্গীকৃত হয়ে গেছে।

যাই হোক শিণ্টো ধর্মে অনেক রকমের ছদ্ম দেবতা আসন নিয়েছেন আমাদের লৌকিক দেবতার মতো। যেমন উজি-গামি, বিসো (আবিষ্কারের দেবতা)।

মানুষের সমাজে যেমন দেবতা বাদ নিয়ে আসা হল, প্রাণীজগতেও তেমনি 'ভয়' হিসাবে দেবত্ব বা 'কামি' ভাব দেখা দিল। ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতির এমনি দেবতা সমাজের উপচার পেতে থ কল।

তত্ত্বগত ভাবে বলতে গেলে জাপানীরা এক-দেবতা অর্থাৎ সূর্যকেই মানৎ করে, কিন্তু ব্যবহারিকভাবে তারা বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী। প্রকৃতির দেবতা যে প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়, মানুষের জীবন যাত্রায় তাদের প্রভাব বহু। এই সত্যই শিণ্টোধর্মের সার।

শিণ্টোধর্মের সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে ইতিহাসের একটি চমকপ্রদ কাহিনী জানা যায়। তাকে-মিকা-ৎস্থচী এবং ফুৎস্থন্থসি এই দুই দেবতা নিনিগির বাসের জন্য জাপানকে তৈরী করেন অসভ্যদের দেবতাদের সরিয়ে। এই অসভ্যদের দেবতা দিনের বেলায় গ্রীষ্মের মক্ষিকার মতো, রাত্রে আলেয়ার মতো ঘুরে বেড়াত। আর পাহাড় পর্বত গাছপালা এবং সমুদ্র ফেনের কথা বলার শক্তি ছিল।

এই কাহিনী থেকে দুটো কথা অনুমান করা যায়—(১) নিনিগিদের আগে এখানে মানুষের বসবাস ছিল এবং (২) তখন জাপান একরকম জলাভূমির মতো ছিল।

বহু দেবতায় বিশ্বাসী হলেও শিণ্টোরা পৌত্তলিক নয়। তবে দেবতার অংশ হিসাবে 'শিনতাই' কল্পনা আছে। এই প্রতীকের কোন আকার নেই অনেকটা নারায়ণশিলা প্রতীকের মতো। সাধারণত পাথরের শিনতাই বেশি প্রচলিত। অবশ্য তারা পৌত্তলিক নয়—তার কারণ যে, নিরাকার ভগবানে বিশ্বাসী তা নয়, আসলকথা শিল্প স্থাপত্যে অনুন্নত হওয়ার দরুণই শিণ্টোদের এই মতবাদ গড়ে ওঠে, (The absence of idols from Shinto is not owing, as in Jndaism and Islam, to a reaction against the evils caused by the use of anthropomorphic pictures and images, but to the low artistic development of the Japanese nation before the awakening impulse was received from China. Aston—page 73)।

দেবতার সঙ্গে পুরোহিত নিশ্চয়ই থাকবে। শিণ্টো ধর্মে মিকাডোই হচ্ছেন প্রধান পুরোহিত। কিন্তু কালক্রমে এই পৌরোহিত্যের অনেক কর্ম নাকাতোমির উপরে বর্তানো হ'ল। পরবর্তীকালে এই নাকাতোমি উত্তরাধিকার সূত্রে উত্তরপুরুষের অধিকারে এল। নাকাতোমি হচ্ছে মিকাডো এবং ঈশ্বরের মাধ্যম। ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী এই নাকাতোমির মধ্য থেকে নির্বাচিত হত।

পূজা বা মন্দিরের অন্যান্য কার্যের জন্য ছিল ইমবে। এরাও উত্তরাধিকার সূত্রে এই পদপ্রাপ্ত হয়—এদেরও সঙ্ঘ বা গোষ্ঠী আছে।

পূজার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের ভার থাকল আর-এক পুরোহিত গোষ্ঠীর উপর—তাদের বলা হত উরাবে।

বিংশ শতকের প্রথম দিক পযন্ত দেখা গেছে—এইসব পুরোহিতের সংখ্যা ১৪,৭৬৬। তাঁদের বেতন থাকত—সর্বাধিক মাসিক বেতন দেখা গেছে ২০ পাউণ্ড মতো।

পূজার করণীয়ের মধ্যে আছে—মাথা নত ক'রে প্রণাম করা, প্রার্থনার পূর্বে ও পরে—দুবার ক'রে। আছে করতালি দেওয়া। পুরনো যুগে বত্রিশবার করতালি দিতে হ'ত। এই রীতিটি বোধ হয় আনন্দ প্রকাশের।

মাথায় পবিত্র বস্ত্র ধারণ করাও একটি মুদ্রা। এছাড়া দেবতাকে ভোগ দেওয়া, বস্ত্র পরিধান করানো প্রভৃতি রীতিও আছে।

পরবর্তীকালে সামরিকতার সঙ্গে সঙ্গে তরবারি, নরবলি, দাস-উৎসর্গ অশ্ব-উপহার প্রভৃতি নানাবকম উপঢৌকন এসে পড়েছিল, কিন্তু আদিতে এসব ছিল না।

আমরা শিন্টো ধর্মতত্ত্বের গভীরে আর প্রবেশ করব না। যে পরিচয়টুকু আমরা পেলাম তাতে এই তথ্যটি দাঁড়াচ্ছে যে, দেবতাদের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের পারিবারিক নিয়ম নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সমস্ত বিশ্ববস্তুর সঙ্গে মানুষের সমাজকে এক ক'রে নিয়ে ভাবা শিন্টো ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য। কোন সময়ই স্বতন্ত্র হয়ে তারা বাস করবে কল্পনা করতে পারে না। মানুষ প্রকৃতি ও প্রাণী এই তিনটির সম্পর্ক নির্ণয় ক'রে সমাজ-বোধ জাগ্রত করাই ছিল শিন্টো ধর্মের একান্ত কাম্য। বলতে গেলে এই ব্যাপক চিন্তা—সমগ্রসমাজের হয়ে ভাবতে পারা-ই জাপানের চরিত্রে দেশ ও সমাজের কল্যাণ-কামনা ভিত্তি নির্মাণ ক'রে বসেছিল। বোধ হয় সেইজন্যই সমগ্র এশিয়ার মধ্যে জাপানই প্রথম এবং অতি দ্রুত পাশ্চাত্য-শক্তির অক্টোপাশের আক্রমণ থেকে নিজকে বাঁচাতে পেরেছিল।

জাপানী চরিত্রের যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য জাপান রাতারাতি বিশ্বের একটি প্রধান শক্তি হিসাবে পরিগণিত হতে পেরেছিল, তা হচ্ছে চরিত্রের চলতা-শক্তির বৈষয়িক দিক; সেই দিকটি আলোচনা করবার পূর্বে 'বুশীদো', সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।

'বুশীদো' হচ্ছে জাপানের সামরিকতার ঐতিহ্য। কেবল সাহসিকতা বললেই এর অর্থ বোঝানো হয় না; ইয়োরোপের নাইটের সঙ্গে তুলনা করলেও এর মর্ম বুঝতে পারা যায় না। বুশীদো হচ্ছে সঙ্কল্পে অটুট, সঙ্কল্পে উৎসর্গীকৃত সৈনিক। এই সৈনিককে জাপানে বলে 'সামুরাই'। বুশীদো হচ্ছে তাদের নীতি। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই নয় জীবনের সর্বসময়ে তাদের এই নীতি পালন করতে হয়। এই নীতি লিখিত নয়, মুখে মুখে এই নীতি শিক্ষা করতে হয়। কোন্ সময়ে এই নীতির সৃষ্টি হয়েছিল কেউ বলতে পারে না। যুগ যুগ ধ'রে এই নীতি প্রতিপালিত হয়ে আসছে সামুরাইদের মধ্যে।

দ্বাদশ শতকের পূর্ব থেকেই এই নীতির সন্ধান পাওয়া যায়। মনে

হয় সামন্ততন্ত্রের এটি যমজ। রণব্যবসায়ীদেরই বলা হয় সামুরাই। যুদ্ধ করাই এদের বৃত্তি। সমাজে এরা বিশেষ সুবিধা ভোগের অধিকারী। সুবিধা ভোগ করবেই বা না কেন? তারা কেবল সমাজের ফুলের মতোই নয়, তারা শিকড়ও বটে (What Japan was she owed to the Samurai. They were not only the flower of the nation, but its root as well. page 159,—Bushido the soul of Japan—Inazo Nitobe, G. P. Putnam's Sons, New York and London 1905)। তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সমগ্র সমাজে সঞ্চারিত হয়। নানা প্রকারে তারা চরিত্র-শক্তিতে নিজদের গোষ্ঠী থেকে সাধারণ লোকস্তরে চারিত্রিক দৃঢ়তার আলোক বিচ্ছুরিতা করে, (In manifold ways has Bushido filtered down from the social class where it is originated, and acted as leaven among the masses, furnishing a moral standard for the whole people.—Bushido, page 163)।

বুশীদো-র নীতি এসেছে প্রধানত তিনটি ধর্মাদর্শ থেকে। প্রথম বৌদ্ধধর্মে পাওয়া গেল—অদৃষ্টে বিশ্বাস, এবং নিয়তির কাছে নির্বাকভাবে আত্মসমর্পণ; দুঃখ সুখে অবিচলিত থাকা। অস্ত্রশিক্ষা গুরু শিষ্যকে বলেন, "আমার এই শিক্ষা সমাপনের সঙ্গে সুরু হোক তোমার ধ্যানের শিক্ষা", (ধ্যানকে জাপানী ভাষায় বলে জেন)। যেখানে ভাষা চলেনা সেখানে ধ্যান। সামুরাইয়ের সমস্ত শিক্ষার পিছনে থাকে এই একাগ্রচিন্তা।

বৌদ্ধধর্ম যেখানে আর কিছু দিল না, সেখানে এল শিন্টোধর্ম। শিন্টোধর্ম, মানুষের সহজাত পাপ-কে স্বীকার করে না। সে বলে প্রত্যেক মানুষেই ভালো আছে, তাকেই জাগাতে হবে। শিন্টো আর দিল গুরুজনে ভক্তি; তা থেকে সম্রাটে বা প্রভুতে ভক্তি। শিন্টোমন্দিরে ঐ দর্পণটি হচ্ছে হৃদয়ের প্রতীক যেন। মন্দিরে গিয়ে দেখে নাও তোমার মনটি, দেখে নাও শরীরটি। দেশভক্তি আর রাজভক্তি এইই হচ্ছে শিন্টোধর্মের ঐতিহ্য। এইজন্যই নিতোবে শিন্টোধর্মকে ধর্ম বলতে বলতে 'জাতির-আবেগ' নামে অভিহিত করেছেন, (This religion—or, is it not more correct to say, this race emotions which this religion expresed ?—thoroughly imbued Bushido with loyalty to the sovereign and love of country. Page 15)।

তারপর চারিত্রনীতিতে প্রভাব আনল কনফুসিয়াসের শিক্ষা। প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক প্রভৃতি ঐ যে তাঁর পঞ্চ সমাজ-নীতির বিধি—ঐ গুলি সামুরাইদের কর্তব্যকার্যে অটল থাকতে উৎসাহ দিল।

কনফুসিয়াসের পণ্ডিতদের সঙ্গে সামুরাইদের মেলে না। পণ্ডিতেরা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সামুরাই শিক্ষা-নীতি স্বাঙ্গীকরণ করে। তারা বলে পণ্ডিতের গায়ে পুস্তকের গন্ধ। শিক্ষা সামুরাইদের কাছে দুর্গন্ধযুক্ত সব্জীর মতো; ঐ সব্জী সিদ্ধ ক'রে ক'রে আহারের মতো ক'রে নিতে হবে। অর্থাৎ যে-শিক্ষা গ্রহণ না করা যায়—তা অব্যবহার্য শিক্ষা।

সামুরাই গোপন বা বক্রপথে কিছু করে না তা হচ্ছে বুশীদোর নীতি বিগর্হিত পন্থা। ন্যায়-বোধই এই চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে। "যুক্তি দিয়ে তোমার ন্যায়-নীতি স্থির করে নাও; অবিচলিত থাক সঙ্কল্পে; যখন মৃত্যু ন্যায় সম্মত হবে তখন মৃত্যু বরণ কর; যখন আঘাত করা ন্যায় হবে তখন আঘাত কর।" এই ন্যায় বোধই হচ্ছে দৃঢ়তার অস্থি, এর উপরই চরিত্র দাঁড়াতে পারে। এইজন্যই যখন সামন্তযুগের সুযোগ দেখা দিল তখন সঙ্কল্প-সিদ্ধ পুরুষকে (Gishi—a man of rectitude) সবাই শ্রদ্ধা করত, তাদের উপরই লোক ভরসা করত।

বুশীদো-র আর একটি শব্দ আছে গি-রি অর্থাৎ কর্তব্য। কর্তব্য আছে মাতা পিতার প্রতি, রাজার প্রতি। এই 'গিরি' শব্দটিতে 'প্রকৃতি যুক্তি'র দিক'ও নিহিত আছে। যু ক্তি দিয়ে কর্তব্য স্থির করতে হবে।

বুশীদো দিয়েছে সাহসিকতার শিক্ষা, পরোপকারের শিক্ষা। সামুরাই-দের কৃচ্ছ্রতাসাধনের যে শিক্ষা, যে অনমনীয় শৃঙ্খলা তার কাছে স্পার্টার শৃঙ্খলাও হার মানে।

কঠোর জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে তারা সৌজন্য শিক্ষা করে দুর্মদ হওয়ার শিক্ষা নেয়, নিষ্ঠার চর্চা করে।

বুশীদো পাঠ্যক্রমে আছে—প্রতি‹ক্ষ তৈরী করা, ধনুর্বিদ্যা, জিউজুৎসু, অশ্বারোহণ, হাতের লেখা, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য এবং ইতিহাস। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, এই পাঠ্যক্রমে অঙ্ক নেই। মনে হয় সামন্তদের যুদ্ধে আঙ্কিক যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন হ'ত না। তা ছাড়া সামুরাইদের শিক্ষায় সংখ্যাবিজ্ঞান একেবারেই অনুপস্থিত। শৌর্যবীর্য আয়-ব্যয়ের হিসাব কসে না; অর্থকে তারা উপেক্ষা করে। অর্থ যে কি ক'রে জমাতে হয়, কি করে

উপার্জন করতে হয় সে শিক্ষা সামুরাইদের ঘৃণার বিষয়। নাগরিকদের অর্থপ্রীতি এবং সৈনিকদের মৃত্যু-ভীতি তাদের কাছে সমান নিন্দনীয়। অর্থ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবেন সমাজ কল্যাণকামীরা আর তা নিয়ে হিসাব কসবে নিম্নতম লোক—এই হচ্ছে জাপানের সমাজ আদর্শ। এইভাবে টাকা এবং অর্থপ্রীতি বুশীদো-র শিক্ষায় বিবর্জিত হওয়ায় সামুরাইরা দুর্নীতি গ্রস্ত কখনও হয়নি, (Money and the love of it being thus diligently ignored, Bushido itself could long remain free from a thousand and one evils of which money is the root. Bushido, Page 99)। বোধহয় এই কারণেই স্পার্টা বা এথেন্সের শৃঙ্খলা থেকে বুশীদোর শিক্ষা অনেক উন্নত ছিল। স্পার্টাদেরও সামরিক শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখা গেছে, কিন্তু তার জন্ম হয়েছিল বহুমানুষকে প্রবঞ্চনা করবার ইচ্ছা থেকে; গৃধ্নু তাতেই তার জন্ম। সেইজন্য স্পার্টার শিক্ষার্থী এবং সৈনিক হয়ে পড়ল দুর্নীতি গ্রস্ত। কিন্তু জাপানের বুশীদো জন্ম নিয়েছে সেবাপরায়ণতা এবং সাহস শিক্ষণের জন্য। ধর্মের অন্ধসংস্কার নেই, আছে প্রজ্ঞার আলোক। সংবাদ বহুল জ্ঞান তারা অর্জন করেনি, প্রজ্ঞার আলোক চরিত্রকে গঠন করেছে।

বুশীদোর শিক্ষায় তিনটি নীতি বড—চি, জিন্, ইয়ু। অর্থাৎ প্রজ্ঞা, পরোপচিকীর্ষা এবং নৈতিক সাহস। সামুরাই শিক্ষার্থী হচ্ছে কর্মী বা কর্মনিরত ব্যক্তি। যে শিক্ষায় এই কর্মের দিক নেই, সে শিক্ষা তারা নেয়নি। ধর্ম এবং ধর্ম ব্যাখ্যা পুরোহিতদের; সামুরাই তার থেকে নিয়েছে এমন এক শক্তি যাতে নৈতিক সাহস অনুশীলিত হয়। দর্শন এবং সাহিত্য পড়েছে—চরিত্র সৃষ্টির সহায়ক হিসাবে, বিদ্যালয় শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে নয়।

ভালো হাতের লেখা তাদের দরকার। বিশ্বাস ছিল হাতের লেখায় মানুষের চরিত্র বোঝা যায়। এইজন্য ভালো লিখনের জন্য চেষ্টা ছিল তাদের অবিরাম। তাছাড়া জাপানী বর্ণমালা অনেকটা সৌন্দর্যের প্রতীক; তাই তাদের শিক্ষা মনোভাব গঠনেরও এইটি সহায়ক বটে। জিউজুৎসু দ্বারা তারা শারীর বিজ্ঞান অধ্যয়ন করত। এতো মল্লযুদ্ধ নয়, অস্ত্রযুদ্ধও নয়। পেশীর শক্তির উপর এই যুদ্ধ নির্ভর করে না। জানতে হবে মানবিক শরীরে কোন্‌টি দুর্বল স্থান। এই যুদ্ধে হত্যা করবার কথা নয়; কিন্তু এমন স্থানে আঘাত করতে হবে যাতে প্রতিপক্ষ সাময়িক ভাবে প্রত্যাঘাত করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। কাজেই শারীর বিজ্ঞানের জ্ঞান এই ব্যাপারে বিশেষ দরকার হ'ত।

যাই হোক্ বুশীদোর শিক্ষারীতিতে বুদ্ধি, চরিত্র, সৎ সাহস এবং আত্ম-সংযম প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত জোর দেওয়া হ'ত।

বুশীদোর আত্মসংযম প্রকাশ পেয়েছে হারাকিরি এবং কাতাকি-উচি প্রথার মধ্য দিয়ে। এই প্রথার মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠানও (সেপ্পুকু বা কাপ্পুকু) আছে। প্রথা হচ্ছে তলপেটে ছোট তরবারি বিঁধিয়ে বামপাশ থেকে ডান পাশে টেনে এনে মৃত্যু বরণ করা ; মরবার সময় সামনে ঝুঁকে পড়তে হবে। মুখে-চোখে বেদনার আভাস থাকবেনা, কোন ক্ষোভ থাকবে না। যদি আমি অপরাধ ক'রে থাকি তবে আমার আত্মাকে তোমার সামনে টেনে এনে দেখাচ্ছি, তুমি দেখে নাও সত্যি আমি দোষী কিনা। এইই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। ইংরেজি সাহিত্যে কেন, মানুষের আদিকালে বিশ্বাস ছিল উদরস্থ অন্ত্রের মধ্যেই আত্মা থাকে। তারপর বোধ হয় অন্তঃকরণে আত্মা বাসা নিল। যাই হোক এই বিশ্বাস থেকেই এই প্রথার সৃষ্টি। সামুরাইদের এই আত্মহত্যার শিক্ষা আত্মসংযমেরই একদিক। কখনও প্রভুর সঙ্গে মতান্তর হ'লে—সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটায় হারাকিরি ক'রে। এই প্রথা এমন সর্বনেশে যে এক সময় রাজারা স্থির করেছিলেন যাতে সামুরাইদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এমন ব্যবহার করতে। কারণ অমিতপরাক্রমশালী এমনি ক'রে আত্মবলি দেওয়ায় রাষ্ট্রের ক্ষতি হ'ত। এই আত্মবলিদান প্রথায় আটবছরের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সমান দক্ষ, সমান সংযমী। মিটফোর্ডের পুস্তকে (Tales of Old Japan) এই সব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে।

এই হারাকিরিকে পাশ্চাত্য জগৎ বর্বরোচিত ব'লে আখ্যা দিয়েছে। আবেগ দমন করবার যে চরিত্রশিক্ষা তার এটি আত্যন্তিক দিক বটে, কিন্তু প্রতিক্ষণ যে ভাবে আবেগ দমন ক'রে চলে সেই চরিত্র শিক্ষা জাপানের জাতীয় সম্পদ। এবং এই কারণেই বোধ হয় তাদের সমাজ-ব্যক্তি এক রোখা হ'য়ে অতিদ্রুত কাজ করতে পারে। তাদের সত্যই 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত-ভাবনা হীন।'

তরবারি হচ্ছে সামুরাইদের ক্ষমতা আর শৌর্যের প্রতীক। হারাকিরি-তেও আমরা তরবারির ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি।

পাঁচ বছর বয়সে শিশু সামুরাই পোষাক পরে 'গো'-খেলা নিয়ে সৈনিক শিক্ষা সুরু করে। খাঁটি তরবারি কোমরে ঢুকিয়ে তার শিক্ষা সুরু। তারপর দিন থেকে তাকে আর তরবারি ছাড়া বাড়ীর বাইরে দেখা যাবে না।

পনের বছর বয়সে সে সাবালক হ'ল। আর তখন থেকে এই তরবারির সাহায্যে তার দায়িত্ব আর মর্যাদা বোধ জাত হ'ল। দুটি ক'রে তরবারি রাজভক্তি আর মর্যাদার প্রতীক—ছোট আর বড। নাম শোতো আর দাইতো। এই তরবারি তার কখনও কাছ-ছাড়া হবে না। কিন্তু এর ব্যবহার বড় বিপজ্জনক। সামুরাইদের শিক্ষা ছিল এই জন্য এত কঠোর। ন্যায় নীতি না মেনে এর ব্যবহার করলে আত্মবলি দিতে হবে।

বুশীদো সম্পর্কে বহু কাহিনী রচিত হয়েছে, যেমন রাজপুত শৌর্য নিয়ে একসময় বাংলা দেশে হয়েছিল। কিন্তু বুশীদো সমগ্র জাপানের অধিবাসীর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তাদের শিক্ষা কখনও ব্যর্থ হয়নি, কারও ব্যবহারে ব্যতিক্রম দেখা যায় নি।

বর্তমানে হয়ত এই জলন্ত দুর্দম শৌর্যের আদর্শ নেই। কিন্তু দেশকে তারা গঠন করে গেছে, দিয়ে গেছে মনের কাঠামো। বর্তমান যুগের শিক্ষা সামুবাইদের শিক্ষাকে নাকচ করেছে। কিংবা এমন হবে যে, আর কোন দিক সমাজের কাঠামোকে আকৃষ্ট করেছে।

যাই হোক, একথা ঠিক স্পর্টাব শৃঙ্খলা-শিক্ষা ক্রটিহীন ছিলনা—তা লোপ পেয়েছে, বুশীদোর শিক্ষা ও শৃঙ্খলা কল্যাণপ্রদ তবু লোপ পেয়েছে। লোপ পেয়েছে অর্থ মানুষ এই শৃঙ্খলা আর চায় না; তার মনে আব আবেদন আনে না। কোন্ শৃঙ্খলা সে শিক্ষায় এবং জাতিব কল্যাণে-চায় তাব সন্ধানও সে পায়নি। কিন্তু অতীত যে আকাঙ্ক্ষার নয় তা বর্তমান যুগ বিস্মৃতির প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছে। বর্তমান শিক্ষাবিদদের তাই ভাবনার বিষয় চরিত্রশিক্ষা কাকে বলে, কাকেই বা বলে শৃঙ্খলাপরায়ণতা? রাষ্ট্র নায়কেরা নিজদেব অভিলাষমতো একরকম ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু শিক্ষাব্রতী তো রাষ্ট্র নায়ক নয়, তাকে নিজের চাহিদা বা অভিপ্রায অনুযায়ী দেশ গঠন করলে চলবে না। শাশ্বত মানুষের চিন্তাই যে তার।

আইনুদের মতবাদই তোক, শিন্টোধর্মই তোক, বৌদ্ধধর্ম বা বুশীদোর প্রভাবই হোক এগুলি যদি এমনি এমনি জাপানে এসে পডত, আর জীবনে মিশে যেত তবে জাপানীর চরিত্রে এতখানি গতি বৃদ্ধি করতে পারত না। জাপান সমাজের গতির কথা আমরা অনুধাবন করতে পরি যদি স্মরণ রাখি এক লহমায় কেমন ক'রে জাপান বাইরের দ্বার বন্ধ করে দিতে পারল, যদি মনে রাখি রাতারাতি শোগুন তাঁর ক্ষমতা মিকাডোকে প্রত্যর্পণ করলেন,

যদি মনে রাখি খৃষ্টধর্ম যেমন দ্রুত জাপানের সমাজে প্রবিষ্ট হল, তেমনি দ্রুত বিবর্জিত হ'ল।

এইসব ঘটনা রাজনীতির খেলা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমাজে শক্তি সুপ্ত থাকে, তাকে জাগানো বিশেষ লগ্নেই ঘটে যায় তাই কেবল নয়, বিশেষ ব্যক্তিরও অনুভব শক্তি দরকার। সামন্ত বা রাজাদের আমরা বহুভাবে ভর্ৎসনা ক'রে থাকি। কিন্তু তাদের দান-কে তো অস্বীকার করা যায় না। ভারতের 'সিপাহী-বিদ্রোহ' ঘটেছিল; ব্যর্থ হয়েছিল তাই সাধারণ লোকের মনে জাতির জন্ম মুহূর্ত সূচনা করেছিল।

একথা ছেড়ে দিলেও, আমাদের স্বীকার করতেই হবে সমাজের প্রতি স্তরে সমাজের এক এবং অব্যাহত বিকাশের শক্তিই উপস্থিত থাকে। কি না হ'লে কেমন হ'ত—সেকথা ভেবে তত লাভ নেই, যতটা ভাবতে হয় সমাজ কেমন ক'রে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। এই অভিজ্ঞতা যার যত বেশি সক্রিয় সে সমাজ তত বেশি গতিশীল। গতিধর্ম সন্ধান করবার পর আমাদেব দায়িত্ব থাকে—সেই গতি-শক্তি উত্তরপুরুষের মধ্যে কেমন ক'রে সঞ্চারিত হয়; অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষা একাধারে রক্ষণশীল এবং পরিবর্তনশীল। শিক্ষার দুটি ধর্ম সমন্বিত হয় কেমন ক'বে তা সমাজের দ্বন্দ্বমূলক ইতিহাসই বলে দিতে পারে।

জাপানেব ইতিহাস থেকে আমরা সেই দ্বন্দ্বের দিকই দেখতে চেষ্টা করব। সেজন্য আমাদের আবার একটু পিছিয়ে সুরু করতে হবে।

শোটোকু তাইশি ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে 'রিজেন্টের' পদে নিযুক্ত হলেন। বুদ্ধিমান রাষ্ট্রনায়ক শোটোকু।

তিনি অনুশাসনে প্রথম কথাই ঘোষণা করলেন, জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকাব আর অনুমোদিত হবেনা। ক্ষমতা বা যোগ্যতা থাকলে যে-কোন ব্যক্তি যে-কোন পদে নিযুক্ত হতে পারবে।

তাঁর সপ্তদশ অনুশাসনের দ্বিতীয় ধারায় দেখা যায়, সবাইকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম বরণ করতে হবে—এই অনুজ্ঞা। পঞ্চম ধারায়—সমাজের যে-কোন ব্যক্তিরই অভিযোগ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।

স্থানীয় নেতাদের আধিপত্য তিনি স্বীকার করলেন না। উৎপীড়ন ক'রে কর আদায় করা চলবেনা ব'লেও তাঁর আদেশ জারী হ'ল।

এই অনুশাসন থেকে সমাজের চরিত্র বোঝা খুব কঠিন নয়। সমাজে

হয়ত 'আভিজাত্য' সূত্রপাত হচ্ছিল। সাধারণ লোকের কথায় কর্ণপাত করতেন না রাজপুরুষেরা। সাধারণকে বঞ্চনা ক'রে সুখ সম্ভোগ করবার রেওয়াজ বোধ হয় চালু হয়ে পড়েছিল। সমাজের প্রধানদের চেষ্টায় জাপান যেন ভাগ হয়ে পড়ছে।

শোটোকু তাই ভূমি এবং মানুষের উপর একমাত্র অধিকার যে সম্রাটের আর কারও নয়—সেই কথাই জারী করতে চাইলেন।

অসুবিধা দেখা গেল জন্মসূত্র প্রাপ্ত অধিকার কেড়ে নেওয়াতে। বহুযুগ থেকে পরিবার-নিয়ন্ত্রিত সমাজ বিশেষ ক'রে এশিয়ার সমাজে এই ধারণা চলে আসছে। সমাজের সাধারণ মানুষ যে উৎপীড়িত হয়ে এই প্রথা পরিবর্তন না করতে চায়—তা নয়। কিন্তু প্রাচীন অভ্যাস সমাজ-শরীরের একটি প্রত্যঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রথার সঙ্গে জোর পড়ল সমাজ প্রধান বা নেতাদের সম্পদ কর্ষণের একটি অভিনব অভিপ্রায়।

দ্বিতীয় বিরোধ আসছে সম্রাটের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে। শোটোকু একদিক দিয়ে পরিবার-প্রথা বজায় রাখতে চান, অন্যদিকে পরিবার-তন্ত্রের সমাজ প্রাপ্ত মর্যাদাকে নষ্ট ক'রে দিয়ে লব্ধ মর্যাদার অনুমোদন করতে চান।

তাই বোধ হয় তাঁর সংস্কার স্থায়ী হল না।

রাজা নাকা-নো-ওয়ে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে নতুন তারিখমালা প্রবর্তন করলেন। জাপানের 'তাইকা' সুরু হল ৬৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে। শোটোকু চীনের তাঙ্ রাজাদের অনুসরণে যে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন—তাও বরবাদ ক'রে ঐ সাল থেকেই স্থানীয় নেতাদের অধিকার স্বীকার ক'রে নিলেন। স্থানীয় নেতাদের শাসন এলেকা ভাগ ক'রে দেওয়া হল দুই উপায়ে—কুণি (প্রদেশ) এবং কোরি বা গুন (পরগণা)। শাসকেরা সম্রাট কর্তৃকই নিযুক্ত হতেন।

কেন্দ্রীয় শাসকের নিয়ন্ত্রণে স্থাপিত হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দাইগাকু (বিশ্ববিদ্যালয়) এবং প্রাদেশিক শাসকের নিয়ন্ত্রণে—কলেজ বা কোকুগাকু। এখানে রাজপুরুষেরাই শিক্ষার অধিকার পেল। যিনি দাইগাকুর পাঠ শেষ ক'রে চাকরীর উপযোগী যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন তিনি প্রশাসনিক বিভাগে নিযুক্ত হতেন।

সাধারণ লোকে দারিদ্রে ক্লিষ্ট অথচ এই রাজপুরুষেরা সুবিধার পর সুবিধা ভোগ ক'রে যাচ্ছেন। ভূমির অধিকারী তো তাঁরা হতেনই, উপরন্তু

তাঁদের পুত্রেরা দাইগাকু বা বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়েও চাকরী পেত। অভিজাততন্ত্র এই ভাবে বিধিবদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তাই ব'লে শোটোকুর বিশ্লেষণ যে স্বপ্ন তা মনে করা যায় না। শোটোকু বাধা পেলেন, কিন্তু তাঁর সংস্কার যে সমাজ-দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে তা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে গেল। সমাজে দ্বন্দ্ব এইভাবে সুরু হল। অর্থাৎ জাপানের সমাজ জটিলতার পথে পা বাড়িয়ে দিল। 'জটিলতার পথে' এইজন্যই বলতে হচ্ছে যে, পুরনো-সমাজের চালচলনের যে-সব প্রথা (institutions) গঠিত হয়ে গিয়েছিল, তাব থেকে সমাজ সরে আসতে চায়। কথা-কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে পবিবার কর্তা তথা রাষ্ট্রেব নায়ক সুবিধা ভোগ করছিলেন, ঐ উপায়েই গ্রাম বা অঞ্চল প্রধানেবাও সুযোগ সুবিধা ভোগ কবছেন। কিন্তু ঐ সঙ্গে সমাজ-ব্যক্তির যে-সব অত্যাবশ্যক চাহিদা ও যোগান, কিংবা তাদেব স্বাধীনতাব 'প্রথা' টি অবলুপ্ত হ'তে চলেছে। এ অবস্থায় সমাজ টিকতে পাবে না। শোটোকু কথা-কাহিনী নির্ভব প্রথা থেকে সবে এসে আইন-নির্ভব প্রথাব প্রবর্তন করতে চাইলেন। শোটোকু ব্যর্থ হলেন, কিন্তু ঐটিই ঐ যুগেব স্বভাব। তাই তাঁব বিবোধীপক্ষ ঐ পথে অগ্রসব হয়ে সমাজ সংগঠনেব দিকে মন দিলেন। কিন্তু এখানে 'বঞ্চনার' দিকটি প্রবল হওয়ায় প্রয়োজন পডবে নতুন প্রথাকে চালু কবা। এই নতুন প্রথা আসতে পারে যদি আব-একটি নতুন ধর্মমত এবং তৎসহ রাজানুশাসন আবিষ্কাব কবা যায়। কেবল তাতেই হযত চলবে ন সমাজ-কর্মেব কেন্দ্রস্থ বস্তু-কে যদি পরিবর্তিত কবা যায়। কাবিগর, বণিক এবং বুদ্ধিজীবীদের নতুন পরিবেশে যদি আনতে পাবা যায় তবেই সমাজের মধ্যমণি সেই বস্তু ও তাকে আশ্রয় ক'রে চিন্তারীতির পবিবর্তন ঘটানো যেতে পারে। চিন্তারীতিব এমনি পবিবর্তন ঘটলেই মানুষের সামাজিক সম্পর্কের যে-পবিবর্তন আসছে তা গ্রহণ করা সহজ হবে।

হয়ত এই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েই সমাজ ব্যক্তিবর্গ সব সময় পরিবর্তন আনে না। কিন্তু সমাজে যখন পরিবর্তন দেখা দেয়, অন্য সমাজের সংস্পর্শে এসে যখন পরিবর্তন এসেই পড়ে, তখন এমনি পরিবর্তন-মেলা মালাবদ্ধ হয়ে অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। জাপানেরও তাই হ'ল।

এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নগর পরিকল্পনা। রাজধানীকে কেন্দ্র ক'রে এই নগর সভ্যতা গড়ে উঠল।

৭১০ খৃষ্টাব্দে নারা-তে রাজধানী তৈরী হল। তাঙ্ রাজাদের অনুকরণেই এই রাজধানীর পরিকল্পনা। রাজধানী নারা-কে কেন্দ্র ক'রে সভ্যতা সুরু হ'ল ব'লে একে বলা হয় নারা যুগ। এর আগে ইয়ামাতো প্রদেশের আসুক (নারা-র ১৫ মাইল দক্ষিণে) নগরীই ছিল জাপানের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের কেন্দ্রস্থল। কিন্তু আসুক ছিল স্বভাবজ, তার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিলনা, আর নারা হ'ল উদ্দেশ্য-নিয়ন্ত্রিত।

নারা নগরী নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পূর্বে বিনিময় প্রথার সময়ে বিশেষ কাল ব্যবধানে গ্রামে গ্রামে বাজার বসত। এখন এখানে রাজকীয় বাজার (প্রতিদিনেব জন্য) স্থাপিত হল। কিছুদিন এখানে বিনিময় প্রথাই ছিল। কিন্তু তারপরই চীনেব অনুকরণে মুদ্রা প্রথা চালু হয়।

সামরিক দিক দিয়েও এই রাজধানী-নির্মাণ পরিবর্তন এনেছে। উপজাতিরা সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করল (এদেব মধ্যে হেযাতো এবং আইনুদের পূর্বপুরুষ ইজো জাতি অন্যতম)। জাপানেব ইতিহাসে এটি বড ঘটনা।

দেশের প্রাথমিক গোষ্ঠী (Primary Group) বৃহত্তর গোষ্ঠীব (Secondary Group) সঙ্গে মিশ্রিত হল।

কিন্তু বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে গোষ্ঠী ঐক্য আসতে পাবে না। কারণ তাব মধ্যে এখন তিনটি শাখা-গোষ্ঠী পাচ্ছি। গ্রামিক গোষ্ঠী, নগর-গোষ্ঠী এবং এই নতুন অপেক্ষাকৃত অনগ্রসব অবদমিত গোষ্ঠী।

এই গোষ্ঠীভেদ নিয়ে এক-রাষ্ট্র চলতে পাবে না। সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বা সমাজ-চেতনায ঐক্য আনবাব জন্য প্রচেষ্টা থাকবে সম্রাটের। আর সেই জন্যই প্রয়োজন প্রতিষ্ঠান-গত শিক্ষার।

জাপানেব পক্ষে এই প্রতিষ্ঠান-গত শিক্ষাব উপকারিতা বুঝতে খুব প্রচেষ্টার দরকার হয়নি। শোটোকুর কালেই দেখা যায চীনের অনুরূপ ইস্কুল প্রতিষ্ঠার দিকে জাপানের রাষ্ট্রনায়কদের ঝোঁক। বৌদ্ধধর্মই কেবল শোটোকু বরণ করেন নি, তাঙ-যুগের শিক্ষা দীক্ষাও।

জাপানের বৌদ্ধভিক্ষুবা চীনে গিয়ে শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে আসতে লাগল। এই বৌদ্ধপণ্ডিতেরাই তাইকু সংস্কার করতে সাহায্য করেছিল। চীনের সুই আমল থেকে তাঙ আমল পর্যন্ত অব্যাহত ধারায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি এদেশে

আসতে লাগল ; মঠ মন্দির নির্মিত হল, জাপানের স্থাপত্য কার্যে গৃহনির্মাণেও পরিবর্তন দেখা গেল।

চীন থেকে শিক্ষিত হয়ে আসতে হলে তখন মৃত্যু বরণ ক'রে যেতে হত। নানারূপ সমুদ্র বিপযয়, জাহাজ দুর্ঘটনা সেকালে নিয়মিতই ছিল। কাজেই বৌদ্ধভিক্ষুদের শিক্ষায় এই আগ্রহ সত্যিই প্রশংসনীয়। অবশ্য একথা সত্য যে, এই মৃত্যুবরণ করবার সঙ্কল্প নতুন ধর্ম-প্রচারের আগ্রহ থেকেই জাত হয়েছিল। কিন্তু সেকথা ধরতে গেলে কোন দেশের কোন কালের শিক্ষাকেই সমাদর করা যায় না। যে-কোন নতুন শিক্ষার মূলেই আছে কিছু একটা প্রাপ্তি,—তা সে আধ্যাত্মিকই হোক আর পার্থিবই হোক।

এই ভিক্ষুদের মধ্যে নাম করতে হয় গঞ্জিন বা চিয়েন-চিনের। কত চেষ্টা ক'রে কত বিপদ বরণ ক'রে যে তাঁকে জাপানে আসতে হয়েছিল তার আর ইয়ত্তা নেই। তিনি এদেশে এসে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে মন দিলেন। এইরূপ একদল ধর্মপ্রচারক আসেন ৭২৮ খৃষ্টাব্দে বোক্কাই রাজ্য থেকে। এই রাজ্য কোরিয়ার উত্তরস্থ বর্তমান মাঞ্চুরিয়ার অন্তর্গত। দশম শতক পর্যন্ত এই স্থানের সঙ্গে জাপানের শিক্ষা ও ধর্মের দিক দিয়ে যোগাযোগ ছিল।

সপ্তম-অষ্টম শতকে পূর্ব রোম, পারস্য, ভারত এবং মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি ও শিক্ষা জাপানে আসতে সুরু করে। কেবল সংস্কৃতি আর সাহিত্যই নয়, সঙ্গীতও। সঙ্গীতের আমদানী হয় সিল্লা, পাইকচে, কোকুলি, কোককাই ও ভারত থেকে।

বিদেশী প্রভাব যদি জাপানে আসে তবে জাপানের আপনার বলতে কিছু থাকে না। কিন্তু কোন সংস্কৃতি-প্রভাবই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরোধী হয়ে আসতে পারে না। জাপানেও যা এল তা জাপানের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে মিশে যেতে বাধ্য হল। এই বিদেশী সঙ্গীতের বেলাতেও তাই হল। এদের সঙ্গে জাপানের নিজস্ব সঙ্গীতধর্ম মিশে গিয়ে জাপানেরই মার্গ সঙ্গীত, গগকুর আবির্ভাব ঘটে।

চীনের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতার দরুণই জাপান চীনের ভাব লিপি (Ideograph) গ্রহণ করল। এই লিপির আবির্ভাব জাপানের প্রচলিত সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তুলল। কারণ, জাপানের কবিতা সাহিত্য আত্ম-প্রকাশ করতে পারল। পূর্বকাল থেকে মুখে মুখে যেসব গান চলে আসছিল সেগুলি বড় বড় কবিতার আকারে (chọka) প্রকাশ পেল, অথবা দীর্ঘ-

'অক্ষর' সমান্বিত (৩১টি অক্ষব) ছোট কবিতার (tanka বা waka)। নারা যুগে প্রায় ৪৫০০ এইরকম কবিতা সংগৃহীত হয়; নাম হ'ল মান-ইয়োশ্। সমস্ত সম্প্রদায়ের অর্থাৎ রাজা থেকে কৃষকের লেখা পযন্ত এতে স্থান পেয়েছিল। এই কবিতাব মধ্যে মানুষের শাশ্বত আবেগের দিকটিই প্রধান। সামান্য বিদেশী লিপি এই দেশের জাতীয়তা সৃষ্টি করতে কতথানি সাহায্য করেছিল, অনুমান করা যায়। আর এটি সম্ভব হল যেহেতু জাপান জাতীয় সম্পদকে আঁকড়িয়ে ধরতেই চায় বলে। জাপানের সমাজের এইটিই বৈশিষ্ট্য যে জগতের যে বস্তু বা আবিষ্ক্রিয়ার সম্মুখীন সে হয়েছে, তাকেই নিজের কাজে লাগিয়েছে। একে আত্মসাৎ করা বলা যেতে পারে, বলা যেতে পারে স্বাঙ্গীকরণ।

একথাও স্বীকার করতে হবে, এখনও এই সংস্কৃতি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি; শুধু রাজপুরুষ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মন্দিরের পুবোহিতদের জন্যই এই শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চা। যখন সম্ভ্রান্তবর্গ রাজধানীতে বাস ক'বে নানা রূপ বিলাসদ্রব্য ও এই নব্যসংস্কৃতির চচা করছেন তখনও গাঁয়েব কৃষকেরা দুবেলা আহার কর্চ্ছে 'শি' গাছের পাতায় করে। অর্থাৎ শিক্ষা যে সর্বসাধারণের নয় সে-কথা বোঝা যায়। কিন্তু সে যুগেব তো এই-ই ধর্ম।

আমরা জানি নারা যুগ থেকেই অভিজাততন্ত্রেব উদ্ভব। সম্রাট কাম্মুর (৭৩২-৮০৬) সময়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হল বর্তমান কিয়োটোর অন্তর্গত হেইয়ানে। এই রাজধানীকে ঘিরে হেইয়ান সভ্যতা সুরু হল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে টোকিওতে স্থানান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জাপানীব রাজধানী হেইয়ানেই ছিল।

হেইয়ানে রাজধানী আসায় জাপানের সমাজ-গতি বেড়ে গেল। নতুন জাপান তৈরীর পথ উন্মুক্ত হয়ে গেল। পুরনো সমাজ যেন এইকালে শীর্ষ বিন্দুতে পৌছে গেল। সেই কারণটিই বলছি।

ফুজিওয়ারা বংশের মেয়েরা সম্রাজ্ঞীর পদে নির্বাচিত হতে সুরু করলেন। আর তাই থেকেই ফুজিওয়ারা বংশের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। ৯ম শতক থেকে ফুজিওয়ারা বংশের লোকই কাম্পাকু বা প্রধান মন্ত্রী—পদের অধিকার পেলেন। এই বংশের অভিলাষমতোই শাসনপদ্ধতি নির্ধারিত হ'তে থাকে। মর্যাদা এল তাঁদের উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁরাই জাপানের ভাগ্যবিধাতা।

অতএব সমগ্রভূমির মালিকানা খাস ক'রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে এনে

জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করার যে সঙ্কল্প পূর্বে করা হয়েছিল তা একেবারে তিরোহিত হ'ল। পুরোহিত এবং অভিজাতবর্গ এই ন্যায়ে সমস্ত জমি কুক্ষিগত করে ফেলল। এমন কি রাজস্বও (যা সম্রাটের প্রাপ্য) এই ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভূস্বামীদের এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে 'শোয়েন' বলা হতে থাকে (অনেকটা ইয়োরোপের ম্যানর এর মতো)। ফলে সম্রাটের রাজস্ব কমে গেল আর ভূস্বামীদের সম্পত্তি বেড়ে গেল।

আমাদের দেশের জমিদারদের মতো শোয়েনের স্বামীরা দেশে থাকতেন না। তাদের সম্পত্তি তদারক করতেন 'শোকন'। 'শোকোন' যেসব কৃষকের সাহায্যে এইসব রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের বলা হ'ত শোমিন। বুশী বা সামরিক পরিবার এই শোকন থেকেই জাত। দশম একাদশ শতক পর্যন্ত ফুজিয়ারা প্রভাব চলল।

এদিকে ৯ম শতকে চীনে তাঙের গৌরব ম্লান হওয়ায় সেখানে আর ছাত্র পাঠানোর রেওয়াজ থাকলনা। এরপরই বোক্কাই রাজ্যের পতন ঘটে।

পূর্বে চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম আসত তা এখানে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থাতেই শিকড় গাড়ত; কিন্তু এইবার সাইচো এবং কুকাইয়ের প্রচেষ্টায় এই ধর্মের আমূল পরিবর্তন ঘটে আর প্রচারিত হয়। এই নতুন ধর্ম অনেকটা গূঢ়। গূঢ় বৌদ্ধধর্মে সামন্তেরা বিলাস ব্যসনের প্রশ্রয় পেল। এইজন্য তারা মহা উৎসাহে নবধর্মের ভক্ত হয়ে পড়ে। তারই ফলে অমিদবুদ্ধ (আমিতাভ) এবং বোধিসত্ত্ব জাপানে পূজো পেতে স্বরু করেন।

চীনের লিপি পরিবর্তিত হয়ে নতুন লিপি দেখা দিল হিরাগানা আর কাতাকানা। ভাবলিপি থেকে ধ্বনিলিপির এই উত্তরণ জাপানী সাহিত্যের নবযুগের সূচনা করে।

৫০টি অক্ষরে (Syllables) সীমাবদ্ধ এই লিপি চীনের কাঞ্জি সহস্রলিপি থেকে জাপানকে মুক্তি দিল। জাপানের সাহিত্য তাই এই যুগকে (দশম একাদশ শতক) স্বর্ণযুগ বলা হয়। বর্তমানে বর্ণসংখ্যা—হিরা-১০৮; কাতা-১০৮ এবং কাঞ্জি-১৮৫০ টি।

এল গদ্যসাহিত্য। প্রথম লক্ষণ গল্প (মোনোগাতারি)। একজন মহিলা (মুরাসাকি শিকিবু ৯৭৫-১০৩১) হাত থেকে গেঞ্জি মোনোগাতারি বা গেঞ্জির গল্প তৎকালের অভিজাত সমাজের একটি বাস্তব উপন্যাস।

হস্তলিপির উৎকর্ষের কথাও এই যুগেই জানা যায়। 'কানা' লেখার নানা

বৈচিত্র্যসাধন হয়। এই বিশেষ হস্তলিপির প্রবর্তক বোধ হয় ফুজিয়ারা নো সারি (৯৪৪-৯৯৮) এবং ফুজিয়ারা নো কোজেই (৯৭২-১০২৭)।

এই যুগেও সাহিত্য ও সংস্কৃতি জনসাধারণের জন্য নয়। তবে এখন থেকে জাপানের নিজস্ব সংস্কৃতি হিসাবে এইযুগ জাপানের এক আদর্শ তুলে ধরল। একথাও উল্লেখ করতে হবে যে, লিপির সংস্কার করবার ইচ্ছা সুবিধা অসুবিধা বোধ থেকে জাত হলেও, এই সুবিধা অসুবিধা বোধ আসে প্রকাশের পরিধি থেকে। কত বেশি লোকের কাছে নিজকে প্রকাশ করা যায়, কত সহজে অপরে এই রচনা বা সংকেত বুঝতে পারে সেই সম্পর্কে যে ভাবনা জন্মে তাই-ই সংস্কারের প্রেরণা। যদিও সাহিত্য চর্চা মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তারা মুষ্টিমেয়ই থাকতে চায় না। গোষ্ঠী গঠনের সেই মানসিক দিকই মানুষকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যায় বা শিক্ষা দীক্ষা ব্যাপক করে। শিক্ষার বস্তু এবং সমাজের অভিজ্ঞতা যত বৃদ্ধি পাবে ততই শিক্ষাকে সংগঠিত করতে ইচ্ছা যায়। সংগঠিত শিক্ষাই রূপ দেয় প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষা ব্যবস্থার বা ইস্কুল ব্যবস্থার। এই জন্যই ইস্কুলের ইতিহাসের সঙ্গে সমাজের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতি জড়িয়ে থাকে।

ভূমিব্যবস্থায় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই যুগে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিল। ফুজিওয়ারা পরিবারের হাত থেকে শাসনভার শোকনদের হাতে চলে এল। অনুপস্থিত ভূস্বামীদের মালিকানাস্বত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া খুব একটা কঠিন ছিল না। শোকন এবং তাদেব পোষ্য ভৃত্যবর্গ উভয়ে মিলে এমন একটা দৃঢ় ক্ষমতা আয়ত্ত করল যে স্থানীয় ফুজিওয়ারা বিদায় নিতে বাধ্য তো হলই, উপরন্তু অন্যান্য সামন্তও তাদের সঙ্গে হাত মিলাল। এই শক্তি অর্জন তারা করে দস্তুরমতো সামরিক শিক্ষায়। সম্রাট এই সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত শোকনদের হাতের মুঠোয় এসে গেলেন। অন্তর্বিদ্রোহ যা এসময় ঘটে তা দমন করতে বুশী বা সামরিক শিক্ষণ প্রাপ্ত এই শোকন সৈন্যদেরই একান্ত সাহায্য নিতে হয়।

সম্রাটের এই দুর্বল মুহূর্তে দুটি সামরিক পরিবার প্রাধান্য অর্জন করে। পূর্বাঞ্চলের গেঞ্জিরা বা মিনামোতো এবং পশ্চিমাঞ্চলের হেইকে বা তাইরো।

দ্বাদশ শতকে বিদ্রোহদমনে সম্রাটকে সাহায্য করায় তাইরোরা কিয়োটোর স্বৈর-শাসক হিসাবে অভিহিত হন। চুসঞ্জির বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র ক'রে তাদের উৎসাহে কিয়োটোর নতুন সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

তাইরোদের প্রতিপত্তিই তাদের সর্বনাশের মূল কারণ। তারা সামরিক চর্চা ভুলে গিয়ে অভিজাতদের মতো বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। বিশবছরের মধ্যেই পূর্বাঞ্চলের মিনামোতোরা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে দেয়। মিনামোতোর নেতা ছিলেন যোরিতোমো (১১৪৭-১১৯৯)।

যোরিতোমো তাইরোদের ত্রুটি থেকে বুঝেছিলেন, নতুন এই গোষ্ঠীকে বাঁচতে হলে চরিত্রগঠন সুদৃঢ় ভাবে করতে হবে। তিনি তাই বুশী চরিত্র গঠনে বিশেষ মনোযোগ দিলেন। বুশীদো সম্পর্কে আমরা পূর্বে বলেছি।

সাগামি প্রদেশের কামাকুরাতে যোরিতোমো তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রশাসনিক বিভাগে দুটি পরিবর্তন আনলেন। প্রধান প্রাদেশিক শাসক শুগো এবং প্রধান ভূমি সচিব জিতো। এই ব্যবস্থা কিয়োতোর সম্রাট কর্তৃক অনুমোদিত হল। এইভাবে ধরতে গেলে সমগ্র রাজ্যের শাসন কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই এল। ১১৯২তে তিনি সেই-ই-তাইশোগুন বা প্রধান সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হ'ন। এই সময় থেকেই বাকুফু বা শোগুন শাসন প্রবর্তিত হয়। প্রায় ৭০০ বছর ধরে জাপানে এই নিয়ম চালু ছিল। কামাকুরার শোগুন অবিলম্বে কিয়োতোর সম্রাট অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েন।

এইযুগে অভিজাতদের সংস্কৃতি ছাড়াও এক নতুন সামরিক-ঐতিহ্য রূপ নেয়। সাহিত্যে ও শিল্পে এর প্রচুর সাক্ষ্য মেলে। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে 'শিন-কোকিন-ওয়াকাশূ' কবিতা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এই কবিতাবলীতে একটি লক্ষণ প্রকাশ পেল এই যে, কবিতার বিষয়বস্তুকে নিসর্গদৃশ্যের প্রতীকতা অপসারিত করে। কবিতার এ এক নতুন রীতি। প্রকৃতি সম্পর্কে পুরোহিত সাইগিযো (Saigyo 1118 1190) অনেক কবিতা লিখে খ্যাতি পান। আর একজন বিখ্যাত কবি, যোরিতোমোর পুত্র শোগুন সানেতোমো। সামরিকতার পৃষ্ঠপোষণা ব'লে গদ্যসাহিত্যে এক দৃপ্তভঙ্গি। অবশ্য তাইরোদের পতন এবং অন্যান্য যুদ্ধের গল্পই বেশি।

যারা পরাভূত হল, তারা যে নিশ্চিন্ত ছিল তা কিন্তু নয়। দেশে অশান্তি লেগেই থাকল। জীবনযাত্রা অনিশ্চিত। কাজেই লোকে ক্রমশ ধর্মাশ্রয়ী হতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের তেনদাই (Tendai) এবং শিনগন (Shingon) মত তো অভিজাতদের জন্য। তার কত ক্রিয়ানুষ্ঠান, কত

ব্যয়বহুল। সুতরাং বাস্তব-সম্পর্ক এসে ক্রিয়াকর্মের নানাবিধ আতিশয্য বর্জন করে নতুন নতুন বৌদ্ধমত উদিত হতে থাকে।

ভিক্ষু হোনেন (১১৩৩-১২১২) ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে যোদো বৌদ্ধধর্মমত প্রবর্তন করলেন। প্রচার করলেন, "মূর্খ দরিদ্র সবাই অমিতাভকে পূজা করে স্বর্গে যেতে পারে।" হোনেন ধনীদের দরজা থেকে ধর্মকে ছিনিয়ে এনে দরিদ্রদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। তাঁর শিষ্য শিনরান (১১৭৩-১২৬২) এই ধর্ম কান্তোভূমির কৃষকদের মধ্যে প্রচার করেন। তিনি গার্হস্থ্যধর্মের সঙ্গে ধর্ম ক্রিয়া উদযাপনে যে বিরোধ নেই সেই মত প্রতিষ্ঠা করেন। গৃহস্থদের পক্ষে, বিবাহিত জীবনের পক্ষে এইটি চরম আশার কথা।

আমাদের দেশের চৈতন্যদেবের মতো 'নামমন্ত্র' বৌদ্ধধর্মে প্রতিষ্ঠা করলেন নিচিরেন (১২২২-১২৮২)। একে বলে হোক্কেশু শাখা। হোক্কের নাম ক'রে প্রার্থনা করলেই নির্বাণ লাভ হয়। ধর্মচর্চা আরও সরল হয়ে গেল। অর্থাৎ জনসাধারণের দিকে এগিয়ে আসা এযুগের ধর্মান্দোলনের মুখ্য নীতি।

যে কারণেই হোক সমাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মনীতি সমাজের যেন অত্যন্ত আপনার। ধর্মনীতির প্রধান গুণ হ'ল, রাজনীতিকে পাশ কাটিয়ে সে মানুষের মধ্যে একতার সৃষ্টি করে। জনসাধারণ এমনি ক'রে ঐক্যমন্ত্রে উজ্জীবিত হতে চেষ্টা করছে।

শোগুনের বিরুদ্ধে সম্রাট দুবার অভিযান করেন। প্রথমবার সম্রাট গোতোবা ১২২১ খৃষ্টাব্দে; এ অভিযান ব্যর্থ হল। দ্বিতীয়বার ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে গোদাইগো। এই অভিযানে কামাকুরায় শোগুন-আধিপত্য বিনষ্ট হল বটে, কিন্তু সামরিক শাসনের অবসান ঘটল না। শুধু শোগুনের পরিবর্তন ঘটল। দেশে বিক্ষোভ থেকে গেল। বুশীরা বিশেষ ক'রে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

আশিকাগা তাকাউজি সম্রাটকে সাহায্য করেছিলেন। সর্বাগ্রে তিনিই দেশের অসন্তোষের কারণ বুঝতে পারলেন। তিনি সুযোগ বুঝে ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অন্য এক ব্যক্তিকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করে নিজে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে শোগুনের পদ অধিকার করে নতুন বাকুফু প্রতিষ্ঠা করেন।

১৪৬৭ খৃষ্টাব্দে ওনিনের অন্তর্যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধের প্রধান পরিবর্তন দেখা দিল শোগুনের আধিপত্য। যত্রতত্র ভূস্বামীরা প্রবল হয়ে উঠল।

এই ভূস্বামীরা হলেন দাইমিয়ো। ওনিনের যুদ্ধের পর দাইমিয়োরাই প্রদেশের সেনাবিভাগ এবং করবিভাগ হস্তগত করেন। জিতো আর শুগো ব্যবস্থার প্রায় বিলুপ্তি ঘটল।

পূর্বে কিয়োটোই ছিল সংস্কৃতি ও শিল্পের কেন্দ্রস্থল। এখন দাইমিয়োরা নিজ নিজ এলেকায় সহর তৈরী ক'রে কারিগরদের বসিয়ে নতুন যুগের সূচনা করলেন। ইয়ামাগুচি সহরটির খ্যাতি এই দিক দিয়ে বেড়ে গেল। কিন্তু দেশের ঐক্যও ভেঙে গেল।

দাইমিয়োদের যে অত্যাচার উৎপীড়ন কম ছিল তা নয়। কয়েকবার কৃষক বিদ্রোহ ঘটে গেল। ইয়ামাশিয়োর (১৪৮৯) কৃষকবিদ্রোহ তার মধ্যে অন্যতম। কিছুদিন বুশী-দের প্রভাব কেটে গিয়ে কৃষকদের আধিপত্য এলেও খুব কাযকরী হল না। দেশ আবার সামন্তদের হাতে চলে গেল।

হেইয়ান যুগ থেকে শিল্প কারখানায় এবং কৃষিকাজে দেশ অগ্রসর হতে থাকে। বছরে দুটো ফসল, চায়ের চাষ, তুলার চাষ সবই দেখা গেল। আর এল খনির কাজ—সোনা, রূপা, তামা।

এইবার দেখা গেল নানারূপ সঙ্ঘ (guild)। ব্যবসায়িক সঙ্ঘ (জা) একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করল উৎপাদনে এবং বাণিজ্যে। ব্যাঙ্কের জন্মও হল (শাকায়া)।

এই সঙ্ঘ গঠন করা জাপান সমাজে অতি প্রাচীন কাল থেকেই দেখা গেছে। গোষ্ঠী-গঠনের মধ্য দিয়ে মানব-সমাজ বৃদ্ধি পায়। সমাজশক্তি সংহত হয়। নৃতত্ত্ববিদদের একথা যদি সত্য হয়, তবে জাপানে যে সমাজ-সংহতি বহু প্রাচীনকাল থেকে রয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। শুধু জাপান কেন চীন-ভারত সর্বদেশেই এই গোষ্ঠী-গঠনের বিধানে সমাজ-ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর একটি দীপ্ত মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় স্বতন্ত্রবাদীদের মধ্যে তত পরিলক্ষিত হয় না। গোষ্ঠী সংগঠন প্রতিভাই আনে পারিবার তন্ত্রে শ্রেণীভেদ বটে, কিন্তু গোষ্ঠী নিমাণেই দেখা যায় গোষ্ঠি-ব্যক্তি সর্বক্ষণ বহুর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করছে।

জাপানের ইতিহাস একবার এক কেন্দ্রিক হচ্ছে আর একবার বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেই বিকীর্ণ সমাজ আবার একীভূত হচ্ছে। এই যে প্রবণতা এ সমাজকে যেমন বিস্তার করে তেমনি একটি বন্ধনও আনে।

এই সংগঠন শক্তি শিক্ষা বা ইস্কুলেও পাচ্ছি। ইস্কুলে এই সংগঠন

শক্তির আবাহন করছে দেশের ধর্ম মন্দির। কামাকুরা আর মুরামাচি যুগের মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শিণ্টো এবং বুদ্ধ মন্দিরে ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। তার সঙ্গে ছিল বাণিজ্যিক শিক্ষা। ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ জীবন যাত্রার এই দুই নীতির মিশ্রণের এই হচ্ছে প্রারম্ভিক কাল, (Here was then a gradual fusion of religious and secular life ; Page 99—Dr. Saburo Ienaga, History of Japan ; J. T. B. Tokyo, Revised ed'n ; 1954) । ইয়েনাগা বলেন, এই ঘটনার জন্যই সহরের প্রাথমিক শিক্ষালয়ের নাম হল তেরাকোয়া বা মন্দির সংলগ্ন শিশু বিদ্যালয়, (It was due to this fact that the organ for elementary education in urban areas came to be called Terakoya, temple children School.—Page 99) ।

দাইমিয়োরা দেশকে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে দিল, কিন্তু কার্যত এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার পক্ষ্যে লোকের কোন বাধা ছিল না।

জাপানকে একটি মাত্র রাজ্যে রূপান্তরিত করবার প্রথম চেষ্টা করেন, ওয়ারি প্রদেশের দাইমিয়ো নোবুনাগা। বহু দাইমিয়োর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। কিন্তু স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করবার পূর্বেই তিনি ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে নিহত হন। তাঁরই সাহায্যকারী হিদেয়যোশি (১৫৩৬-১৫৯৮) এই স্বপ্ন সফল করেন।

হিদেয়যোশি এক অখ্যাত কৃষক পরিবারের সন্তান। শৌর্য বীর্যে তিনি সামুরাই হিসাবে অভিহিত হন। তিনি পরিশেষে কামপাকু হন। এর পূর্বে এই পদ ফুজিওয়ারা ছাড়া আর কেউ পায় নি।

তাঁর অনেক ভালো কাজের মধ্যে একটি কাজ খুব বিতর্কের। যারা সামুরাই নয় তাদের অস্ত্র তিনি বাজেয়াপ্ত করলেন। বুশী আর অন্যান্য লোকের মধ্যে একটি ব্যবধান ঘটালেন। কৃষক আর নাগরিক সামুরাই পদ পাবে না বলে হুকুম জারী করলেন।

অভিজাতরা এবার ধর্ম মন্দিরকে দুর্গে রূপান্তরিত করল। এই কারণেই নোবুনাগা থেকে সুরু ক'রে হিদেয়যোশির আমল পর্যন্ত মন্দির ধ্বংস করা যেন একটি রাজনৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল।

ব্যবসা-বাণিজ্যেও জা-র একাধিপত্য নষ্ট করা হল। অর্থাৎ এই যুগে যত রকমের সঙ্ঘ বা গোষ্ঠী ছিল তা সমূলে বিনষ্ট করা হ'ল। শুধু নতুন গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হ'ল—সামুরাই গোষ্ঠী।

জাপানের সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব যত না দেখা যায়, গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সংগ্রাম বেশি। ব্যবসায়িক গোষ্ঠী ঐ জা-র কথাই ধরা যাক। কেন এই গোষ্ঠী তৈরী হল। ব্যবসায়িক মনোবিজ্ঞানে বলে প্রতিযোগিতাকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য। প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে কি আছে? প্রতিযোগিতায় লব্ধ মর্যাদার দিকে ব্যক্তির প্রলোভন বেশি। প্রতিবেশির কোন ব্যক্তির সঙ্গে যেন তার দ্বন্দ্ব। কিন্তু গোষ্ঠিব মধ্যে আছে অন্য এক গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব। সামন্ততন্ত্র প্রথার অবসানে জাপানে 'জা' তৈরী হয়নি। হয়েছে পাশাপাশি।

কেবল সামন্ত-গোষ্ঠী কেন, পুরোহিত গোষ্ঠীও আছে। কাজেই ব্যবসায়িক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর একটি সমবেত চাপ সৃষ্টি করতে চায় যেন। এখানে হয়ত রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নেই; এখানে আছে সমাজশক্তি আহবণ নিয়ে দ্বন্দ্ব। হয়ত অর্থ নিয়েও নতুন বোধ সৃষ্টি হচ্ছেনা। তবে এই গোষ্ঠী সৃষ্টির মুধ্য দিয়ে প্রক্ষোভের অভিনব দিক সৃষ্টি হয়। প্রধান প্রক্ষোভ হচ্ছে—গোষ্ঠী-চেতনা, যে-চেতনা তার বিশেষ অধিকারকে জড়িয়ে আছে। যেমন অধিকার আছে বৃশীদের, পুরোহিতের, সামন্তদের; মোটের উপর জাপানে প্রথমাবধি বহু মানুষকে জড়িয়ে এক-একটি আবেগ বা প্রক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে দেখা যায়। আর একটা দিক এর মধ্য থেকে লক্ষিত হয়, তাহচ্ছে—কোন বিশেষ ব্যক্তির নিরাপত্তা এখানে বড নয়, বড হচ্ছে ঐ সঙ্ঘটির। বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতেও যে এই সঙ্ঘ বা গোষ্ঠীর কোন ক্ষতি হবে না—এমন এক পরিহৃতব্রত এতে থাকে। কাজেই চরম মুনাফার দিকই যে এই ব্যবসায়িক সঙ্ঘের লক্ষ্য ছিল তা বলা যায় না।

রাষ্ট্রীয় শক্তি যার হাতে, অজ্ঞাতসারে সে-ও তেমনি এই গোষ্ঠী চেতনাকে নষ্ট কবতে চায় নানা কৌশলে। এই জন্যই দেখতে পাই জাপানে প্রথমে বিদেশী প্রভাব খুব স্বীকৃত, আদৃত; কিন্তু যখনই সেই প্রভাব নতুন বিরোধী গোষ্ঠীচেতনা সৃষ্টি করতে বসল তখনই রাতারাতি তাকে বিনষ্ট করা হয়েছে। পরিবার তন্ত্রের এও একটি ধর্ম। কোন অবস্থাতেই জাপান এই পরিবার তন্ত্রকে বিসর্জন দিতে পারে নি।

এই প্রক্ষোভ খুব অবহেলার নয়। আমাদের দেশে 'কালোবাজার' প্রথা যে ব্যাপক হয়ে পড়ছে তার কারণ এই প্রক্ষোভ জড়িয়ে পড়ছে। এই প্রতিযোগিতামূলক সমাজে কালোবাজার স্বীকৃত নয়। সন্ন্যাসীর দেশে

অর্থ-সম্পদও খুব নীতি-মূলক বিষয় নয়। প্রত্যেকেই কালোবাজারের বিরুদ্ধে। কিন্তু যখনই তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শক্তি আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বন করে তখনই ছোটবড় সমস্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বোধ হয় ঐ গোষ্ঠীচেতনা। সাধারণত সমস্ত ব্যবসায়ীই কালোবাজারের মহাজনকে ঘৃণা করে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা সমর্থন না করে পারে না। তাদের ঘৃণা আসে অসম ব্যবসাদারের যে উদ্বিগ্নতা বা নিরাপত্তা তাই থেকে। ছোট ব্যবসাদার বড়-র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারে না। কিন্তু ব্যবসায় হিসাবে যখন বাধা আসে তখনই তারা সমবেত। অজ্ঞাতসারে তারা এমনি করে গোষ্ঠী চেতনা এনে একটা বৃহত্তর চাপের সৃষ্টি করে সমাজে। নির্জ্ঞান মনে এমনি করে সঙ্ঘ-বোধ আসে।

যাই হোক, ত্রয়োদশ শতকে কুবলাই খানের চীন থেকে ফিরে এসে মার্কোপোলো পশ্চিমের কাছে প্রথম জাপানের খবর দেন Zipangu বলে। চীন বলত Jihpan ভুল ক'রে পশ্চিম বলল Zipangu মার্কোপোলো মনে করলেন জাপান হচ্ছে—সোনার দেশ। আসল নাম নিপ্পোন—সূর্যদেবীর দেশ।

পোর্তুগীজ জাহাজ মাকাও-তে যেতে গিয়ে ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে জাপানের উপকূলে ভিড়ল। এই-ই হল সূত্রপাত। নতুনধর্ম খৃষ্টধর্মের স্থান জুটল জাপানে। জেস্যুইটরা স্থাপন করল Seminarios এবং Collegios—জাপানে খৃষ্টধর্ম প্রচারের শিক্ষালয়।

১৫৯৮তে হিদোয়োশি মারা গেলেন। তাঁরই সহযোগী তোকুগাওয়া ইয়েয়াসু (১৫৪২-১৬১৬) দাইমিয়োদের যুদ্ধে হটিয়ে দিয়ে এডোতে রাজধানী নিয়ে এসে শোগুন শাসন প্রবর্তন করেন। এডো হচ্ছে বর্তমানের টোকিও। জলাভূমির একটি গ্রাম। ১৪৫৭তে ওটা দোকান (১৪৩২-১৪৮৬) নামে এক যোদ্ধা এখানে ছোট একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এটিই হচ্ছে এডোর রাজপ্রাসাদের মূল। ইয়েয়াসুর সময় থেকেই জাপানে শ্রেণীভেদ এল। এদের মধ্যে বুশীরা হল সর্বোচ্চশ্রেণীর। বুশীদের পর কৃষিজীবী, কারিগর, তারপর বণিক। বণিকদের ঠেকিয়ে রাখা হল। কিন্তু সম্ভব হল না।

পশ্চিমের সংস্পর্শে জাপান হস্তশিল্প থেকে কারিগরী-শিল্প যুগে উত্তীর্ণ হল। উদ্ভব হল নতুন সম্প্রদায় চোনিন বা নাগরিক শ্রেণী।

মুরোমাচি যুগে জেন্-সাধুরা শিক্ষা দিতেন মন্দিরে। তোকুগাওয়া যুগে তেরাকোয়া বা মন্দির-পাঠশালা আর কিয়োটো বা কামাকুরার মঠেই

সীমাবদ্ধ থাকল না। তোবাকয়া এখন সর্বত্র। ছাত্রসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলল। সহয়ের সংখ্যাও বেড়ে গেল। ছেলেবা অঙ্ক কসত, মেয়েরা সীবন-শিক্ষা এবং চা-অনুষ্ঠান শিখতে থাকে। কাঠের ব্লকের সাহায্যে পুস্তকও প্রচুর ছাপা হতে থাকল। পুস্তক ছাপানোর সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে গেল (Saburo Ienaga-Page 154)।

১৫৬১ থেকে দেখা গেছে বাকুফু কনফুসিযাসের শিক্ষাব সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শিক্ষা যুক্ত হয়ে চলেছে। কেন এরূপ হয়েছিল তা কনফুসিয়াসের স৷ 'জনীতি থেকে জানা যাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন জাপানের ঐতিহ্য অনুশীলনের দিকে আন্দোলন সুরু হল (কোকুগাকুশা)।

তৃতীয় আন্দোলন ডাচ-শিক্ষা। বিদেশী বর্জনেব কালে জাপানের সঙ্গে একমাত্র হল্যাণ্ডের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠল যারা বাকুফুব কর্মচারীদের সঙ্গে ডাচের যোগাযোগ সাধন করত। তাবা ডাচেব ভাষা ও শিক্ষা চায়। অষ্টোদশ শতকে এই শিক্ষাব প্রসার ঘটে।

এ পযন্ত ইয়োরোপীয় শিক্ষালয়ে দুটি ধাবা দেখা দিল, (১) ধর্মীয় শিক্ষা (২) বাণিজ্যিক শিক্ষা।

১৮২৩-৫ ফিলিপ ফ্রাঞ্জ ফন সেইবোল্ড জাপানে এসে নাগাসাকির কাবখানায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তন করেন।

বাকুফু নিয়ন্ত্রিত পাশ্চাত্য শিক্ষাব ইস্কুলে শেষের দুটি কার্যক্রম অর্থাৎ বাণিজ্যিক এবং বিজ্ঞান-কাবিগরী যে প্রবর্তিত হবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দাইমিয়োরা কিন্তু অস্ত্র নির্মাণ আর বয়ন কারখানা খুলে প্রাচীন জাপানেব পথে থেকেই নতুন শিক্ষা প্রবর্তন করেন।

সমাজের পরিবর্তন দেখাদিল আব এক দিক দিয়ে। ঐ যে সহববাসীর (চোনিন) কথা পূবেই বলেছি, তারা পাশ্চাত্য সভ্যতা অর্থাৎ বাণিজ্য আর বিজ্ঞান চচা গ্রহণ ক'বে সমৃদ্ধিশালী হয়ে পড়ে। এমন কি সম্পদের দিক দিয়ে রাজা মহারাজাও তাদের কাছে নিষ্প্রভ হয়ে গেল। কিন্তু জাপানের প্রাচীন সমাজে এই জন্য প্রচণ্ড ধাক্কা এলেও জাপানীর দেশভক্তি বা প্রাচীন ঐতিহ্য এই জোয়ার থেকে বিপদগ্রস্ত তরীটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে চালনা ক'রে আপন স্রোত বইয়ে নিয়ে চলল। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন ১৮৬৯ সালে রাতারাতি কি ভাবে বাকুফু শাসনের অবসান ঘটে।

সম্রাট মেইজি এবার নিজের হাতে সমগ্র দেশকে তুলে নিলেন। সংবিধানিক শাসন কাল সুরু হল। ১৮৯০ তে প্রথম ডিয়েটের অধিবেশন বসে। তবে নতুন সমস্যা ধনতান্ত্রিকতা এসে জাপানে জুড়ে বসল। কেন একে নতুন সমস্যা বলছি তা পাশ্চাত্য দেশের অর্থনীতির কথা আলোচনা করলেই বোঝা যায়।

১৮৭২ সালের অনুশাসনে সকলের শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হল। দেশের সর্বত্র অখ্যাত স্থানেও তোকাগাওয়া যুগের তেরাকোয়ার স্থান দখল করল প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষা হল অবশ্যিক এবং বাধ্যতা মূলক। মেইজি যুগ চলে ১৮৬৮ থেকে ১৯১২ তারপব তাইশোর যুগ। ১৯১২-থেকে ১৯২৬।

শিক্ষার দিক দিয়ে বা ইস্কুলের কথা বলতে গিয়ে আমাদের এই বর্তমান ইতিহাসকে আলোচনা করবাব তেমন অবশ্যকতা নেই। আমরা জাপানের প্রাচীন শিক্ষা ও ইস্কুল ব্যবস্থার পর ইয়োরোপীয় শিক্ষারীতির কতখানি কেমনভাবে তারা গ্রহণ করেছে তার পর্যালোচনা করব। তবে এই আলোচনায় সর্বক্ষণ জাপানের ঐতিহ্যকে মিলিয়ে নেওয়ার অনুরোধ থাকলই।

(১) প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষাব অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কিণ্ডারগার্টেন, প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা (প্রাথমিক দিকেব) এবং বিকলাঙ্গদের শিক্ষা। প্রকৃতপক্ষে কিণ্ডারগার্টেন আর প্রাথমিক শিক্ষাকেই সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাব অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৩ থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদেব জন্য কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা। ১৮৭৬ সালে আমেরিকার সাহায্যে জাপানের শিক্ষাবিভাগ টোকিওতে শিক্ষণ-শিক্ষিকাদের জন্য প্রথম কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপরই এই ইস্কুলের উপকারিতা বোঝা গেল। এই ধবণের বহু কিণ্ডারগার্টেন বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল।

নিয়মিত ইস্কুলের পঠন পাঠন এখানে হ'ত না। অপরিণত মনের উপর শিক্ষার চাপ সৃষ্টি করা জাপানী মনস্তত্ত্ববিদের নীতি বিরোধী। ইয়োরোপের কিণ্ডারগার্টেন থেকে জাপানের ইস্কুলের পাঠ্যক্রমে স্বাতন্ত্র্য

আছে। অন্যত্র কিণ্ডারগার্টেনে ফ্রোয়েবেলের প্রথম নীতি ধর্ম-শিক্ষা পালন করা হয়। জাপানে এই নীতি গ্রহণ করে নি। করেছে কন্‌ফুসিয়াসের পাঁচ রকম সমাজ-সম্পর্ককে ভিত্তি। জাপানের চরিত্রে গোড়া থেকেই দেখা গেছে তারা ধর্মের জন্য নয়, সমাজের জন্য। এখানেও সেই দিকটিই দেখা গেল। শিন্টোবাদের উপর ভিত্তি ক'রে কনফুসিয়াস আর বৌদ্ধধর্ম যে নব চরিত্র গঠন করেছে, জাপানীরা তারই আধ্যাত্মিক প্রকাশ।

সরকারী কিণ্ডারগার্টেনে (একটি মাত্রই) একটি পৃথক ঘর বরাদ্দ ছিল দুঃস্থদের ছেলেমেয়েদের জন্য। সেখানে সহজ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮৯০ সালে এই ইস্কুলের সংখ্যা ১৩০ (The Real Japan. H. Norman ; T. Fisher Unwin, London, 1890) শার্প সাহেবের হিসাবে (The educational system of Japan. W. H. sharp, Bombay 1906 ; Page 70) ১৮৩টি বেসরকারী এবং ৭৯টি ব্যক্তিগত পরিচালনায় বিদ্যালয় ছিল। শিক্ষক সংখ্যা ৭২৬, এবং শিশুসংখ্যা ২৪,১৮৪ (এর মধ্যে বালকের সংখ্যা ১২,৭৪৪)। কিন্তু শার্প সাহেব বলেন, দশ বছরে এই ইস্কুলের শিশু সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পেলেও প্রাথমিক ইস্কুলে এর থেকে হাজারে ৬ জনও যোগ দেয় না। তবু জাপান 'জাতীয় অপচয়ের' অজুহাতে এই ইস্কুল বন্ধ করে দেয় নি। বরং ১৯২২-২৩ সালে দেখা গেল, সর্বসমেত কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুল ৬১২টি (২টি মাত্র সরকারী); তার মধ্যে ২৫২টি বেসরকারী আর ৩৫৮টি ব্যক্তিগ· পরিচালনায়। ব্যক্তিগত পরিচালনার ইস্কুল এত বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন সে কথা ভাববার মতো বটে (Japan and its educational system ; Syed Ross Masood, Hyderabad-Deccan, 1923-Page 215)।

ইস্কুল সম্পর্কে বিধানের মধ্যে আছে যে, একটি কিণ্ডারগার্টেনে ১০০ শতের বেশি ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া চলবে না ; প্রতি শিক্ষকের অধীনে ৪০এর বেশি ছাত্র থাকবে না। সরকারী কিণ্ডারগার্টেন দুটিতে ১৬৭টি ছেলেমেয়ের জন্য ২৮ জন শিক্ষক। বেসরকারী আর ব্যক্তিগত পরিচালনার ইস্কুলেও এই নিয়ম মান্য করা হ'ত। কোবের (kobe) কিণ্ডারগার্টেনটি এর মধ্যে বিখ্যাত ছিল ; এখানে প্রত্যেক শ্রেণীতে ১৩ থেকে ১৬টি ছাত্রছাত্রী। এই ইস্কুলটি বেসরকারী।

সাধারণত একতলা বাড়ী (এই ব্যবস্থাই অনুমোদিত)। ঘিঞ্জি

অঞ্চল থেকে একটু দূরে অবস্থিত কিণ্ডারগার্টেন, শিশুদের নিরাপত্তার জন্য। কলকাতাতেও (ইঙ্গ-বঙ্গ ইস্কুল ছাড়া) কোন কোন ইস্কুলের শিশুবিভাগ সহরের ঘিঞ্জি পল্লীতে তো বটেই, অধিকন্তু গাড়ী-ঘোড়া লাইসেন্স বিভাগের একেবারে গায়ের সঙ্গে লাগানোও বটে। যেদিন 'লরী' পর্যবেক্ষণ চলে সেদিন শিশুরা একেবারে বাড়ীতে প্রাণ-ভোমরা রেখে আসতে বাধ্য হয়। অবশ্য এ ব্যবস্থাও মনস্তত্ত্ব দ্বারা সমর্থন করা যায়; যে শিশু বড় হয়ে এমনি গাড়ীঘোড়া অনুষ্ঠিত অঞ্চলে বাস করতে বাধ্য হবে তাকে ছোট বেলা থেকেই এই অভ্যাসে সিদ্ধ করতে হয়। পাভলভের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত সৃষ্টির পথে এই ব্যবস্থাকে একেবারে যে অনুমোদন করা যায় না তা বোধ হয় নয়।

জাপানী কিণ্ডারগার্টেন খুব আলো-হাওয়া সমন্বিত, বসবার ব্যবস্থাও স্বাস্থ্য সম্মত। একটি বড় ঘর থাকে, মেঝেতে বৃত্ত আঁকা; সেখানে তারা সঙ্গীত অভ্যাস করে। ছোট ছোট ঘরে টেবিলের চার ধারে তারা বসে। বায়গায় একটি ক'রে লেবেল আঁটা থাকে তাতে লেখা শিশুর নাম ও ঠিকানা। কোন রকম বিপদ হ'লে ধাত্রীরা এসে পরিচর্যা করেন।

কিণ্ডারগার্টেনের 'শিক্ষক' সাধারণত শিক্ষিকা। স্থানীয় সরকার শিক্ষা বিষয়ে অনুমোদন পত্র তাদের দেন এই মর্মে যে, তারা প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার উপযুক্ত। কোন ক্ষেত্রে যদি শিক্ষিকাদের বরখাস্ত করতে হয় তবে সরকারকে জানাতে হবে। মর্যাদা আর বেতনের দিক দিয়ে তারা প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার নিম্নপদে।

সহবৎ শিক্ষাই এই ইস্কুলের প্রধান অঙ্গ। পাঠ্যক্রমের মধ্যে আছে—গান, আলাপ-আচার, ফ্রোয়েবেলের খেলনা (gifts) নিয়ে শিক্ষা গ্রহণ, প্রকৃত ক্রীড়া। পাঠকাল দৈনিক ৫ ঘণ্টার বেশি নয় (দুপুরের আহার সমেত)। শনি-রবিবার ছুটি।

কিণ্ডারগার্টেনে ব্যবহৃত পাঠ-উপকরণ জাপানেই তৈরী হয়। ঘরের দুই দিকে ব্ল্যাকবোর্ড আছে, তাতে জাপানের প্রাকৃতিক ছবি, ধান-রোপণ, ধান-উঠানো, জাপানের সৈন্যদের কুচকাওয়াজ প্রভৃতি ছবি প্রদর্শিত হয়। সরকারী বিদ্যালয়ে জাপানের যুদ্ধ-জাহাজ এবং বৈদ্যুতিক ট্রাম সম্পর্কেও ছবি প্রদর্শিত হয়।

কিণ্ডারগার্টেন বাবদ বাৎসরিক মোট খরচ ১২,০৬০ পাউণ্ড, তার মধ্যে

প্রায় অর্ধেক টাকা আসে বেতন বাবদ। সরকারী বিদ্যালয়ে দরিদ্র-ছেলেরা বিনা বেতনেও পড়তে পারে।

কিণ্ডারগার্টেন ছাড়া যে-প্রথমিক ইস্কুল তা হেনরী নরম্যান (The Real Japan ; Henry Norman ; T. Fisher Unwin ; London 1890, 4th Editioin) দুভাগে ভাগ ক'রেছেন ; সাধারণ আর উচ্চ। সাধারণ প্রাথমিক ৬ থেকে ১০ বছরের ছেলেমেয়ে পড়তে পারে ; উচ্চ প্রাথমিকে ১০ থেকে ১৪। এই ইস্কুলের সংখ্যা তখন ছিল, ২৯,২৩৩ (৫৩২ টি ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষণায়) ; ছাত্র সংখ্যা ৩,২৩৩,২২৬ ; শিক্ষক সংখ্যা ৯৭,৩১৬ ; বাৎসরিক ব্যয় ১,২৫৯,৫০০ পাউণ্ড। কিন্তু এই হিসাবই সব নয় ; নরম্যান তৎকালে বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষা সর্বকালেই জাপানীদের সর্বত্র প্রচলিত ; সর্বনিম্ন শ্রেণীর মেয়ে পুরুষের মধ্যে এমন ব্যক্তি পাওয়া দুর্লভ যে লিখতে বা পড়তে জানে না ; তাঁর ধারণা বার্মিংহাম বা বেস্টোনে টোকিওর তুলনায় নিরক্ষরের সংখ্যা বেশী। যখন পাশ্চাত্য জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা জাপানে এল তখনই এই শিক্ষা ব্যাহত হল ; তারা তখন একত্রে কয়েকটি দেশের ব্যবস্থাকে রূপ দিল—ইংল্যাণ্ডের বোর্ড 'ইস্কুল', আমেরিকার হাই ইস্কুল, ফ্রান্সের নর্মাল ইস্কুল আর জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়, (Elementary education has always been fairly diffused among the Japanese, and it is so rare a thing to find even in the lowest class a man or wo: an who cannot read and write that I have no doubt the proportion of illiteracy is higher in Birmingham or in Boston than ıı is in Tokyo. Page 90)। তিনি বলেন, জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষার তিনটির মধ্যে দুটি নীতি কার্যকরী ; শিক্ষা আবশ্যিক এবং ধর্মশিক্ষা বিবর্জিত ; তবে অবৈতনিক নয়, (The educational system exhibits two out of the three great principles of national instruction ; it is compulsory and secular. It is not gratuitous. Page 90)।

প্রাথমিক ইস্কুলের সংখ্যাতত্ত্বে নরম্যানের সঙ্গে শার্প ১৯০৫ সনে যা দিয়েছেন তার বৈষম্য আছে। ১৯০৫ সনে শার্প বলছেন, ২৭,১৫৫ ইস্কুল আর ৫১ লক্ষ ছাত্র এবং শিক্ষক ১ লক্ষ ৯ হাজার। মনে হয়, শার্পের হিসাবে ৬,৬৪৪ টি যুক্ত সাধারণ এবং উচ্চ প্রাথমিক ইস্কুল আছে, তেমন যুক্ত-ইস্কুল

নরম্যান ১৮৯০ তে পূর্ববর্তী আদম-সুমারীতে পান নি। যাই হোক ১৫ বছরে প্রায় ৪ হাজারের মতো ইস্কুল বেড়েছে ব'লে অনুমিত হয় (Sharp Page 75)।

৬ থেকে ১০ বছর বয়সে যে সাধারণ প্রাথমিকে পড়তে হয়, সেখানে বছরে ৩২ সপ্তাহ ইস্কুলে উপস্থিত থাকা আবশ্যিক। এপ্রিলের প্রথম তারিখ থেকে ইস্কুলের বছর সুরু হয়। ছুটির সংখ্যা রবিবার সমেত ৯০ দিন; ২২৩ দিন ইস্কুল বসে। ৩২ সপ্তাহ আবশ্যিক ধরলে বলতে হয় সমস্ত কার্য-দিবসই উপস্থিত থাকতে হয়। আগস্টে বড ছুটি—৪।৫ সপ্তাহ মতো। যখন কৃষক ধান তোলে বা রেশম শিল্পের মরশুম—তখন কোন কোন অঞ্চলের ইস্কুলে ছুটি থাকে; অবশ্য এই ছুটি বড ছুটি থেকে কেটে নেওয়া হয়। এ ব্যবস্থার কারণ বোধহয় এই, পডবার সময়েও জাতির উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ছেলেমেয়ে যোগ রাখতে পায়; তাতে শ্রমের অভাবে পণ্যদ্রব্যের ঘাটতি পডে না। জাতির সম্পদের দিক ভেবে ইস্কুলের এই ব্যবস্থা সত্যিই চমকপ্রদ।

গরমের সময় ইস্কুল বসে ৭টা থেকে ১১টা বা ১২ টা পর্যন্ত; অন্য সময়ে ৮ টা থেকে ২ টা বা ৯টা থেকে ৩টা পর্যন্ত।

প্রাথমিক (সাধারণ) ইস্কুলের পাঠ্যক্রমে আছে—নীতি শিক্ষা, মাতৃভাষা অঙ্ক, ব্যায়াম—আর তার সঙ্গে অঙ্কন, গান, শারীরিক শ্রম; সীবন—ঐচ্ছিক হিসাবে।

১০-থেকে ১৪ বছরের ইস্কুলে পাঠ্য তালিকায় বাডতি এল—ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা, ইংরেজি ভাষা, কৃষিবিজ্ঞান, ব্যবসায় বিজ্ঞান।

কনফুসিয়াসের নীতিতে যদিও ৭ বছরের পর বালক বালিকাকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা, জাপানের সহরের ইস্কুলে অন্য কারণে এই কথা অনেকটা মান্য করা হলেও, গ্রামের ইস্কুলে ৮ বছর ধ'রেই একসঙ্গে পডতে পারে।

ইস্কুলের উপকরণ সম্পর্কে একটু বলবার আছে। ইস্কুলে ঢুকতেই অনেক-গুলো তাক দেখতে পাওয়া যাবে। সেখানে ছাতা ইত্যাদি রাখতে হয়। কেবল পরিষ্কার হালকা চটি পরে ইস্কুলের ভেতরে যেতে হবে। একজন বা দুজন একত্রে বসবার মতো ডেস্ক এবং টেবিল। ব্ল্যাকবোর্ড সাধারণত দেওয়ালে, দেওয়াল জুডে। সামান্য একটু কাঠের টুকরোয় রঙ্ করা নয়। এই বোর্ডে ফুল বা গাছের ছবি আঁকা থাকে নানা রঙে। নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রেও নক্সা বা ছবি এঁকে ব্যবহার করা হয়। এই ছবির মধ্যে জাপানী

বীরদের ছবি বেশি। কি ভাবে পোষাক পরতে হয়, কি ভাবে আচরণ করতে হয় তা দৃষ্টান্ত সহযোগে বোঝানো হয়। এ ছাড়া থাকে নৌ ও স্থলসেনার কার্যপদ্ধতির ছবি। যুদ্ধ জাহাজের মডেলও দেখানো হয়; আছে এই সব উপকরণ সংরক্ষিত যাদুঘর (ইস্কুলেই)।

সাধারণত বাড়ী থেকে ছাত্র এসে পড়ে, কিন্তু আঞ্চলিক অসুবিধার দরুণ আবাসিক বিদ্যালয়ও আছে।

প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় বিশেষ ধরণের ইস্কুল আছে। এই ইস্কুল শুধু গরীব ছেলে মেয়েদের জন্য। টোকিওতে এই ধরণের কিছু কিছু ইস্কুল ছিল।• পড়বার ব্যবস্থা এখানে দুবেলায় পৃথক পৃথক ভাবে। এক দল পড়ে বেলা ৮টা থেকে ১১টায়। তার দ্বিতীয় দল ১টা থেকে ৪টা। বই খাতা পেন্সিল সমস্তই এখানে ছেলেমেয়েরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে পায়। নিজদের কোন খরচ লাগেনা।

জাপানের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হযেও অবৈতনিক নয় বলেই বোধ হয় দরিদ্রের জন্য সরকার এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

সাধারণ আর উচ্চ প্রাথমিক বিভাগ থাকলেও, ওরই মধ্যে আর একটু বৈচিত্র্য আছে। তাকে বলা যেতে পারে একরকমের অব্যাহত (Continuation School) ইস্কুল। কখনও যদি সাধারণ বিভাগের ছাত্র উচ্চ বিভাগে যেতে অসমর্থ হয়, তবে তাদের পড়ার জন্য বাড়তি শ্রেণী থাকে; কিন্তু ঐ সঙ্গে স্থানীয় শিল্পকারখানা সংক্রান্ত ব্যবহারিক কাজও জানতে হয়। একই বিষয় তাদের পড়তে হয় না; স্বাধীন করবার জন্য ঐ সময়ই তাদের কারিগরী শিখে নিতে হয়। যদি উচ্চ প্রাথমিক বা উচ্চ বিদ্যালয় ছাত্রদের বাসস্থান থেকে অনেক দূরে পড়ে যায়, তবে ঐ ইস্কুলেই তাদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়। এই সব ছাত্রের অনেক সময় নীচের শ্রেণীর ছাত্রদেব পড়াতেও হয়। কারণ ইস্কুলের শিক্ষকেরা এদের পড়াতে গিয়ে নীচের শ্রেণীর কাজ কমাতে বাধ্য হন। রাষ্ট্রের অসুবিধার দরুণ শিক্ষায় যেটুকু বাধা আসে শিক্ষা বিভাগ তার পূরণ করেন এমনি ক'রে। এই কারণেই নৈশ ইস্কুলও জাপানে বিশেষভাবে স্বীকৃত।

বিশেষ পাঠ বা বক্তৃতার ব্যবস্থাও আছে যেমন ল্যাণ্টার্ণ বক্তৃতা প্রভৃতি। এসব ক্ষেত্রে কয়েকটি ইস্কুল একত্র হয়ে ব্যয় বহন করে।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ

মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্পর্কে কিছু বলবার আগে একটা কথা বলতে হয় এই যে, প্রাথমিকের সঙ্গে মাধ্যমিকের দুটো বছর জড়িয়ে আছে। প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ কাল হচ্ছে ৮ বছর ; এদিকে মাধ্যমিক ইস্কুলে ছাত্রেরা আসতে পারে প্রাথমিকের ষষ্ঠ বছরের পরই। অনেকগুলি কারণে এমনি ঘটনা ঘটেছিল।

মাধ্যমিক শিক্ষার অঙ্গ হচ্ছে, (১) ছেলেদের মধ্য বিদ্যালয় (middle School), (২) মেয়েদের উচ্চতর বিদ্যালয়, (৩) বিবিধ বিদ্যালয় যথা, কৃষি, বাণিজ্য, কারিগরী প্রভৃতি।

তৃতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয় সাধারণত বেসরকারী।

(১) ছেলেদের মধ্য বিদ্যালয় ঃ

মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রচলিত রূপ যা কিছু ছিল তা সামুরাইদের শিক্ষার জন্যই। সামুরাই অথবা পুরোহিত—এঁরাই সেখানে পড়তেন। পড়ানো হ'ত—চীনের নীতিশাস্ত্র, অঙ্ক এবং শারীরিক চর্চা।

১৮৭২ এর শিক্ষা-নীতি দেশকে ২৫৬টি মাধ্যমিক শিক্ষার এলেকায় ভাগ ক'রে দিল। প্রথম দিকে দুইটি ইয়োরোপীয় ভাষা যেমন ইংরেজি ও ফরাসী, শিখতে হ'ত ; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে খুব প্রয়োজন না থাকায়, এবং ছেলেদের দুর্বহ হয়ে যাওয়ার দরুণ ১৮৯৪তে একটি ভাষা পরিত্যক্ত হয়। ১৮৯৪তে আর-একটি পরিবর্তন করা হ'ল যে, যারা আরও উচ্চ শিক্ষা নেবেনা তাদের শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ যাতে হয় তার ব্যবস্থা। তার ফলে পাঠ্যক্রম বিভক্ত হল। সাধারণ পাঠ্যক্রমের সঙ্গে কৃষি বা বাণিজ্য বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা হল। এই বিভক্তীকরণ হল পাঠ্যকালের চতুর্থ এবং পঞ্চম বৎসরে। টেকনিক্যাল ইস্কুল খুলে সেখানে কারিগরী-বিদ্যাভ্যাসের ব্যবস্থাও করা হল। চীনের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ সুরু হওয়ায় শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্যালয়ের প্রাচুর্য ঘটল। অর্থাৎ জাপানের মাধ্যমিক শিক্ষা দুটি লক্ষ্য নির্দেশ করে ; (১) কলেজে যারা পড়তে চায় এবং সাধারণ মননবিদ্যা ও বিজ্ঞানে আগ্রহী ছাত্রদের প্রয়োজন সাধন, (২) যারা তা না চায় তারা বিশেষ ধরণের ইস্কুলে যাতে যেতে পারে তার ব্যবস্থা। অনেকটা আমাদের দেশের বর্তমান সর্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়ের মতো। ১৮৮৯ সালে মধ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৩টি,

১৯০২-এ ২৫৮টি; ছাত্র সংখ্যাও বাড়ল প্রায় ৯ গুণ। দেশের চাহিদার তুলনায় এ সংখ্যাও কম। মধ্য-ইস্কুলের চাহিদা এই সময়ে জাপানে অত্যধিক হয়ে পড়ে। তার নানা সামাজিক কারণ ছিল। মধ্য ইস্কুল থেকে উত্তীর্ণ হলে—নানা বিষয়ে পড়বার স্থবিধা। আমাদের আই-এস-সি পাশের মতো। কিন্তু কেমন ক'রে জানিনা জাপান বুঝেছিল—বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা নেওয়ার আগে সাধারণ শিক্ষা বা মননবিদ্যার শিক্ষা ঠিক মতো ভিত্তি গঠন করুক।

আঞ্চলিক শিক্ষা পর্ষদের উপরই এই মধ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভার থাকল। ১৯০২ সাল পর্যন্ত সরকার পরিচালিত একটি মধ্য বিদ্যালয়ই ছিল তা টোকিও-র নর্মাল ইস্কুলের সঙ্গে সংলগ্ন। মন্দির-মঠ সংলগ্ন বা ব্যক্তিগত মালিকানা মতো মধ্যবিদ্যালয়ও ছিল।

তিনটি পর্যায় ইস্কুলের বর্ষ। ১লা এপ্রিল থেকে ১০ই জুলাই; ১১ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বর; এবং ৮ই জানুয়ারী থেকে ২০শে মার্চ। বছরে ২০০ দিন কাজের। দিনে ৫।৬ ঘণ্টা ইস্কুল চলে। ৮টা থেকে ১২টা আবার ১টা থেকে ২টা। প্রত্যেক ঘণ্টার পর দশ মিনিট বিশ্রামের সময়। অঙ্ক আর রচনা ছাড়া বাড়ীর কাজ বিশেষ কিছু দেওয়া হয় না। ছাত্রেরা বাড়ীতে ৩ ঘণ্টার বেশি পড়ে না।

মনোবিজ্ঞান থেকে আমরা এই ব্যবস্থার দুটো দিকের সন্ধান পাই। অবিরাম শ্রেণী পাঠনা চললে, অর্থাৎ কোন ঘণ্টার পর বিশ্রাম না থাকলে বিষয়ের অনুরক্তিতে বাধা জন্মে। ধরা যাক, প্রথম ঘণ্টায় অঙ্ক পড়ল; অঙ্ক সম্পর্কে চিন্তন শেষ হ'তে না হতেই যদি সাহিত্য পড়া স্থরু হয় তাহলে ছাত্রদের মনোরাজ্যে বিশৃঙ্খলা আসা স্বাভাবিক। আবার দশ মিনিট অবসর যদি থাকেই তবে শিক্ষক ও ছাত্রের নিয়মনিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন। ক্লাসে যেতে দশ মিনিট দেরী করলে বা ক্লাসের বাইরে জটলা পাকিয়ে সময় নষ্ট করলে আবার 'নেই কাজের' আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। সবই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। কিন্তু অভ্যাস যদি নিয়ম শৃঙ্খলার উপর ভিত্তি ক'রে গঠিত হয় তবে শরীর মনের কিছু উন্নতি হয়। দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে পড়া যেন ছাত্রদের শিশু জীবনের তপস্যা না হয়ে যায়। ইস্কুলের বই হাত থেকে নামাতে না নামাতেই যদি বাড়ীতে আবার বই নিয়ে বসতে হয় তবে সাধারণ ছেলের কাছে 'পড়া' একটি উৎপীড়ন ব'লে বোধ হয়। এই চাপে তারা সমাজ-কর্মেও যোগ দিয়ে উঠতে পারে না।. ইস্কুলেই যদি পড়ার সমস্ত প্রসঙ্গ শেষ

ক'রে দেওয়া যায় তবে ভালো। বাড়ীতে এসে পাঠের মধ্য থেকে যদি কোন নতুন আলোক পায়, তাই চরিত্রে-ব্যবহারে প্রতিফলিত করুক। জানিনা জাপানের এই কার্যক্রম কতখানি সফল হয়েছিল। তবে একথা বোঝা যায়, জাপানী ইস্কুলের কার্যক্রমে মনোবিজ্ঞান মেনে চলা হত; এবং পড়া যে কাজেরই একটি অঙ্গ একথা স্বীকার করা হয়েছিল; তাই এত অবসরের ব্যবস্থা।

এই বিদ্যালয়ে ভর্তি সম্পর্কে একটা নিয়ম ছিল যে, শিক্ষার্থীকে ১২ বছর বয়সের হ'তে হবে; এবং উচ্চতর প্রাথমিকের দ্বিতীয়-বর্ষ উত্তীর্ণ হ'তে হবে। অথবা অনুরূপ যোগ্যতা অর্জন করেছে কিনা জানবার জন্য পরীক্ষা করে নিতে হবে।

শিক্ষাকাল ৫ বছরের অর্থাৎ পাঁচটি শ্রেণী আছে। পড়বার বিষয় হচ্ছে নীতিশিক্ষা, জাপানী ও চীনভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদি, বিদেশীভাষা (সাধারণত ইংরেজি), সাধারণ ভূগোল ও জাপানের ইতিহাস (তৃতীয় বর্ষ থেকে পৃথিবীর ইতিহাস) অঙ্ক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (উদ্ভিদ, অথবা ভূবিজ্ঞান অথবা জীববিজ্ঞান), পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা, অঙ্কনবিদ্যা, সঙ্গীত ও শরীরচর্চা। চতুর্থ শ্রেণীতে ঐচ্ছিক হিসাবে আছে—কৃষি ও ব্যবসায়িক বিজ্ঞান। পঞ্চম শ্রেণীতে শাসনতন্ত্রও রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

৮০০এর বেশি ছাত্র কোন ইস্কুলে থাকতে পারবেনা, তবে বিশেষ অনুমোদনে ১০০০ ছাত্রও পড়তে পারে (১৯২০ সাল পর্যন্তও এ ব্যবস্থা দেখা গেছে)। প্রতি শ্রেণীতে ৫০ জন ছেলে; এবং প্রতি শ্রেণীর জন্য দুজন করে অন্তত শিক্ষক থাকবেন। যদি কখনও এই শ্রেণীকে আরও ক্ষুদ্র শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তবে প্রতি শ্রেণীতে ১½ জন শিক্ষক হারে শিক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রদের পড়তে হয় সপ্তাহে ২৯ ঘণ্টা, তারপরের শ্রেণী গুলিতে ৩০ ঘণ্টা! প্রতি শিক্ষকের বরাদ্দ প্রতি সপ্তাহে ১৯ ঘণ্টা। পড়ানোর মাধ্যম মাতৃভাষা।

শিক্ষকদের মধ্যে দুরকমের পদ (১) শিক্ষক এবং (২) সহকারী শিক্ষক। অবশ্য পদ-বিভাগে শিক্ষা-যোগ্যতার দিক দিয়ে কোন তফাৎ নেই; তবে যাঁরা বেশী অভিজ্ঞ তাঁদেরই প্রথম শ্রেণীতে নিযুক্ত করা হয়। এঁরা প্রত্যেকেই উচ্চতর নর্মাল ইস্কুলের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত। শিক্ষকেরা নর্মাল ইস্কুলে যে বিষয় পড়েছেন, কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয় নিয়ে তাঁর বিশেষ অধ্যয়ন

করেছেন সেই বিষয়ই তাঁদের পড়াতে দেওয়া হয়। মর্যাদার দিক দিয়ে দুরকমের শিক্ষক আছেন। মধ্যবিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষক সোনিন মর্যাদার, অন্যান্য শিক্ষক হানিন শ্রেণীভুক্ত; সোনিন পদের শিক্ষক সাধারণত শিক্ষা মন্ত্রীর অনুমোদনে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত, আর হানিন হচ্ছেন প্রধান পরিদর্শকের অনুমোদন ক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত।

মেয়েদের এই উচ্চ শিক্ষায়তনকে কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয় বলা হয়। তবে কার্যক্রম ছেলেদের মধ্য বিদ্যালয়েরই মতো।

মেয়েদের জন্য অন্য এক ধরণের ইস্কুলও আছে তাকে বলা হয় গার্হস্থ্য উচ্চবিদ্যালয় (Domestic High Schools for Girls)। এখানে মেয়েরা প্রাথমিক ইস্কুল সাঙ্গ করে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিয়ে পডতে আসে। ৪ বছরের ইস্কুল এগুলো। যদি কোন মেয়ে উচ্চতর শিক্ষালয়ে যেতে চায় তবে গার্হস্থ্য ইস্কুলের ছাত্রীদের মাত্র দুবছর পডতে হয়, আর উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দুই বা তিন বছর ধরে পডতে হয়।

ছেলেদের উচ্চতর বিদ্যালয় :

বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী শিক্ষায়তন হচ্ছে এই উচ্চতর বিদ্যালয়। আমাদের দেশের কলেজের মতো এর চরিত্র। যদিও বর্তমান গ্রন্থে এই ইস্কুলের কথা অপ্রাসঙ্গিক। তবু জাপানে এই ধরণের বিদ্যালয়কেও ইস্কুল বলা হ'ত ব'লে এদের ইতিহাস একটু লিপিবদ্ধ করি।

এই ধরণের ইস্কুলের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে টোকিও সহরে স্থাপিত ইংরাজি শিক্ষার ইস্কুলটি। কিছুদিনের মধ্যেই চার বছরের পাঠ্য তালিকা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার প্রস্তুতি ইস্কুল হিসাবে এটি পরিগণিত হ'ল। এখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ছেলেরা আইন, বিজ্ঞান এবং সাহিত্য প্রভৃতি বিশেষ শিক্ষায়তনে যোগদান করত। এই ধরণের ইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ বিদেশী ভাষা শিক্ষা। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক বিদেশীভাষায় রচিত হত, অনেক অধ্যাপক বিদেশীভাষাতেই পডাতেন। কাজেই বিদেশীভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান বিদ্যালয় পাঠেচ্ছুদের এই ইস্কুল থেকে সংগ্রহ করতে হত।

এই শিক্ষার চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৮৮৬ সালের দিকে মধ্য বিদ্যালয় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল—(১) সাধারণ এবং (২) উচ্চতর।

১৮৯৪ তে উচ্চতর মধ্য বিদ্যালয়ের নামকরণ হল 'উচ্চতর বিদ্যালয়, (higher Schools)।

সৈয়দ রস মাসুদ ১৯২৩ সনে বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতেই এই উচ্চতর বিদ্যালয়কে দুই প্রকারের করা হবে

(ক) সাতবছরের কার্যক্রম

(খ) তিন বছরের কার্যক্রম।

প্রথম শ্রেণীর ইস্কুলের প্রথম চার বছর সাধারণ শিক্ষার জন্য; মধ্য ইস্কুলের প্রথম চার বছরের অনুরূপ; পরবর্তী তিন বছরের পাঠ্যতালিকা বিশেষ উন্নত শিক্ষার জন্য।

শেষোক্ত শ্রেণীতে মাত্র তিন বছরের উন্নত শিক্ষার পরিচালনা থাকবে। এই উচ্চতর শিক্ষার দুটি ধারা—(১) সাহিত্য এবং (২) বিজ্ঞান। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা আইন বা সাহিত্য পড়বে তারা প্রথমটি নেবে আর যারা ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি পড়বে—তারা নেবে বিজ্ঞান-শিক্ষা। আবার যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চায় না অথচ বিশেষ ভাবে কোন একটি বিষয় শিখতে চায়—তাদের জন্য একবছরের একটি উন্নত পাঠ্যতালিকার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অর্থাৎ উচ্চতর বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারে অথবা ঐ ইস্কুলেই একবছরের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হ'তে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ববর্তী শিক্ষা ব্যবস্থা জাপানে এই কয় প্রকারেরই ছিল ১৯৪৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত।

কারিগরী শিক্ষালয় :

জাপানের ইতিহাসে দেখেছি কারিগরী ও বাণিজ্য নিয়ে তাদের সমাজ অগ্রসর হয়েছে। তাদের কারিগরী শিক্ষার প্রথা নিশ্চয় ছিল। তবে এই প্রচলিত প্রথার সঙ্গে পশ্চিমী-সভ্যতায় পুষ্ট ১৮৭০ এর পরবর্তী শিক্ষাব্যবস্থার প্রভেদ আছে। পূর্বের প্রথার মধ্যে পারিবারিক নিয়মতন্ত্র বিদ্যমান ছিল; নতুনের মধ্যে সেটি নেই।

পূর্ব-ব্যবস্থায় শিক্ষানবিশীর দিকটিই অনুসৃত হ'ত। কোন প্রকার বৃত্তিকরী শিক্ষা নিতে হলে এই শিক্ষানিবিশীকাল কোন এক ব্যবসায়ী বা কারিগরের শিক্ষা তত্ত্বাবধানে কাটাতে হত। তাদের প্রাথমিক শিক্ষা রপ্ত হলে, ১৫ বা ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই তারা নাম মাত্র বেতনে ঐ ব্যবসায়ী

বা কারিগরের অধীনে অধিকতর দায়িত্ব নিয়ে কাজকর্ম করত। খাওয়া-পরা এই প্রভু-শিক্ষকই দিতেন। শিক্ষার্থী সেই পরিবারের একজন ব্যক্তি হিসাবে গৃহীত হ'ত।

তারপর এই শিক্ষানিবিশী আরও অগ্রসর হলে, অনেক সময় স্বাধীন ব্যবসা করার জন্য এই প্রভু-শিক্ষকই তাকে অর্থপ্রদান করতেন। এই অর্থপ্রদানে একটি সর্ত থাকত যে, প্রভু-শিক্ষকের ব্যবসায়ের নামানুসারেই নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি চালু হবে। এমনি ক'রে পরিবারতন্ত্রের নীতি এবং একচেটিয়ার ব্যবসায়ী প্রথা দৃঢ় করা হত।

এই শিক্ষানবিশী পাঠে সাহিত্য-শিক্ষা প্রায় কিছুই ছিল না। কেবল চিঠি মুসাবিদা করা মাত্র। কিছু অঙ্ক, কিংবা সন্ধ্যাবেলায় ব্যবসায়ের হিসাব রক্ষণ জানত। প্রধান পাঠ্যক্রম ছিল দৈনিক ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করা।

তারপর, ১৮৬৯ থেকে পাশ্চাত্যের নতুন কারিগরী শিক্ষা সুসংবদ্ধ ক'রে শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবা হল। ১৮৭১ সালে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করা হয়। 'পাবলিক ওয়ার্কস' বা সরকারী জন-কর্মাধিকারের সঙ্গে যুক্ত এই প্রতিষ্ঠান। কেবল ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করা ছিল এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। এখানকার শিক্ষকেরা ছিলেন ইংরেজ; জাপান সরকার তাঁদের ইংলণ্ড থেকে নির্বাচন ক'রে আনে। ১৮৮৬ সালের পর এই বিদ্যালয়টি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে উন্নীত হয়।

১৮৭৪ সালে কৃষি বিদ্যায়তন এবং ১৮৭৭-এ বন-বিভাগীয় শিক্ষার ইস্কুল টোকিওতে প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৯০ সালে এই দুইটি বিদ্যালয় একত্রিত হয়ে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কৃষি-কলেজে রূপান্তরিত হল। বাণিজ্য শিক্ষার জন্যও ১৮৭৫ সালে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৮৮১ সালে কারিগরদের জন্য একটি ইস্কুল খোলা হল। এই ইস্কুলে বিভিন্ন ধরণের শিল্প-কারখানা উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হত পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক পন্থায়। এই ইস্কুলই পরবর্তী কালে টোকিও হাইয়ার টেকনিক্যাল ইস্কুল নামে খ্যাত হয়।

সঙ্ক্ষেপে এই-ই হচ্ছে জাপানের কারিগরী বিদ্যালয়ের পূর্ব ইতিহাস। এই কারিগরী বিদ্যালয়ের মধ্যে থাকে—কৃষিবিজ্ঞান, বাণিজ্য বা ব্যবসায় বিজ্ঞান, মৎস্য-চাষ, পশু-চিকিৎসা, নৌবিদ্যা। তা ছাড়া ইঞ্জিনীয়ারিং সংক্রান্ত

শিক্ষা আছেই। এই সব বিদ্যালয়ের চারটি স্তর : (১) বিশ্ববিদ্যালয় স্তর; (২) উচ্চস্তর, (৩) মধ্যস্তর, (৪) নিম্নস্তর।

উচ্চস্তরের মধ্যেই পড়ে কারিগরী শিক্ষার কলেজ বা ইস্কুল। এগুলিকে বিশেষ বিদ্যালয়ও বলে (Special Schools)। মধ্যস্তরের কারিগরী ইস্কুলকে যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাতে উচ্চতর প্রাথমিক ইস্কুল সাঙ্গ ক'রে ১৪ বছর বয়সে ভর্তি হ'তে হয়। আর নিম্নস্তরের বিদ্যালয়ে সাধারণ প্রাথমিকের ছাত্র ১২ বছর বয়সে ভর্তি হয়।

এ সব ইস্কুল ছাড়া আছে অব্যাহত কারিগরী বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় হচ্ছে তাদেরই জন্য যারা প্রাথমিক ইস্কুল উত্তীর্ণ হয়ে মধ্য ইস্কুলে যাবে না অথচ কিছু কারখানা শিল্প বিদ্যা শিখে আত্মনির্ভর হতে চায়। এই জন্য এই সব ইস্কুলে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। এই ইস্কলের দুই রকম পাঠ্য-তালিকা, নিম্ন আর উচ্চ। সাহিত্য ও নীতিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এখানে স্বাস্থ্যচর্চা এবং লোকশাসন (legislation) জানবার ব্যবস্থাও আছে। অর্থাৎ এই ইস্কুলই যেন একপ্রকারের স্বয়ংসম্পূর্ণ ইস্কুল। উচ্চতর বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে না পড়তে পেয়ে তারা যে অজ্ঞ সমাজ-ব্যক্তি হয়ে পড়বে সে সম্ভাবনা নেই। কারিগরী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমও একেবারে একরোখা হয়ে পড়ে না।

জাপানী কারিগরী বিদ্যালয়ের এ একটি স্বতন্ত্র চরিত্র যা এশিয়ার অন্য দেশে সে সময় দেখতে পাওয়া যায় নি।

নর্মাল ইস্কুল :

শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য দুরকমের নর্মাল ইস্কুল আছে। নর্মাল ইস্কুল আর উচ্চতর নর্মাল ইস্কুল।

১৮৭২ সালে টোকিওতে প্রথম নর্মাল ইস্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৭৫ সালে সমস্ত জেলায় নর্মাল ইস্কুল খুলবার আদেশ করা হয়। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ এর মধ্যে সরকার নিজের তত্ত্বাবধানে ৫।৬ টি এই ইস্কুল খুলেছিল। কিন্তু ১৮৭৫ থেকে তার অনেকগুলো উঠিয়ে দিয়ে ২টি মাত্র রাখা হ'ল। টোকিও সহরের এই দুটি ইস্কুল উচ্চতর নর্মাল ইস্কুলে পরিণত হল। প্রত্যেক নর্মাল ইস্কুলের সঙ্গে একটি ক'রে আদর্শ-ইস্কুল সংযুক্ত।

এই নর্মাল ইস্কুলের বিভিন্ন রকমের পাঠ্যতালিকা :

(১) প্রস্তুতি পাঠ্যক্রম — ১ বৎসর শিক্ষণীয় কাল,

(২) নিয়মিত — 'ক' বিভাগ—৪ বছর ,,

'খ' বিভাগ—১ বা ২ বছর ,,

(৩) বিশেষ স্বল্পকালীন ,, — এক বছরের কিছু বেশী।

প্রস্তুতি পর্যায়ের পাঠ্যক্রম শেষ ক'রে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের 'ক' বিভাগে ভর্তি হ'তে হয়। শিক্ষার্থীকে সৎস্বভাব ও সুস্বাস্থ্যের হ'তে হয়;,এবং উচ্চপ্রাথমিকের দুবছর শেষ করার পর ১৪ বছর বয়স হ'লে তবে এখানে প্রস্তুতি পর্যায়ে ভর্তি হওয়া যায়। নিয়মিত 'ক' বিভাগের বয়স ১৫, এবং হয় নর্মাল ইস্কুলের ১ নং পাঠ্যক্রম অথবা উচ্চপ্রাথমিকের ৩ বছরের পড়া সঙ্গে ক'রে আসতে হয়।

যারা মধ্যবিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ এবং ১৭ বছর বয়স (মেয়েদের বেলাতে ১৬) তারাই ২ নম্বরের 'খ' বিভাগে ভর্তি হ'তে পারে।

নিয়মিত শিক্ষকদের জন্য ৩ নম্বরের পাঠ্যক্রম।

নিয়মিত 'ক' ও 'খ' বিভাগের পাঠ্যতালিকা অনেকটা মধ্যবিদ্যালয়েরই মতো তবে শিক্ষাশাস্ত্র পড়তে হয়। 'ক' বিভাগের থেকে 'খ' বিভাগে শিক্ষাশাস্ত্র একটু বেশি পড়তে হয়।

উচ্চতর নর্মাল ইস্কুল (ছেলেদের জন্য) মাত্র দুটি, নর্মাল ইস্কুল, মধ্য বিদ্যালয় প্রভৃতির শিক্ষকদের জন্য এই ইস্কুল। এক একটি ইস্কুলে ৮০০ ছাত্র, ৯৩ জন অধ্যাপক।

৬ রকমের পাঠ্যতালিকা—(১) সাহিত্য বিভাগ (৩টি শ্রেণী)—৪ বছরের; (২) বিজ্ঞান বিভাগ (৩ শ্রেণী) ৪ বছরের; (৩) শরীর চর্চা বিভাগ ৪ বছরের (৪) স্নাতকোত্তর শ্রেণী ১ বা ২ বছরের (৩) নীতি ও শিক্ষার উন্নত পাঠ্যতালিকা—২ বছরের (৬) শিল্প ও কায়িক শিক্ষণের—৩ বছর।

প্রথম তিনটিতে ভর্তি হয় যারা নর্মাল বা মধ্যবিদ্যালয় উত্তীর্ণ, এবং ইস্কুলের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত। একটি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে ভর্তির সময়।

এই ৪ বছরে কেবল শিক্ষানীতি ও শাস্ত্রই নয়—অন্যান্য সাধারণ এবং বিজ্ঞান বিষয় গভীরভাবে পড়ানো হয়।

এই নর্মাল ইস্কুল ছাড়া জাপানে সঙ্গীত, অঙ্কন, বা বিদেশী ভাষা শিক্ষার ইস্কুল আছে; মূক বধিরদের ইস্কুলও আছে।

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ :

শিক্ষামন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা। তিনিই সম্রাটের কাছে শিক্ষাবিষয়ে দায়ী থাকেন। তাঁর একজন সহকারী মন্ত্রী থাকেন। মন্ত্রী নিজে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

মন্ত্রণাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত ৬টি পর্ষদ।

(১) উচ্চতর শিক্ষা পর্ষদ।

(২) সাধারণ " "

(৩) কারিগরী " "

(৪) পাঠ্যপুস্তকের "

(৫) ধর্ম " "

(৬) দপ্তর পর্ষৎ।

বিশজন পরিদর্শকও মন্ত্রীব সরাসরি অধীনে; তাঁরা দেশের ইস্কুল-কলেজ প্রভৃতি পরিদর্শন করে তার বিবরণ মন্ত্রীকে জানান।

প্রত্যেক পর্ষৎ আবার কয়টি শাখায় বিভক্ত। যেমন,

(১) উচ্চতর শিক্ষা পর্ষৎ—প্রথম শাখা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত করে; উচ্চতর শিক্ষায়তন এবং অধ্যাপক শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারের নিয়ামক। দ্বিতীয় শাখা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয, কলেজ, (কারখানা বা কারিগরী কলেজ বাদে) প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে; শিল্প প্রদর্শনীও পরিচালনা করে। তৃতীয় শাখা নানারকম উপাধি বিতরণ এবং ভূমিকম্প, ভূমিব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়।

(২) সাধারণ শিক্ষা পর্ষৎ : প্রথম শাখা দেখে কিণ্ডার গার্টেন, প্রাথমিক ইস্কুল, নর্মাল ইস্কুল, উচ্চতর নর্মাল ইস্কুল। দ্বিতীয় শাখা তত্ত্বাবধান করে মধ্য বিদ্যালয় এবং তাদের শিক্ষকদের। তৃতীয় শাখা এই সব বিদ্যালয়ের অন্যান্য দিক।

৪র্থ শাখা নিয়ন্ত্রিত করে—সামাজিক শিক্ষা, বিশেষ বক্তৃতা, গ্রন্থাগার মূক-বধির অন্ধদের শিক্ষালয়।

সাধারণ শিক্ষা পর্ষদের এই চারটি শাখা।

(৩) কারিগরী শিক্ষা-পর্ষৎ। এরও চারটি শাখা।

(৪) পাঠ্যপুস্তক পর্ষদেব দুটি শাখা।

(৫) ধর্মশিক্ষা পর্ষদের শাখা দুইটি মাত্র।

(৬) দপ্তর পর্ষদের শাখা পাঁচটি।

এ ছাড়া ইস্কুল পরিদর্শকদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত কবা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগেব নির্দিষ্ট কার্যবিধি আছে।

মোটামুটি এইই হচ্ছে ১৯৪৫ সালেব আগেকাব শিক্ষা ব্যবস্থা। ১৯৪৫ সালের পব আমেরিকা অধিকৃত হয়ে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা আমেবিকাব রীতি-নীতি গ্রহণ কবতে বাধ্য হবে সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।